রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস

নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেন

রৈবতক কুরুক্ষেত্র-প্রভাস

সম্পাদনা ও ভূমিকা
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল.,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(দ্বিতীয় সংস্করণ--১৯৬৬)

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :

শ্রীজানকীনাথ বসু, এম. এ.,

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড,

১, শংকর ঘোষ লেন,

কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ—১৯৬০

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬৬

মূল্য—আট টাকা

মুদ্রাকর :

শ্রীপরিমলকুমার বসু

বসুশ্রী প্রেস

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

সম্পাদকের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রায় এক বৎসর পূর্বে নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে বলিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। যাহা হউক, বুকল্যাণ্ডের কর্মী-বন্ধুদের সহযোগিতায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই মুদ্রণকার্য সুচারুরূপে সমাধা করা গিয়াছে। এবার মুদ্রণ-সৌষ্ঠবও বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রন্থের পরিসরও কিছু বাড়িয়াছে।

যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে পাঠ নির্ণয় করা হইলেও ত্রুটি-একটি মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়িতেছে, আশা করি তাহার জন্য পাঠকগণ কিছু মনে করিবেন না। অধুনা অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সংস্কৃতি লইয়া নানা গবেষণায় মাতিয়াছেন, গত শতাব্দীর মধ্যেই আধুনিক বাঙালীজীবনের মর্মরহস্য লুকাইয়া আছে, একথা আজ অনেকেই সমাজবিবর্তনের ইতিহাস অবলম্বনে বিচার বিশ্লেষণ করিতেছেন। সেই দিক হইতে নবীনচন্দ্রের এই 'ত্রয়ী' কাব্য সংস্কৃতি বিচারের উপাদান হিসাবে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অ. কু. ব.
বাংলা বিভাগ,
১৩৭৩ ॥ ১৯৬৬

(প্রথম সংস্করণ)

নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস প্রকাশিত হইল। শুধু কাব্যধর্মের জন্যই কাব্যের মূল্য নহে, ইহার পশ্চাতে একটা বিশেষ দেশ ও কালের ইতিহাস লুকাইয়া থাকে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূল্য যেরূপ হউক না কেন, তদানীন্তন বাঙলাদেশের পটভূমিকায় তাঁহার রচনাবলীর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ কী ভাবে বাঙলাদেশের চিত্তলোকে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, পুরাতন ও নূতন ভাবাদর্শের যুগসন্ধি হইতেছিল, সেই সমস্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই কাব্যত্রয়ে নিহিত আছে। সেইজন্য এখনও এগুলির অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তিনখানি কাব্যের একত্রে মুদ্রণের কারণ—পাঠকগণ ইহার মধ্যে মূল কাহিনীর বিকাশ ও বিস্তার লক্ষ্য করিতে পারিবেন, নবীনচন্দ্রের মনোভাবটিও স্পষ্টতর হইবে।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় কবির জীবৎকালের সংস্করণের পাঠের সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের পাঠ মিলাইতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার প্রীতিভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ. ভূমিকার কিয়দংশের প্রেসকপি তৈয়ারী করিয়া দিয়া আমার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছেন।

ভূমিকায় নবীনচন্দ্রের জীবন, রচনাবলী ও মনোবিকাশের ধারা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অধুনা কালধর্মে নবীনচন্দ্রের কাব্যের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি এই কাব্যপরিচয় পাঠে যদি কাহারও মূল কাব্য পড়িবার ইচ্ছা জাগে, এই আশায় নানা বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করিয়াছি। মহাকাব্যের লক্ষণ, ইতিবৃত্ত, য়ুরোপের রেনেসাঁস ও আধুনিকতা, তাহার সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সম্পর্ক, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ও নবীনচন্দ্র—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বক্তব্য-বিষয়কে সুপরিস্ফুট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি, তাহা পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে বুকল্যাণ্ডের কর্মাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, এম. এ., মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি উদ্যোগী হইয়া মুদ্রণের সুব্যবস্থা না করিলে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয় একত্রে প্রকাশ করিতে সাহসী হইতাম না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অ. কু. ব.

১৩৬৭ ॥ ১৯৬০

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গসরস্বতীর সেবা করিয়া বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য একথা সত্য—"নবীনচন্দ্র সেনের কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদের আজ আর কোনও মোহ নাই, তাঁহার কাব্যের মহৎ গুণগুলির সঙ্গে মহৎ দোষগুলির আলোচনাও বিস্তারিতভাবে হইয়াছে।"[১] তবু আমরা কেন কবির 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস' কাব্যের পুনর্মুদ্রণ ও আলোচনার প্রয়াস করিতেছি, সে সম্বন্ধে দুই-একটি কথা নিবেদন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কবি হিসাবে নবীনচন্দ্রের মূল্য যাহাই হউক না কেন, একটা বিশেষ যুগ ও জীবনে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এবং তাহার দ্বারা বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন প্রয়াস পাঠক ও সমালোচকের আবশ্যিক কর্তব্য। সাহিত্য-বহির্ভূত মানদণ্ড সাহিত্য বিচারে যেমন ব্যর্থ, তেমনি কবির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাসও উদ্দিষ্ট ফললাভে বঞ্চিত। তাই তদানীন্তন যুগ, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও ব্যক্তিমানসের সহিত অন্বিত কবিজীবন ও কাব্যকে মিলাইয়া দেখা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে বাংলা কাব্যের যে অদ্ভুত রূপান্তর হইয়াছে,—বস্তু, প্রকাশরীতি, মানসিকতা, দার্শনিক প্রত্যয় প্রভৃতি নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কাব্যকবিতা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় একান্ত দুর্লভ। নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ীকাব্য' সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনধারার এক-একটি বিস্ময়কর তরঙ্গভঙ্গ। তাই আধুনিককালের পাঠকচিত্ত নবীনচন্দ্রের কাব্যপাঠে সেযুগের পাঠকের মতো উৎসাহিত না হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-মানসের অন্তর্গূঢ় পরিচয় লাভের জন্যও নবীনচন্দ্রের ঐ কাব্যত্রয়ের (রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস) পরিচয় গ্রহণ করা কর্তব্য। টি. এস. এলিয়ট ড্রাইডেনের কবিতায় অবগাহন করিয়া মানসিক রসভোগের আনন্দলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদেরও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি সম্বন্ধে উন্নাসিকতার প্রশ্রয় না দিয়া বরং এই যুগের মারফতে সমগ্র যুগমানসটি বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

---

১ কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত নবীনচন্দ্রের 'প্রভাস' কাব্যের মুখবন্ধে ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উক্তি।

॥ কবিজীবনী ॥

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন, "কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?" কবির জীবনচরিতে কবিকাহিনী যথার্থতঃ ধরা পড়ে না। সে জীবনচরিত যদি আবার অন্য কাহারও রচিত হয়, তাহা হইলে কবির স্বরূপনির্ণয় আরও দুরূহ হইয়া পড়ে। কারণ কবির ব্যক্তিগত জীবন—অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কতকগুলি চিরাচরিত পথ ও পরিচিত প্রকৃতি আছে যাহার দ্বারা কবির ভূমিচারী ব্যক্তিসত্তাটিকে চিনিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু কবির সারস্বত জীবনের মর্মগূঢ় রহস্য বাহিরের লোকের নিকট কি করিয়া ধরা দিবে ? এই জন্য কবির কাব্য-জীবনী উদ্ধার করিবার জন্য আমরা কবির আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ডায়েরি প্রভৃতির খোঁজ লইয়া থাকি। রাবণ-অপহৃতা সীতা যেমন রামচন্দ্রকে পথের নিশানা দিবার জন্য আকাশ হইতে অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তেমনি কবিদের আত্মকথা ও চিঠিপত্রাদিতে কাব্যসূত্র প্রচ্ছন্ন অবস্থায় নিহিত থাকে। আমাদের সৌভাগ্য, নবীনচন্দ্র পাঁচখণ্ডে রচিত নিজের জীবনকথা 'আমার জীবন' (১৯০৮-১৯১৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত) এবং সহধর্মিণী ও বন্ধুজনের নিকট লিখিত চিঠিপত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'আমার জীবন' অবলম্বনে নবীনচন্দ্রের পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও কাব্যজীবনের এমন সমস্ত গূঢ় পরিচয় পাওয়া যায় যে, অপরের রচিত কবিজীবনীতে তাহার অনেক তথ্যই অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়া যাইত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া লওয়া ভাল। 'আমার জীবন'-এর উপর পুরাপুরি নির্ভর করিলে কবিজীবনবিচারে আমাদিগকে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িতে হইবে। আত্মজীবনী অধিকাংশস্থলে আত্মগোপন-প্রয়াসী এবং আত্মপ্রচারকামী। কেহ কেহ নিজ জীবনের সদ্‌দৃষ্টান্ত-গুলিকে সারি দিয়া সাজাইয়া বাহবা পাইতে চাহেন, কেহ নিজের অপূর্ণ কামনা ও খণ্ডিত জীবনকে আদর্শায়িত কল্পিতরূপের মধ্যে পূর্ণতা দিতে চাহেন, কেহ-বা কল্পিত অপরাধের বোঝা স্বেচ্ছাক্রমে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া এক প্রকার আত্মধর্ষণকামী নৈতিক তৃপ্তি পাইতে চাহেন। নবীনচন্দ্রের মতো আবেগপ্রবণ, অসংযতবাক্ ও স্বেচ্ছাচারী কবির আত্মজীবনী অনেক সময়ে তাঁহার কাব্যপাঠককে বিপথে পরিচালিত করে। তাঁহার চশমার মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয় বলিয়া পাঠকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক।

নবীনচন্দ্র আত্মজীবনী রচনায় একটি আনুবীক্ষণিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন; ফলে তাঁহার জীবনের ভুলভ্রান্তি, আশানৈরাশ্য, গুণাগুণ—সমস্তই 'আমার জীবন'-এর মধ্যে বড় আকারে ধরা পড়িয়াছে।

কোন কোন ফলের বাহিরের অংশ পরিপুষ্ট হইলেও ভিতরে কিছু কাঁচা থাকিয়া যায়। নবীনচন্দ্রের দেহের বয়স বাড়িলেও মনের বয়স বাড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ হয়। চট্টগ্রামের দুর্বিনীত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিশোরটি দীর্ঘ বাষট্টি বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিলেও কোন দিন পৌগণ্ডসীমা অতিক্রম করেন নাই। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের ধর্ম—আত্মপ্রীতি ও আত্মকেন্দ্রিকতা; সমস্ত

জগৎ যেন কিশোরটিকেই ঘিরিয়া আবর্তিত হয়; বিশ্বনাটকের সে-ই সূত্রধার এবং নায়ক। জগৎ ও জীবন তখন একটি ব্যক্তিচিত্তের রঙে রঙিন হইয়া ওঠে। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন'-এ ঠিক তাহাই হইয়াছে। আত্মজীবনী রচনা করিতে গেলে যে-জাতীয় নিঃস্পৃহতা প্রয়োজন, নবীনচন্দ্রের চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। তাই উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষী এই আত্মজীবনী উপন্যাসেই পরিণত হইয়াছে। এই উপন্যাসের পটভূমি—চট্টগ্রাম, কলিকাতা, যশোহর, ভবুয়া, পুরী, বিহার, নোয়াখালি, রানাঘাট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা। ঘটনা—পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি, আশাভঙ্গ, আত্মীয়দের নির্যাতন, ডেপুটি জীবনের অভিশাপ। পরিসমাপ্তি—১৯০৪ সাল, ১লা জুলাই; এই তারিখে কবি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই ধরনের আত্মজীবনীতে সত্যের অতিরঞ্জন স্বাভাবিক। তদুপরি কবি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং আচার-আচরণ ও সংলাপে অসতর্ক ও অসংযত ছিলেন। ওলডহ্যাম্ নামক এক উপরওয়ালা কবির বল্‌গাহীন রসনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "impulsiveness of your expression."[২] সমগ্র কবিজীবনী এই রূপ impulsiveness of expression-এ এমন আকীর্ণ যে, অনেক সময় ইহাতে কবির আসল স্বরূপ ঢাকিয়া গিয়াছে। কবি ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া নিঃস্পৃহতার উচ্চলোকে উঠিতে পারেন নাই বলিয়া নিজ জীবনের ভালমন্দ ও সুখদুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া এই আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি কৈশোর ও প্রথম যৌবনের 'ডন জুয়ানী' লীলার স্মৃতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন; নিজে চরিত্র ও নীতির পরিপোষক হইয়াও বিবাহিতা মহিলার আবেগোন্মত্ত প্রণয়লিপি বহু আকাঙ্ক্ষার ধনরূপে শিরোধার্য করিয়াছেন।[৩] কবি যাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে স্বর্গের দেবতার পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আবার যাহার নিকট প্রতিকূল ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাকে নরকস্থ করিয়াছেন। কখনও তিনি কাহারও প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কখনও-বা নিন্দায় কলকণ্ঠ। এই নিন্দা-প্রশংসা—সমস্তই কবি ব্যক্তিগত দিক হইতে বিচার করিয়াছেন; অযাচিত দানকে তিনি ভক্তি-কৃতজ্ঞতা প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন, অপ্রত্যাশিত আঘাতকেও শতগুণে ফিরাইয়া দিয়াছেন। ফলে 'আমার জীবন' অবলম্বনে কবির অন্তর্জীবনের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করা কিছু দুরূহ। যাহা হউক আমরা সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

১৮৪৭ সালে (১৭৬৮ শকাব্দ, ২৯ মাঘ) ১০ই ফেব্রুয়ারী নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপীমোহন রায়, মাতা—রাজরাজেশ্বরী দেবী। কবি 'রায়' উপাধি ত্যাগ করিয়া বৈদ্য বংশের সেন উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণী অঞ্চলে বাস করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় সম্ভবতঃ এই বৈদ্যবংশ প্রথমে ত্রিপুরা জেলার চকসাইর পরগণায় বাস্তু স্থাপন করেন; কিছুদিন পরে তাঁহারা হাটহাজারী থানার অন্তঃপাতী 'মেখলা' গ্রামে চলিয়া আসেন। পরিশেষে চট্টগ্রামে, কর্ণফুলীর উত্তর তীরে নয়াপাড়া গ্রামে তাঁহাদের স্থায়ী বাস্তু নির্মিত হয়। কবির বংশকুলজীতে

২ নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড; পৃঃ ১৮।

৩ ঐ, পৃঃ ১১৬। কবি 'আমার জীবন'-এর ৫ম খণ্ডে এই 'নিষ্কাম' প্রণয়লিপিটি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"পুত্রকে বলিয়া রাখিয়াছি, এই পত্রখানি যেন আমার চিতানলে সমর্পিত হয়।"

'রাঢ়ভঙ্গ' লেখা আছে; অর্থাৎ তাঁহারা রাঢ় দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। এই জন্য নবীনচন্দ্র বরাবর রাঢ়ভূমির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন। বরং সময়ে সময়ে পূর্ববঙ্গ, বিশেষতঃ ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলকে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র অনুকরণে তিনি বিদ্রূপচ্ছলে 'শ্রীপাট' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রতিও তাঁহার কোনরূপ মমতা ছিল না। তাঁহার উক্তি—"আমি আশৈশব পূর্ববঙ্গের ভাষার ঘোরতর বিদ্বেষী ছিলাম"।[৪] তাঁহাদের পরিবারে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহা রাঢ়ভাষার অধিকতর অনুগত। তিনি কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট ভাষা এমন নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে চট্টগ্রামবাসী বলিয়া চিনিতেই পারিত না। তাঁহার এইরূপ কৃতিত্বে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—সকলেই তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কবিও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষায় মাতৃভাষাবৎ কথা বলিতে পারিতেন বলিয়া গর্ব বোধ করিতেন।

নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পর্বত ও নদীপথের রমণীয় পরিবেশ, পিতা গোপীমোহনের সস্নেহ সতর্কতা, বংশের কাব্যপ্রীতি এবং বালক বয়সের কাব্যানুরক্তির পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যে অতিশয় দুর্বিনীত ছিলেন বলিয়া তিনি 'Wicked the Great' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত সুযোগ্য রাজকর্মচারী সরকারের নিকট কোন খেতাব পান নাই বটে, কিন্তু বাল্যে-অর্জিত এই প্রশংসনীয় উপাধিটি তিনি পরবর্তী জীবনেও সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন; কাজেই পাঠশালার বাঁধাগতের পড়াশুনা সাঙ্গ করিতে সামান্য সময় অতিবাহিত হইত। বাকি সময়টা তিনি বিশুদ্ধ দুষ্টামি করিয়া কাটাইতেন। স্কুলের শিক্ষকগণ এবং পাড়ার সকলে তাঁহার 'নিরীহ দুষ্টামি'র জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। উদ্ধত শিক্ষকের উদরে প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া তিনি যে বিশেষ কুণ্ঠিত হইতেন তাহা মনে হয় না।[৫]

শৈশবে পাঁচবৎসর বয়সে হাতেখড়ি দিয়া কবির বিদ্যারম্ভ হয় এবং নয়াপাড়া গ্রামে তিন বৎসর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যালাভ হয়। তারপরে তিনি আট বৎসর বয়সে স্কুলে পড়িবার জন্য চট্টগ্রাম শহরে প্রেরিত হন। তাঁহার পিতা চট্টগ্রাম আদালতের পেস্‌কার ছিলেন, পরে সেরেস্তাদার, এবং পরিশেষে উকিল হইয়াছিলেন। পিতার সহিত শহরের বাসায় থাকিয়া তিনি স্কুলে পড়িতে লাগিলেন এবং নিত্য নূতন দৌরাত্ম্যে চট্টগ্রাম শহর ও স্কুলগৃহকে কাঁপাইয়া তুলিলেন।

কবির আত্মীয়-স্বজন, বিশেষতঃ পিতা ও পিতৃব্যের কিছু কাব্যানুরাগ ছিল। বাল্যকাল হইতেই নবীনচন্দ্র সাহিত্যের পরিবেশে বর্ধিত হন এবং কাব্যানুরাগ অর্জন করেন। শৈশবেই তিনি সুর করিয়া পুঁথি ও বটতলা প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যাদি পাঠ করিয়া জননী ও অন্যান্য পুরমহিলাদিগকে তৃপ্তি দান করিতেন। যখন তিনি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর (আধুনিক কালের পঞ্চম শ্রেণী) ছাত্র, বয়স অনুমান দশ-এগার, তখন হইতেই তাঁহার কাব্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়;

৪ নবীনচন্দ্রের রচনাবলী (সা. প. সং) ১ম খণ্ড পৃ ৩৯

৫ নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯-৪০

ঐ বালক-বয়সেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অনুকরণে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। স্কুলের এক পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে নবীনচন্দ্র সতের বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম স্কুল হইতে এনট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার মত দুর্দান্ত কিশোরের এই কৃতিত্বে চট্টগ্রামবাসীরা বিস্মিত হইলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার এক আত্মীয়া-কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু পারিবারিক বাধার জন্য বিবাহ হয় নাই। কবি দীর্ঘ দিন সেই প্রথম অনুরাগের 'প্লেটোনিক' স্মৃতি বহন করিয়াছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্রাহ্ম-মতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, স্ত্রীস্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগদান করেন। যদিও তিনি শাক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা শাক্ত মতাবলম্বী ছিলেন, তবু কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিয়া নবীনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থিত বাটীতে দুই ব্রাহ্ম বন্ধুসহ নিত্য হাজিরা দিতেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার এক বন্ধু ব্রাহ্ম সম্পর্ক ত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবনে কবি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগকে কারণে অকারণে নিন্দাবিদ্রূপ করিতেন। বোধ হয় তরুণ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া কবি নূতনের মোহে ব্রাহ্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; সেই বয়সে তাঁহার অন্তরে কোনরূপ ভক্তিভাব জাগিতে পারে নাই। পরবর্তী জীবনে সরকারী প্রয়োজনে পুরীধামে বদলি হইবার পূর্বে তাঁহার চিত্তে ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয় নাই।

কলিকাতায় অধ্যয়ন করিবার সময়ে এক ধনবানের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে তিনি ঘোরতর আপত্তি করেন এবং কোনও প্রকারে রক্ষা পান। কবি কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃ-সন্ধিকালে লক্ষ্মী নাম্নী এক বালিকার রূপগুণের কথা শুনিয়াই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কবি পরিহাস করিয়া এই অদর্শনে প্রেমকে 'Love at no sight' বলিয়াছেন। কবির নির্বন্ধাতিশয্যে এই বালিকা লক্ষ্মীই কবির সহধর্মিণী হন। তখন কবির বয়স উনিশ এবং স্ত্রীর বয়স দশ। তখনও তাঁহার ফার্স্ট্ আর্টস্ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ পূর্বরাগমূলক (অবশ্য "শ্রবণাদিজা"); কাজেই এই বিবাহোপলক্ষে চট্টগ্রাম তোলপাড় হইয়াছিল। এই বিবাহে খানিকটা মধ্যযুগীয় রোমান্স ও 'ডনজুয়ানী' ভাব ছিল। কবি কোনও দিনই 'ডনজুয়ানী' ভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এমন কি, যখন তিনি বিবাহিত, তখনও এক আত্মীয়কন্যার নিষ্কামপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। যাহা হউক তিনি ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাস করিয়া জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউশনে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পড়িবার সময় তাঁহার কবিশক্তি সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করে। ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম স্কুলে পড়িবার সময়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর (আধুনিক ৭ম মান হইতে ১০ম মান) মধ্যে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কিছু কিছু 'অবকাশরঞ্জিনী'তে স্থান পাইয়াছিল। এফ. এ. ক্লাসে পড়িবার সময়ে রচিত তাঁহার কবিতার কয়েক ছত্র উল্লেখযোগ্য—

ছিঁড়িয়াছে আশালতা মৃণালের সূত্র যথা
ছিঁড়ে মত্ত করিপদ দলনে।
সংসারের সুখ যত সকলই হয়েছে গত
কি কাজ তার দুঃখভরা জীবনে।

তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থাতে তিনি এই কবিতা রচনা করিয়া কলিকাতার সাহিত্যসমাজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। একটু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে—

এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে
দীনভাবে, ম্লানমুখে, বসিয়া দুঃখিনী।
ভাবিতেছে এ সংসারে কার তরে বাঁচে,
নীরবে বিরলে বসি কাঁদে একাকিনী।

অশ্রুজলে ছল ছল নয়নের তারা,—
অকালে শিশিরে কেন সিক্ত কমলিনী?
নীলোৎপল হতে ঝরে মুকুতার ধারা
কাহার লাগিয়া আহা! দিবস যামিনী?

এফ. এ. পড়িবার সময় হইতে 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত।

যখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন তাঁহাকে দারুণ দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। এতদিন পিতার প্রেরিত অর্থের দ্বারাই তাঁহার কলিকাতার ব্যয় নির্বাহ হইত। কিন্তু তাঁহার পিতা অতিরিক্ত দানশীলতা এবং জ্ঞাতিশত্রুদের সহিত মামলার ফলে ক্রমেই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছিলেন, অর্থসাহায্যও কমিয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ কবিকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া গোপীমোহনের মৃত্যু হইল, কবি তখন কলিকাতায় ছাত্র পড়াইয়া বাসা-খরচ চালাইতেছেন। তখনও বি. এ. পরীক্ষার কিছু বিলম্ব ছিল। 'ডন জুয়ান' নবীনচন্দ্র দুঃখের সমুদ্রতটে নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যিনি প্রথম যৌবনের প্রেমে, রোমান্সে, পরিহাসে-উচ্ছল মুহূর্তগুলি স্বপ্নের মতো অতিবাহিত করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহাতে ছেদ পড়িল! দারিদ্র্য-নিপীড়িত কবি কোন প্রকারে বাসা খরচ চালাইয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সস্নেহ করুণা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই মহাপুরুষের স্নেহাশীর্বাদ তিনি প্রসাদী নির্মাল্যের মতো চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্যে তাঁহার পরিবারবর্গ কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেও কলিকাতার স্বজনহীন প্রবাসে অতি দুঃখে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শুধু নিজ বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে তিনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলকাম হন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের পদ লাভ করিয়া ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ২৪ জুলাই মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে যশোহরে প্রেরিত হন। এই যশোহরে বাস করিবার সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়—জীবনে তাঁহার দ্বিতীয় শোক।

তদানীন্তন কলিকাতার ছাত্রজীবনেও কিছু কিছু আবিলতা প্রবেশ করিয়াছিল। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রের পানদোষ ছিল, কেহ-বা গণিকাপল্লীতেও যাতায়াত করিত। কোন কোন সহপাঠী কবিকে জোর করিয়া নিষিদ্ধ স্থানে লইয়া যাইত এবং সুরা পানে বাধ্য করিত। কবি তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য তাহাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। এইরূপে একবার এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে তিনি গণিকালয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার অভিলাষ—বন্ধুকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিবেন। এই পল্লীর একটি অল্পবয়স্কা গণিকা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মুমূর্ষু হইয়া পড়িলে কবির বন্ধুগণ হতভাগিনীকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল, কোন প্রতিবেশিনীও সাহায্য করিতে আসিল না। কবি সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে সেই গণিকার সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন। পরে সে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো ভক্তি করিত। নারীকে তিনি কোন দিন ঘৃণা করিতে পারেন নাই, গণিকাকেও সহৃদয়তার সহিত স্নেহ করিয়াছেন। কবি মানুষকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাই পঙ্ক হইতে পঙ্কজটিকে সযত্নে তুলিয়া লইতে দ্বিধা করিতেন না।

মাতার পদধূলি এবং স্বর্গতঃ পিতার আশীর্বাদ ললাটে ধারণ করিয়া কবি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ২৪ জুলাই তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের ভারপ্রাপ্ত হন এবং ১৯০৪ সালের ১লা জুলাই ছত্রিশ বৎসর সরকারী কর্ম করিয়া ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণীর ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেঃ কালেকটারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মচারী হিসাবে তাঁহার দক্ষতা বঙ্কিমচন্দ্রের সমতুল্য। অবশ্য তাঁহার মত ঋজু চরিত্র, স্পষ্টভাষী ও ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী ব্রিটিশ শাসনে যে তর্জিত হইবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ঊর্ধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ও 'কালা সিভিলিয়ান'—উভয় সম্প্রদায়ের রোষদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রে নিরতিশয় নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, ১৮৭৭ সালে প্রায় দেড় মাস তিনি 'সাসপেণ্ড' হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম অপরাধ—তিনি উপরওয়ালার নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত মূঢ় নির্দেশের প্রতিবাদ করিতেন; দ্বিতীয় অপরাধ—তিনি বিচারকার্যে সরকার অপেক্ষা জনসাধারণের কথা বেশি ভাবিতেন এবং বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে ধৃত আসামীকে প্রায়ই খালাস দিতেন। ফলে তাঁহার 'খালাসি হাকিম' বলিয়া সরকারী মহলে অখ্যাতি হইয়াছিল। তৃতীয় অপরাধ—তৎকালীন দেশনেতাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি সংবাদপত্রেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি এই সমস্ত সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ জানাইতে দ্বিধা করিতেন না। চতুর্থ অপরাধ—'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা। এই কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাকে সিডিসনের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। তাহা হইতে তিনি কোনক্রমে রক্ষা পাইলেও চাকুরীজীবনে অত্যন্ত নির্যাতিত হইয়াছিলেন।

যশোহরে কর্ম করিবার সময়ে তিনি বয়সে নবযুবক মাত্র। সেই অঞ্চলের নৈতিক আদর্শ বিশেষ পরিশুদ্ধ ছিল না। তখন সরকারী চাকুরীর উচ্চ বৃক্ষারূঢ় অনেক পদস্থ কর্মচারী অতিশয় দুর্নীতি-পূর্ণ জীবন যাপন করিতেন। এমন কি যশোহরের একজন প্রবীণ প্রধান শিক্ষক আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া শিক্ষকের মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। যশোহরের নৈতিক আবহাওয়া কিরূপ বিষাক্ত ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে জানা যাইবে।

একদা কবি এক বন্ধুর অনুরোধে এক গেলাস সিদ্ধি পান করিয়া প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার দিকে একটু সুস্থ হইলেন। পরের ঘটনা কবির ভাষাতেই শোনা যাক :

> "সংবাদ পাইয়া সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছেন। হেডমাস্টার বাবুর সেই তারকণ্ঠ ও উপহাস শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গায় মাথায় হাত দিয়া বলিলেন —"বেটা! তান্ত্রিকের ছেলে। শক্তিমন্ত্র ছাড়িয়া শিবমন্ত্র ধরিয়াছিস্, যন্ত্র ছাড়িয়া সিদ্ধির ষষ্টি ধরিয়াছিস। এরূপ ধর্মবিপর্যয়,—তা ধর্মে সহিবে কেন? আয় বেটা, প্রায়শ্চিত্ত কর্। একপাত্র টান্! শক্তির ভয়ে শিব বেটার চৌদ্দপুরুষ ছুটিয়া পলাইবে।" দেখিলাম, তিনি ইহারই মধ্যে শক্তিসেবা আরম্ভ করিয়াছেন। আমি বলিলাম—"দোহাই আপনার! ইহার উপর এই ব্যবস্থা হইলে আমি বাঁচিব না।" তখন তিনি বলিলেন—"যা বেটা! তবে পড়ে ঘুমা।"
>
> —নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩

তরুণ নবীনচন্দ্রের প্রথম কর্মজীবন এইরূপ আবহাওয়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশ্য যশোহরে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত মতিলাল ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষের সাহচর্যে আসেন; তাঁহাদের প্রভাবে কবিচিত্তে স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত হয়। ইঁহাদের প্রভাব নবীনচন্দ্রের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইঁহাদের স্নেহচ্ছায়ায় না আসিলে তিনি যশোহরের দূষিত পরিবেশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পড়িবার সময়ে এডুকেশন গেজেটে তাঁহার কবিতা মুদ্রিত হয়। তাহার পরেও এই পত্রে "শ্রীনঃ" এই স্বাক্ষরে তাঁহার আরও অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাঁহার "পিতৃহীন যুবক" কবিতাটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দীনবন্ধু মিত্র—সকলেই নবীন কবিকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই যশোহরে কবির অনেকগুলি গীতি-কবিতা ('নিরাশ প্রণয়', 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী,' 'মুমূর্ষু শয্যায় বাঙালী যুবক' প্রভৃতি) রচিত হয়। পরে তিনি যখন পাটনার অন্তর্গত ভেবুয়ায় বদলি হইলেন তখন পূর্বপ্রকাশিত খণ্ড কবিতা লইয়া ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রথম কাব্য 'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে ১৮৬৮ সালে যশোহরে তিনি পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে ১৮৭৩ সালে ইহাকে নূতন করিয়া খণ্ড কাব্যাকারে রচনা করিলেন। পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হইলে তিনি যেন প্রভাতে উঠিয়াই খ্যাতির তোরণদ্বারে উপনীত হইলেন। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া শিবিরে নবীনচন্দ্র 'ক্লিওপেট্রা' কাব্য রচনা করেন (১৮৭৭)। ইহার দুই বৎসর পূর্বে তিনি ভারতে যুবরাজ (সপ্তম এডোয়ার্ড্) আগমন উপলক্ষে ১৮৭৫ সালে বিলাতের Crown Perfumery Company আয়োজিত কবিতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

চাকুরী ক্ষেত্রে তিনি হুকুম-বরদারদের দলভুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্ত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহাকে অন্যায়ভাবে প্রায় একবৎসরের জন্য পুরীতে বদলি করা হয়। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্তনের সূচনা হয়—এই স্থানে 'রৈবতক',

'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের' উৎপত্তি। পুরীধাম ও পাটনার অন্তর্গত বিহার মহকুমায় কিছুকাল চাকুরী করিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্র ও রাজগৃহের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন এবং মহাভারত, ভাগবত ও গীতা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে তাঁহার উদ্ধত ও চঞ্চল প্রকৃতি ভক্তির নিকট নতি স্বীকার করিল। তিনি বাঙলার বাহিরে বদলি হইয়া নানা কষ্টভোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে বাংলা সাহিত্যের লাভই হইয়াছে। তিনি শ্রীক্ষেত্রে বদলি না হইলে তাঁহার চারিত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটিত না, এবং উক্ত কাব্যত্রয় রচিত হইত কিনা সন্দেহ।

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে কবির আরও অনেক খণ্ড কবিতা 'অবকাশ রঞ্জিনী দ্বিতীয় খণ্ড' নামে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে 'রঙ্গমতী' কাব্যের সূচনা হয়। তারপর প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া কবির উপর দিয়া নানা দুর্বিপাকের ঝড় বহিয়া যায়। ইহার মধ্যে 'রঙ্গমতী'র কিছু কিছু অংশ রচিত হইয়া পড়িয়া থাকে। পরে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে 'রঙ্গমতী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম পুত্র নীরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু তাঁহার জীবনে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল। ১৮৭৯ সালে মাত্র এক বৎসর বয়সে এই শিশুটি কবির ক্রোড়েই প্রাণত্যাগ করে।

১৮৭৭ সালের শেষভাগে নবীনচন্দ্র পুরীতে বদলি হন এবং এখানে শ্রীক্ষেত্রের মহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং 'অমিতাভ' কাব্যে বুদ্ধলীলা বর্ণনার ইচ্ছা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের প্রস্তাবনা লিখিয়া কাব্যরচনা সম্পর্কে অনেকের অভিমত সংগ্রহ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ফেণীতে অবস্থানকালে রৈবতক কাব্য সমাপ্ত হয় এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই কাব্য প্রকাশিত হইলে কবি আশাতীত খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পরে ১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দ—পাঁচ বৎসরের মধ্যে 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' (১৮৮৯) ও গীতার (১৮৮৯) পদ্যানুবাদ, 'খ্রীষ্ট কাব্য' (১৮৯৯) এবং 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) প্রকাশিত হয়। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের রচনা আরম্ভ হয় 'রৈবতক' রচনার পাঁচবৎসর পরে (১৮৯০)। প্রায় এক বৎসরের মধ্যে ইহা সমাপ্ত হয়; কিন্তু প্রকাশিত হইতে আরও দুই বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য প্রকাশিত হইলে কবির যশ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইল। কবি তখনও 'প্রভাস' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। 'কুরুক্ষেত্র' রচিত হইলেও ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বেই কবি 'চণ্ডী', 'খ্রীষ্ট' ও 'অমিতাভ' রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডী ও খ্রীষ্ট কুরুক্ষেত্রের পূর্বে এবং 'অমিতাভ' (১৮৯৫) কুরুক্ষেত্রের পরে প্রকাশিত হয়। 'অমিতাভ' প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পূর্বে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে 'প্রভাস' রচনা আরম্ভ হয় এবং প্রায় দেড়বৎসর পরে ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ইহা সমাপ্ত হয় এবং ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 'প্রভাস' সমাপ্ত করিয়া কবি বুঝিলেন, "আমার কাব্য-জীবন ফুরাইল।"[৬] ইহার পরে 'শুভনির্মাল্য' নামক একখানি নাটিকা (পুত্র নির্মলচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে রচিত এবং কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত, ১৯০০), 'ভানুমতী' (উপন্যাস, ১৯০০), পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ 'আমার জীবন' (১৯০৮ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত) এবং 'অমৃতাভ' (কবির মৃত্যুর অল্প পরে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত) প্রচারিত হয়।

৬। নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩১১

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি শান্তিতে অতিবাহিত করেন। কর্মে পুনর্নিয়োগের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি দাসত্বের গলরজ্জু ধারণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বাঙলার নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ণধার হইয়া তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়াছেন। সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসী হইয়াও তিনি কলিকাতার সারস্বত সমাজ ও অভিজাত পরিবারে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবিতকালেই অশেষ যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে কবি সজ্ঞানে নিজ হাতে লিখিয়া কয়েকটি নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর কবির শেষকৃত্য কিভাবে করিতে হইবে, ইহাতে তাহারই ইঙ্গিত ছিল। সেই নির্দেশের একস্থলে আছে :

১। বাঁশের কাঠাম করিয়া তাহা নেওয়ারের মারকিন দিয়া ছাইয়া তাহাতে আমাকে শ্মশানে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে নিবে।

২। চন্দন ও বিভূতি মাখাইয়া গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পরাইয়া, মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ি বাঁধিয়া ও সাথে গেরুয়া রঙ্গের চাদর দিয়া ঢাকিবে।

জগৎ-প্রপঞ্চে মুগ্ধ নবীনচন্দ্র মৃত্যু-মুহূর্তে সমস্ত চাওয়া-পাওয়া ও আশা-নৈরাশ্যকে বৈরাগ্যের গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া ১৯০৯ সালে মহাযাত্রা করেন।

দুই

॥ নবীনচন্দ্রের গ্রন্থপরিচয় ॥

অবকাশরঞ্জিনী, ১ম ভাগ (১৮৭১), ২য় ভাগ (১৮৭৮)

বাংলা কাব্যে নবীনচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব হয় গীতিকবিরূপে। বাল্যে তাঁহার প্রবল কাব্যানুরক্তি ছিল; স্কুলের সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহে তিনি অল্প বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি আরও বর্ধিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারের উৎসাহে তিনি নবীন উদ্দীপনায় অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। ইহার অধিকাংশই 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কবিতার কিছু কিছু লইয়া ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে 'অবকাশরঞ্জিনী'-র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে। অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পূর্বে তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ভারত উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫) ও 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগে প্রকাশিত (প্রথম সংস্করণ) কবিতার সংখ্যা ছিল ষোল, পরে বাংলা ১২৯১ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে আরও পাঁচটি কবিতা সঙ্কলিত হইলে মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়াইল একুশ। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগের (প্রথম সংস্করণ) মোট কবিতার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ, পরবর্তী

সংস্করণে আরও এগারটি কবিতা সংযোজিত হইলে এই খণ্ডের কবিতার সংখ্যা দাঁড়াইল মোট ছেচল্লিশ। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'নব্যভারত', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁহার আরও ছয়টি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দুইখণ্ড এবং অন্যত্র প্রকাশিত তাঁহার খণ্ড কবিতার মোট সংখ্যা তিয়াত্তরটি।

'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম খণ্ডের 'বিজ্ঞাপনে' কবি জানাইয়াছিলেন, "'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই আমার আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত।" অর্থাৎ কবি যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন (১৮৬৩) সেই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি ডেপুটির পদ গ্রহণ করিয়া যখন চট্টগ্রামে বদলি হইয়াছিলেন (১৮৭১)—মোট আট বৎসরের মধ্যে প্রথম খণ্ডের কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল। কবি উক্ত কাব্যের প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলেন যে, কবিতাগুলি স্কুলের বালকের রচিত। এই উক্তি কিন্তু যথার্থ নহে। স্কুল-জীবনের সামান্য কিছু কবিতা ইহাতে স্থান লাভ করিলেও ইহার অধিকাংশই কলিকাতার কলেজ-জীবনে ও পরবর্তী চাকুরী-জীবনে রচিত হয়। বিশেষতঃ এই সমস্ত কবিতায় ঠিক স্কুলের বালকের মনোভাব প্রতিফলিত হয় নাই। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পূর্বেই কলিকাতার সারস্বত সমাজে নবীনচন্দ্রের কবিযশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম খণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

'অবকাশরঞ্জিনী'র (প্রথম ভাগ) অন্তর্ভুক্ত "কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি" তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। সম্ভবত ইহা ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ বা তাহার সামান্য কিছু পূর্বে রচিত হয়। কারণ ইহা প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত হয়। প্যারীচরণ ১৮৬৬-৬৮ খ্রীঃ অব্দ দুই বৎসর 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক ছিলেন। কবি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের এফ. এ. ক্লাসের ছাত্র। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে, কবি যখন পুরীধামে বদলি হইয়া গিয়াছেন। ইহাতে ১৮৭২-৭৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত প্রায় সমস্ত খণ্ড কবিতা ঠাঁই পাইয়াছিল। পরে নবীনচন্দ্র মহাকাব্য, জীবনকাব্য, আখ্যানকাব্য ও ধর্মগ্রন্থের কাব্যানুবাদ লইয়া এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গীতিকাব্য রচনার আর বিশেষ অবকাশ পান নাই।

গীতিপ্রাণতাই নবীনচন্দ্রের কবিধর্ম ; তিনি বস্তুপ্রধান মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যে খুব একটা সার্থক হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। বরং ঐ সমস্ত বস্তুপ্রধান মহাকাব্যে লীরিক কবিচেতনার যেটুকু প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই নবীনচন্দ্রের কবিস্বরূপটি যথার্থত পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবি নহেন। অবশ্য কবি এই ভাবিয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনিই প্রথম আত্মসচেতন গীতিকবি। "অবকাশরঞ্জিনী সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না।" একথা কিন্তু ঠিক নহে। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১) এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২) নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কবিতা হিসাবে এই দুইটি গীতিকবিতা নবীনচন্দ্রের তিয়াত্তরটি খণ্ড কবিতার যে কোনটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

'অবকাশরঞ্জিনী'র (১ম ও ২য় ভাগ) কবিচিত্ত প্রেম, প্রকৃতি ও স্বাদেশিকতা—এই ত্রিধারায় উৎসারিত হইয়াছে। গীতিকবিতা যদিচ "intense personal emotions" হইতে জন্ম লাভ করে, তথাপি দৈনন্দিন মুহূর্তের ঊর্ধ্বে প্রয়াণ করিতে না পারিলে কবির ব্যক্তিগত কথা বিশ্বগত হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র প্রথম যৌবনের নিরাশপ্রণয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন; ফলে গীতিকবিতাগুলি লৌকিক ব্যক্তিসত্তার উপরে উঠিতে পারে নাই। কবির নিভৃত জীবনের সুখ-দুঃখ এত বেশি তরল, উত্তেজিত, অসংযত ও আত্মঘোষণা-পরবশ যে, কবিতাগুলি সার্থক গীতি কবিতা হইতে পারে নাই। তথাপি প্রথম ভাগের 'প্রতিমা বিসর্জন', 'শশাঙ্কদূত', 'হৃদয়-উচ্ছ্বাস' এবং দ্বিতীয় ভাগের 'বিষণ্ণ কমল', 'আমার সঙ্গীত', 'কে তুমি', 'কেন ভালবাসি', 'মেঘনা' প্রভৃতি গীতিকাব্যের আদর্শে নিন্দনীয় মনে হইবে না। দুই চারি ছত্রের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:—

১। এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে
দীনভাবে ম্লানমুখে বসিয়া দুঃখিনী।
ভাবিতেছে, এ সংসারে কার তরে বাঁচে,
নীরবে বিরলে বসি কাঁদে অনাথিনা।
('কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি')

২। নিবুক নিবুক প্রিয়ে দাও তারে নিবিবারে
আশার প্রদীপ।
এইতো নিবিতেছিল কেন তারে উজলিলে
নিবুক সে আলো, আমি
ডুবি এই অন্ধকারে।

* * *

নিবুক নিবুক প্রিয়ে! দাও তারে নিবিবারে
জ্বালিও না আর;
উন্মত্ত জলধিরূপে উন্মত্ত জীবন জলে
অস্ত যাক শেষ তারা
হোক সব অন্ধকার। ('উত্তর')

৩। তাঁদের সন্তান কিগো আমরা সকলে!
আমরা দুর্বল ক্ষীণ পাপিষ্ঠ হৃদয়!
জননি ভারত ভূমি বীর প্রসবিনী তুমি
কেমনে পুষিলে হেন ক্ষীণ জীবচয়,
শুকের কোটরে যত শালিকের দল। ('সায়ং চিন্তা')

পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)

এই কাব্য হইতেই নবীনচন্দ্র খ্যাতির উচ্চ শীর্ষে উপনীত হইলেন। কোন এক সমালোচক বলিয়াছেন, "সে সময়ের খুব কম কাব্যই পলাশির যুদ্ধের মত অতশীঘ্র সমাদৃত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে।" 'বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে' বাক্যাংশটি কিন্তু যথার্থ নহে। 'পলাশীর যুদ্ধ' সমগ্র বাঙলা দেশেই সুপ্রচারিত হইয়াছিল, ইহার নানা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থ ছিল বলিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে ইহার জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গিয়াছিল। যশোহরে ডেপুটী কর্ম নির্বাহ করিবার সময় তিনি পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বনে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া (১৮৬৮ সালের শরৎকাল) ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৩ খ্রী: অব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামে কিছুকাল অবকাশ যাপনের ফাঁকে সেই দীর্ঘ কবিতাটিকে ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যে রূপান্তরিত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কবিকে লিখিয়াছিলেন, "পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য—next, if at all, to Meghnad." ১৮৭৫ খ্রী: অব্দে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হইলে তরুণ কবি কলিকাতার সারস্বত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রকাশের কিছুকাল পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ন্যাশনাল থিয়েটারে 'পলাশীর যুদ্ধ'কে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করাইলেন (১৮৭৮)। কাব্যটি সে যুগে এমন খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল যে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ও অধ্যাপক ফ্লেক্ মলেন (ইনি উত্তমরূপে বাংলাভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন) 'পলাশীর যুদ্ধ'কে Alexandrine ছন্দে ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নানা কারণে তিনি এই অনুবাদ মুদ্রিত করিতে পারেন নাই।

'পলাশীর যুদ্ধ' একদিকে কবিকে যেমন খ্যাতি প্রতিপত্তি দান করিয়াছিল, তেমনি আবার ইহার জন্য কবিকে অত্যন্ত নিগ্রহও ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশের অনেক সমালোচক তাঁহার এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনিয়াছিলেন।[৭] তাঁহাকে এইজন্য চাকুরী-ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল ; ফলে পরবর্তী সংস্করণে তিনি এই কাব্যের কিছু কিছু পংক্তি বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চাকুরীতে তিনি বহুদিন উচ্চতর গ্রেড হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর উডবার্ণের নিকট কবি এইজন্য মৃদু অনুযোগ করিলে, গভর্ণর বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "You say you have a grievance against Government. But Government has a greater grievance against you. So long I remain Lieutenant Governor, there is absolutely no chance of your promotion." ইতিপূর্বে তিনি 'পলাশীর যুদ্ধে'র মতো একখানি কাব্য লিখিয়া সরকারী মহলেরও অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। যাহা হউক দেশবাসী তাঁহাকে এই কাব্যের জন্য যথেষ্ট সম্মান দিয়াছিল।

পাঁচটি সর্গে সমাপ্ত এই ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য বায়রনী ঢঙে রচিত। সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, মিরজাফর প্রভৃতির ষড়্যন্ত্র, ক্লাইভের সহিত মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাভূত, যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মোহনলালের খেদোক্তি, সিরাজ ধৃত ও নিহত, ক্লাইভের পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া মিরজাফরের বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ, ক্লাইভের জয়জয়কার—

৭ আমার জীবন (সা. প. সং নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৬৪-৬৮).

মোটামুটি এই কাহিনীটুকু ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্য হিসাবে ইহা অত্যন্ত শিথিল, অপরিপক্ক হাতের রচনা। কাহিনী অতিশয় অবিন্যস্ত; যুদ্ধকাণ্ড দুর্বলভাষায় বর্ণিত। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রদৃশ্য অনেকটা ডিবেটিং সোসাইটীর বক্তৃতার মত হইয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে কবি সিরাজচরিত্রের প্রতি সম্পূর্ণ অবিচার করিয়াছেন; বরং ক্লাইভ চরিত্রটি (রোমান্টিক বাড়াবাড়ি ও অনৈসর্গিকতা সত্ত্বেও) অপেক্ষাকৃত সুচিত্রিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে কবি কয়েকটি গান রচনা করিয়া কাব্য মধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে একঘেয়ে যুদ্ধ বর্ণনা কিয়দংশে সজীব হইয়া উঠিবে। কিন্তু ঐ গান দুইটি মূল কাহিনীকে কোন দিক দিয়াই পরিপূর্ণতা দিতে পারে নাই; বরং কাহিনীর মূল সুর হইতে বিপর্যস্ত হইয়াছে।

কোন কোন সমালোচকের মতে, "বায়রনের কবিতা সর্বত্র জ্বালাময়ী; গভীরতা অপেক্ষা তাহাতে বরং তরঙ্গই অধিক; এবং তিনি রচনাপ্রণালী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবধান ও অসতর্ক। এই সমস্ত দোষে এবং গুণে নবীনচন্দ্রও পরিপূর্ণ; তাঁহার পলাশীর যুদ্ধে ও অবকাশরঞ্জিনীতে এই প্রকৃতিই সমধিক পরিস্ফুট।"৮ কিন্তু বায়রনের উদ্দাম কল্পনা, উদগ্র আবেগ, বাক্‌রীতির অশনিনির্ঘোষ, চিত্রাঙ্কনের বিস্ময়কর শক্তি এবং ভাষা ও ছন্দের চকিত চটুলতা নবীনচন্দ্রের মত অসংযত-আবেগ কবি কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবেন? বরং তাঁহার মধ্যে বায়রনের দোষগুলি অধিকতর পরিস্ফুট। যাহা হউক, একদা 'পলাশীর যুদ্ধ' সমস্ত বাঙলাদেশেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল; তিনি পরিণত বয়সে মহাকাব্যাদি লিখিয়া ভক্তিনত চিত্তের পরিচয় দিতে চাহিলেও লোকে তাঁহাকে 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবিরূপেই সম্মান দিয়াছে। সে যুগে ইহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল; তাহার ফলে মধ্যশিক্ষিত পাঠকও ইহার সহিত পরিচিত হইয়াছিল। ইহাতে নিকটবর্তী ইতিহাসের ঘটনা ও বীররসপূর্ণ যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা আছে বলিয়া অনেক প্রাচীন ব্যক্তি এখনও ইহা হইতে অনেক ছত্র আবৃত্তি করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

স্বর্গমর্ত্য করে যদি স্থানে বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহস দুর্জয়!
কার্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।

অথবা রণক্ষেত্রে-পতিত মোহনলালের বিষণ্ণ উক্তি:

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি—

প্রভৃতি ছত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু কবিত্ব শক্তি লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কবি এই কাব্য হইতে যেমন অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার কোন কোন স্থান হইতে নিগৃহীতও হইয়াছিলেন। স্কুল বুক কমিটীর কোন কোন পদস্থ কর্মচারী

---

৮ শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী'তে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্য তাঁহার অভিমত নহে। তিনি কোন কোন সমালোচকের মতামত আলোচনা করিতে গিয়া ঐভাবে যুক্তি সাজাইয়াছেন। তিনি কিন্তু মনে করিতেন যে, নবীনচন্দ্রের কাব্যের ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য বায়রনের প্রভাবে আবির্ভূত হয় নাই, ইহা কবি চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'র কয়েক স্থলে ইতিহাসগত তথ্যবিচ্যুতি আছে; ফলে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতো কোন কোন ঐতিহাসিক নবীনচন্দ্রের ওপর কথঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা কবিকে নিন্দাও করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কাব্য লিখিয়া নবীনচন্দ্রকে খ্যাতি ও অখ্যাতির উভয় বরমাল্যই কণ্ঠে ধারণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কাব্য হিসাবে 'পলাশীর যুদ্ধে' অপটুহাতের অদক্ষতা প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাইবে।

ভারত উচ্ছ্বাস (১৮৭৫)

১৮৭৫ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ইংলণ্ডের ক্রাউন পারফিউমারী কোম্পানী একটি কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেন। এই প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আটজন কবির কবিতা উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নবীনচন্দ্রের কবিতা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার জন্য কবি পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কবিতা হিসাবে ইহা অসার্থক। নবীনচন্দ্রের উক্তি স্মরণীয়, "সে উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কান পাতিবার জো নাই। কিন্তু এরূপ 'হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই।" তিনি হুজুকে মাতিলেন না বটে, কিন্তু কোন এক বন্ধুর অনুরোধও এড়াইতে পারিলেন না, ক্রাউন পারফিউমারী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়া রাজভক্তিমূলক একটি প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। কবি কিঞ্চিৎ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় 'হুজুগে' কবিতা লিখিতে উৎসাহবোধ করেন নাই; কিন্তু হুজুকে না মাতিলেও এই কবিতা প্রতিযোগিতায় কেন অবতীর্ণ হইলেন তাহার স্পষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭)

নবীনচন্দ্র যখন মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে সমুদ্রতীরবর্তী কুতুবদিয়ার খাসমহলের কার্য করিতেছিলেন তখন এই দীর্ঘ কবিতাটি রচিত হয়। পরে ইহা 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগের ১২৯৫ সালের সংস্করণে গৃহীত হইয়াছিল। মোট পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি দীর্ঘ কবিতায় ক্লিওপেট্রার ভাষণ ও স্বগতোক্তির সাহায্যে তাঁহার জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মিশরেশ্বরী ক্লিওপেট্রা তাঁহার সখী চারমিনারের নিকট সিজার ও অ্যাণ্টনীর কাহিনী বলিতেছেন। অবশ্য সিজার ও অ্যাণ্টনীর প্রেম তাঁহার চরিত্রে কি প্রতিক্রিয়া ও মনোদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছিল, কবি সে সম্বন্ধে মিতবাক্। কাহিনীটি উত্তমপুরুষের উক্তিরূপে বিবৃত হইলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ, চরিত্রচিত্রণেও প্রশংসনীয়। সিজার ও অ্যাণ্টনী কাব্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নাই, সমস্ত ঘটনা নেপথ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই কাহিনী জীবন্ত হইতে পারে নাই। কবি ক্লিওপেট্রাকে দ্বিচারিণী রূপে না দেখিয়া সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। "ক্লিওপেট্রার প্রেম পুরোহিতের মন্ত্রে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল না বলিয়া যদি তাহাকে ঘৃণা করিতে হয়, করিও; কিন্তু ক্লিওপেট্রা অবস্থার দাসী বলিয়া দয়া করিও, ক্লিওপেট্রা অভাগিনী বলিয়া দুঃখ করিও।" যখন কালীপ্রসন্ন

ঘোষ ঢাকায় 'বান্ধব' পত্রে ক্লিওপেট্রাকে পাপীয়সী বলিয়া অপরাধিনীর শাস্তির বহর বাড়াইতেছিলেন, হেমচন্দ্র 'ছায়াময়ী'তে তাহাকে নরকস্থ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন, তখন নবীনচন্দ্রের এই উক্তি বিস্ময়কর বলিয়া বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। কাব্যটি পরিপক্ক রচনা না হইলেও, মানববাদের প্রচ্ছন্ন স্পর্শ আছে বলিয়া ইহার একটা বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

রঙ্গমতী (১৮৮০)

চট্টগ্রামের রাঙামাটি অঞ্চলের পার্বত্য সৌন্দর্যের পটভূমিকায় এই ছদ্ম-ঐতিহাসিক (Pseudo Historical) রোমান্টিক কাব্য পরিকল্পিত হইয়াছে। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রকাশিত হইলেও ইহার প্রথম তিন সর্গ ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে রচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে কবির জীবনে পারিবারিক ও নানাপ্রকার অশান্তি নামিয়া আসে। তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে আমার বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে। রঙ্গমতী আমার জীবনের একটি বিষাদপূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস।" (উৎসর্গ পত্র) এই নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার পটভূমিকায় এই কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া ঘটনার মধ্যেও করুণ রস ও বিষাদান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে। প্রধানতঃ স্কটের ছদ্ম-ঐতিহাসিক কাব্যের অনুসরণে এবং বায়রনী আবেগ মিশাইয়া ইতিহাসের ছায়াতলে এই কাল্পনিক কাহিনীটি পরিকল্পিত হইয়াছে।

ঔরঙ্গজেবের সমকালীন কাহিনী। মুকুটরায় মোগলের প্রতিভূ হইয়া সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ শাসন করিতেন। তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রের মাতা সপত্নীর অত্যাচারে গৃহত্যাগ করেন। বীরেন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতার সন্ধানে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যুদ্ধশিক্ষাভিলাষে মোগলবাহিনীতে যোগ দিল। ঘটনাচক্রে তাহার সহিত শিবাজীর পরিচয় হইল এবং শিবাজীই তাহার অন্তরে স্বদেশ প্রেমের বীজ বপন করিলেন। মোগলের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার জন্য বীরেন্দ্র রাঙামাটিতে ফিরিয়া আসিল। তাহার বাল্যপ্রণয়িনী কুসুমিকা এদিকে তাহার পথ চাহিয়া দিন গণিতেছিল। বীরেন্দ্রের পিতৃব্য মর্কটরায়ের ষড়যন্ত্রের ফলে বীরেন্দ্র মৃত্যুকালে জননী ও কুসুমিকার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; এ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কুসুমিকাও প্রাণত্যাগ করিল। বীরেন্দ্রের সন্ন্যাসিনী নিরুদ্দিষ্টা মাতা পুত্রকে কাছে পাইয়াও ধরিয়া রাখিতে পারলেন না, তিনিও শোকে উন্মাদিনী হইয়া রঙ্গমতীর ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলেন। এই সুযোগে পার্বত্য দস্যুরাও রঙ্গমতী আক্রমণ করিল। ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্যে কাব্য সমাপ্ত হইল।

বলা বাহুল্য, এই কাব্যে ঘটনা ও চরিত্র অত্যন্ত দুর্বল; কবি অসংযত আবেগের দ্বারা এত দূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কল্পনার বলে ইতিহাসের পটভূমিকায় যথেচ্ছা উড়িয়া বেড়াইয়াছিলেন। শিবাজীর আঘাত হইতে শায়েস্তা খাঁকে বাঁচাইতে গিয়া বীরেন্দ্রের বন্দিদশায় শিবাজীর সাক্ষাৎলাভ, পরে শিবাজীর নির্দেশে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য রঙ্গমতীতে প্রত্যাবর্তন

—প্রভৃতি কাল্পনিক ও উদ্ভট ঘটনাকে ইতিহাসের সহিত মিশাইতে গেলে স্কটের মতো প্রতিভার প্রয়োজন; নবীনচন্দ্র সে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। রচনা-ভঙ্গিমায় মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব সত্ত্বেও কাব্য পরিকল্পনার মূলে অসঙ্গতি ও রোমান্টিক অসংযমের অতিরেকের জন্য 'রঙ্গমতী' পরিণত মনের কাব্য হইতে পারে নাই। কবি উৎসর্গপত্রেই বলিয়াছেন যে, নানা অশান্তির মধ্যে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। ফলে করুণ-রসের অকারণ উচ্ছ্বাস, হত্যাকাণ্ডের বাড়াবাড়ি, কাহিনীগ্রন্থনে নৈপুণ্যের অভাব এবং চরিত্রচিত্রণে ব্যর্থতা 'রঙ্গমতী'কে সার্থক রোমান্টিক আখ্যান-কাব্যের কোঠায় উঠিতে দেয় নাই। কবি বীরেন্দ্রের মধ্যে নিজেকে এবং কুসুমিকার মধ্যে কোন এক বাল্যপ্রণয়িনীকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন—এই ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে আত্মাভিমুখী করিয়াছে। তবে এই কাব্যে কবির বর্ণনাশক্তি কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং পলাশীর যুদ্ধের অপরিপক্বতা ইহাতে কথঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়াছে।

[রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), এবং প্রভাস (১৮৯৭) পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।]

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (১৮৮৯)

নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী যে পৌরাণিক সংস্কৃতির দিকে ফিরিতেছিল, তাহা 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'রৈবতক' কাব্যেই (১৮৮৭) বুঝা যাইতেছে। বৈষ্ণব মতের প্রতি কবির অধিকতর আকর্ষণ থাকিলেও শাক্তমতের প্রতিও তাঁহার বিরূপতা ছিল না। 'রৈবতক' প্রকাশের ঠিক দুই বৎসর পরে ১৮৮৯ সালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদের পূর্বে কবি একটি দীর্ঘ সরস ভূমিকা যোগ করিয়াছিলেন। অনুবাদ অপেক্ষা এই ভূমিকাটি অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। কবি ছদ্ম পরিহাসের সহিত চণ্ডীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গীতা ও চণ্ডীর সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং দশাবতার ও Evolution তত্ত্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইয়াছেন। ভূমিকায় পরিচ্ছন্ন পরিহাসের মার্জিত রীতি প্রশংসনীয়। ধর্মগ্রন্থের ভূমিকায় কৌতুক-পরিহাস আমদানি করিয়া তিনি গতানুগতিকতার পথ ত্যাগ করিয়াছেন। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

> "সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত। ভগবান নিদ্রার শেষশয্যায় শায়িত। তাঁহার কানের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক দুই অসুর জন্মিয়া তাঁহারা নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্ম-প্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রাণের দায়ে ব্রহ্মা নিদ্রাদেবীর কাছে মহা কান্না আরম্ভ করিলেন। খোসামুদিটা তাহা হইলে কেবল হালে প্রচলিত হয় নাই।······
>
> 'নিদ্রাযুক্ত জগন্নাথ' দুরাত্মা মধু-কৈটভের সঙ্গে সহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। অসুর দুটা বড় Noble fellow ছিল। যখন দেখিল যে, নারায়ণ কিছুতেই কাণ্ডটার কিনারা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাহাদের মনে লোকটার প্রতি দয়া হইল। তাহারা বলিল, 'আচ্ছা, বর লও।' নারায়ণ বলিলেন, 'আর কি ছাই বর লইব।

আমার বধ্য হও।' একেবারে প্রাণ ধরিয়া টান—তখন অসুর ফুটো কিঞ্চিৎ Diplomacy (কূটনীতি) খাটাইয়া বলিল, 'জল নাই এমন স্থানে আমাদিগকে বধ কর!' সর্বত্র জল, অতএব হরি নিজের উরুর উপর রাখিয়া তাহাদের মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন।"

অনুবাদ মূলানুগ, কিন্তু শ্রুতিসুখকর নহে। সে যুগের গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনীষী ব্যক্তিও কবির অনুবাদশক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের চণ্ডী অনুবাদ আদৌ সুখপাঠ্য হইতে পারে নাই। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

চণ্ডী—যা দেবী সর্বভূতেষু সুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

অনুবাদ—যে দেবীর সর্বভূতে সুধারূপে সংস্থান।
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম ॥

চণ্ডী—গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশুদেবতাঃ ॥

অনুবাদ গর্জ গর্জ মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ।
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জিবেন দেবগণ ॥

মূলের সহিত অনুবাদ মিলাইলেই বুঝা যাইবে যে, নবীনচন্দ্র মূলের গম্ভীর শব্দবিন্যাস বাংলাভাষায় আদৌ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত দুই চরণকে বাংলা দুই চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া এই ত্রুটি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—পদ্যানুবাদ (১৮৮৯)

সম্ভবতঃ গীতার অনুবাদটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অল্প কিছুকাল পরে ১৮৮৯ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়। কবি উক্ত অনুবাদের প্রথমে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের তত্ত্বাংশ সংক্ষেপে আলোচনা করেন, তারপর প্রত্যেক শ্লোকের মূলানুগ অনুবাদ করেন। ভূমিকায় কবি গীতা ও বৌদ্ধদর্শনকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজগৃহ দর্শনে গিয়া তাঁহার মনে যুগপৎ ভগবান বাসুদেব ও যতিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের মহিমা উদিত হইয়াছিল। গীতায় সেই ভক্তিনত চিত্তটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুবাদটিও সে-যুগের ভক্ত ও মনীষিগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও কবি যে উৎকৃষ্টতর কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। ইহার ছন্দ দুর্বল, শব্দযোজনায় অপরিপক্ক হাতের ছাপ স্পষ্ট এবং অন্ত্যানুপ্রাস অবহেলাভরে পরিকল্পিত। মূলানুগ করিতে গিয়াই তিনি গীতার কাব্যত্ব মাটি করিয়াছেন।

গীতা—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অনুবাদ—যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্মের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ ॥

সর্বত্রই প্রায় এইরূপ আক্ষরিক অনুবাদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে; ফলে ইহা বহুস্থলে যথার্থ অনুবাদ হইলেও প্রায় কোথাও কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য দুই-এক স্থল নিতান্ত মন্দ নহে।

গীতা—ঊর্ধ্বং মূলমধঃ শাখামশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

অনুবাদ—অব্যয় অশ্বত্থরূপী এ সংসার ঊর্ধ্বমূল, অধঃ শাখান্বিত।
বেদ যার পত্রাবলী, তাহাকে যে-জন জানে সেই বেদবিৎ ॥

খৃষ্ট (১৮৯১)

সেণ্ট্ ম্যাথুর গসপেল অবলম্বনে নবীনচন্দ্র খ্রীষ্টজীবন বিষয়ক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের কিছু পূর্ব হইতে (পুরীধামে বদলি হইবার পর) কবির চঞ্চল ও ইহমুগ্ধ চিত্তে সর্বপ্রথম ভক্তিভাবের জাগরণ হয়। 'রৈবতকে' তাহার সূচনা (১৮৮৭)। এই কাব্য রচনা করিবার পর মহামানব ও দেবকল্প মানবচরিত্র অবলম্বনে কাব্য রচনার ইচ্ছায় কবি বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও চৈতন্যদেবকে কাব্যের নায়করূপে নির্বাচিত করেন। প্রথম তিন মহাপুরুষ সম্বন্ধে তিনখানি জীবনকাব্য রচনা করিলেও মহম্মদ সম্বন্ধে তিনি পৃথক কোন কাব্য রচনা করেন নাই, কেবল 'প্রভাসে'র শেষাংশে মহম্মদের আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন ('প্রভাস' ১৩শ সর্গ)।

নবীনচন্দ্র সেণ্ট্ ম্যাথুর গসপেলকে কবিতায় অনুবাদ করিয়া ভক্তের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টের অলৌকিক জীবন চিত্রিত করেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, অবতারগণ ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ এবং সর্বধর্মসমন্বয় নবীগণের জীবনের আদর্শ। ধর্মে ধর্মে ভেদ নাই, মহাপুরুষজীবনী রচনা করিয়া তিনি তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য খ্রীষ্টকে তিনি হিন্দু সাধকরূপে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার অসাম্প্রদায়িক প্রভাব স্বীকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবীনচন্দ্রের এই জাতীয় কাব্যে সেই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

কবির 'খৃষ্ট' ম্যাথুর গসপেলের আক্ষরিক অনুবাদ এবং আক্ষরিক বলিয়াই ব্যর্থ অনুবাদ। নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার তথাকথিত মহাপুরুষ-জীবনীগুলি বাদ দিতে হইবে। 'খৃষ্ট' কাব্যের ভাষা দুর্বল, প্রকাশভঙ্গী জড়তাগ্রস্ত এবং ছন্দ নানা ত্রুটিপূর্ণ। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

মূল—"And if any man will sue thee at the law and take away
thy coat, let him have thy cloke also."
(*St. Matthew's Gospel*, Chap. V, 40)

অনুবাদ—একখানি বস্ত্রতরে যে চাহে বিচার,
দিও তারে অন্য বস্ত্রখানিও তোমার।

ইহা তবু কথঞ্চিৎ সহনযোগ্য। কিন্তু

রে ধর্মযাজকগণ ওরে ভণ্ড নরাধম
তোমাদের ঘটিবে পরিতাপ।
মানুষের স্বর্গদ্বার তোরাই করিবি রুদ্ধ
করিস রে স্বর্গ-আলাপ ॥

ছত্র কয়টির দুর্বলতা ক্ষমার অযোগ্য। 'খ্রীষ্ট' কাব্যে নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি বর্ধিত হয় নাই।

প্রবাসের পত্র (১৮৯২)

পুণা, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র সমস্ত দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিয়া পত্নীকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছিলেন; সেগুলি ধারাবাহিকভাবে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি যেরূপ হউক না কেন, চিঠিপত্রের সহজ ভাষাটি তিনি অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, তিনি কিছু বেশি গদ্য লিখিতে পারিলে অধিকতর কৃতিত্ব অর্জন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও ডায়েরীর মধ্যে যে শিল্পগুণ ও রসভোগের স্বাদু স্পর্শ পাওয়া যায়, নবীনচন্দ্রের এই পত্রগুলি অবশ্য সেরূপ সাহিত্যগুণান্বিত নহে; তথাপি ইহার ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও মনোভাবের আন্তরিকতা পাঠকের ভাল লাগিবে।

অমিতাভ (১৮৯৫)

নবীনচন্দ্র ১৮৮০ হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত পাটনার অন্তর্গত বিহার অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটারের কর্ম করিয়াছিলেন। বিহার দর্শন করিয়া তিনি বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এডুইন আরনল্ড প্রণীত *The Light of Asia* পাঠ করিয়া কবি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই; কারণ উহাতে বুদ্ধদেবের অলৌকিক ও অতিমানুষিক লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কবি বুদ্ধদেবকে মানবীয় মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অবশ্য কাব্যের শেষাংশে বৌদ্ধধর্ম বর্ণনার সময় তিনি আরনল্ডের আদর্শকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, অমিতাভ বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত দেবলোকে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে, "ভারতের বৈষ্ণবধর্ম রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র।" তাই তিনি বুদ্ধদেবকে হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম এবং বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মেরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি সিংহল ও শ্যামদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় কবিকে প্রশংসা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রশংসাবাণী পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলের শৈলবিম্বারাম বিহারের অধ্যক্ষ শীলস্কন্ধ স্থবির 'অমিতাভ' কাব্য পাঠে মুগ্ধ হইয়া সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক কলিকাতায় মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বহু বিদেশী

পণ্ডিত এবং বাঙলাদেশের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টার ফলে বাঙালী সমাজে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেব সম্বন্ধে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল জাগ্রত হয়। কাজেই নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' বাঙালী পাঠকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল,—যদিও ইহার কাব্যগুণ বিশেষ প্রশংসনীয় নহে।

এই কাব্যে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবি সরল ঘটনা-বিবৃতির সাহায্যে বুদ্ধচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে বুদ্ধদেব ও শিষ্যদের কথোপকথনের মারফতে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মানবমূর্তি অঙ্কন করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ; ফলে এই কাব্যে গার্হস্থ্যচিত্র বেশ জীবন্ত আকারে অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ নীতিমার্গীয় জীবনচর্যা। কিন্তু কবি ভক্তির দৃষ্টিকোণ হইতে বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করিয়াছেন ; ফলে এই কাব্যকে বুদ্ধদেবের যথার্থ জীবনী বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, কবি চরিত্র চিত্রণে কথঞ্চিৎ সার্থক হইলেও কবিত্বশক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইহার রচনা অত্যন্ত শিথিল, ছন্দ শিল্পকৌশল বর্জিত, কল্পনাশক্তিও অতিশয় দুর্বল। কবি ইহাতে বৌদ্ধধর্মের নীতিমার্গ, হিন্দুর ভক্তিধর্মের প্রেম এবং উনিশ শতকী মানববাদকে মিশাইয়া এক অভিনব মহাপুরুষ-জীবনকাব্য রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার ভাবাদর্শ যেরূপই হউক, আধুনিক পাঠকের নিকট 'অমিতাভ' রুচিকর হইবে না।

শুভনির্মাল্য (১৯০০)

কবির পুত্র নির্মলচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যটি ('অপরেট্টা') রচিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র নবীনের পূজারী ছিলেন এবং সর্ববিষয়ে মৌলিকতার পোষকতা করিতেন। পুত্রের বিবাহকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। বিবাহ সভায় খানিকটা রঙ্গমঞ্চের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া তিনি এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করিয়া অভিনয় করাইয়াছিলেন। তিন-অঙ্কে-সমাপ্ত এই নাটিকাটি বাস্তব ও কল্পনা এবং কৈলাস ও চট্টগ্রামের মিশ্র-ভৌগোলিক সংস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার নায়ক বরবেশী স্বয়ং নির্মলচন্দ্র। প্রথম অঙ্কে বর ও পুরোহিতের মধ্যে হিন্দুবিবাহের আদর্শ লইয়া কথোপকথন। দ্বিতীয় অঙ্কে কবির গৃহলক্ষ্মী (অর্থাৎ কবিপত্নী লক্ষ্মীদেবী) ও কবির কুলদেবী দ্বিভুজা ভগবতীর কথোপকথন এবং দেবী কর্তৃক গৃহলক্ষ্মীকে আশীর্বাদী মাল্য দান। এই দৃশ্যে দেবীর অনুচর হিন্দুস্থানী দারোয়ানের ভূতের দ্বারা স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষণীয়। তৃতীয় অঙ্কে সভামঞ্চে বর আসীন, অপ্‌সরাগণের নৃত্যগীত, বরকে নন্দন হইতে পারিজাত মালা প্রেরণ ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন।

চট্টগ্রামস্থিত কবিভবনের প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চনির্মাণ করিয়া নির্মলচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে এই গীতিনাট্য দুই রাত্রি বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইহা কুমিল্লায় মুদ্রিত হয় এবং কেবল পরিচিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। পরে 'প্রবাসী' পত্রে (শ্রাবণ, ১৩৫৪) শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নাটক হিসাবে ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। রূপক ও বাস্তব ঘটনাকে

মিশ্রিত করিবার মতো নাট্যশক্তি কবির আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাঁহার ব্যক্তিগত কথা ও পারিবারিক জীবন প্রাধান্য পাইয়াছে বলিয়াই বোধহয় ইহা সে যুগে প্রচারিত হয় নাই এবং কবির সেরূপ কোন উদ্দেশ্যও ছিল না।

ভানুমতী (১৯০০)

১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে চট্টগ্রাম শহর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভয়াবহ ক্ষতি হইয়াছিল। এই সামুদ্রিক ঝড়ের প্রচণ্ডতা কবির মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কোন একটি রচনায় এই ঝড়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি অঙ্কন করিবেন। ইহার অল্প কিছু পরে একটা আকস্মিক সুযোগ জুটিয়া গেল। এই ঘটনার প্রায় একবৎসর পরে তাঁহার খুড়তুতো ভাইয়ের কন্যা তাঁহার কাছে একখানি গ্রন্থের আবদার করিলে তাহাকে খুশি করিবার জন্য কবি মাত্র সাতদিনের মধ্যে 'ভানুমতী' শীর্ষক একখানি উপন্যাস রচনা করেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, সে-যুগের বাঙালী পাঠক এই উপন্যাসের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। এমন কি, জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ানও (তিনি বাংলা জানিতেন) ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কবিকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। উপন্যাসটি বালিকার জন্য লেখা, কাজে কাজেই কবি ইহাতে আদিরসাত্মক বর্ণনা একেবারে বাদ দিয়াছেন এবং ভারি ভারি তত্ত্বকথা, ধর্ম, দর্শন, সমাজচিন্তা নীতিতত্ত্ব, জীবনাদর্শ প্রভৃতি অনাবশ্যক বিষয়ের দ্বারা ইহার পৃষ্ঠা বাড়াইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী সোনাদিয়ার জমিদার অনাথনাথ স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। পথে ভানুমতী নাম্নী এক বাজিকরের বালিকা কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় ও ঘূর্ণি বাত্যায় তাঁহার নৌকা ডুবিয়া গেলে তিনি কোনক্রমে কূলে উঠিয়া রক্ষা পাইলেন। তাঁহার স্ত্রীর কোন সন্ধান মিলিল না ; তাঁহার শিশুপুত্রটি দৈবক্রমে রক্ষা পাইল—বালিকা ভানুমতীই তাহাকে কোনপ্রকারে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু শিশুটি বাঁচিল না, অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনাথনাথ স্ত্রীপুত্র বিয়োগের শোক ভুলিবার জন্য বাজিকর-কন্যা ভানুমতীকে নিজ কন্যারূপে পালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি একখানি চিঠি হইতে ভানুমতীর আসল ইতিহাস জানিতে পারিলেন। সে বাজিকর কন্যা নহে, তাঁহারই কন্যা—অমিয়া। বহুদিন পূর্বে অনাথনাথ আর একবার নৌকাডুবির মধ্যে পড়িয়া দুই বৎসরের কন্যা অমিয়াকে হারাইয়াছিলেন ; ভাবিয়াছিলেন—সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু অমিয়ার মৃত্যু হয় নাই। এক বৈরাগী তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ কন্যার মতো পালন করিয়াছিল। বৈরাগীর মৃত্যুর পর অমিয়া বাধ্য হইয়া এক বাজিকরের দলে যোগ দেয়। বাজিকর তাহাকে কন্যার মতো স্নেহ করিলেও বাজিকর পত্নী অযথা পীড়ন করিত। ভানুমতীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া অনাথনাথ তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিলেন। কিন্তু ভানুমতী বৈরাগী পালকপিতার নিকট ধর্ম ও জীবনের অর্থ বুঝিয়াছিল, পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি তাহার কোন মোহ ছিল না। সে গেরুয়া বস্ত্র মাত্র সম্বল করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল। অনাথনাথও সমস্ত সম্পত্তি দেবসেবায় ও সাধুসেবায় সমর্পণ করিয়া নিজেও কন্যার আদর্শ অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাস লইলেন।

এই উপন্যাসের কাহিনী অত্যন্ত শিথিল, কোন চরিত্রই বিকশিত হয় নাই, কাহারও মধ্যে কোনরূপ মানসিক দ্বন্দ্ব বা দ্বিধাসংশয় নাই। বোধ হয় বাজিকরের প্রভাবে ঘটনাগুলি ভোজবাজির মতো ঘটিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের সামুদ্রিক ঝড় শুধু চট্টগ্রামকেই লণ্ডভণ্ড করে নাই, কবির স্বাভাবিক পরিমাণবোধকেও (যাহা খুব তীক্ষ্ণ ছিল না) ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়াছিল ; তাহার প্রমাণ এই 'ভানুমতী' উপন্যাস। ইহাতে হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ, বিধবাবিবাহ, সংযম, নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে মঞ্চঘেঁষা দীর্ঘ বক্তৃতা আছে, যাহা কাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। শুধু চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সামুদ্রিক ঝড়ের বর্ণনায় কবির কিছু কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর প্রেম লইয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাও আবার বিদেশীধরনের উগ্র আদিরসাত্মক প্রেমের কাহিনী। আমাদের কবি যুবকযুবতীর প্রেমকে একেবারে বাদ দিয়া পবিত্র আদর্শের উপন্যাস ফাঁদিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু উপন্যাস রচনার আঙ্গিক তাঁহার আদৌ জানা ছিল না, কাজেই 'ভানুমতী' উপন্যাস হিসাবে কিছুমাত্র সার্থক হইতে পারে নাই।

আমার জীবন (১৯০৮-১৯১৩)

পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত কবির এই আত্মচরিতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনীর অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা আছে। ইহার প্রথম খণ্ডটি তাঁহার জীবিতকালে (১৩১৪ সাল) প্রকাশিত হয়। আর চারিটি খণ্ড (২য় খণ্ড—শ্রাবণ, ১৩১৬, ৩য় খণ্ড—অগ্রহায়ণ, ১৩১৭, ৪র্থ খণ্ড—চৈত্র, ১৩১৮, ৫ম খণ্ড—আশ্বিন, ১৩২০) তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ করেন তাঁহার পুত্র। তাঁহার এই আত্মচরিত সম্বন্ধে আমরা এই ভূমিকার প্রথমেই আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, কবির এই সুদীর্ঘ জীবনকাহিনী আত্মচরিতে-দুর্বল বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব দূর করিয়াছে। কবির দৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলাদেশের সমাজ, জীবনযাত্রা, নানা ভাবতরঙ্গের যেমন পরিচয় পাইয়াছি, তেমনি কবির ব্যক্তিগত মনোভাবটিও জানিতে পারিয়াছি। কবির উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহংবোধ এই উপাদেয় আত্মজীবনীকে মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছে। তিনি শাণিত ভাষায় ব্যক্তি, সমাজ ও গোষ্ঠীকে আক্রমণ করিয়াছেন, কোথাও-বা নির্জলা আত্মস্তুতি করিয়াছেন। যাহা হউক, এই আত্মজীবনীতে কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও, কবি-জীবনের যথার্থ স্বরূপ জানিতে হইলে ইহার সাহায্য লইতে হইবে।

অমৃতাভ (১৯০৯)

চৈতন্যদেবের চরিত্র অবলম্বনে কবি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু মাত্র বারটি সর্গ লিখিয়া তাঁহার দেহান্ত হয়। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং শচীমাতার বিলাপে কাব্যটি খণ্ডিত হইয়াছে। এই খণ্ডিত কাব্য পরে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' হইতে এই কাব্যের কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। 'অমিতাভ' রচনা করিতে গিয়া কবি পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়াছিলেন ; বুদ্ধদেবের নীতিমার্গীয় দর্শনে তাঁহার আবেগ তো বাধা পাইবেই। "অমৃতাভে" কবির রুদ্ধ আবেগ মুক্তি পাইল। তিনি প্রেমভক্তি ও আবেগের গঙ্গোদকে চৈতন্যদেবকে অভিষিক্ত করিয়া ভক্তের

ভগবানরূপেই তাঁহাকে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। এই সময়ে তিনি প্রবীণত্বের শেষ ধাপে পৌঁছিয়াছিলেন। দেহ অপটু, মন বিষণ্ণ, পুত্র নির্মল বিদেশে; এরূপ মানসিক বিপর্যয়ের অবস্থায় কাব্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কবি প্রায়ই ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরে উঠিতে পারেন নাই; প্রবাসী পুত্রের জন্য কাব্যের নানা স্থানে তিনি ব্যক্তিগত শোক ও বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, পুত্রের নিরাপত্তার জন্য চৈতন্যের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এই কাব্যে যেমন ভক্তির আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি রচনার অপটুতা পাঠকের পক্ষে বেদনাদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্রচিত্রণ, পরিমাণবোধ প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই তিনি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কবির মজ্জাগত ত্রুটি—অসংযত আবেগ। তাহাই এই খণ্ডিত কাব্যকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে। ইহার রচনাভঙ্গিমা, শব্দবিন্যাস ও ছন্দকৌশল শিশুসুলভ; বার্ধক্যে মানুষ খানিকটা শিশুত্ব ফিরিয়া পায়। নবীনচন্দ্রের 'অমৃতাভে' সেই শিশুমনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কাব্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা কবিপ্রশস্তি গাহিতে চাহেন, তাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষ হইতে বিচার করিলে নবীনচন্দ্রের 'অমৃতাভে' কবি-প্রতিভার দীপ্তিহীন অঙ্গারমূর্তি ভিন্ন কোন উজ্জ্বলতর কবিচেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না।

তিন

॥ রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ॥

'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', ও 'প্রভাস' কাব্যত্রয় একত্রে বাংলা সাহিত্যে 'ত্রয়ীকাব্য' নামে পরিচিত। এই কাব্য তিনখানি পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত হইলেও ইহাদের মধ্যে ঘটনা, ভাবাদর্শ ও চরিত্রগত গভীর যোগাযোগ আছে,—'রৈবতক' কাহিনীই ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে 'রৈবতক', ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে 'কুরুক্ষেত্র' এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে 'প্রভাস' প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার সূচনা আরও পূর্বে হইয়াছিল। কবি 'আমার জীবনে' এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

> "১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যত্রয়ের ধ্যান আরম্ভ করি, এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাস শেষ করি। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিয়া 'মহাভারত' শুনিয়াছিলেন। আমি চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী এই যজ্ঞ করিয়া শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম।"—নবীনচন্দ্র রচনাবলী (সা. প. সং.) তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩১০

এবিষয়ে কোলরীজের উক্তি স্মরণীয়। তিনি মনে করিতেন যে, মহাকাব্য রচনা করিতে বিশ বৎসর প্রয়োজন। দশ বৎসর উপাদান সংগ্রহ এবং নানা তত্ত্বে নিপুণতা অর্জন, পাঁচ বৎসর ধরিয়া রচনা এবং বাকি পাঁচ বৎসর সংশোধনে ব্যয়িত হইবে।[১]

১. "I should not think of devoting less than twenty years to an epic. Ten years to collect materials and warm my mind with universal science...the next five in the composition of the poem, and the five last in the correction of it."—Coleridge.

১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে 'রৈবতক' রচনা আরম্ভ হইলেও কবির মনে ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দেই শ্রীকৃষ্ণমহিমা প্রথম জাগ্রত হয়। এই সময়ে তিনি পুরীধামে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক্যালেক্টারের কর্ম করিতেছিলেন। সেই বৎসর তিনি জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ব্যবস্থাপনার ভার প্রাপ্ত হন। সেই বিপুল ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সর্বপ্রথম ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। কবির উক্তি—"আমার হৃদয়ে একটি নূতন স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং সেখানেই রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস অঙ্কুরিত হইল।" সুতরাং ১৮৭৮ সালেই কবিচিত্তে এই মহাকাব্য রচনার প্রথম আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। নিম্নে এই তিনখানি কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রৈবতক (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭)

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে পুরীধামে রথযাত্রা উপলক্ষে ঐ উৎসবে সমাগত অসংখ্য যাত্রীদের মধ্যে একটি ভক্তিমতী বালিকার জগন্নাথ দর্শনের আকুল আগ্রহ দেখিয়া ইহমুগ্ধ কবিচিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ইহাই কৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মহাকাব্য রচনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ মানসিক অবস্থায় তিনি ভাগবতের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া কৃষ্ণলীলার গূঢ় অর্থ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে নবীনচন্দ্র পাটনার অন্তর্গত বেহার মহকুমায় বদলি হন। এই মহকুমার অন্তর্গত রাজগৃহে (রাজগির) শিবির স্থাপন করিয়া সরকারী কর্ম নির্বাহ করিবার কালে তিনি পুনর্বার মহাভারত পাঠ করিলেন এবং কৃষ্ণলীলার নূতন তাৎপর্য সন্ধানে উৎসুক হইলেন। এবিষয়ে তাঁহার উক্তি উল্লেখযোগ্য: "মহাভারত পড়িতে পড়িতে আমার প্রথম ধারণা হইল যে, মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য (Stupendous Epic) নহে, উহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য।" এই মহাকাব্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হইল। "বুঝিলাম, অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম মহাভারত। শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত ধর্মরাজ্যই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য।" অত্যন্ত আবেগের বশে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতের দার্শনিক ইতিহাস (Philosophical History) রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ গুরুতর ব্যাপারে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। তখন কবি তাঁহার বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু "তিনিও পারিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিলেন।" এদিকে কবিচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাবপ্রবাহে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। "আমি এই আত্মহারা ভাবে কি এক অচিন্তনীয় আবেগের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনখানি কাব্যের প্রস্তাবনা লিখিলাম—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', এবং 'প্রভাস'।" পরে তিনি 'রৈবতক' কাব্যের প্রথম তিনটি সর্গ লিখিয়া তিনখানি কাব্যের খসড়া সমেত মতামতের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে সরকারী কর্মে নিযুক্ত। তিনি উক্ত প্রস্তাবনা

(plot) এবং রৈবতকের তিনসর্গ পাঠ করিয়া ১৮৮০ সালের ১০ই জানুয়ারী কবিকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

> "You have planned a new 'Mahabharat' indeed—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্ম রামায়ণ। It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that execute with same grandeur as you have planned, you will perfectly justify yourself. Properly executed, the poem will of course take its rank as the greatest in the language. I warn you however, not to be two confident of success ; of popularity I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century."

তারপর তিনি কবিকে সম্পূর্ণ কাব্যটিকে অমিত্রাক্ষরে ছন্দে লিখিতে নিষেধ করিলেন, "If you continue the poem, my advice is that, you should change the ছন্দ at every chapter let it generally be rhyme." পরে ঐ পত্রে নবীনচন্দ্রের অভিনব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন :

> "Lastly will your poem be historically and politically true ? I have advised you to keep clear of history ; but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are concerned, but I am hardly bold enough to advise you to do so, in the case of large national movements. Now I believe that it is not historically true, either that Krishna set himself against Brahminical authority (there was never a greater champion of it)—or that the Brahmanas ever coalesced with the non-Aryans in order to put down the Kshatriyas."

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পত্রেই রৈবতকের তিন সর্গের নানা স্থানে সমালোচনা করেন। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক মন্তব্যই স্বীকার করেন, কিন্তু ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, কৃষ্ণের আবির্ভাবকালে শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়শক্তি ধ্বংসের জন্য অনার্যদের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ এবং সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঈষৎ তীক্ষ্ণ সমালোচনায় কবি একটু ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধু এবং তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবিকে নিন্দা করিলেন। তিনিও কবিকৃত অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্ব জীর্ণ করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। কেবল ঢাকা 'বান্ধব' পত্রের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ কবিকে কিছু উৎসাহ দিয়া লিখিলেন :

> "আমি আপনার কাব্যসূচনীয় এক খোষখত নকল করাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেইটি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পড়িয়াছি। Conception extraordinarily grand. Execution ঠিক তেমনি হইবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে। মহাভারতরূপ

কাব্যসমুদ্রকে আবার ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিতে যাওয়া বড় স্পর্ধার কথা, পারিলে অসামান্য সুখের কথা।"

এই সমস্ত মন্তব্যের ফলে নবীনচন্দ্র কাব্যরচনায় কিছু বিলম্ব করিলেন। তারপর ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাস হইতে তিনমাসের ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিলেন এবং আবেগের দ্বারা চালিত হইয়া 'রৈবতকে'র আরও কয়েকসর্গ লিখিয়া ফেলিলেন। পরে ১৮৮৪ সালের মে মাসে নোয়াখালিতে এবং ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে ফেণীতে বদলি হইলেন। এই বৎসর 'রৈবতকে'র প্রায় অধিকাংশ রচিত হইয়া যায়। রৈবতকের প্রথমার্ধ নকল করিয়া ছাপিবার জন্য তিনি কলিকাতায় পাণ্ডুলিপিটি পাঠাইয়া দেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি অসুস্থ অবস্থায় কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী: অব্দে আগস্ট মাসের পূর্বে কবি সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং এই বৎসরের ১৬ই আগস্ট ফেণীতে অবস্থান কালে 'রৈবতক' সমাপ্ত করিলেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ খ্রী: অব্দ—মোট তিন বৎসরের মধ্যে 'রৈবতক' রচিত হয়। কিছুকাল ছাপাখানায় পড়িয়া থাকার পর ১৮৮৬ খ্রী: অব্দের শেষে 'রৈবতক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এই তারিখ—১৮৮৭ খ্রী: অ:, ২রা ফেব্রুয়ারী। 'রৈবতকে'র প্রথম সংস্করণে কবি তাঁহার বন্ধু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়া যে পত্রটি সংযোজিত করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ—১লা ভাদ্র, ১২৯৩ সন—অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাস। এই পত্রে জানা যাইতেছে যে, এই সময়ে রৈবতকের মুদ্রণ কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ছাপাখানার হাঙ্গামা চুকাইয়া বোধহয় কাব্যটি পাঠকসমাজে প্রচারিত হয় ১৮৮৭ সালের প্রথমে। তাই বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় ১৮৮৭ খ্রী: অব্দের উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রকাশের পর রৈবতক আশাতীত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। 'সাধারণী' পত্রিকায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় নিজ নাম গোপন করিয়া এই কাব্যের প্রশংসামূলক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। তখন নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত; কিন্তু দেশের ভাবুক সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে 'রৈবতকে'র মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন। কিছু কাল পরে 'সাহিত্য' পত্রেও রৈবতকের প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের লেখক স্বনামধন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তখনও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ হীরেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় নাই। পরে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হীরেন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার কোন কোন অংশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; তাহাতে সভায় কিছু বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। (নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, ২য়, পৃ: ৪৭৪)। যাহা হউক হীরেন্দ্রনাথের মতো পণ্ডিত ও রসিক ব্যক্তি রৈবতকের প্রশংসা করিলে সারস্বত সমাজে কবির প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও *Calcutta Review* পত্রিকায় 'New Bengali Literature' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের কাব্যের সামান্য সমালোচনা করিলেও অজস্র প্রশংসাবাক্যে রৈবতকের কবির কবিত্ব ও পরিকল্পনাকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"The grandeur of the situation fails description. A dim pre-historic vista—a hundred surging peoples and mighty kingdoms, in the dim

light clashing and warring with one another like emblematic dragons and crocodiles and griffins on some Afric shore, the astitute Brahmin priest fomenting eternal disunion by planting—distinction of caste, of creed and of political government on the basis of Vedic revelation···in the foreground the figure of the half divine legislator Krishna, whom Bishnu, the Lord of the Universe, guides through mysterious visions and phantasms,—unfurling in the fulness of his destiny the flag of the Universal religion of Baishnavism to hurl down the Brahminic priesthood and their cruel Vedic ritualism and to establish in their place the Kingdom of God in Mahabharat —one vast Indian Empire, a realised universal human brotherhood, embracing Aryan and Non-Aryan in bonds of religious, social and political unity, a grand design, scenic pomp, an antique as well as modern significance like this what national epic can show ?"

—B N. Seal's *New Essays in Criticism*

অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ 'রৈবতকে'র শেষার্ধের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, তিনি এই কাব্যকে দর্শন ও ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় রাখিয়া ইহার গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রও কবিকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, "তোমার এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তুমি যেরূপ জলের মত চালাইয়াছ, আমার বিশ্বাস যে, এতদিনে নাটক লিখিবার ভাষা সৃষ্টি হইল।" তিনি নবীনচন্দ্রের পরিকল্পিত অভিনব কৃষ্ণচরিত্র বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই লিখিয়াছিলেন, "কিন্তু তুমি কৃষ্ণকে যেভাবে দাঁড় করাইয়াছ, তিনি দেশের হৃদয়ে সেভাবে দাঁড়াইতে পারিবেন কিনা আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।"

ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন। তবু তিনি প্রচণ্ড আবেগের বশে স্বীয় মতানুযায়ী কাব্য ও চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 'রৈবতক' প্রকাশের পরে তিনি প্রচুর প্রশংসা লাভ করিলেন। তাঁহার কাব্যে আস্তিক্যবাদী মনোভাব ও উচ্চনীতি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া চিন্তাশীল পাঠক সুখী হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম মতাবলম্বী কোন কোন পাঠক বোধ হয় কবির উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও পুরাণের অভিনব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 'ভারতী' পত্রিকায় এই কাব্যের কঠোর সমালোচনা বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথও এই কাব্যের প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন না। তাহা হইলেও সে যুগে প্রশংসার দিকেই 'রৈবতকে'র পাল্লা ঝুঁকিয়াছিল, ইহা মিথ্যা নহে।

'রৈবতক' রচনার পূর্বে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলা পাঠ করেন দুই গ্রন্থে। পুরীধামে অবস্থানকালে তিনি সর্বপ্রথম ভাগবতের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন এবং ব্রজলীলার অনুরাগী হইয়া পড়েন। তার পর তিনি রাজগিরে বদলি হইয়া নূতন ভাবদৃষ্টির সাহায্যে মহাভারত আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলেন। তাই 'রৈবতকে'র আখ্যান পরিকল্পনায় মহাভারত ও ভাগবতের যুগপৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণের আখ্যানের সহিতও 'রৈবতকে'র সাদৃশ্য আছে। প্রেমভক্তি এবং ব্রজলীলার অংশ ভাগবত হইতে এবং কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিক পরিকল্পনার সূত্র মহাভারত হইতে গৃহীত হয়। কবি মহাভারতকে ঐতিহাসিক মহাকাব্য বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়া রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের কাহিনী ও তত্ত্বাংশের পরিকল্পনা করেন, তাহার অনেকটাই তাঁহার স্বকৃত কল্পনাসৃষ্ট। নিম্নে সংক্ষেপে 'রৈবতকে'র উৎস প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কবি 'রৈবতক' কাহিনী পরিকল্পনায় মূল উৎস অনুসরণ করিলেও স্বকল্পিত বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য কাহিনী ও চরিত্রকে নানাস্থানে অদল-বদল করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু নবীনচন্দ্রই নহেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি ও চিন্তানায়কগণ প্রাচীন পুরাণকথাকে সর্বত্র রেখায় রেখায় অনুসরণ করেন নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র—ইঁহারা সকলেই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ সংস্কারের দ্বারা নূতন করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও 'রৈবতক' কাহিনী নির্বাচনে অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

মহাভারতের আদি পর্বের ২১৩ অধ্যায়ে অর্জুনের দ্বাদশবর্ষ বনবাস বর্ণিত হইয়াছে। একদা অর্জুন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে একাসনে দর্শন করিয়া পূর্ব-প্রতিজ্ঞামত দ্বাদশবর্ষের জন্য বন গমন করেন। তিনি বহু তীর্থ পর্যটনের পর ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রভাসতীর্থে উপনীত হইলেন। এখানে কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; তাঁহারা দ্বারকাবাসীর দ্বারা অভ্যর্থিত হইলেন এবং রৈবতক পর্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই পর্বের ২১৯ অধ্যায়ে (সুভদ্রাহরণ পর্বাধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে যে, রৈবতক পর্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দের উৎসবে অর্জুন বসুদেব-দুহিতা, কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী ও সারণের সহোদরা সুভদ্রা৲কে দর্শন করিয়া চিত্তচাঞ্চল্যের বশীভূত হইলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ মৃদু পরিহাস করিয়া তাঁহাকে সুভদ্রা হরণে অনুমতি দিলেন। "স্বয়ংবর কাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কারণ স্বয়ংবরে কে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?" (কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্করণ)। অতঃপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি আনাইয়া এবং বসুদেবের সম্মতি পাইয়া রৈবতক পর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাও রৈবতক পর্বতে দেবার্চনার পর সখীসহ দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় অর্জুন কর্তৃক বলপূর্বক গৃহীত হইলেন। অর্জুন তাঁহাকে রথে তুলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রথ চালনা করিলেন। ইহাতে অপমানিত হইয়া ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বলরামের নির্দেশে নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট অর্জুনের অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। কৃষ্ণ সকলকে বুঝাইলেন যে, অর্জুন সুভদ্রাহরণ করিয়া বীরোচিত কার্যই করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যে যাদবগণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনকে সসম্মানে ইন্দ্রপ্রস্থের পথ হইতে দ্বারকায় ফিরাইয়া আনিলেন। দ্বারকায় অর্জুন ও সুভদ্রার যথাবিধি বিবাহ হইল। অর্জুন নববধূর সাহচর্যে মহানন্দে দ্বারকায় একবর্ষ যাপন করিলেন।

কাশীরামদাসের মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত এই কাহিনীতে আরও একটু অতিরঞ্জন আছে। অর্জুন রৈবতকে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সুভদ্রাও কামশরে আহত হইলেন। ("অর্জুনের নয়নচাহনি তীক্ষ্ণ শর। আজি অঙ্গ আমার করিল জরজর॥") তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন, "তোমার বিবাহ দিব স্থির হও বলি।" কাশীরাম এই ব্যাপারে সুভদ্রার আগ্রহাতিশয্য বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যভামা কৃষ্ণের নিকট সমস্ত ব্যাপার

বলিয়া নিজেই সুভদ্রাকে অর্জুনের করে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু অর্জুন ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবাহে সম্মত হইলেন না। তখন সত্যভামা রতির সাহায্যে সুভদ্রাকে মোহিনী রূপে সাজাইয়া অর্জুন সমীপে পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন। রতির কৌশলে সুভদ্রা অর্জুনের শয়নকক্ষের দ্বার স্পর্শ করিতেই তাহা মুক্ত হইয়া গেল। অর্জুন তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং খড়্গের দ্বারা ভয় দেখাইলেন। কিন্তু সুভদ্রার সিঁথিমূলে রতির মন্ত্রপূত সিন্দুর ও নয়নের কাজল দেখিয়া অর্জুনের বিরূপতা ভাসিয়া গেল। তিনি কামের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন সুভদ্রার নির্দেশে ও সখীগণের সহায়তায় অর্জুন ও সুভদ্রার গান্ধর্বমতে বিবাহ হইল। অতঃপর সত্যভামা কৃষ্ণের নিকট এই সংবাদ নিবেদন করিলেন এবং সামাজিক বিবাহের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ একটু বিমনা হইলেন; কারণ বলরাম হয়তো এই বিবাহে সম্মত হইবেন না। এই বিষয়ে দেবকী ও রোহিণীর মধ্যেও আলোচনা হইল। দেবকী বলরামকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পাণ্ডবদের জন্মকথা তুলিয়া বলরাম এই বিবাহে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ ও সত্যভামা ইহাতে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কারণ হলধর দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। অর্জুন ক্ষুব্ধ হইয়া সুভদ্রাকে হরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কৃষ্ণ এই সমস্ত কলহদ্বন্দ্বের পথে না গিয়া অর্জুনকে সুভদ্রাহরণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পশ্চাতে তিনি বলরামের ক্রোধ নিবারণ করিবেন। ইতিমধ্যে বলরামের নির্দেশে দুর্যোধন বরবেশে দ্বারকার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া বলরাম সুভদ্রাবিবাহের অধিবাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অধিবাসের সাজসজ্জাসহ সুভদ্রা সরস্বতীকূলে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের নির্দেশে সারথি দারুক অর্জুনের আজ্ঞাবহ হইলেন। অর্জুন সেই রথে সরস্বতী তীরে উপনীত হইলেন এবং সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রথ চালনা করিলেন। এই সংবাদে হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া যাদবগণকে অর্জুন-আক্রমণে প্রেরণ করিলেন। বীরাঙ্গনা সুভদ্রা অর্জুনের সঙ্কট দেখিয়া নিজেই রথরজ্জু ধারণ করিলেন এবং অর্জুন অক্লেশে যাদব বীরদিগকে নিরস্ত করিলেন। সুতরাং দুর্যোধন বিফল-মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিলেন। যাদবগণ মহানন্দে অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে সুভদ্রাসহ অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং দ্রৌপদীর ক্রোধ শান্ত করিলেন।

এবার 'রৈবতক' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে:

প্রথম সর্গ (প্রভাস): প্রভাসের সমুদ্রতীরে প্রত্যূষে কৃষ্ণার্জুন উপবিষ্ট এবং নিসর্গসৌন্দর্যে মুগ্ধ; ঋষিগণ সূর্যবন্দনা করিলে কৃষ্ণ জড়বস্তুর উপাসনা না করিয়া সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। ইত্যবসরে সশিষ্য দুর্বাসা উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া উত্তর না পাইয়া 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে'—এই অভিশাপ দিয়া সক্রোধে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের অত্যাচারে চিন্তিত হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ (ব্যাসাশ্রম): ব্যাসাশ্রমের অহিংস সাত্বিক মূর্তি দর্শনে অর্জুন মুগ্ধ; আশ্রম শিশুগণ কর্তৃক আধো আধো ভাষায় কৃষ্ণার্জুনের অভ্যর্থনা। এখানে

অর্জুনের সুভদ্রা সন্দর্শন ও কৃষ্ণের নিকট তাঁহার পরিচয় লাভ। তাঁহার হৃদয়ে আবেগ সঞ্চার।

তৃতীয় সর্গ (অদৃষ্টবাদ): ব্যাস, কৃষ্ণ ও অর্জুনের ধর্মতত্ত্ব লইয়া গভীর দার্শনিক আলোচনা। ব্যাসদেব ও কৃষ্ণ অদৃষ্টবাদ ও কর্মবাদ লইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। অর্জুন চন্দ্রচূড় নামক এক নাগকে হত্যা করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে তীর্থ পর্যটন করিতেছেন। সেই নাগ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিতে আসিয়াছিল; তাই অর্জুন তাঁহাকে নিহত করেন। মৃত্যুকালে সেই নাগ সকরুণ কাহিনী বলিয়াছিল। সে তাহার একমাত্র শিশুকন্যাকে এক বিন্দু দুগ্ধ দিবার জন্যই এই দুষ্কর্ম করিতে আসিয়াছিল, অন্য কোন অসদুদ্দেশ্যে নহে। তদবধি অর্জুন মৃত-নাগের বালিকা কন্যাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তাহাকে পাইলে তিনি অপত্যনির্বিশেষে পালন করিবেন। কিন্তু ব্যাসদেব বলিলেন, মানুষের অদৃষ্টে কি আছে কেহ কি বলিতে পারে? অর্জুনের দ্বারা হয়তো সেই বালিকার চূড়ান্ত ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং বালিকার সন্ধানের আর প্রয়োজন কি? সেই প্রসঙ্গেই কৃষ্ণ ও ব্যাসের মধ্যে অদৃষ্টবাদের যৌক্তিকতা লইয়া আলোচনা হইল। বহুধাবিভক্ত ভারতের অবস্থা দর্শনে ব্যাস চিন্তিত, কৃষ্ণ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসুক।

চতুর্থ সর্গ (মহাসন্ধি): দুর্বাসা কৃষ্ণের ঔদাসীন্যে অপমানিত হইয়া সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য অনার্যরাজ বাসুকির স হত ষড়যন্ত্র করিলেন। বাসুকি ইতিপূর্বে সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অনার্যকরে ভগিনী দানে কৃষ্ণ সম্মত হন নাই। এইজন্য কৃষ্ণার্জুনের প্রতি তাহারও অতিশয় বিরাগ; দুইজনে একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়বিনাশের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ (অনুরাগ): কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা ও অন্তঃপুরিকা সুলোচনার নিকট সুভদ্রার অর্জুনপ্রীতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ছদ্মক্রোধে সত্যভামা সুভদ্রার অঙ্কিত অর্জুনের ছবিখানি কাড়িয়া লইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ (পুরোদ্যান): পুরোদ্যানে সুভদ্রার সহিত অর্জুনের প্রথম সাক্ষাৎকার, অর্জুনের চিত্রখানি অর্জুনের সম্মুখেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অতর্কিতে সত্যভামা ও সুলোচনা পুরোদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা অর্জুন ও সুভদ্রার পারস্পরিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়া সুখী হইলেন। এই সময়ে এক অনার্য বালকের সতর্ক চেষ্টার ফলে, বিষধরের বিষদন্ত হইতে অর্জুন রক্ষা পাইলেন। তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অর্জুন তাহাকে সেবক নিযুক্ত করিলেন।

সপ্তম সর্গ (পূর্বস্মৃতি): কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ জীবনের পূর্বকথা বিবৃত করিলেন।

অষ্টম সর্গ (দলিত ফণিনী) : বাসুকির ভগিনী যুবতী জরৎকারু সখীর নিকট কৃষ্ণাসক্তির কথা বলিল। কৃষ্ণ একদা কর্মোপলক্ষে পাতালপুরে বাসুকির রাজ্যে গিয়াছিলেন। সেখানে নাগরাজকন্যা বাসুকি-ভগিনী জরৎকারু তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু কৃষ্ণ কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকে প্রত্যাখান করেন, তদবধি কৃষ্ণের প্রতি জরৎকারুর ঘৃণাপূর্ণ দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মিল। বাসুকির অনুরোধে নাগজাতির কল্যাণের জন্য মনের কামনা মনে রাখিয়া সে বৃদ্ধ দুর্বাসাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। দুর্বাসা নিজ নাম গোপন করিয়া ইহাদের নিকট আপনাকে জরৎকারু নামে পরিচয় দিয়াছেন।

নবম সর্গ (আত্মবিসর্জন) : অর্জুনের ভৃত্য অনার্যবালক শৈল ছদ্মবেশিনী শৈলজা, বাসুকির ভগিনী-স্থানীয়। অর্জুন এই শৈলজার পিতা চন্দ্রচূড়কেই গোধনহরণ অপরাধে বধ করিয়াছিলেন। বাসুকি শৈলজার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে বালকবেশে অর্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল—উদ্দেশ্য শৈলজা কর্তৃক অতর্কিতে অর্জুনের বধসাধন। কিন্তু সদয় ব্যবহারে শৈলজার বিরূপ চিত্ত ধীরে ধীরে অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

দশম সর্গ (কুমারীব্রত) : কুমারীব্রতচারিণী ভদ্রাকে অপহরণের নিমিত্ত দস্যুর ছদ্মবেশে বাসুকির আক্রমণ, অর্জুনের সহিত দস্যুর যুদ্ধ। শৈলজার বুদ্ধিকৌশলে সুভদ্রা ও অর্জুন উভয়েই দস্যুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন।

একাদশ সর্গ (মানিনীর পণ) : কৃষ্ণ ও সত্যভামার মান-অভিমানের লীলা, সত্যভামা সুভদ্রার সহিত অর্জুনের বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর। বলরামের কথা চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ কিছু শঙ্কিত।

দ্বাদশ সর্গ (সোঽহং) : কৃষ্ণ দূতমুখে সংবাদ পাইলেন যে, কৃষ্ণবিরোধিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি ধর্মরাজ্য স্থাপনের অভিলাষী। ব্যাসকে সেই কথাই নিবেদন করিলেন। ব্যাসদেব এ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ বিরাট-মূর্তি (বিশ্বরূপ) দেখাইয়া অর্জুন ও ব্যাসকে এই মহাব্রত লইতে উদ্বুদ্ধ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ (দুর্বাসার দৌত্য) : দুর্বাসা ক্ষত্রিয়বিনাশ দ্রুততর করিবার জন্য বলরামের কাছে দুর্যোধনের কথা নিবেদন করিলেন এবং সুভদ্রার সহিত দুর্যোধনের বিবাহ হওয়া উচিত তাহা জানাইলেন। কৃষ্ণের অসম্মতি সত্ত্বেও বলরাম দুর্যোধনকে মনোমত পাত্র বলিয়া স্থির করিলেন। দুর্বাসার দৌত্য অনেকটা সফল হইল।

চতুর্দশ সর্গ (ঊর্ণনাভ) : বাসুকি অনূঢ়া ভদ্রাকে হরণ করিতে গিয়াছিল শুনিয়া দুর্বসা তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন—কৃষ্ণ সুভদ্রার প্রলোভনের ফাঁদে ফেলিয়া বাসুকিকে নিরস্ত করিতে চাহেন। সুতরাং বাসুকির ও-পথ পরিত্যাগ করা উচিত

দুর্বাসার ষড়যন্ত্রে সুভদ্রাকে লইয়া অর্জুন ও দুর্যোধনের মধ্যে বিরোধ বাধিলে ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট হইবে, তখন বাসুকি ভদ্রালাভ সমর্থ হইবে। বাসুকি দুর্বাসার এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার বুদ্ধিমতো চলিতে লাগিল।

পঞ্চদশ সর্গ (গঙ্গাযমুনা): অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহসম্পর্কে কৃষ্ণ, রুক্মিণী ও সত্যভামার কথোপকথন। নারীগণ সুভদ্রার্জুনের মিলনের জন্য বিশেষ উৎসুক। কৃষ্ণেরও তাহাই অভিপ্রায়।

ষোড়শ সর্গ (রাখিবন্ধন): নিভৃতে অর্জুন-সুভদ্রার সাক্ষাৎ। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের সম্মান রক্ষা করিতে অভিলাষী; রক্তপাত না হইলে সুভদ্রার আপত্তি নাই। দুইজনে নারায়ণরূপী কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণতি জানাইলেন। সত্যভামা উপস্থিত হইয়া ধনঞ্জয়ের করে সুভদ্রাকে অর্পণ করিলেন এবং আপনার প্রকোষ্ঠ হইতে পুষ্পরাখী খুলিয়া পার্থের মণিবন্ধে বাঁধিয়া দিলেন।

সপ্তদশ সর্গ (মহাভারত): গভীর রাত্রে অর্জুন কৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের সহিত নানা তত্ত্বালোচনা হইল। কৃষ্ণ অর্জুনকে ভারতের দুরবস্থা দেখাইয়া দিলেন এবং 'ধর্মরাজ্য' ('মহাভারত') স্থাপনের জন্য অর্জুনকে আহ্বান করিলেন। ধর্ম সংস্থাপনার জন্য ধর্মযুদ্ধ প্রয়োজন, এই কথাই তিনি অর্জুনকে বুঝাইলেন। তারপরে তিনি অর্জুনকে সুখতত্ত্ব ও 'সোঽহং'বাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ (তপস্বিনী): দুর্বাসা ও জরৎকারুর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবন। পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধির মানসে এই দাম্পত্য বন্ধন।

ঊনবিংশ সর্গ (অদৃষ্টফল): অর্জুনের সদয় ব্যবহারে শৈলজার অন্তরে অর্জুন-আসক্তির আবির্ভাব। অর্জুনকে সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া শৈলজা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয় দিল এবং বাসুকির অভিসন্ধি জ্ঞাপন করিল। পরিশেষে অর্জুনের প্রতি তাহার সর্বসমর্পণমূলক নৈষ্ঠিক রতি নিবেদন করিল এবং অর্জুন সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া প্রিয়জনের সুখের জন্য দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল। অর্জুন চিন্তিত হইলেন। হয়তো ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ হইবে। অর্জুন এই বালিকার হন্তারক হইবেন—ইহাই কি অদৃষ্ট ফল?

বিংশ সর্গ (অঙ্কুর): বলরামের নিকট বার্তাবহ আসিয়া জানাইল যে, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়া লইয়া যাইতেছেন, সুভদ্রা স্বেচ্ছায় রথের রজ্জু ধারণ করিয়াছে। ইহাতে সত্যভামা, সুলোচনা প্রভৃতি অন্তঃপুরিকাগণ বিশেষ আনন্দিত। এই সংবাদে বলরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্যাসদেব ও কৃষ্ণের অনুরোধে বলরাম কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। অর্জুন রথের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িলে

সুভদ্রা চরণে রথের রশ্মি ধরিয়া নিজেই শরক্ষেপ করিয়া আক্রমণকারীদের আঘাত হইতে মূর্ছিত অর্জুনকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া বলরামের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইল। তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন। যদুবংশ ও পাণ্ডব-বংশের মধ্যে বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কৃষ্ণ ও ব্যাসদেব আশান্বিত হইলেন—ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল।

নবীনচন্দ্র 'রৈবতকে'র কাহিনী নির্বাচনে মূল মহাভারতের সাহায্য গ্রহণ করিলেও কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতই তাঁহাকে অধিকতর অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অর্জুন ও সুভদ্রার পরিণয় ব্যাপার বর্ণনাই এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাভারতে বর্ণিত এই রোমাণ্টিক প্রণয়গাথার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া কবি সর্বপ্রথমে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাহ্যতঃ ইহাতে অর্জুনের প্রাধান্য থাকিলেও সমস্ত কাহিনীটির অন্তরালে কৃষ্ণের অঙ্গুলিসঙ্কেত রহিয়াছে; ভারতের বৃহৎ কল্যাণের জন্য ভদ্রার্জুনের বিবাহ কৃষ্ণের অভিপ্রেত। সুতরাং সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের চিত্তবিকার দর্শনে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে সুভদ্রাহরণের অনুমতি দিলেন। অবশ্য মূল মহাভারতে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে কাশীরাম দাস তাহাকে আরও বিস্তৃতভাবে তরল ও সরস করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাশীরাম বর্ণিত সুভদ্রাবিবাহে সত্যভামার প্রাধান্যই অধিক এবং কামশরাহত সুভদ্রাও অধিকতর সপ্রতিভ ও সক্রিয়। নবীনচন্দ্র মূল কাহিনী বর্ণনায় কৃষ্ণের অন্তঃপুরকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন এবং রুক্মিণী, সত্যভামা ও সুলোচনার স্নেহ, ব্যঙ্গ, পরিহাস প্রভৃতি তরল ব্যাপারকে খানিকটা ঘরোয়া পরিবেশে স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের অনুমান, কবি এই বিষয়ে মূল মহাভারত অপেক্ষা কাশীরাম দাসের বর্ণনাকে অধিকতর অনুসরণ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রাভিনয়ে সুভদ্রাহরণ আখ্যান অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। কবি তাহার দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। হেমচন্দ্র 'রৈবতক' পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমার মতে সাদাসিদে 'সুভদ্রাহরণ' লিখিলে ভাল হইত।" এই মন্তব্যে নবীনচন্দ্র একটু ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "হা অদৃষ্ট! সুভদ্রাহরণ লেখা যে রৈবতকের উদ্দেশ্য নহে, তাহা কি হেমবাবু বুঝিলেন না?" অর্থাৎ কেবলমাত্র যাত্রাভিনয়ের সুভদ্রাহরণ বর্ণনাই নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণজীবনকে নূতন ভাবাদর্শ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বালোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কৃষ্ণ যে মহাভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, অর্জুনসুভদ্রা-বিবাহ তাহারই ভূমিকামাত্র। তাই নবীনচন্দ্র কৃষ্ণজীবনের বৃহদাদর্শকে তিনখানি মহাকাব্যে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিতে চাহিয়াছিলেন। 'রৈবতকে' সুভাদ্রার্জুনের বিবাহ, 'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্যুর নিধন এবং 'প্রভাসে' যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ—মহাকাব্যের এই বিরাট আখ্যানকে তিনি এই ভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ কৃষ্ণের জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহারই জন্য এই কাহিনীর পরিকল্পনা। কাহিনীর প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 'রৈবতকে' সুভদ্রাহরণ-পর্বকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিতে গিয়া কবি সম্পূর্ণ কাল্পনিক আখ্যানের সাহায্য লইয়াছেন এবং সেই আখ্যানটিকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজবিশ্লেষণেও প্রয়োগ করিয়াছেন। পুরাণ হইতে সামান্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া দুর্বাসা ও জরৎকারুর কাহিনীকে তিনখানি কাব্যেই মূল

ঘটনার সহিত অন্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কংসবিনাশে সাহায্যের জন্য কৃষ্ণের পাতালে গমন ও অবস্থিতি, সেখানে নাগকন্যা জরৎকারু তাঁহার প্রতি আসক্ত; কৃষ্ণের নিকট জরৎকারুর আত্মনিবেদন, কর্তব্যের অনুরোধে কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান, ব্যর্থ প্রণয়ে ক্রুদ্ধ জরৎকারুর অন্তরে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সঞ্চার, বাসুকির সুভদ্রাকামনা, এবং তাহাতে নিরাশ হইয়া কৃষ্ণার্জুন ও ক্ষত্রিয়সমাজের বিরুদ্ধে আক্রোশ, অর্জুনকে অতর্কিতে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে বাসুকি কর্তৃক শৈলজা নিযুক্ত, কৃষ্ণের অবৈদিক ধর্মপ্রচারে ক্ষুব্ধ দুর্বাসার বাসুকির সহিত কৃষ্ণ ও ক্ষত্রিয়বিনাশের ষড়যন্ত্র এবং এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ ও অনার্যের সন্ধি, এই একই উদ্দেশ্যে দুর্বাসার জরৎকারু বিবাহ —প্রভৃতি ঘটনা কবির কল্পনাসৃষ্টি। পুরাণে-মহাকাব্যে ইহার সমর্থন নাই; কবি সামান্য তথ্যকে বৃহৎ কাহিনীর রূপ দিয়া সুভদ্রাহরণ নামক পৌরাণিক প্রেমের আখ্যানকে একটা জটিল জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও দার্শনিক তত্ত্বের দ্বন্দ্বের দ্বারা মহাকাব্যোচিত বিশালতা দান করিতে চাহিয়াছেন। তিনি 'রৈবতকে' একদিকে যেমন মূল কাহিনী অপেক্ষা কল্পিত কাহিনীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, তেমনি আবার কৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও অর্জুনের কথোপকথনের সাহায্যে সমাজদর্শন, তত্ত্ববাদ, অদৃষ্টতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার নিজস্ব ধ্যানধারণা সুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাসুকি, জরৎকারু, শৈলজা, দুর্বাসা প্রভৃতি চরিত্রকে তিনি সম্পূর্ণ নূতনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধকে মহাভারতীয় যুগের সমাজচিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং কি কাহিনী, কি চরিত্র এবং কি সমাজদর্শন—সর্ববিষয়েই নবীনচন্দ্র মূল পুরাণ ও মহাভারতকে যৎসামান্য অনুসরণ করিয়া নিজ কল্পনার অবাধ রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজেই 'রৈবতক' প্রেমের পৌরাণিক আখ্যান হিসাবে পাঠযোগ্য হইলেও মহাকাব্যের কোঠায় ইহার ঠাঁই হওয়া দুঃসাধ্য—তিনখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড হিসাবেও নহে, পৃথগ্‌ভাবেও নহে। মহাকাব্য পরিকল্পনার মতো কিছু শক্তি ও কল্পনা যে তাঁহার ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু মানসিক সংযমের অভাবে এবং চিত্তধর্মের অরিপক্বতার জন্য তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা মহাকাব্য সৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩)

কবি 'রৈবতকে'র পাঁচবৎসর পরে ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে 'কুরুক্ষেত্র' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ফেণীতে অবস্থানকালে সমাপ্ত করেন। সমাপ্তির পর তিনি পাণ্ডুলিপিটি ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং দুর্বাসা, জরৎকারু প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে ঠাকুরদাসের সঙ্গে পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট প্রেরিত হইল। হীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া কিছু কিছু মন্তব্য করিলেন এবং কবিকে দুর্বাসা-শিষ্যের চরিত্রটি বাদ দিতে অনুরোধ করিলেন। তখনও হীরেন্দ্রনাথ জানিতেন না যে, কবি 'প্রভাস' কাব্যেরও পরিকল্পনা করিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন, "'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতকে'র সমান নহে। কারণ, ইহাতে গভীর দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিক গবেষণা সেই পরিমাণে নাই।" যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ১৮৯৩ সালে কুরুক্ষেত্র প্রকাশিত হইল। কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আদর্শকে 'কুরুক্ষেত্রে' গ্রহণ

করিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তেরও প্রথম দিকে সেইরূপ সংশয় ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও কবির সহিত 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে যে সমস্ত পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, হীরেন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিয়া নিঃসংশয় হইলেন যে, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র কবির নিজস্ব মৌলিক পরিকল্পনা। মনীষী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদা কবির অধ্যাপক ছিলেন এবং কবিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনিও কুরুক্ষেত্র পাঠের পর কবিকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। জরুৎকারুর কৃষ্ণাসক্তি তাঁহার সমর্থন পায় নাই। কৃষ্ণের মুখে কবি বলিয়াছেন, "অধর্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন"—এই মন্তব্যটিও গুরুদাসের নিকট সমীচীন মনে হয় নাই। যাহা হউক তিনি দু এক স্থানের বর্ণনা সমর্থন করিতে না পারিলেও উক্ত কাব্য ও কবির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবির ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র 'কুরুক্ষেত্র' রচনার পর যেমন পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিলেন, তেমনি কোন কোন পাঠকের কঠোর মন্তব্যের সম্মুখীন হইলেন। 'নব্যভারত' পত্রে (কার্তিক, ১৩০০ সাল) 'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে সমালোচক বলিয়াছিলেন, "আমরা যখন কুরুক্ষেত্র প্রথমবার পড়িলাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম, কি নবীনচন্দ্র পড়িলাম, তাহা ঠিক থাকিল না।···কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীনবাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী।" ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্র হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই সংশয় নিরসন করিয়াছিলেন। তিনি পত্রিকা-সম্পাদককে পত্রযোগে জানাইলেন যে, 'রৈবতক' কল্পিত ও সূচিত হয় ১৮৮২ সালে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় ১৮৮৪ সাল হইতে। 'রৈবতক' লিখিত হইবার একবৎসর পরে যখন ইহার অর্ধেক ছাপা হইয়া গিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' তখনও মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছিল। তাই তিনি উক্ত প্রতিবাদ-পত্রে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিলেন, "রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে ঋণী নহি।" (নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, ৩য়, পৃ ৩) কথাটা অমূলক নহে। কবি ১৮৮২ সালে 'রৈবতক' কাব্যের প্রথম তিন সর্গ এবং 'কুরুক্ষেত্রে'র সম্পূর্ণ খসড়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি তথ্য পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইতে থাকে ১২৯১ সনের 'প্রচার' পত্রের আশ্বিন সংখ্যা হইতে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ)। ১২৯১ সনের আশ্বিন-কার্তিক, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ-আষাঢ়ে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র অনেকটা 'প্রচার' পত্রে প্রকাশিত হয়; গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে—তাহাও 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সবটা নহে—প্রথম খণ্ডাকারে ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'কৃষ্ণচরিত্রে'ই বঙ্কিমের প্রথম কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ পায় নাই। এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের পূর্বেই তাঁহার মনে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হয়। ১২৮১ সনের চৈত্রমাসে (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ) তিনি 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণলীলায় অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত আলোচনা হইতে একটু উদ্ধৃত হইতেছে:

> "কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমদ্ভাগবতে নহে। ইহার আদি

মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণচরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতে কি তা'ই? চারিজন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি একপ্রকার সেই ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?......"

পরবর্তী কালে রচিত 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে যে, নবীনচন্দ্রের রৈবতক পরিকল্পনার পূর্বে বঙ্কিম-মানসে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র এই কাব্য পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী হউন আর নাই হউন, রৈবতক পরিকল্পনার (১৮৮২) সাত বৎসর পূর্বে ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। এই সময়ে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তখন কবির মনে কৃষ্ণ সম্পর্কিত কোন তত্ত্বেরই উদয় হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি পুরীধামে (১৮৭৭) এবং পাটনার অন্তর্গত বেহার মহকুমায় (১৮৮৩) বদলি হইবার পর কৃষ্ণলীলার প্রতি আকৃষ্ট হন। অবশ্য ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'রঙ্গমতী'র একস্থলে রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের আভাস আছে:

অন্তরবিগ্রহে বৎস ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতিছত্রে এই বহ্নিশিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইল কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একচ্ছত্র হইল স্থাপন।
এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব অভিনেতৃ সম্বরিল লীলা
সিন্ধুপ্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ি-করে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্রে'র মৌলিকতা বিচার প্রসঙ্গে 'রঙ্গমতী' হইতে এই কয়ছত্র উদ্ধার করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, নবীনচন্দ্র এই কাব্য পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী নহেন। কিন্তু আমরা পরে দেখাইয়াছি যে, নবীনচন্দ্রেরও পূর্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্য গৌরগোবিন্দ রায় কৃষ্ণ-লীলার এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর সপ্তম দশকের পর বাঙলার ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ে কৃষ্ণলীলা

যেভাবে গৃহীত হইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেই ভাবধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলেন, একে অপরের দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ প্রভাবিত হন নাই। ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত কৃষ্ণজীবনের ঐতিহাসিকতা, নৈতিক আদর্শ ও দার্শনিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বয়ং কেশবচন্দ্রও কৃষ্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার উপদেশমালা ও প্রবন্ধাদিতে কৃষ্ণের নৈতিক আদর্শ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখ আছে। তাঁহার অনুগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ১৭৯৮ শকের ১লা কার্তিকের 'ধর্মতত্ত্বে' (১৮৭৬ সাল) শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা করেন এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির দ্বারা কৃষ্ণচরিত্রের নিত্যশুদ্ধ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সেই অনুসন্ধানের ফলে ১৮১১ শকে (১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ) 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' প্রকাশিত হয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বা সামান্য কিছু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা ও দার্শনিকতার অনুকূলে প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করেন। বলা বাহুল্য গৌরগোবিন্দ রায় কেশবচন্দ্রের নিকট উৎসাহ পাইয়া এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণের ভগবতসত্তায় বিশ্বাস করিতেন। অবশ্য কৃষ্ণের মানবিক মাহাত্ম্যই তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয় হইয়াছিল। তিনি ১৮০২ শকে লিখিত 'সেবকের নিবেদন', 'একাধারে নর-নারী প্রকৃতি' প্রভৃতি বাংলা প্রবন্ধে, ১৮৭৬ সালের ১০ই ও ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালের ১৪ই আগষ্টের 'Sunday Mirror'-এ, ১৮৮১ সালের ৯ই জুন, ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ সালের ২৩এ সেপ্টেম্বরের 'New Dispensation'-এ এবং ১৭৯৮ শকের (১৮৭৬) 'ধর্মতত্ত্বে' শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাকথা বলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের আর একজন অনুরাগী 'চিরঞ্জীব শর্মা' (ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সারবত্তা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন——সম্ভবতঃ ব্রহ্মানন্দের আদর্শে। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মহিমাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক উক্তিটি স্মরণীয়: "ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে দিয়া ফিরিয়া এস…" (জীবনবেদ, পৃ-২৯-৩০)। 'একাধারে নর-নারীর প্রতি উপদেশ' নামক প্রবন্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশক হইতে কৃষ্ণজীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচার করা হইতেছিল, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যেও কৃষ্ণমহিমা অল্পাধিক স্বীকৃত হইয়াছিল। সে মহিমা কৃষ্ণের মানবমহিমা। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের চেষ্টায় ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি কৃষ্ণলীলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শিশিরকুমার কৃষ্ণের ভগবত লীলা ও অলৌকিকতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরদের কেহ কেহ কৃষ্ণের আধুনিক যুগোপযোগী মানবলীলাকেই অধিকতর শ্রদ্ধা করিতেন। যাহা হউক নবীনচন্দ্রের পূর্ব হইতেই যে কৃষ্ণলীলা-কথা ও তত্ত্বব্যাখ্যা শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের পূর্বেই সেই লীলাকথাকে ইতিহাস, দর্শন ও যুক্তিবাদের পক্ষ হইতে বিচার করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাহাতে ভাগবতোক্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের অনুগত ভক্তিবাদ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কিয়দংশে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী এবং তৎকালীন যুগমানসের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রধান ঘটনা অভিমন্যুবধ। এই অভিমন্যুবধ মহাভারতের দ্রোণপর্বের অন্তর্গত 'অভিমন্যুবধ পর্বাধ্যায়ে' বর্ণিত হইয়াছে। আমরা মহাভারতোক্ত সেই কাহিনী সংক্ষেপে

বিবৃত করিতেছি। 'অভিমন্যুবধ পর্বাধ্যায়' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনের বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধেই অভিমন্যু নিহত হন।

দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করিলেন। এদিকে অর্জুন সংশপ্তকগণের[১০] সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। এই চক্রব্যূহ ভেদের কৌশল অভিমন্যু জানিতেন। আর জানিতেন অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অভিমন্যু চক্র্যব্যূহভেদে প্রস্তুত হইলেন। অবশ্য তিনি চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ জানিতেন, নির্গমের কৌশল জানিতেন না। যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিলেন যে, অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহারাও তাঁহার অনুগামী হইয়া সাহায্য করিবেন। তখন অভিমন্যু মহাবেগে দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়া কৌরবপক্ষীয়দিগকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কেবল জয়দ্রথ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া ব্যূহপ্রবেশের মুখ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি মহাদেবের বর-প্রভাবে অর্জুন ভিন্ন অন্য চারজন পাণ্ডবকে বাধা দিবার সামর্থ্য রাখিতেন। অর্জুন তখন সংশপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। অতঃপর দুর্যোধনের আহ্বানে ন্যায়-অন্যায় বোধ রহিত হইয়া দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্‌বল ও কৃতবর্মা—এই কয়জনে মিলিত হইয়া নিষ্করুণভাবে অন্যায় সমরে অভিমন্যুকে নিহত করিলেন।

দ্রোণপর্বের অন্তর্গত 'প্রতিজ্ঞা পর্বাধ্যায়ে' ইহার পরবর্তী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। অর্জুন সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া নিরানন্দময় শিবিরে ফিরিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি বীরোচিত বিলাপ করিতে করিতে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পাপ জয়দ্রথ তাঁহার শরণাগত না হইলে পরদিনই তাহার জীবনান্ত করিবেন। জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে যদি সূর্যাস্ত হয়, তাহা হইলে সব্যসাচী হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। অভিমন্যুর মৃত্যুতে সুভদ্রা, পাঞ্চালী ও উত্তরা মূর্ছিত-প্রায় হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি সান্ত্বনা দিলেন। অর্জুন কি করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া জয়দ্রথের বধ সাধন করিলেন, তাহা মহাভারত পাঠক অবগত আছেন।

নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ অভিমন্যুবধকেই এই কাব্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়াছেন। 'অভিমন্যুবধ পর্বাধ্যায়' ১৩শ দিনের যুদ্ধের বর্ণনাসহ আরম্ভ হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্র ১১শ দিনের যুদ্ধের বর্ণনাসহ কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। সুলোচনা সুভদ্রাকে শিবিরে শিবিরে সেবিকার ব্রত লইয়া পর্যটন করিতে দেখিয়া যে মৃদু অনুযোগ করিয়াছে, সেখানে সে একাদশ দিনের উল্লেখ করিয়াছে ("আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ"—৩য় সর্গ)। একাদশ দিনের যুদ্ধে অভিমন্যু শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভীম অভিমন্যুকে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং শল্যকে আঘাতে আঘাতে বিহ্বল করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্মা শল্যকে রথে তুলিয়া লইয়া পলাইয়া গেলেন। এদিকে দ্রোণাচার্যের শরজালে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল। অর্জুন তখন শরজালে চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিলেন। নবীনচন্দ্র ৬ষ্ঠ সর্গে অভিমন্যুর উক্তিতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অভিমন্যুকে প্রশ্ন করিলেন—

১০ যে সমস্ত যোদ্ধা শপথ ও মরণপণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদিগকে সংশপ্তক বলে। কৌরব পক্ষের সুশর্মা, তাঁহার পঞ্চভ্রাতা, মালব, তুণ্ডিকেরগণ, মাবল্লেক, ললিত্থ ও মদ্রকগণ সংশপ্তক নামে পরিচিত। অর্জুন ইঁহাদের সকলকেই নিহত করেন। তিনি যখন ইঁহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সেই অবকাশে কৌরবপক্ষীয়েরা অন্যায়-সমরে অভিমন্যুকে হত্যা করেন।

"কহ বাবা! শুনি কার কার সনে
করেছিলে আজ রণ?"

তাহার উত্তরে অভিমন্যু বলিয়াছেন:

"পিসা জয়দ্রথ হয়ে অগ্রসর
দিয়া গেলা পদধূলি।
মাতামহ শল্য আসিয়া তখন
আরম্ভিলা মহারঙ্গ,
না হতে রগড় ছোট জেঠা আসি
করিলেন রসভঙ্গ।"

সর্বশেষ সর্গে (১৭শ) উত্তরা ও শৈলজার কথোপকথনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তির ইঙ্গিত আছে। কৃপ, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থমা ভিন্ন কৌরবপক্ষীয় আর সকলেই নিহত হইয়াছেন; পাণ্ডবপক্ষেও পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই—কবি শেষ সর্গে এইরূপ আভাস দিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র কাব্য সপ্তদশ সর্গে সমাপ্ত; অভিমন্যুবধ ভিন্ন আর কোন জটিল কাহিনী নাই। কাজেই আখ্যানকে দীর্ঘতর করিবার জন্য তাঁহাকে মহাভারত বহির্ভূত কাহিনী ও প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইয়াছে। নিম্নে প্রতি সর্গের সূত্র বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম সর্গ (ধর্মক্ষেত্র): ব্যাসদেব ও তাঁহার শিষ্যের (ছদ্মবেশিনী শৈল) ধর্মতত্ত্ব ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের তাৎপর্য লইয়া আলোচনা।

দ্বিতীয় সর্গ (জীবনসঙ্গীত): অভিমন্যু উত্তরার কৈশোরসুলভ কামগন্ধহীন দাম্পত্য প্রেম।

তৃতীয় সর্গ (নারীধর্ম): সুভদ্রার সেবিকামূর্তিতে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সমস্ত শিবিরে পরিভ্রমণ।

চতুর্থ সর্গ (মাতাপুত্র): সুভদ্রা অভিমন্যুর নিকট গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন।

পঞ্চম সর্গ (ভ্রাতাভগিনী): জরৎকারু ও দুর্বাসার বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবন এবং দুর্বাসা ও বাসুকির ষড়যন্ত্র।

ষষ্ঠ সর্গ (কুরুক্ষেত্রের পুতুলখেলা): পাণ্ডবশিবিরে অর্জুন, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার নানা তত্ত্বালোচনা, বিরাটরাজ ও সুলোচনার হাস্যপরিহাস।

সপ্তম সর্গ (দাবাগ্নি): কৃষ্ণশিবিরে জরৎকারুর প্রবেশ; কৃষ্ণের প্রতি বহ্নি-জ্বালাময় আসক্তির প্রকাশ ও মূর্ছা।

অষ্টম সর্গ (সূর্যমুখী): সুভদ্রা ও কৃষ্ণ কর্তৃক মূর্ছিতা জরৎকারুর চৈতন্য-সম্পাদন, সুভদ্রার নিকট জরৎকারুর অন্তর্জ্বালা জ্ঞাপন, সূর্যমুখী ফুলের মতো সেও

কৃষ্ণবল্লভা; কিন্তু সূর্যের সঙ্গে সূর্যমুখী ফুলের যেমন দুস্তর ব্যবধান, তাহার অদৃষ্টও সেইরূপ।

নবম সর্গ (কৃষ্ণনাম): কৃষ্ণ ও ব্যাসের ধর্মতত্ত্ব লইয়া কথোপকথন।

দশম সর্গ (ব্যাধ): কর্ণের সহিত দুর্বাসার ষড়যন্ত্র, ক্ষত্রিয় বিনাশের সংবাদে দুর্বাসা উল্লসিত; দুর্বাসা কর্তৃক কর্ণের জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটন। জন্মকথা জানিতে পারিয়া কর্ণের পাণ্ডব ও অভিমন্যুর প্রতি মমতা বিসর্জন এবং যুদ্ধে প্রস্তুতি। দুর্বাসা এখানে ব্যাধের মতো সুগোপনে অভিমন্যুবধে কর্ণকে উত্তেজিত করিয়াছেন।

একাদশ সর্গ (মৃগশিশু): অভিমন্যু ও উত্তরার কথোপকথন, অভিমন্যু কর্তৃক বনমাতা শৈলজার সাক্ষাৎলাভের কাহিনী বর্ণনা, যুদ্ধে গমনোদ্যত অভিমন্যুকে উত্তরার নিবৃত্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

দ্বাদশ সর্গ (সুখতত্ত্ব): ব্যাস ও কৃষ্ণের অদৃষ্ট, কর্মফল, সুখতত্ত্ব, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে বিরোধ, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা।

ত্রয়োদশ সর্গ (সম্মিলন): শৈলজার ব্যাসশিষ্যরূপ ছদ্মবেশে খসিয়া পড়িল; সুভদ্রা ও শৈলজার মিলন; উভয়ের মধ্যে মনুষ্যত্ব, সুখ, আর্য-অনার্য, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া আলাপ; শৈলজার সকাম প্রেমপিপাসার নিবৃত্তি, অপার্থিব স্নেহ প্রেমের আস্বাদন লাভ।

চতুর্দশ সর্গ (বিদায়): উত্তরা ও অভিমন্যু; রণে গমনোদ্যত অভিমন্যুকে উত্তরা ও সুলোচনার বাধাদান, তথাপি বীরকুমার অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা।

পঞ্চদশ সর্গ (বীরের শোক): কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্র; চক্রব্যূহ বর্ণনা, অর্জুনের নিরানন্দ শিবিরে প্রত্যাবর্তন, অভিমন্যুর মৃতদেহ দর্শনে বিলাপ, সূতের নিকট অভিমন্যুর বীরত্ব বর্ণনা শুনিয়া অর্জুন ক্ষুব্ধ চিত্তে জয়দ্রথ বধের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ষোড়শ সর্গ (শোকে শান্তি): অভিমন্যুর মৃত্যুতে উন্মত্তপ্রায় উত্তরার রোদন ও মূর্চ্ছা, শোকের পটভূমিকাতেও কৃষ্ণ স্থির, অচঞ্চল; মানবমঙ্গলে বিশ্বাসী সুভদ্রাও যোগস্থচিত্তে শোকবিজয়িনী, দারুণ শোকে সুলোচনার প্রাণত্যাগ, ব্যাসদেব কর্তৃক অর্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান, কৃষ্ণের পদপ্রান্তে সকলের আশ্রয় গ্রহণ।

সপ্তদশ সর্গ (মহাভারত): মূর্চ্ছিতা উত্তরা, মূর্চ্ছান্তে অর্ধ-উন্মাদিনী, পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা। উত্তরার গর্ভে পাণ্ডব-উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণের নির্দেশে উত্তরা সহমৃতা হইল না; অভিমন্যুর চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুভদ্রা কর্তৃক অর্জুনকে সান্ত্বনাদান, অভিমন্যুর পারলৌকিক কৃত্যের পর অর্জুন ও সুভদ্রায়

শিবিরে প্রত্যাবর্তন; অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যুতে কৃষ্ণও বিচলিত হইলেন; মানুষের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও কি ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে না? কৃষ্ণ দেখিলেন যে, অভিমন্যুর চিতা হইতে ভারতমাতার 'রাজরাজেশ্বরী' মূর্তির আবির্ভাব হইল—মহাভারতের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। ভদ্রার্জুন ও কৃষ্ণ এই ধর্মরাজ্যের পটভূমিকায় দাঁড়াইলেন, ব্যাসদেব ও তাঁহার শিষ্যা শৈলজা ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিমূর্তির বন্দনা করিলেন। কবিও সেই ধর্মরাজ্যে স্থান পাইবার জন্য অন্তিম কামনা জানাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিলেন।

'কুরুক্ষেত্রে'র কাহিনী অংশে অভিমন্যুর হত্যাকাণ্ড প্রধান স্থান লাভ করিলেও সপ্তদশ সর্গে সমাপ্ত এই বৃহদ্ কাব্যে মাত্র তিনটি সর্গে (১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ) অভিমন্যুহত্যা সংক্রান্ত প্রসঙ্গ আছে। এতদ্ব্যতীত ২য় সর্গ, ৪র্থ সর্গ, ৬ষ্ঠ সর্গ এবং ১১শ সর্গে অভিমন্যুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু যে-অভিমন্যুর হত্যাকাণ্ডে কাব্যের সমাপ্তি, তাহা প্রত্যক্ষতঃ বর্ণিত হয় নাই, দূত-মুখে সমস্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কবির বর্ণনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অধিকাংশই নেপথ্যে সমাধা হইয়াছে। এই যুদ্ধের কারণ, বীভৎসতা এবং ফলাফল কৃষ্ণার্জুন ও ব্যাসদেবের কথোপকথনের দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই কাহিনীবিচারে 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য অতিশয় দুর্বল তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল কাহিনীর দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে কবি দুর্বাসা, বাসুকি, জরৎকারু, শৈলজা প্রভৃতির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতেও কাহিনীর শেষ রক্ষা হয় নাই—ইহা কোন দিক দিয়াই মহাকাব্যোচিত বিশালতা লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র কাহিনীটিকে অভিমন্যুর হত্যাকাণ্ডের অভিমুখে ঋজুগতিতে পরিচালিত করিতে পারিলে হয়তো, নানা ত্রুটি সত্ত্বেও, ইহা মহাকাব্যরূপে কিয়দংশে সার্থক হইতে পারিত। অনাবশ্যক দার্শনিকতা ঘরোয়া পরিবেশের লঘু বর্ণনা ও মাত্রাতিরিক্ত আবেগোচ্ছ্বাসের জন্য কুরুক্ষেত্র কাব্য অতিশয় দুর্বল রচনা বলিয়া মনে হইবে।

কাব্যটি প্রকাশিত হইবার পর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কবিকে লিখিয়াছিলেন, "কুরুক্ষেত্র রৈবতকের সমান নহে। কারণ ইহাতে গভীর দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিক গবেষণা সেই পরিমাণে নাই।" আমাদেরও মনে হয়, 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতক' অপেক্ষা নিকৃষ্ট,—দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিক গবেষণার অভাবই ইহার কারণ নহে। ইহাতে কৃষ্ণ, ব্যাস, অর্জুন, সুভদ্রা, শৈলজা—সকলে মিলিয়া যেরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় মাতিয়া উঠিয়াছেন তাহাতে ইহাকে দার্শনিকতাহীন বলা যায় না। কবি 'রৈবতকে' যে অভিনব ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, 'কুরুক্ষেত্রে' তাহার পরবর্তী অংশের চিত্র রহিয়াছে। দুর্বাসা-বাসুকির সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে ক্ষত্রিয় সমাজ, বিশেষতঃ কৃষ্ণার্জুনকে বাধাপ্রদান—এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা কুরুক্ষেত্র কাব্যেও বর্তমান। সুতরাং হীরেন্দ্রনাথ-কথিত ত্রুটিই কুরুক্ষেত্র কাব্যের ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী নহে। 'রৈবতক' রোমান্টিক আখ্যানের দিক হইতে কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়াছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কাব্যের কাহিনী নির্বাচন ও তাহাকে মহাকাব্যের বিশালতার দিক পরিচালনা করিবার মতো শক্তি নবীনচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। সে যুগে হীরেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিরা এই কাব্যের অন্তর্নিহিত ভক্তিবাদ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার কাব্যলক্ষণ বিচার করিয়া দেখেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে কুরুক্ষেত্রের প্রশংসা করিয়াছেন[১১] অবশ্য কবি নিজে এই কাব্য রচনায় ফলাফলের কোন দায়িত্ব লইতে চাহেন নাই। কেহ ইহার চরিত্র বা অন্য কোন বর্ণনার সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বোধহয় হৃদিস্থিত হৃষিকেশের প্রতি বরাত দিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাহিতেন, "রৈবতক, কুরুক্ষেত্র আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলী কেন এইরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই-বা কেন এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোনও এক অজ্ঞাতশক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন আমি সেরূপ লিখিয়াছি।" হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক সঙ্কলনগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের কথা বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট এত গালি খাইয়াছেন।

প্রভাস (১৮৯৬)

কবি রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের খ্যাতি লাভে উৎসাহিত হইয়া কৃষ্ণলীলার অবসানসূচক 'প্রভাস' রচনায় উৎসুক হইলেন। তাঁহার মতে 'রৈবতকে' সুভদ্রার্জুনের বিবাহ এবং 'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্যুবধ প্রধান ঘটনা হইলেও উক্ত দুইখানি কাব্যের অন্তরাল দিয়া কৃষ্ণলীলা স্রোত বহমান। কৃষ্ণেরই অঙ্গুলি সঙ্কেতে সুভদ্রার্জুন-পরিণয় সমাধা হইয়াছে, তাঁহার সারথ্যে ও উপদেশে পাণ্ডবগণ ভারতযুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন—অবশ্য তাহার জন্য অভিমন্যুর প্রাণ আহুতি দিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য স্থাপনে অভিলাষী, বিবদমান রাজন্যদিগকে একটি রাষ্ট্রের শাসনছত্রতলে আনয়নে সমুৎসুক, বেদবাদী ও কাম্যকর্মসঙ্কুল ভারতে প্রেমধর্ম প্রচারে সতত নিরত। তাই এই দুইখানি কাব্যের বাহ্য ঘটনা যাহাই হউক না কেন, ঘটনাসূত্রগুলি মহাভারত নাটকের সূত্রধার বাসুদেবের করধৃত—নবীনচন্দ্র এই ভাবেই তিনখানি কাব্যের কাহিনী নির্বাচন করিয়াছেন। অবশ্য প্রথম দুইখানি কাব্যে কৃষ্ণের এইরূপ চরিত্রাদর্শ প্রায়ই যথেষ্ট জীবন্ত ও সক্রিয় হইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, কবি নবীনচন্দ্র 'কুরুক্ষেত্রে'র পর কৃষ্ণলীলার পরিণতি দেখাইবার জন্য কৃষ্ণের অন্তিমলীলা-সঙ্কলিত 'প্রভাস' কাব্যের সূত্রপাত করেন। 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' সম্পর্কে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবির মধ্যে যখন পত্রব্যবহার হইয়াছিল, তখনই তিনি অন্ত্যখণ্ড অর্থাৎ 'প্রভাস' লিখিবার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন।

১১ স্বয়ং কবি 'আমার জীবনে'র একস্থলে বলিয়াছেন, "রৈবতক হইতে বরং কুরুক্ষেত্রের প্রতিপত্তি অধিক হইয়াছে।"
—নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২

১২ ১৩২১ সনে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' প্রকাশিত হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে জীবিত লেখকগণ এই গ্রন্থে প্রকাশের জন্য তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিজীবনের ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, তাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে।......জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন।" এই প্রবন্ধ পরে তাঁহার 'আত্মপরিচয়ে'র প্রথম প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই প্রবন্ধ পড়িয়া বিষম ক্ষেপিয়া যান। ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অকারণ-বিরোধিতার সূচনা হয়।

কবি ১৮৯৪ খ্রী: অব্দের নভেম্বর মাসে রাণাঘাটে 'প্রভাস' রচনা আরম্ভ করেন এবং দুই সর্গ লিখিয়া ফেলিয়া রাখেন। ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতায় বদলি হন। আবার ১৮৯৫ খ্রী: অব্দের জুলাই মাস হইতে 'প্রভাসে'র অবশিষ্টাংশে হাত দিয়া ১৮৯৬ সালের ৯ই মে এই কাব্য সমাপ্ত করেন। তাঁহার উক্তি: "১৮৮২ খ্রী: অব্দে কাব্যত্রয়ের ধ্যান আরম্ভ করি, ১৮৯৫ খ্রী: অব্দে প্রভাস শেষ করি।" বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা অনুসারে ১৮৯৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রভাস প্রকাশিত হয়। বোধ হয় কাব্যটি ১৮৯৬ সালেই সমাপ্ত হয়, ১৮৯৫ সালে নহে।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইল। ডা: নীলরতন সরকার, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, নানা পত্র-পত্রিকা—সকলেই কবির কাব্যত্রয়ীর শেষ কাব্যখানির উচ্চ প্রশংসা করিলেন। কেহ-বা 'রৈবতক'কে সর্বশ্রেষ্ঠ কেহ-বা 'প্রভাস'কে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। কবি তাঁহার পাঠক-পাঠিকার মত জানিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন: "যাঁহাদের মন philosophical (দর্শনপ্রবণ), তাঁহারা 'রৈবতক'কে প্রথম, যাঁহাদের মনে emotional (ভাবপ্রবণ), তাঁহারা 'কুরুক্ষেত্র'কে প্রথম এবং যাঁহাদের হৃদয় devotional (ভক্তিপ্রবণ), তাঁহারা 'প্রভাস'কে প্রথম বলিতেন।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, যাঁহাদের মন রোমান্টিক আবেগপ্রবণ, তাঁহারা রৈবতকের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'প্রভাসে'র রচনাভঙ্গী যে অন্য দুইখানি কাব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা স্যার গুরুদাস কবিকে জানাইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার বড়ালও কবিকে সেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কবিও স্বীকার করিয়াছেন, "প্রভাসের ভাষায় সাবধানতার অভাব।" তাহার কারণ প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। সেই নিষ্ঠুর ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি পাঠককে ছাড়িয়া দিয়া নিজেই কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন। তাঁহার উক্তিই তাহার প্রমাণ: "প্রভাসের 'বীণা পূর্ণতান' সর্গ লিখিয়া, যেখানে জরৎকারু ভগবানের শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতেছে, সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত-ভক্ত-সেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ হৃদয়ে কেমন করিয়া লিখিব! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, অক্ষর ভাসিয়া যাইতেছে …।"[১৩] এ যেন ভূতের গল্প লিখিয়া স্বয়ং লেখকের আঁৎকাইয়া ওঠার মতো হাস্যকর। এরূপ মানসিক বৈকল্য ঘটিলে কাব্যের যে শোচনীয় পরিণতি হয়, প্রভাসের তাহাই হইয়াছে—অশ্রুসায়রে কাব্যটির সলিল-সমাধি হইয়াছে। সে যুগে যাঁহারা নবীনচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা প্রকাশমাত্র এই কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করিলেন; অমৃতবাজার পত্রিকায় স্তুতিবাচনপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইল। এমন কি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত মনীষী ব্যক্তিও সানন্দে ঘোষণা করিলেন, "কাব্যাংশে প্রভাস অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। আপনার সৃষ্ট চরিত্র সকলগুলিরই (বাসুকি, দুর্বাসা, জরৎকারু ও শৈল) অতি সুন্দর পরিণাম ঘটাইয়াছেন—সুন্দর consistent এবং কাব্যোপযোগী। আর কৃষ্ণপ্রেমের যে বন্যা বহাইয়াছেন, তাহাতে সকল সমালোচনাই ভাসিয়া যায়। 'মহাপান' ও মহাপ্রস্থান' অংশ বাংলা সাহিত্যে অতুল।"

অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে: "Speaking of the

১৩ ভূমিকায় যেখানে কবির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 'আমার জীবন' হইতে গৃহীত।

poem (Provas) which is now before us, we would confine ourselves to noticing certain prominent characteristics thereof, because the space at our disposal would not permit anything like an exhaustive review. We find that the poetic power of the author do not show any sign of decay or abatement ; for we meet with a great many passages in the poem which for depth of feeling, sublimity of sentiment, high seriousness of thought, sweetness of rhythm and beauty of expression may challange comparison with the best and highest portion of Bengali Poetry."

অবশ্য কেহ কেহ তাঁহার উপর বিরূপও হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ বিরোধী ছিলেন। কাজেই উক্ত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হয়তো তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। অপরদিকে তিনি এই কাব্যত্রয়ে হিন্দুর প্রচলিত পৌরাণিক সংস্কারকে যেথায় যেথায় অনুসরণ করেন নাই। কাজেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সম্প্রদায়ও তাহার প্রতি প্রতিকূল হইল। বীরেশ্বর পাঁড়ে সর্বপ্রথম নবীনচন্দ্রের যশে লোষ্ট্রপাত করিলেন। ১৮৯৭ সালে পাঁড়ে মহাশয় "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নাম দিয়া নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের সুকঠোর সমালোচনা করিলেন। দুইশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই প্রতিবাদ-গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, নবীনচন্দ্র পুরাণ ও মহাভারতকে অমান্য করিয়া হিন্দুধর্মের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে অস্বীকার করিয়া এবং পরিবর্তিত করিয়া যে অভিনব গ্রন্থ রচনা করেন, সনাতন হিন্দু ধর্মের পক্ষ হইতে বীরেশ্বর পাঁড়ে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। মনে হয়, এই সময়ে কবির 'পলাশীর যুদ্ধ' পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত হইলে শিক্ষাবিভাগের কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতিশয় শক্তিশালী ও সমাজমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ফলে কবিকে কর্মস্থানেও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বীরেশ্বর পাঁড়ে তাঁহাদের কাহারও দ্বারা গোপনে উৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। একদা নবীনচন্দ্রের সঙ্গে পাঁড়ে মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি নবীনচন্দ্রের কাছে বিশেষ সাহায্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে নবীনচন্দ্র তাঁহাকে আসল ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তিনি আসল কথা চাপিয়া গেলেও নবীনচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, "হিং টিং ছট্" মহাশয়ই (চন্দ্রনাথ বসু ?)[১৪] পাঁড়ে মহাশয়কে উক্ত গ্রন্থ লিখিতে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতা গেজেটেও প্রভাসের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইল। ইহাতেও জের মিটিল না। 'বঙ্গবাসী' পত্রে বীরেশ্বর পাঁড়ের গ্রন্থের সমালোচক বলিলেন যে, প্রভাসের উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম ও সমাজ ধ্বংস নহে। কারণ 'বঙ্গবাসী' হিন্দুসমাজের সংরক্ষক ; সুতরাং কে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে ? নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ের উদ্দেশ্য—Sedition। 'বঙ্গবাসী'র এই অসতর্ক ও মূঢ় উক্তির জন্য কবিকে কর্মস্থানে বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

১৪ রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' কবিতাটি নাকি চন্দ্রনাথ বসুকে বিদ্রূপ করিয়া রচিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে'র অধিকাংশস্থলে চন্দ্রনাথ বসুকে 'হিং টিং ছট' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের পুস্তকনির্বাচনী বিভাগের প্রধান নেতা চন্দ্রনাথ বসু নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের বিশেষ বিরোধিতা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে কবিকে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রও তাহার শোধ লইয়াছেন তিনি যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই নির্মমভাবে চন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

নিম্নে সংক্ষেপে প্রভাসের উৎসমূল ও কাব্যের কাহিনী-অংশের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মহাভারত—প্রভাসের কাহিনীর মূল কাঠামো মহাভারতের মৌষল পর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ছত্রিশ বৎসর পরে দ্বারকা হইতে এই কাহিনী শুরু হইতেছে। একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকা নগরীতে উপনীত হইলে কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুভদ্রার সহোদর সারণ শাম্বকে (কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র) গর্ভিণী স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনির সঙ্গে কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই রমণী পুত্র, না কন্যা—কি প্রসব করিবে ? ঋষিগণ অপমানিত হইয়া অভিশাপ দিলেন, শাম্ব লৌহ মুষল প্রসব করিবে এবং সেই মুষলের দ্বারাই কৃষ্ণবলরাম ব্যতীত যদুবংশের আর সকলেই নিহত হইবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ করিবেন এবং জরা নামক এক ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করিবে, ইহাও ঋষিদের অভিশাপ। পরদিন শাম্ব সত্যই মুষল প্রসব করিলেন। ইহাতে উগ্রসেন ভীত হইয়া মুষল চূর্ণ করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় দ্বারকায় নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখা গেল। সকলে লক্ষ্য করিল যে, একজন কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি, যিনি কালপুরুষ নামে পরিচিত, তিনি চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধৃত বা বিদ্ধ করিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণ ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া তীর্থযাত্রাভিলাষে দ্বারকাবাসীকে প্রভাসের সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। কিন্তু পাপাচারী যাদবগণ প্রভাসতীর্থে আসিয়াও সুরাপান ত্যাগ করিল না ; তাহারা এক দিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া একে অপরকে আঘাত করিতে লাগিল, এইরূপে জ্ঞাতিকলহ আরম্ভ হইল। এই ব্যাপারে কৃষ্ণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তীরজাত একমুষ্টি এরকাকে (নলখাগড়া) বজ্রতুল্য মুষলে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা যদুবংশের কদাচারী ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আত্মদ্রোহে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। কৃষ্ণ বলরামের সন্ধানে গিয়া দেখিলেন যে, অগ্রজ তপস্যারত ; পরে অনন্তদেবের অবতার বলরাম দেহ রক্ষা করিলেন। কৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, তাঁহারও মর্ত্যদেহ ত্যাগের সময় হইয়াছে। তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময় জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পদতলে শরবিদ্ধ করিল। সে এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া কৃষ্ণের পদতলে শরণ লইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দারুকের নিকট এই দুঃসংবাদ পাইয়া চিন্তিত অর্জুন হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং এই শোকাবহ ব্যাপার দর্শনে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। তিনি মৃতদেহের সৎকার করিয়া বালবৃদ্ধনারীদিগকে লইয়া সপ্তম দিবসে হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন। অর্জুন দ্বারকা ত্যাগ করিলেই সমস্ত পুরী জলপ্লাবিত হইয়া গেল। পথিমধ্যে আভীর দস্যুগণ, অর্জুনের বাধাদান সত্ত্বেও, যাদবরমণীদিগকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিল, কোন স্ত্রী-বা স্বেচ্ছায় দস্যুদিগকে অনুসরণ করিল। গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী কৃষ্ণবিহনে সমস্ত শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ব্যাসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ঋষিপ্রবরকে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব অর্জুনকে সান্ত্বনা দিলেন ; যাহা ভবিতব্য, তাহাই সংঘটিত হইয়াছে, পঞ্চপাণ্ডবও যথোচিত কর্তব্য করিয়াছেন, অতএব বৃথা শোক পরিহর্তব্য।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত—বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী মহাভারত হইতে গৃহীত, তবে পুরাণকারদের স্বভাব অনুযায়ী ইহাতে কিছু কিছু অতিরঞ্জন ও নূতন বর্ণনা আছে। আরম্ভে দেখা-

যাইতেছে—যদুবংশীয় কুমারগণ পিণ্ডারক নামক মহাতীর্থে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে দেখিতে পাইয়া কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে শাম্বকে রাজা বভ্রুর গর্ভিণী স্ত্রী-রূপে সাজাইয়া ঋষিদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মহাভারতে পিণ্ডারক তীর্থের স্থানে দ্বারকা পুরীর উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজা বভ্রুর কোন প্রসঙ্গ নাই। শাম্ব-প্রসূত মুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইলে তাহা সমুদ্রতীরজাত এরকাতে পরিণত হইল। সেই মুষলের কিয়দংশ চূর্ণ করা সম্ভব হইল না; তখন সেই লৌহখণ্ডটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। সেই লৌহখণ্ডটিকে একটি মাছ গিলিয়া ফেলিল। সেই মাছটি জেলের জালে ধরা পড়িলে তাহার পেট চিরিয়া লৌহগোলকটি পাওয়া গেল এবং জরা নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ডটির দ্বারা বাণ নির্মাণ করিল। তীরজাত এরকার দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হইল এবং জরা ব্যাধের ঐ শরটির আঘাতে শ্রীকৃষ্ণেরও দেহান্ত হইল। এইরূপে ঋষি-অভিশাপ যথার্থই ফলিল। মুষলটিই যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের দেহান্তের কারণ হইল। মহাভারতে এই ঘটনার এত বিস্তৃত বর্ণনা নাই। ভাগবতের বর্ণনা কিয়দংশে বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ (ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায় ১৬-২৪ শ্লোক)। সুতরাং দেখা যাইতেছে—যদুবংশ ধ্বংস বিষয়ক ঘটনাটির মূল মহাভারত; তাহা হইতেই বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের আখ্যান গৃহীত হইয়াছে, কোথাও-বা পুরাণকার কিছু অধিক বর্ণনা বা অতিরঞ্জন জুড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের কাশীরাম দাসও পিছাইয়া নাই; তিনিও ঐ দুইটি পুরাণ, মহাভারত এবং নিজ কল্পনা মিশাইয়া মূল কাহিনীকে আরও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। নবীনচন্দ্র, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও কাশীরাম দাস অবলম্বনে প্রভাস কাহিনীর আখ্যান অংশ নির্মাণ করেন এবং ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ভক্তি-বিষয়ক তত্ত্বকথাগুলিকে মূল কাহিনীর সহিত মিলাইয়া দিবার জন্য কাহিনীকে যথেচ্ছা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। নিম্নে 'প্রভাস' কাব্যের সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দিষ্ট হইল।

প্রথম সর্গ (ছায়া): প্রভাসতীর্থে সমাগত দ্বারকাবাসী, কৃষ্ণ-বলরাম, কৃষ্ণ-মহিষী রুক্মিণী ও সত্যভামা। সত্যভামা চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া বিষণ্ণ, কৃষ্ণ প্রথমে সত্যভামাকে পরিহাস করিলেও পরে স্বীকার করিলেন যে, কুকর্মের জন্য যদুবংশের ধ্বংস অনিবার্য। তিনি নিজে এই ধ্বংস নিবারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু তিনি তো শুধু যাদবদের নেতা নহেন, "আমি মানবের স্বামী"—ইহাই তাঁহার ধ্যানগম্ভীর উক্তি। সত্যভামা ও রুক্মিণীর ভয় কাটিল না।

দ্বিতীয় সর্গ (অভিশাপ): দুর্বাসা-প্রেরিত শিষ্যগণ পাঞ্জাব, উত্তরভারত, কাশ্মীর, গান্ধার, পূর্বভারত প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর সর্বত্র কৃষ্ণের মহিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রাধান্য লাভ করিতেছে না দেখিয়া দুর্বাসা ক্রুদ্ধ, শিষ্যগণ কিছু সংশয়ান্বিত। শিষ্যগণ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহারা দ্বারকাপুরীর বালকগণের দ্বারা অপমানিত হইয়া যদুবংশ ধ্বংসের অভিশাপ দিয়া আসিয়াছেন। দুর্বাসা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অচিরেই অভিশাপ ফলিবে।

তৃতীয় সর্গ (দুই ভগিনী) : দীর্ঘকাল পরে জরৎকারু ও শৈলজা—দুই ভগিনীর মিলন হইলে। জরৎকারুর অন্তরে সকাম কৃষ্ণপ্রেম, শৈল নিষ্কাম প্রেমধর্মের উপাসিকা। জরৎকারু নামেমাত্র দুর্বাসার পত্নী, দুর্বাসা তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। সে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিল, কিন্তু শৈলজার বাধাদানের ফলে দুর্ঘটনা নিবারিত হইল। সে জরৎকারুকে সর্ব-সমর্পণমূলক আত্মমোহ-বর্জিত কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। বলা বাহুল্য জরৎকারুর অন্তরে তীব্র আসক্তিমূলক কৃষ্ণপ্রেম বর্তমান। তাহা আসক্তিমূলক ও আত্মাভিমুখী বলিয়া তাহার অন্তরে এত জ্বালা।

চতুর্থ সর্গ (যোগানল) : দুর্বাসার নির্দেশ সত্ত্বেও বাসুকি অনার্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই ; কারণ অনার্যভূমিতেও কৃষ্ণপ্রেমবন্যা প্রবেশ করিয়াছে, শৈলজাই সেই প্রেম প্রচার করিয়াছে। দুর্বাসা ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন যে, বনভূমি কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া গেলেও দ্বারকাপুরী সুরাপ্রেমে টলটলায়মান এবং জরৎকারুই দ্বারকাপুরীতে সুরাস্রোত ও অনার্য রমণীর তীব্র রূপাসক্তি-প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছে। বাসুকি, জরৎকারুর এই ব্যবহারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেও বুঝিল যে, ব্যর্থপ্রেমের জ্বালাতেই জরৎকারু দুর্বাসার নির্দেশ পালন করিয়াছে। বাসুকি কৃষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে যাইতে অসম্মত, কারণ সেও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছে। তখন দুর্বাসা শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কোন এক শিষ্যকে পূর্ব হইতেই তিনি মহাদেব সাজাইয়া অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছিলেন। অকস্মাৎ দৈবক্রমে সেই সময়ে পর্বতে ভূমিকম্প শুরু হইল। দুর্বাসার মহাদেববেশধারী শিষ্য এই সুযোগটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। তিনি বাসুকিকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। সরলপ্রকৃতির বনচর অনার্যকে ছলনা করা দুরূহ নহে।

পঞ্চম সর্গ (মহাপান) : প্রভাসতীর্থে সমবেত নরনারীগণ ভাগবতোক্ত কৃষ্ণ-কথারসে নিমগ্ন। ভক্তির এই অবারিত উচ্ছ্বাস কৃষ্ণ সহিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণ ও উদ্ধবের কথোপকথনে প্রকাশ পাইল যে, যাদবগণের অনাচারের জন্য যদুবংশের ধ্বংস ঘনাইয়া আসিতেছে।

ষষ্ঠ সর্গ (লীলাশেষ) : জরৎকারুর কৌশলে সাত্যকি উত্তেজিত হইয়া কৃতবর্মাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ফলে সুরামত্ত যাদবগণের মধ্যে জ্ঞাতিকলহ শুরু হইয়া গেল এবং পরস্পরে আক্রমণ করিয়া সকলেই নিহত হইল।

অষ্টম সর্গ (মহাপ্রস্থান) : বাসুকির অনার্যসেনার গুপ্ত শরেই এই হত্যাকাণ্ড এত দ্রুতবেগে সমাধা হইল। কৃষ্ণ বিমর্ষ বলরামকে ভারতের বাহিরে প্রেমধর্ম প্রচারে অনুরোধ করিলেন, বলরাম সৌরাষ্ট্র সমুদ্রতটে অপেক্ষমান অর্ণবযানে পশ্চিম-দিশে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার নাম দিলেন 'হরিকুলেশ' ('Hercules')।

যে সমস্ত অনার্য সৈন্য যদুবংশ ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে গুপ্ত স্থান হইতে শরনিক্ষেপ করিয়াছিল, কৃষ্ণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলরামের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। এই ব্যাপারে বাসুকি দুর্বাসার নীচতা ও ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিল। সে দেখিল দুর্বাসাই 'জরৎকারু' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার আসল নাম গোপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে বাসুকি বহু অন্যায় কাজ করিয়াছে, কৃষ্ণবিরোধিতায় মত্ত হইয়াছে। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাসুকি দুর্বাসার সন্ধান করিতে লাগিল। দুষ্টের শাসন হওয়া প্রয়োজন।

নবম সর্গ (বীণা পূর্ণতান) : ব্যর্থপ্রেমে হতাশ জরৎকারু কৃষ্ণকেও বাণ বিদ্ধ করিল। বাসুকি সেই দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া জরৎকারু আপনার একান্ত ঈপ্সিত জনকেই চূড়ান্ত আঘাত করিল। কিন্তু এ দৃশ্য সে সহ্য করিতে পারিল না, মূর্ছিত হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ত্যাগ করিবার কালে বলিলেন যে, যে যে-ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, সে তাঁহাকে সেইভাবে পায়। জরৎকারু স্বর্গীয় সুখে প্রিয়বক্ষে প্রাণত্যাগ করিল। কৃষ্ণেরও মর্ত্যলীলার অবসান হইল।

দশম সর্গ (প্রায়শ্চিত্ত) : কৃষ্ণের প্রেরিত দুঃসংবাদ পাইয়া অর্জুন-সুভদ্রা প্রভাসের অভিমুখে চলিয়াছেন। অর্জুন যেন সব সময়ে কৃষ্ণের কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহারা দুর্বাসাকে অতি শোচনীয় অবস্থায় ভূপতিত দেখিলেন। ক্রুদ্ধ বাসুকি বঞ্চনা-ব্যবসায়ী ঋষির উচিত শাস্তিবিধান করিয়াছে, বুকের উপর পাথর চাপা দিয়া গিয়াছে। দুর্বাসা মুমূর্ষু, তথাপি কৃষ্ণবিদ্বেষ ছাড়িতে পারিতেছেন না। পরে সুভদ্রার প্রয়াসে তিনি মৃত্যুমুহূর্তে কৃষ্ণের নীলকান্ত রূপ দর্শন করিয়া জ্বালাযন্ত্রণা ও মূঢ়তা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ সর্গ (স্বর্গারোহণ) : প্রভাসে উপস্থিত হইয়া অর্জুন সভয়ে ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে-মুগ্ধ বাসুকি সুভদ্রার প্রতি কামভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রথমে মাতৃরূপে পরে কৃষ্ণময়ী রূপে উপলব্ধি করিল এবং পরিশেষে মহাভাবে মুগ্ধ হইয়া তনু ত্যাগ করিল।

দ্বাদশ সর্গ (কর্মফল) : অর্জুন দুঃখিতচিত্তে ব্যাসদেবের নিকট সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। আভীর দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখেই যাদবরমণীগণকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, কোন রমণী-বা স্বেচ্ছায় দস্যুদিগকে অনুসরণ করিল। অর্জুন বাধা দিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ব্যাসদেব তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, কর্মফল অলঙ্ঘ্য। তবে ঈশ্বরকৃপায় কর্মফলও অন্যথা হইতে পারে। তাঁহার মতে যদুবংশ ধ্বংসের জন্য শোক করিবার কারণ নাই, লোহিত সমুদ্রের উত্তর-পূর্বে নূতন যদুবংশে নূতন যদু-অবতার (খ্রীষ্ট) জন্মগ্রহণ করিবেন।

ত্রয়োদশ সর্গ (ভবিষ্যৎ): শৈলেরও আয়ুকাল সমাপ্ত হইল। তাহার অন্তিম কামনা প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণার্জুন ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন ও মঠ প্রতিষ্ঠা। মুমূর্ষু শৈলজা ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিল যে কৃষ্ণলীলা ভারতেই শেষ হইয়া যায় নাই, ইহুদী বংশে যিশুখ্রীষ্ট, আরববংশে সখ্যরস-অবতার মুহম্মদ এবং ভারতে ভাগীরথীতীরে গৌরহরি কৃষ্ণলীলাকেই সম্পূর্ণ করিবার জন্য আবির্ভূত হইবেন। কৃষ্ণপ্রেমময়ী শৈলজা লোকান্তরের যাত্রী হইল।

প্রভাসের কাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের কলেবর পরিত্যাগই ইহার প্রধান ঘটনা। কবি প্রথমসর্গ হইতেই তদভিমুখে কাহিনীকে পরিচালিত করিয়াছেন। সপ্তম সর্গে যদুবংশ ধ্বংস এবং নবম সর্গে কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে এবং মহাভারতে যদুবংশ ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ ঋষিদের অভিশাপ এবং পরোক্ষ কারণ দ্বারকাপুরীতে সুরার প্রাধান্য। যদুবীরগণ এত অধিক পরিমাণ সুরা পান করিতে লাগিল যে, যথেচ্ছাচার আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আবার অনাচার প্রবেশ করিল। প্রথমে কৃষ্ণ সুরাপান ও যথেচ্ছাচারের প্রতি কঠোর হইয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে সকলেই সুরাপায়ী উন্মত্ত, সেখানে এ বিধানেও কোন সুফল দেখা যায় না। কৃষ্ণ বুঝিলেন, ভবিতব্য খণ্ডিত হইবার নহে; যদুবংশ কুকর্ম কদাচারের দ্বারা যে অধর্ম সঞ্চয় করিয়াছে তাহার পরিণাম বিনাশ; ঋষি-অভিশাপ তাহার নিমিত্ত মাত্র।

নবীনচন্দ্র মূলকাহিনীর রেখাচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন মহাভারত, পুরাণ ও কাশীরাম দাস হইতে। কিন্তু নিজ মত ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিবার জন্য এ কাহিনীটিরও পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি ঋষি-অভিশাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন বটে (২য় সর্গ), কিন্তু তাহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, এবং অভিশাপের বৃত্তান্তেও কিছু নূতনত্ব সঞ্চার করিয়াছেন। দুর্বাসার শিষ্যগণ অপমানিত হইয়া যদুবংশ-ধ্বংসের অভিশাপ দিয়াছিল—তিনি এই ভাবে কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন। মূল কাহিনী সেরূপ নহে। মহাভারতে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এবং ভাগবতে দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সে যাহা হউক, নবীনচন্দ্র যদুবংশের ধ্বংসের কারণ স্বরূপ ঋষি-অভিশাপকে গুরুত্ব না দিয়া বরং মদ্যাসক্তি, লাম্পট্য, স্বার্থ বিদ্বেষ প্রভৃতিকেই প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে জরৎকারুর প্রতিহিংসাই যদুবংশধ্বংস ও কৃষ্ণহত্যার মূল কারণ। জরৎকারুর কৃষ্ণের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা তাহাকে ভয়ঙ্করী ডাকিনী শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। কৃষ্ণকে দয়িতভাবে না পাইয়া সে নিজ ঈপ্সিতজন ও তাঁহার সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া ধর্ষকামী (Sadistic) আনন্দ পাইতে চাহিয়াছে। দুর্বাসা তাহাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সে-ই দ্বারকাপুরীতে অনার্য রমণী ও উত্তেজক সুরা আমদানি করিয়া যদুবংশের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। কবি 'রৈবতক' কাব্য হইতেই তাহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। 'প্রভাসে' তাহাকে কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত জরৎকারুই কৃষ্ণকে আঘাত করিয়াছে। কবি বাসুকির কাহিনীকেও স্বতন্ত্র ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরার দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন। বাসুকি প্রথমে সুভদ্রাকে কামনা করিয়াছিল; তাহাতে ব্যর্থ হইয়া সে অর্জুন, কৃষ্ণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজের

প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছে। পরে শৈলজার প্রভাবে তাহার অন্তরে কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হয়, এবং সুভদ্রার প্রতি কামভাব বিদূরিত হয়। শৈলজার প্রেমানুরাগ এবং সকাম আকাঙ্ক্ষার উন্নয়ন 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রভাসে' তাহার কাহিনীর কোন গতি ও বিকাশ লক্ষিত হয় না। ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সে রক্তমাংসের জীবন ত্যাগ করিয়াছে এবং আদর্শলোকের পিঙ্গল প্রাণহীন প্রতীকে পর্যবসিত হইয়াছে। 'প্রভাসে' কাহিনীগত চাতুর্য প্রকাশের পূর্ণ অবকাশ থাকিলেও কবি ভক্তি ও রোমান্সের স্বখাতসলিলে কাব্যটিকে ডুবাইয়া মারিয়াছেন। 'রৈবতকে' কাহিনীর বৈচিত্র্য অল্পাধিক প্রশংসা দাবি করিতে পারে, কুরুক্ষেত্রে তাহার খানিকটা হ্রাস পাইয়াছে, প্রভাসে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার মতো উচ্ছ্বাসপ্রবণ অসংযত কবিচিত্ত মহাকাব্যের কাহিনী চয়নে যে ব্যর্থ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

চার

॥ নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য ॥

মহাকাব্যের শ্রেণীবিভাগ

বৃহদ্ বনস্পতি যেমন ফল দিয়া, ছায়া বিস্তার করিয়া একটা অঞ্চলকে আশ্রয় দান করে, তেমনি মহাকাব্য সমগ্র জাতি ও জীবনকে ধারণ করিয়া থাকে, ঐতিহ্যকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, অডেসি, ঈনিড, বিওউল্‌ফ, Nibelungenlied, লুসিয়াডাস, জেরুজালেমা লিবারেটা, শাহ্‌নামা—এগুলি তো শুধু কাব্যমাত্র নয়, ইহাদের মধ্যে দেশকালের গণ্ডিবদ্ধ একটা বিশেষ জনজীবনের আবর্তন-বিবর্তন অনশ্বর রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। তাই আমরা সেই বৃহৎ শিল্পকে 'মহাকাব্য' নাম দিয়াছি, আকারে-প্রকারে যাহা সাধারণ কাব্য অপেক্ষা অনেক বিশাল, যাহা শুধু একটি ব্যক্তি-মানসের অলসবিলাসী মুহূর্তের আকস্মিক সৃষ্টি নয়—যাহার মধ্যে মানবচেতনার সমগ্র রূপটি স্পন্দিত হয়।

ইংরেজীতে মহাকাব্যকে epic বলে। Epic শব্দের মূল গ্রীকভাষায় নিহিত। গ্রীক *epos* শব্দের অর্থ শব্দ বা গান। আদিতে *epos*-এর দ্বারা শব্দ (words) বুঝাইত। তাহা ক্রমে ক্রমে এইরূপ অর্থ-সম্প্রসারণ লাভ করিয়াছে : Epos—শব্দ—গল্প—গান—বীরত্বব্যঞ্জক গান—বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাব্য। গ্রীকভাষায় মহাকাব্যের প্রতিশব্দ—*epikos*। এই শব্দের অর্থ ও অর্থবিস্তারের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে আদিযুগে আখ্যান ও গান উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া বীরকাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিল। ইলিয়ড গীত হইত, রামায়ণ-মহাভারত গীত ও পঠিত হইত।

মহাকাব্যের ইতিবৃত্ত ও বিবর্তনধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার অন্ততঃ পাঁচটি স্তর আছে—(১) গীতাত্মক ও নৃত্যসম্বলিত আদিরূপ (২) বিবৃতিমূলক ব্যালাড্ বা আখ্যায়িকা (৩) মৌলিক প্রাচীন মহাকাব্য (৪) অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন আলঙ্কারিক মহাকাব্য (৫) ব্যঙ্গ মহাকাব্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্ধবর্বর যূথচারী মানুষ নৃত্যগীতের সাহায্যে জীবনের নানা ঘটনাকে ফুটাইয়া তুলিত। শিকারকাহিনী, বিভিন্নদলের মধ্যে সংঘর্ষ, কোন একজন নেতার অধীনে

পশুশিকারে সাফল্য, নারীহরণ, ভূমির উপর অধিকার বিস্তার—প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের নানা পরিচয় ঐ নৃত্যগীতে আত্মপ্রকাশ করিত। অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বীররসই আদিম মানুষের কল্পনাকে সবিশেষ উত্তেজিত করিত; কারণ তখন প্রাণধারণের আদিম তাড়নাটাই মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয় বহন করিত। প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণহননের প্রয়োজন সে যুগের মানুষকে উত্তেজিত, উদ্ধত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত। সেই প্রাণরক্ষার আর্ত প্রচেষ্টা আদিম মানুষের নৃত্যগীতে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা অনুমান করা যায়। সে যাহা হইতে চাহিত, কামনা করিত—তাহার নৃত্যগীতের উদ্দাম ছন্দে এবং অর্ধস্ফুট কণ্ঠের অর্থহীন শব্দপরম্পরায় তাহা ধরা পড়িত। অবশ্য এইরূপ কোন সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত আধুনিক মানুষের হাতে পৌঁছায় নাই। তাই তাহার সঠিক রূপটা আজ আর বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উচ্চকিত কোলাহল নীরব হইয়া গেলেও গুহাগাত্রে আঁকাজোকা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, আদিযুগের মানুষেরা কি কি বিষয় লইয়া নৃত্যগীত করিত। যূথচারী আদিম মানুষ যূথপতির গৌরব করিত। যে যূথপতি তাহাদিগকে শিকারে লইয়া যাইত, বিপদ হইতে রক্ষা করিত, ভিন্ন গোত্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, ছিঁড়িয়া কাটিয়া অপর দলের নারীকে কাড়িয়া আনিতে নির্দেশ দিত, তাহার গৌরবগানই যে সে যুগের মানুষকে উত্তেজিত করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, সভ্যতায় সে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে, দল-উপদলের সীমা ছাড়াইয়া তাহার জীবন আরও একটু সম্প্রসারিত হইয়াছে, জীবনের পরিধি বাড়িয়াছে। কাজেই সেই উন্মত্ত নৃত্যগীতাত্মক কাহিনীর রক্তোৎসব থামিয়া গিয়াছে। তখন কোন বীরপুরুষের জীবনকথা দীর্ঘদিনের চেষ্টায় পল্লবিত আকারে আখ্যানধর্মী হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি হইল বীররসাত্মক আখ্যান বা Heroic Ballad। প্রথমোক্ত কোন নৃত্যগীতাত্মক প্রাগৈতিহাসিক আখ্যায়িকার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পর্যায় বা বীররসাত্মক আখ্যায়িকার প্রচুর নিদর্শন না মিলিলেও তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিচয় আধুনিক কালের মানুষের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। হোমরের ইলিয়ড পূর্বে ব্যালড-আকারেই প্রচলিত ছিল; তারপরে হোমরের ব্যাপক প্রতিভা অন্য সকলের খ্যাতি গ্রাস করিয়া ট্রয়যুদ্ধ-কাহিনীকে বিশাল রূপ দিয়াছে। আদি কবি বৃদ্ধ বাল্মীকি যতই সত্যসন্ধ হউন না কেন, তিনিও যে কতজনের আখ্যায়িকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহার ঠিকঠিকানা নাই। রামায়ণ-কাহিনী পূর্বে বিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকা আকারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, পালিভাষায় লিখিত 'দশরথ জাতক' তাহার প্রমাণ। 'দশরথ জাতকে' রামায়ণকাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত হেমচন্দ্রের রামায়ণে রাবণেরই প্রাধান্য। খোদ বাল্মীকির রামায়ণও অঞ্চলভেদে কিছু ভিন্ন প্রকার। দক্ষিণভারত, উদীচ্য ও গৌড়ীয় রামায়ণে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। রামায়ণকাহিনীকে বাল্মীকি পূর্ণাঙ্গ আলঙ্কারিক কাব্যের (Ornate Poetry) রূপ দিলেও তাঁহার পূর্ব হইতে এই গল্পটি ব্যালাডের আকারে সারা দেশে প্রচলিত ছিল। মহাকাব্য পূর্ণ আকার লাভ করিবার পূর্বে এইরূপ একটা আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইত, এবং সেই আখ্যায়িকাগুলি অধিকাংশ স্থলে বীরত্ব, প্রেম, প্রভুভক্তি প্রভৃতি বিষয় লইয়া রচিত হইত। তাই বলিয়া যে-কোন আখ্যায়িকা, যত বীরত্বব্যঞ্জকই হউক, মহাকাব্যে

রূপায়িত হইতে পারে না। স্কাণ্ডিনেভিয়ার সাগা, এড্ডা, ইংলণ্ডের রবীনহুড ব্যালাড এবং স্কটলণ্ডের যুদ্ধকলহমূলক ব্যালাডসমূহে অনেক অদ্ভুত রোমান্স্ ও বীরত্বের আখ্যায়িকা আছে। কিন্তু সেগুলি মহাকাব্যের বিশালতা লাভ করিতে পারে নাই। কোন্ আখ্যায়িকা কি করিয়া যে স্থানীয় সঙ্কীর্ণ পরিবেশ ত্যাগ করিয়া মহাকাব্যের মহাকাশে বিচরণ করিবার শক্তি অর্জন করে, তাহার কোন বাঁধাধরা হিসাব পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, যে-সমস্ত আখ্যায়িকায় ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা অপেক্ষা দেশ ও জাতির বড় সত্তাটাই অধিকতর ধরা পড়ে, যাহার কাহিনী, চরিত্র ও রসের মধ্যে দেশকালাতীত ব্যাপকতা আছে, তাহাই সাধারণতঃ মহাকাব্যের শ্রেণীতে স্থান পাইয়া থাকে। মহাকাব্য যথার্থ আকার লাভ করিবার পূর্বে যে-গীতাত্মক আখ্যায়িকার আকারে প্রচলিত থাকে, সে-রূপ কোন দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যায় নাই। কারণ মহাকাব্য লেখার মধ্যে ধরা দিবার পূর্বে যে-ব্যালাড আকারে প্রচলিত ছিল, তাহার সমস্তটাই মৌখিক ধারার অনুগত। যাহা আখরের বন্দিত্ব স্বীকার করে নাই, লোকসঙ্গীতের আশ্রয়ে বাঁচিয়া ছিল, পরবর্তী কালে তাহার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মৌখিক সাহিত্যের এইরূপ দুর্গতি স্বাভাবিক। কিছুকাল পূর্বে পাশ্চাত্য গবেষকগণ মৌখিক মহাকাব্যের সামান্য ভগ্নাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। ফিনল্যাণ্ড ও এস্টোনিয়া হইতে এইরূপ দুইখানি মহাকাব্য উদ্ধার করা গিয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের এই মহাকাব্য *Kalevala* এবং এস্টোনিয়ার মহাকাব্য *Kalevipoeg* নামে পরিচিত। ১৯শ শতাব্দীতে Elias Lonnrot নামক একজন গবেষক মুখে মুখে প্রচলিত *Kalevala* মহাকাব্য সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করেন। F. R. Kreutzwald নামক আর একজন প্রাচীন-সাহিত্যামোদী ব্যক্তি এস্টোনিয়া হইতে *Kalevipoeg* মহাকাব্য সংগ্রহ করেন। 'কালেব' একজন অখ্রীষ্টান পৌত্তলিক দেবতা। খ্রীষ্টানধর্মের প্রভাবে ইনি পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে 'টিটান' নামে পরিচিত হন। বহু পূর্বে তিনি এস্টোনিয়ার জাতীয় বীর রূপে সম্মান পাইয়াছিলেন। এই মহাকাব্যের কুড়িটি সর্গ এবং ১৮,৯৯৩ শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইখানি মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলিকে এই রূপ গীতাত্মক আখ্যায়িকা বা ব্যালাডের লোকগাথা পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও ইলিয়ডের অব্যবহিত পূর্বে এই জাতীয় আখ্যানকাব্য লোকমুখে প্রচলিত ছিল। ফিনল্যাণ্ড ও এস্টোনিয়ার কোন বড় কবি আবির্ভূত হইয়া লোকমহাকাব্যকে যথার্থ মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারেন নাই বলিয়া এই গুলি অদৃশ্য হইয়া যায় নাই।

মহাকাব্যের তৃতীয় স্তরটিকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে Primitive Epic, Epic of Growth, Authentic Epic বা মৌলিক বিশুদ্ধ মহাকাব্য বলিতে চাহেন। আমাদের মনে হয়, এই তৃতীয় স্তরকে Primitive Epic বা আদিম মহাকাব্য বলা যায় না। ইহার পূর্ববর্তী আকারকে যথা—(*Kalevala, Kalevipoeg*) আদিম মহাকাব্য বলা যায়, যখন মহাকাব্য লোকমুখে গানের আকারে প্রচলিত ছিল, লেখার মধ্যে আশ্রয় লয় নাই। সুতরাং আমরা তৃতীয় পর্যায়কে Primitive Epic না বলিয়া বরং Epic of Growth বা মৌলিক মহাকাব্য অথবা ভারতীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আর্ষ মহাকাব্য' বলিতে পারি। ভারতের রামায়ণ-মহাভারত, গ্রীসের অডিসি-ইলিয়াড, প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের বিওউল্ফ্, প্রাচীন জার্মানীর

Nibelungenlied প্রভৃতি মহাকাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাচীনতম মহাকাব্য ব্যাবিলোনীয় ভাষায় আনুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম—'গিলগামেশ' (*Gilgamesh*) —গিলগামেশ নামক এক বীর রাজার কাহিনী। তারপরে একখানি প্রাচীন মিশরীয় মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হয়। মিশর সম্রাট দ্বিতীয় রামেশিস্ হিট্টী জাতিকে পরাভূত করেন। সেই কাহিনী অবলম্বনে আনুমানিক ১৩২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে 'পান্টা ঔর' (*Panta Our*) মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণ-মহাভারত ঋষি-রচিত; হোমার ঠিক ঋষি না হইলেও য়ুরোপে ঋষি বলিয়াই পূজিত। সুতরাং আমরা Epic of Growth ও Authentic Epic কে 'আর্য মহাকাব্য' নাম দিতে পারি। এই সমস্ত মহাকাব্য আকারে অতি বৃহৎ; কাহিনী, চরিত্র, বক্তব্যভঙ্গিমা, রস ইত্যাদি সাধারণ-জীবনের অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে; এই জন্য এই শ্রেণীর মহাকাব্য প্রধানতঃ বীররসকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় গৌরবময় অতীতকে ফুটাইয়া তোলে। তাই কোন কোন সমালোচক বীররসকে মহাকাব্যের একমাত্র রস এবং বীর্যবান্ চরিত্রকে মহাকাব্যের একমাত্র নায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ ধীরে ধীরে দীর্ঘ চেষ্টার দ্বারা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি এই মহাকাব্যও বহুজনের চেষ্টায় বহুদিন ধরিয়া নানা পরিবর্তন ও সংযোজনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া জাতি ও জীবনের মধ্যস্থলে অনশ্বর আসন পাতিয়া বসে। তখন এই আর্য মহাকাব্য শুধু আর সারস্বত সাধনার বস্তু হইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, যুগ ও জাতির প্রয়োজনে এই মহাকাব্য জাতীয় মহাকাব্যরূপে (National Epic) সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করিয়া থাকে। পুরাতন জার্মান ও এ্যাংলো স্যাক্সন মহাকাব্যের কথা স্মরণ করিয়াও বলা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমার ব্যতীত আর কোন চতুর্থ মহাকবির আবির্ভাব হয় নাই।

মহাকাব্যের চতুর্থ স্তর বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রূপান্তরকে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ Epic of Art, Literary Epic বা কৃত্রিম মহাকাব্য বলিয়াছেন। আমরা এই পর্যায়কে আলঙ্কারিক মহাকাব্য (Ornate Epic) বলিতে পারি। অতঃপর বর্তমান আলোচনায় Epic of growth-এর স্থলে 'আর্য মহাকাব্য' এবং Epic of Art-এর স্থলে 'আলঙ্কারিক মহাকাব্য' ব্যবহৃত হইবে।

চতুর্থ পর্যায়ে মহাকাব্যের সার্বিক বিশালতা হ্রাস পাইয়া গিয়া স্বল্পতর পাঠকের জন্য একটা কৃত্রিম ও শিল্পানুগত রচনারীতি সহ আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচিত হয়। এই মহাকাব্য সর্ব-সাধারণের ভোগ্য নহে, উচ্চ কণ্ঠে গান বা আবৃত্তিরও উপযোগী নহে। সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে এই আলঙ্কারিক এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃত্রিম মহাকাব্যের আবির্ভাব হয়। ইহার বিষয়বস্তু প্রায়শঃই আর্য মহাকাব্য হইতেই গৃহীত হয়। এই শ্রেণীর সর্বাধিক পরিচিত মহাকবি ভার্জিল হোমার হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করেন। ব্যাস-বাল্মীকির পরবর্তী কালের ভারতের সমস্ত মহাকবি রামায়ণ-মহাভারত হইতেই কাহিনী ও বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য আর্য মহাকাব্য যেরূপ বিপুলকায়, বিশালপ্রসর এবং বহুজনের মিলিত কল্লোলে উচ্চকিত, আলঙ্কারিক মহাকাব্য সেরূপ নহে। একজন কবির রচনা বলিয়া ইহার কাহিনী সংহত, একমুখী এবং শিল্পশাস্ত্রানুসারী। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে বিশালতা আছে, সেই সঙ্গে স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলাও

আছে; অপর দিকে মানবসৃষ্ট শিল্পে একটা কৃত্রিম pattern বা প্রকরণ অবলম্বন করে বলিয়া তাহার মধ্যে পারিপাট্য ও নিয়মানুগত্য থাকে। হিমাচলের আকার-আয়তন শিল্প-দর্শনের কোন নীতি-নিয়ম না মানিয়া, শৃঙ্খলার বাঁধা পথ না ধরিয়া বিপুল বিস্ময়ের আকারে শির তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর দিকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির বিশাল আকার সত্ত্বেও শিল্পসংহতি, শৃঙ্খলা ও মানবহস্তের নির্মিতি-কৌশলে চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। আলঙ্কারিক মহাকাব্যেও এইরূপ একটি রচনাগত দৃঢ় সংযম, চরিত্র, বর্ণনা, রস প্রভৃতির ধারাবাহিক ক্রমপরিণতি এবং একহস্তের শিল্পকৌশল সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য তাই বলিয়া এই মহাকাব্যকে আলঙ্কারিক অতএব কৃত্রিম বলিয়া ছোট করা উচিত হইবে না। 'বিও-উল্‌ফ্' এ্যাংলো-স্যাকসন যুগের মৌলিক মহাকাব্য, মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট্' অর্বাচীন কালের কৃত্রিম মহাকাব্য। বাঙলার মঙ্গলকাব্যও বহুলাংশে মৌলিক মহাকাব্যের অনুরূপ। অন্যদিকে 'মেঘনাদবধ', 'বৃত্রসংহার' আধুনিক কালের কৃত্রিম মহাকাব্য। তাই বলিয়া কি আমরা ভার্জিলের 'ঈনিড' ছাড়িয়া হেসিয়ডের 'থিয়োগনি' পড়িব, 'প্যারাডাইজ লস্ট্' ফেলিয়া 'বিও-উল্‌ফ্' ধরিব, না মাইকেল-হেমচন্দ্রকে ছাড়িয়া মুকুন্দরাম-বিজয়গুপ্ত লইয়া মাতামাতি করিব? বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারকে ছাড়িয়া দিলে, আর কোন্ মহাকাব্যকেই বা মৌলিক মহাকাব্যের গৌরব দেওয়া যায়? ভার্জিল, টাসো হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কালের মধুসূদন পর্যন্ত—এই সমস্ত কবি আলঙ্কারিক মহাকাব্য লিখিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের উক্ত 'কৃত্রিম' মহাকাব্য কি শত শত 'মৌলিক' মহাকাব্য অপেক্ষা অধিকতর গৌরব দাবি করে না? য়ুরোপে ভার্জিলই (পাব্‌লিয়াস ভার্জিলিয়াস মারো—৭০-১৯ খ্রীঃ পূঃ) সর্বপ্রথম লাতিন ভাষায় আলঙ্কারিক মহাকাব্য সৃষ্টি করেন। তাঁহার 'ঈনিড' হোমারের ইলিয়াড ও অডিসির আদর্শ ও প্রভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল। ঈনিড পরবর্তী যুগে য়ুরোপের কবি-সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লুকান, দান্তে, পেত্রার্কা, বোকাচিও, টাসো, কারদুচি, কামোইন্‌স্, রনসার্ড, ভোলতেয়র, চসার, স্পেনসার—সকলেই কোন না কোন দিক দিয়া ভার্জিলের নিকট ঋণী। পরবর্তী কালে লাতিন ভাষায় লুকান (৩৯-৬৫ খ্রীঃ অঃ) রোমের গৃহযুদ্ধ অবলম্বনে 'ফারসালিয়া' নামক মহাকাব্য রচনা করেন। সিলিয়াস ইটালিকাসের 'পিউনিকা' মহাকাব্যে হ্যানিবলের সঙ্গে রোমের যুদ্ধকথা বর্ণিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের য়ুরোপে বড় বড় বীরপুরুষ ও রাজা-মহারাজদের লইয়া স্থানীয় ভাষায় অনেক আখ্যান রচিত হইয়াছিল, যাহাতে মৌলিক মহাকাব্যের লক্ষণ আছে। আলেকজাণ্ডার, শার্লামেন, রাজা আর্থার ('সিগফ্রিড্') প্রভৃতি বীর রাজাদের কীর্তি ও বীরত্ব লইয়া যে সমস্ত মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিগফ্রিডের কীর্তি-সম্বলিত পুরাতন জার্মান ভাষায় *Nibelungenlied* (আনুমানিক ১২০০ খ্রীঃ অঃ), স্কাণ্ডিনেভিয়ায় প্রচলিত Volsung Saga বা মহাকাব্যের অনুরূপ রচনা *Burnt Njal, Grettir the Strong, King Olaf* প্রভৃতি কাব্য মৌলিক মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। ফরাসী ভাষাতেও মধ্যযুগে শার্লামেনের গৌরবগাথা বিষয়ক *Gester de Roi* এবং ঐ শ্রেণীর *Chanson de Roland, Ogrier the Dane* প্রভৃতি বীররসাত্মক আখ্যায়িকায় মহাকাব্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে। ১২শ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ভাষায় রচিত *Poem of Cid*ও জাতীয় গৌরববাচক বীররসের মহাকাব্য। ৭ম শতাব্দীতে পুরাতন ইংরেজী ভাষায় রচিত

'বিওউল্‌ফ্' (*Beowulf*) একখানি মৌলিক মহাকাব্য, যাহা শুধু রসিক পাঠকের পাঠের জন্ম রচিত হয় নাই,—ইহার সহিত হোমারীয় বিশালতার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ভার্জিল যে আলঙ্কারিক মহাকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেন, তাহা মধ্যযুগে য়ুরোপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইতালির দান্তের *Divina Commedia* (1320) আরিয়োস্টোর *Orlando Furioso* (1516) টাসোর *Gerusalemme Liberata* (1575) পর্তুগীজ কবি কামোইন্‌স্‌-এর *Os Lusiados* (1570) ফরাসী সাহিত্যে ভোল্‌তেয়রের *Henriade* (1728) ইংরেজী সাহিত্যে স্পেন্সারের *Faerie Queen* (1590-96), মিল্টনের *Paradise Lost* (1667), *Paradise Regained* (1671), রিচার্ড ব্লাকমুরের *Prince Arthur* (1695), *King Arthur* (1697), *Eliza* (1705), উইলিয়ম মরিসের *The Defence of Guinevere* (1858), *Sigurd the Volsung* 1877) প্রভৃতি আলঙ্কারিক মহাকাব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। ১৮শ শতাব্দীর পর ইংলণ্ডের রোমান্টিক পুনর্জাগৃতির ফলে মহাকাব্য রচনার কৃত্রিম প্রচেষ্টা সংযত হয় এবং গীতিকাব্যের বিরাট উৎসমুখ বাধামুক্ত হয়। ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতেও মহাকাব্য রচনার প্রয়াস য়ুরোপের নানা দেশেই লক্ষ্য করা যায়। গ্যয়ঠের *Faust* (১৭৬৯ সালে রচনা আরম্ভ, ১৮৩২ সালে সমাপ্ত) ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত হইলেও ইহাতে মহাকাব্যের বিশালতা লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন টমাস হার্ডি। তাঁহার *The Dynasts* (1903-8) নেপোলিয়নের যুদ্ধ লইয়া রচিত; নাটকের আঙ্গিকে রচিত হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত সুরটি মহাকাব্যের অনুরূপ। আলফ্রেড নয়েসের *Drake* (1906-8) মহাকাব্যের আদর্শে রচিত—যদিও ইহার বিশালতা ও মহনীয়তা উল্লেখযোগ্য নহে। ইদানীন্তন কালে উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করিবার ফলে অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, আর্ষ মহাকাব্য বা আলঙ্কারিক মহাকাব্য—উভয়েরই স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে; যে সামাজিক পরিবেশে মহাকাব্য রচিত হইত, তাহার পরিবর্তনের জন্য মহাকাব্যও ভোল পাল্টাইয়া গদ্য-উপন্যাসের মধ্যে নব কলেবর লাভ করিয়াছে। বর্তমান কালে য়ুরোপে মহাকাব্যের মতো বিশালকায় জটিল ঘটনাসঙ্কুল এমন সমস্ত উপন্যাস রচিত হইতেছে যে, তাহাকে গদ্য মহাকাব্য বলাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য অতি সম্প্রতি কোন কোন দুঃসাহসী য়ুরোপীয় কবি আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচনার আদর্শটিকে পুনঃ প্রবর্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রীক কবি কাজান্‌তাজাকিনের *The Odyssey a Modern Sequel* এবং ফরাসী কবি সাঁজান প্যার্স-এর *Amers* মহাকাব্য সেই প্রয়াসের নিদর্শন লক্ষ্য করা যাইবে।

মহাকাব্যের শেষ স্তর হইল বিদ্রূপাত্মক মহাকাব্য বা Mock Heroic Epic. মহাকাব্যের উৎকর্ষের যুগ শেষ হইয়া গেলে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী পাঠকের মনে কখনও কখনও বিরক্তি বা কৌতুক সঞ্চার করে। তখন বীররসকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের লবণাক্ত আক্রমণে বিপর্যস্ত করিয়া মহাকাব্যের বহিরঙ্গের অনুকরণে ব্যঙ্গমহাকাব্য রচিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, এই জাতীয় রচনা একপ্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে জন্মলাভ করে। অতিমাত্রায় নিয়মের দাসত্বে যখন মহাকাব্যের স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হইয়া যায়, ক্লাসিকতার মরণফাঁস যখন কবিদের শ্বাস রোধ করে, বীররসের শূন্যগর্ভ অস্ফালন যখন মানুষের হৃদয়টাকে ঢাকিয়া ফেলে তখন এই ব্যঙ্গ

মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। অতি তুচ্ছ সাধারণ বস্তুকে বীররস ও গম্ভীর বর্ণনার দ্বারা ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া অসাধারণ করিয়া তোলার মধ্যে একটা অসঙ্গতিজনিত কৌতুকবোধ লুকাইয়া থাকে। আদিতম ব্যঙ্গমহাকাব্যের নাম *Batrachomyomachia* বা 'ভেকমূষিকের যুদ্ধ'। হোমারের নামে এই ক্ষুদ্র অসমাপ্ত ব্যঙ্গ-কাব্যটি একদা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল হোমারের পরবর্তী হওয়াই সম্ভব। মধ্যযুগেও এইরূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাকে Beast Epic বা জন্তুজানোয়ারের মহাকাব্য বলে। ঈশপের গল্পকাহিনী (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক?) জানোয়ারের মহাকাব্যের জন্মদান করিয়াছিল। এই কাব্য মহাকাব্যের রীতিতেই রচিত হইত, কিন্তু সমস্ত চরিত্রই ইতর জন্তু। রেনার্ড্ নামক এক ধূর্ত শৃগাল এই মহাকাব্যের নায়ক। ইহাতে শৃগালের ধূর্ততা এবং পরিশেষে তাহার পরাজয়—ইহাই মূল বক্তব্য। অন্যান্য জীব-জন্তুও মহাকাব্যের অনুরূপ গম্ভীর নাম পাইয়াছে। নেকড়ে বাঘের নাম—য়িসেনগ্রিম, বন্য কুক্কুটের নাম—চ্যান্টিক্লার ইত্যাদি। লাতিন ভাষায় লেখা প্রাচীন জানোয়ার-মহাকাব্য—*Ecbasis Captive* অর্থাৎ 'বন্দীর পলায়ন' (৯৩০ খ্রীঃ অঃ), *Ysengrmius* (আনুমানিক ১১৫০ খ্রীঃ অঃ) ইত্যাদি। ফরাসী ভাষায় লিখিত এই জাতীয় ব্যঙ্গ-মহাকাব্যে জন্তুজানোয়ারের চরিত্র রাজা ও অভিজাতবংশকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যেমন—শৃগাল ধর্মযাজকদের প্রতীক, নেকড়ে বাঘ ব্যারনদের চরিত্র; বলা বাহুল্য সিংহ ছিল রাজার প্রতীক। ফরাসী ভাষায় লিখিত এই জাতীয় *Le Roman de Renard* (1130-1210) এবং জার্মান ভাষায় রচিত *Reinhart Fuch* (1180) প্রভৃতি জানোয়ার-কাব্য তদানীন্তন অভিজাত সমাজকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল।

ইহার পর ব্যঙ্গমূলক মহাকাব্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার ছদ্মগাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া পরিহাস সৃষ্টি করিত। ইতালির কবি টাসোনি-র (১৫৬৫-১৬৬৫) *La Secchia Rapita* ('চোরাই বাল্তি') নামক কাব্যে এই রীতির প্রথম সূচনা হয়। ফরাসী কবি ও সমালোচক বোয়ালো-র *Le Lutrin* (১৬৭৪-৮৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত) নামক ব্যঙ্গ মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইতেছে,—পড়ার টেবিল কোথায় রাখা হইবে, তাহা লইয়া ধর্মযাজকদের কলহ। বাটলারের *Hudibras*-এ (১৬৬৩-১৬৭৮) পিউরিটান মতবাদকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে আলেকজাণ্ডার পোপের *The Rape of the Lock* (1714) বা 'কুন্তল সংহার' কাব্য সবিশেষ পরিচিত। পোপ বেলিণ্ডা নাম্নী এক যুবতীর এক গুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল খোয়া যাইবার কাহিনীকে মহাকাব্যের রীতিসম্মত উপায়ে বর্ণনা করেন। এই ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, ইহার পশ্চাতে খানিকটা সত্য ঘটনাও আছে। লর্ড পিটার আরাবেলা ফারমোর নাম্নী এক অবিবাহিতা যুবতীর একগুচ্ছ কুন্তল বলপূর্বক কাটিয়া লওয়াতে দুই পরিবারের মধ্যে বিষম মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। পোপ এই ঘটনাটিকে রীতিমত বীররসাত্মক মহাকাব্যের ছাঁদে ফাঁদিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ব্যঙ্গ করিয়া জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের আশ্বিন মাসে বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্যে'র প্রথম সর্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' (১৮৭৮) উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গমহাকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত।

সংস্কৃত সাহিত্যেও মহাকাব্যের দুইটি স্তরের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একটি আর্ষ মহাকাব্য

(Epic of Growth), আর একটি ঈষৎ পরবর্তী কালে রচিত আলঙ্কারিক মহাকাব্য (Epic of Art)। বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত—মাত্র এই দুইখানি আর্ষ মহাকাব্য বা মৌলিক মহাকাব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে মহাভারত রামায়ণের পূর্বে রচিত হয়। কিন্তু অনুমান, এ সিদ্ধান্ত যথেষ্ট যুক্তিসহ নহে।[১৫] সে যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের আকার লাভ করিবার পূর্বে ballad বা লোকগাথার মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'দশরথ-জাতক' অনুরূপ কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু আদিকবি ও বেদব্যাস এই সমস্ত উপকথা ও লোকগাথাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ছোট ছোট লোক-কবিদের সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারতই ভারতবর্ষের একমাত্র আর্ষ মহাকাব্য। ইহার পর যত মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুই-একখানি ব্যতীত সমস্ত মহাকাব্য রামায়ণ অথবা মহাভারত হইতে কাহিনী ও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। এই আলঙ্কারিক মহাকাব্যের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অশ্বঘোষের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দে'। ব্রাহ্মণ অশ্বঘোষ প্রথমে হীনযান, পরে মহাযান মত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ-মহিমা বিষয়ক এই দুইখানি মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি ধর্মমতে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করেন নাই। তারপরে কালিদাসের (কীথের মতে ৪০০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে) 'কুমারসম্ভবম্' ও 'রঘুবংশম্', ভারবির (৬ষ্ঠ শতাব্দী) 'কিরাতার্জুনীয়ম্' ভট্টির (৭ম শতাব্দী), 'রাবণবধ' (ভট্টিকাব্য), কুমারদাসের (৬ষ্ঠ শতাব্দী) 'জানকীহরণ', মাঘের (৭ম শতাব্দীর শেষে) 'শিশুপালবধ' প্রভৃতি কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক মহাকাব্য নামে পরিচিত। বলাই বাহুল্য, এই মহাকাব্যগুলির আকর-স্থান হইতেছে রামায়ণ ও মহাভারত। প্রাকৃত ভাষাতেও কিছু কিছু আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে ভারতীয় ভাষায় যে সমস্ত মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ অধিকাংশ স্থলেই পাশ্চাত্য মহাকাব্য হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

মহাকাব্যের লক্ষণ ॥

নবীনচন্দ্র মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং পৌরাণিক ভারতবর্ষকে আধুনিক সমাজদর্শন, অধ্যাত্মচেতনা, নীতিবোধ প্রভৃতির পটভূমিকায় বিরাট কৃষ্ণজীবনের *Volsung Saga* রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আধুনিক কালেও পাশ্চাত্যের কোন কোন কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং নবীনচন্দ্র সেই একই পথের পথিক হইয়া এমন কোন অন্যায় করেন নাই, প্রাচীন ভারতকে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা পরিবর্তিত করিয়াও এমন কিছু অপরাধ করেন নাই। টমাস হার্ডি তাঁহার *The Dynasts* মহাকাব্যে পুরাপুরি মহাকাব্যের ছাঁদে (কিছুটা নাটকীয় লক্ষণ স্বীকার করিয়া) নেপোলিয়ন-যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহে অনৈসর্গিকতার সাহায্য লইয়াছেন। নবীনচন্দ্র না হয় উল্টাটা করিতে গিয়াছিলেন, প্রাচীন কাহিনীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যের দ্বারা

১৫ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র (১ম খণ্ড) ৪৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে একটু-আধটু কালানৌচিত্যদোষ (*anachronism*) ঘটিলেও কাব্যের খাতিরে তাহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে. নবীনচন্দ্রের আদৌ মহাকবির প্রতিভা ছিল না। নবীনচন্দ্রের এই প্রতিভা বিচার করিবার পূর্বে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শে মহাকাব্যের স্বরূপ ও লক্ষণ আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য মতে মহাকাব্য—পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের গুরু অ্যারিস্টট্‌ল সর্বপ্রথম তাঁহার *Poetics* গ্রন্থে মহাকাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। অবশ্য ট্র্যাজেডি ছিল তাঁহার মূল আলোচ্য বিষয়; শুধু ট্র্যাজেডির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য তিনি প্রসঙ্গক্রমে মহাকাব্যের কথা বলিয়াছেন। তাই তাঁহার এই আলোচনা হইতে মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ বুঝা যায় না। ট্র্যাজেডি মহাকাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, অ্যারিস্টট্‌ল সেই কথাটাই তাঁহার *Poetics*-এর তিনটি অধ্যায়ে (*Chaps. XXIII, XXIV. XXVI*) বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার আলোচনা হইতে ক্লাসিক মহাকাব্যের সংজ্ঞা, রীতি ও প্রকরণ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়। অ্যারিস্টট্‌ল-প্রদত্ত মহাকাব্যের সংজ্ঞা:

> "As to the poetic imitation which is narrative in form and employs a single metre, the plot manifestly ought, as in a tragedy to be constructed on dramatic principles. It should have for its subject a single action whole and complete, with a beginning, a middle, and an end.…All other poets take a single hero, a single period, or an action single indeed, but with a multiplicity of parts". (*Poetics*, XXIII)
>
> (ভাবার্থ—সেই কাব্যই মহাকাব্য যাহাতে একই প্রকার ছন্দে কাহিনী বিবৃত হয়। ট্র্যাজেডির মত ইহার আখ্যান নাট্যলক্ষণযুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সে আখ্যানটি হইবে আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ কাহিনী। মহাকবিরা একটি ঘটনা এবং একজন নায়ককে গ্রহণ করিলেও আরও অনেক উপকাহিনীকে মূলকাহিনীর অংশস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন।)

সুতরাং অ্যারিস্টট্‌লের মতে মহাকাব্যে এই লক্ষণগুলি প্রয়োজন: (১) আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত নাট্যধর্মী বিবৃতিমূলক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, (২) একজন নায়কের ঘটনা, (৩) একই প্রকার ছন্দ, (৪) প্রধান কাহিনীর অংশস্বরূপ নানা উপকাহিনী। *Poetics*-এর ২৪শ অনুচ্ছেদে তিনি বলিতেছেন যে, মহাকাব্য চারি প্রকার হইতে পারে—সরল, জটিল, নৈতিক ও করুণরসাত্মক। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্য আছে। মহাকাব্যে ঘটনাগত প্রসার বা দৈর্ঘ্য দেখান সম্ভব; ট্র্যাজেডিতে সে সুযোগ নাই। কারণ ট্র্যাজেডির ঘটনা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরিমিত সংখ্যক চরিত্রের দ্বারা রূপায়িত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে ঘটনা অভিনীত হয় না, বিবৃত হয়; তাই ইহাতে ঘটনার পরিধি প্রয়োজনমত দীর্ঘপ্রসারিত হইতে পারে, অনেক উপকাহিনী সংযোজিত হইতে পারে। মহাকাব্যে একটি ছন্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত, বীরত্বব্যঞ্জক Heroic measure (Dactylic hexameter) মহাকাব্যের যথার্থ ছন্দ। যাঁহারা মহাকাব্যে একাধিক ছন্দ ব্যবহার করেন, অ্যারিস্টট্‌ল তাঁহাদিগকে প্রশংসা করেন নাই। মহাকাব্যের কবি নিজের কথা না বলিয়া প্রথমেই

মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে অবতারিত করিবেন। ট্র্যাজেডিতে অনৈসর্গিক ব্যাপারের উল্লেখ থাকিলেও মহাকাব্যেই তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। এমন কি, অসম্ভব অদ্ভুত ঘটনাও মহাকাব্যে বেশ চলিয়া যায়—যাহা ট্র্যাজেডিতে সম্ভব নহে। অ্যারিস্টট্‌লের মতে ট্র্যাজেডিতে মহাকাব্যের সমস্ত গুণ বর্তমান, উপরন্তু ইহার আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা মহাকাব্যের নাই। ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, পাঠ করিয়াও সেই আনন্দ উপলব্ধি হয়। কিন্তু মহাকাব্যের সে সুযোগ নাই। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "It plainly follows that Tragedy is higher art, attaining its end more perfectly." মহাকাব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌ল দীর্ঘ আলোচনা না করিলেও যেটুকু করিয়াছেন তাহা হইতেই মৌলিক মহাকাব্যের লক্ষণ বুঝা যাইতেছে।

অ্যারিস্টট্‌ল-কথিত মহাকাব্যের আদর্শ দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। তাই প্রাচীন যুগে মহাকাব্য বলিতে প্রায়ই বীররসাত্মক আখ্যানকেই নির্দেশ করা হইত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে সমস্ত আলঙ্কারিক মহাকাব্য (Epic of art) রচিত হইয়াছে, তাহাতে সর্বদা বীরত্বের আদর্শই প্রাধান্য লাভ করে নাই। ভার্জিলের *Aeneid*-এ রাজকুমার ইনিয়াসের চরিত্র সাধুসন্তদের মতো সাত্ত্বিক গুণান্বিত হইয়া গিয়াছে, ইহাতে বীররস অপেক্ষা করুণ রসের দিকেই যেন কবির অধিকতর প্রবণতা। দান্তের *Divina Commedia*-র বিষয়বস্তু বীররসাত্মক নহে, ইহার কাহিনী ভাগবত প্রেমের আদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছে। *Paradise Lost*-এর বিষয়বস্তু বীররসের অনুকূল নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মানবসমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের মনোভাব দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং হোমারীয় যুদ্ধবিগ্রহাদি পরবর্তী কালের অনেক মহাকাব্যে হ্রাস পাইয়া গিয়াছে; প্রাচীন জীবনের আদিম লক্ষণের স্থলে আধুনিক জটিল জীবন অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিশালতার স্থানে সূক্ষ্মতা আসিয়াছে।

ইংরেজী সমালোচনার জনকস্থানীয় স্যার ফিলিপ সিড্‌নে মহাকাব্য সম্বন্ধে ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধে ঘোষণা করেন :

> "The Heroicall······is not onely a kinde, but the best and most accomplished kinde of Poetry. For as the image of each action styrreth and instructeth the mind, so the loftie image of such Worthies most inflameth the mind with desire to be worthy, and informs with counsel how to be worthy." (*An Apology for Poetrie*)
>
> (ভাবার্থ—মহাকাব্য সমস্ত কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা আমাদের মনকে যেমন মহৎ ভাবে উত্তেজিত করে, জ্ঞানসঞ্চার করে, তেমনি মহৎ চরিত্রের সু-উচ্চ বর্ণনা আমাদের মনে মহৎ হইবার বাসনা জাগ্রত করে, এবং তদনুরূপ আদর্শ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকে।)

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, সিড্‌নে মহাকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর মহাকাব্যের প্রভাবের বিষয়ে অধিকতর কৌতুহল দেখাইয়াছেন। ইহার কারণ, গসন নামক এক লেখক *School af Abuse* (1579) নামক পুস্তিকা লিখিয়া

তাহাতে পিউরিটান মতের বশবর্তী হইয়া সাহিত্যকে নিন্দা করেন। সিডনে তাহার উত্তর দিতে গিয়া *An Apology for Poetrie* (১৫৮০-৮১ খ্রীঃ অব্দে রচিত, ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত) রচনা করেন। সাহিত্য মানুষের নৈতিক জীবনকে কত উন্নত করে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সিড্‌নে মহাকাব্যের নৈতিক প্রভাবের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ইহার পরে ড্রাইডেন মহাকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন দুইটি প্রবন্ধে *Apology for Heroic Poetry and Poetic Licence* (1677), *An Essay on Heroic Plays* (1661). ইংরেজী সাহিত্যে সর্বপ্রথম ড্রাইডেন বীররসাত্মক মহাকাব্যের আনুপূর্বিক আলোচনা করেন। মহাকাব্যকে তিনি বলিয়াছেন, "A serious poem, truly such, is undoubtedly the greatest work which the soul of man is capable to perform." (মহাকাব্য যথার্থই একটি গম্ভীর কাব্য, মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।)

য়ুরোপে প্রাচীনকালে যেমন সমালোচকগণ মহাকাব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, তেমনি আধুনিক কালের পণ্ডিতগণও মহাকাব্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এই আলোচনায় মহাকাব্যের গঠনপ্রকৃতি, বিষয়বৈচিত্র্য এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন একজন সমালোচক মহাকাব্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

> "The true epic, wherever created, will be a narrative poem, organic in structure, dealing with great characters, in a style commensurate with the lordliness of its theme, which tends to idealise these characters and actions, and to sustain and embellish its subject by means of episode and amplification." (W. M. Dixon—*English Epic and Heroic Poetry*)
>
> (ভাবার্থ—যে সমস্ত যথার্থ মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার প্রধান লক্ষণ—নানা আঙ্গিকে ঘনপিনদ্ধ এমন একটি বিশাল কাহিনী যাহার চরিত্রগুলি সুমহৎ হইবে। সেই মহৎ ও বৃহদ্‌ বিষয়ের জন্য একটি গাম্ভীর্যমণ্ডিত রচনারীতি প্রয়োজন, যাহার দ্বারা চরিত্র ও কাহিনী আদর্শলোকের মহত্তর স্তরে উত্তীর্ণ হইবে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা ও উপকাহিনীর দ্বারা অলঙ্কৃত ও দীর্ঘায়ত হইয়া মহাকাব্যের কাহিনী বিশালতা লাভ করে।)

উল্লিখিত সংজ্ঞা এবং অন্যান্য আলোচনা হইতে পাশ্চাত্য মতে মহাকাব্যের লক্ষণগুলি বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মহাকাব্যের বিরাট কলেবর একটা সামগ্রিক পূর্ণতা লাভ করে এই উপাঙ্গগুলির সমবায়ে—বিষয়বস্তু, আখ্যান, চরিত্র ও রচনারীতি। এই চারিটি বৈশিষ্ট্য ভিন্ন মহাকাব্য সর্বোপরি জাতীয় জীবনের প্রতীকরূপে যুগে যুগে শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে এবং এই জাতীয় গ্রন্থ পাঠ, আবৃত্তি ও শ্রবণে চিত্তের মধ্যে বিশালতা সঞ্চারিত হয়।

পাশ্চাত্য মহাকাব্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ স্থানেই জাতীয় জীবনের সঙ্গে সমীভূত বীররসের আখ্যান অবলম্বন করিয়া থাকে। সমগ্র জাতির সঙ্কটমোচন, জয়লাভ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি গৌরবজনক ব্যাপার ইহার মূল বক্তব্য। কোন একজন বীরপুরুষ বা একাধিক মহৎ চরিত্রের

এমন গৌরবময় কাহিনী মহাকাব্যের অবলম্বন হইয়া থাকে, যাহাতে প্রত্যহের ক্ষুদ্র জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা চিরকালীন ভাবাবেগে ও মানবজীবনাদর্শ দীর্ঘস্থায়ী আসন লাভ করে। কাজেই মহাকাব্যের বিষয় যুদ্ধবিগ্রহাদিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে, কারণ যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে জয়-পরাজয়ের উন্মাদনা, একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা এবং প্রতি-দিবসের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বতর সত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় সুদৃঢ়ভাবে ফুটিয়া ওঠে। এইজন্য মহাকাব্যে যুদ্ধবিগ্রহ কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে বর্ণিত হয়।

অবশ্য বহু বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ সমুদ্রযাত্রাও মহাকাব্যের বিষয় হইতে পারে—যেমন 'অডিসি'। রামায়ণের সমুদ্র অতিক্রমও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রযাত্রা, পর্যটন, সমুদ্রাতিক্রম প্রভৃতির মধ্যে বিশালতা, বিপদসঙ্কুল উত্তেজনা ও বৈচিত্র্য থাকে বলিয়া তাহার মধ্যে সহজেই মহাকাব্যের রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। অবশ্য সভ্যতার একটু আদিম স্তরে এই দুই ধরনের কাহিনী মহাকাব্যের বিষয়রূপে ব্যবহৃত হয়, যখন জীবনের মধ্যে এত জটিলতা প্রবেশ করে নাই, যখন মানুষের জগৎ পিরামিডের মতো বিশালতা লাভ করিয়াছিল, তাজমহলের মতো কারুকলাঋদ্ধ সৌন্দর্যবিলাসী হইয়া ওঠে নাই।[১৬] (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'মহাকাব্যের লক্ষণ')

কিন্তু পরবর্তী কালে আলঙ্কারিক মহাকাব্যের (Epic of Art) যুগ হইতে মহাকাব্যে বীররসের একচ্ছত্র আধিপত্য ক্রমেই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। ভার্জিলের 'ঈনিড' মহাকাব্যে এই নূতনত্বের প্রথম সূচনা দেখা দিল। রাজকুমার ইনিয়াস হোমারীয় যুগের চরিত্র; ইহাতে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার বর্ণনাও আছে। ইহার কাহিনী ও রচনারীতিতে হোমারের প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে এবং অগাস্টাসের নেতৃত্বে রোমসাম্রাজ্যের বিরাট ইতিবৃত্তও বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ইনিয়াসের মধ্যে বীররসোজ্জ্বল জীবনের উগ্র উত্তেজনা লক্ষণীয় নহে। মানবজীবন ও নিয়তি সম্বন্ধে গভীর এষণা এবং ইনিয়াসের সাত্ত্বিক ও করুণার্দ্র চরিত্র মহাকাব্যের বীর-আখ্যানের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার পর দান্তের 'দিভিনা কোমেদিয়া' হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কালের অধিকাংশ মহাকাব্যে বীররসের প্রাধান্য বহুলাংশে হ্রাস পাইল। দান্তের মহাকাব্যে ভাগবত প্রেম ও মুক্তি, স্পেন্সরের 'ফেয়ারি কুইন'-এ রোমান্টিক প্রতীকাখ্যান, মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এ ইহুদী পুরাণানুযায়ী ভগবানের ন্যায়বিচার ঘোষণা প্রভৃতি তত্ত্বকথা প্রাধান্য লাভ করিল। ইদানীং জাতীয় জীবনের আদর্শে মহাকাব্যের মধ্যে আবার পুরাতনী বীররসের বিশালতা সঞ্চার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে (টমাস হার্ডির 'ডাইনাস্ট্‌স্'), কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল গীতিকাব্যের যুগে মহাকাব্যের বিশালতা এবং বস্তুগত কাহিনীর দিকটি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে।

মহাকাব্যের প্রধান অঙ্গ—ইহার কাহিনী। একদা মানুষ গল্পরসের জন্যই মহাকাব্য পড়িত, এখনও পাঠকেরা যে বিশালকায় উপন্যাস পড়িয়া থাকে, তাহার মূলেও মহাকাব্যের গল্পরসের অনুরূপ চিরন্তন স্পৃহা বর্তমান। বলা বাহুল্য যে, মহাকাব্যের কাহিনী জাতীয় জীবনের সহিত অন্বিত হইবে। কেহ কেহ এই ধরনের জাতীয় ভাবব্যঞ্জক মহাকাব্যকে National Epic

১৬ ড্রাইডেনের মতে বীররসাত্মক নাটক ও মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইবে প্রেম অথবা বীরত্ব—"An Heroic play ought to be an imitation in little, of an heroic poem ; and consequently, that Love and Valour to be the subject of it." (*Of Heroic Plays*)

বা জাতীয় মহাকাব্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু আলঙ্কারিক মহাকাব্যের পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত মহাকাব্যকেই National Epic বলা যায়। বাল্মীকি-ব্যাস, হোমার, 'বিওউল্‌ফে'র কবি, প্রাচীন জার্মান মহাকাব্যের রচয়িতা—ইঁহাদের অবলম্বিত কাহিনী একটা বিশাল দেশ ও কালের সীমার মধ্যে আবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক জাতির জীবন ও সাধনা যেমন 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'কে কেন্দ্র করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 'ঈনিডে' অগাস্টাসের যুগে রোমক জাতির প্রাণসিন্ধু কল্লোলিত হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারতে দুই যুগের ভারতবর্ষ সমগ্র জাতির জীবনধারাকে বিকশিত করিয়াছে, তেমনি পুরাতন এ্যাংলো স্যাক্‌শন জাতি, প্রাচীন জার্মান এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যথাক্রমে 'বিওউল্‌ফ', *Nibelungenlied* এবং *Volsung Saga* ও *Edda* প্রভৃতি মহাকাব্য এবং ঐ শ্রেণীর রচনার মধ্যে আপনাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে সারস্বত আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া যে সমস্ত মহাকাব্য রচিত হইয়াছে ('দিভিনা কোমেদিয়া', 'ফেয়ারি কুইন', 'প্যারাডাইজ লস্ট', 'আঁরিয়াদ', 'ডাইনাস্টস' প্রভৃতি), তাহাতে শুধু একজন কবির মনোভাব প্রতিফলিত হয় নাই,—এই সমস্ত ধর্মীয়, রোমান্টিক বা প্রতীকী কাহিনীতে দেশ ও কালের ছায়া পড়িয়াছে।

বিশাল বনস্পতির মতো মহাকাব্যের মূল কাহিনীটি দেশের জীবনমূল হইতে উত্থিত হইবে এবং একটি সরল পন্থাভিমুখী বীররসের কাহিনী অথবা বিশালজীবনের ভারবহনক্ষম যে-কোন আখ্যান মহাকাব্যের মূল আখ্যান হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। যেমন—ট্রয়যুদ্ধ, অডিসিয়াসের সমুদ্রযাত্রা, ইনিয়াসের রোমসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, বিওউল্‌ফের গ্রেণ্ডেল দানবের সঙ্গে জলতলে সংগ্রাম, রামচন্দ্রের লঙ্কাভিযান এবং সীতার উদ্ধার, পঞ্চপাণ্ডবের ধর্মযুদ্ধে জয়ী হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন লাভ ইত্যাদি। এইগুলি মূল বা প্রধান কাহিনী। ঐ মূল কাহিনীকে পূর্ণতা দিবার জন্য অসংখ্য শাখাকাহিনী বনস্পতির শাখার মতো মূলকে ধারণ ও বর্ধন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ শাখাকাহিনী বা উপকাহিনীর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস করা যায় না। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যেমন সঞ্চারিভাবের সহযোগিতা না পাইলে স্থায়িভাব উৎকৃষ্ট রসে পরিণতি লাভ করিতে পারে না, সেই রূপ উপকাহিনীর সহযোগিতা ব্যতীত মহাকাব্যের মূল কাহিনী পূর্ণতা পায় না। এমন কি কোন কোন সময়ে মূল কাহিনীটি শাখা কাহিনীর দ্বারাই রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়, বৈচিত্র্য লাভ করে।

মহাকাব্যের কাহিনীর সীমা কতদূর সম্প্রসারিত হইতে পারে, তাহা লইয়াও নানা আলোচনা হইয়াছে। অ্যারিস্টট্‌লের মতে মহাকাব্যের কাহিনী হইবে "of such a length as can be read in a day"—কাহিনীটি এমন হওয়া চাই যাহা একদিনে পড়িয়া শেষ করা যায়। মিনটুর্নোর মতে মহাকাব্যে একবৎসরের অধিক ঘটনা না থাকাই ভাল। আবার জিরল্‌ডি বলেন, মহাকাব্যে নায়কের সমগ্র জীবন বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের কাহিনীগত কালপরিমাণ অধিকাংশ স্থলে খুব দীর্ঘ নহে। মোট ঊনপঞ্চাশ দিনের ঘটনা ইলিয়াডের বিষয়; তাহার মধ্যে একুশ দিনের ঘটনা প্রথম সর্গেই বিবৃত হইয়াছে। 'বিওউল্‌ফে'র প্রথম ভাগে মাত্র পাঁচদিনের ঘটনা এবং দ্বিতীয়ভাগে একদিনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ভারতীয় মহাকাব্যের কাল-পরিমাণ মহাকাব্যোচিত বিশালতা লাভ করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের মূল ঘটনা দীর্ঘবিস্তারী—যদিও লঙ্কাভিযান ও কুরুক্ষেত্র মহাসমরের (যাহা মূলঘটনার কেন্দ্রবিন্দু) কালপরিমাণ

অতিশয় দীর্ঘ নহে। যাহা হউক মহাকাব্যের কাহিনী দীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখা সমন্বিত হইলেও তাহার মধ্যে একটা আদিম সরলতা লক্ষ্য করা যাইবে। তাই ইহাতে প্রচুর অনৈসর্গিক ব্যাপার অক্লেশে স্থান লাভ করে।[১৭]

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু যেমন একটা দেশ ও সমাজকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে, তেমনি ইহার সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে একটি চরিত্র,—তাহাকে নায়ক চরিত্র বলা হয়। এই নায়ক চরিত্র কাব্যের কেবল একটি চরিত্র রূপেই বর্ণিত হয় না, সমগ্র জাতির মানসসম্ভূত জীবন ও সাধনার মূর্ত বিগ্রহরূপেই আবির্ভূত হয়। তাই নায়কের সাফল্য বা জয়লাভই মহাকাব্যের মূল বক্তব্য। এ্যাকিলিস, ইনিয়াস, বিওউল্‌ফ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির—ইহাদের জয় বর্ণনাতেই কাব্যের সার্থকতা। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নায়কের মৃত্যুও বর্ণিত হইতে পারে। যেমন প্রাচীন জার্মান মহাকাব্য *Nibelungenlied*; ইহার নায়ক নাইবেলুন্‌জেন্‌ মহাকাব্যের প্রথমার্ধে নিহত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহার পত্নী ক্রিম্‌হিল্ড স্বামী-হন্তারকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইয়াছেন। যাহা হউক, নায়কের জয়েই মহাকাব্যের সিদ্ধি; নায়ক যেখানে জাতীয় জীবনের প্রতিভূ, সেখানে এরূপ না হইয়াই পারে না, এবং সেই জন্য অধিকাংশ মহাকাব্যের নায়ক বীর যোদ্ধা। প্রচণ্ড কর্মৈষণা, এবং ঘটনাবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্যে সুদৃঢ় থাকিয়া সুকঠিন বীর্যের দ্বারা সুমহৎ কল্যাণ লাভই নায়ক চরিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

টাসোর মতে মহাকাব্যের নায়ক "should be perfectly virtuous"—মহাকাব্যের চরিত্র হইবে অপাপবিদ্ধ। কিন্তু ড্রাইডেনের মতে, "it is not necessary that the manners of the hero should be immaculate." মহাকাব্যের নায়ক যে পবিত্র চরিত্র হইবে, এমন কোন কথা নাই। ড্রাইডেনের অনুমানই ঠিক। মহাকাব্যের নায়ক আদর্শলোকের জ্যোতির্ময় বিগ্রহ নহে; আকারে-প্রকারে সে চরিত্র সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বৃহৎ হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সর্বোপরি মানবিক গুণান্বিত হইতে হইবে। রামচন্দ্র, অর্জুন-যুধিষ্ঠির, অ্যাকিলিস-হেকটর—ইহারা আদর্শলোকে উপনীত হইলেও মানবগুণ বর্জিত নহেন; বরং মানবগুণই ইহাদিগকে, জগৎ ও জীবনধারার নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও, মানুষের নিকট-আত্মীয়ে পরিণত করিয়াছে।[১৮] ইনিয়াসের চরিত্রে এই মানবগুণ অপেক্ষা সাত্ত্বিকগুণ অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে রামচন্দ্র যখন বীরনায়কের পদ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর অবতারে পরিণত হইলেন, তখন তাঁহারও মানবধর্ম বহুলাংশে হ্রাস পাইল এবং রামায়ণ মহাকাব্য হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে রূপান্তরিত হইল। সে যাহা হউক, বিশুদ্ধ ট্র্যাজিক চরিত্রের মতো মহাকব্যের সমস্ত চরিত্রই "above common level"

১৭ ড্রাইডেন মহাকাব্যে অলৌকিক ব্যাপারের বিশেষ সমর্থন করিতেন:
"An heroic poet is not tied to a bare representation of what is true or exceeding probable; but that he may let himself loose to visionary objects, and to the representation of such things as depending not on sense, and therefore not to be comprehended by knowledge may give him a free scope for imagination." (*Of Heroic Plays*)

১৮ প্রথমে রামচন্দ্র 'heroic poem'র পার্থিব নায়ক ছিলেন। পরে তিনি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দেবলোকে উন্নীত হইলেন। কি করিয়া তিনি মর্ত্যসীমা ছাড়াইয়া স্বর্গীয় হইয়া উঠিলেন, সে বিষয়ে এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র (১ম) ৪৭৭-৪৮০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

হওয়া প্রয়োজন; এমন কি নায়কের প্রতিবাদী খল, দানব, শত্রুর চরিত্রও বড় আকারে অঙ্কিত হওয়া চাই। রামায়ণের রাবণ, মহাভারতের দুর্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রগণ, 'বিওউল্‌ফে'র গ্রেণ্ডেল, *Nibelungenlied*-এর ক্রিমহিল্ড প্রভৃতি চরিত্র তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত।[১৯] মানবধর্মের সঙ্গে অসাধারণ গুণ মিশিয়া গিয়া মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে দেশকালের অধীন করিয়াও তাহা হইতে মুক্তি দিয়া থাকে। তাই অতীতের সহিত ভবিষ্যতের রাখীবন্ধন সম্ভব হয়।[২০]

মহাকাব্যের রচনারীতি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। রচনারীতির গুণেই মহাকাব্য মহাকাব্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। যাহাকে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য (Epic grandeur) বলে, অর্থাৎ ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও চিত্রকল্প প্রয়োগের দ্বারা একটা বৃহৎ মনোভাব ও বিস্ময়রস সৃষ্টির দুরূহ শিল্পসাধনা—তাহা না থাকিলে বিষয়বস্তু ও চরিত্র যতই মহৎ হোক না কেন, মহাকাব্যের বিশালতা সৃষ্টি করিতে পারে না। মহাকাব্যের ভাষার মধ্যে অতিশয় সরলতার সঙ্গে কখনও কখনও আভিধানিক দুরূহতা, ও অপ্রচলিত প্রাচীনতার চিহ্ন থাকে। মহাকাব্যের বিষয়টি সাধারণ জীবন অপেক্ষা দূরতর, উচ্চতর ব্যাপার—এই বিশেষ পটভূমিকা সৃষ্টির জন্য ভাষার মধ্যে কিছু কিছু কঠিনতা আপনা আপনি আসিয়া যায়। ঘটনাকে একটা প্রাচীন ও পৌরাণিক পরিমণ্ডল দিবার জন্য মহাকবিগণ ইচ্ছা করিয়াই প্রচলিত প্রাচীন ভাষার সাহায্য লইতেন। উপরন্তু ভাষার শব্দঝঙ্কার ও ছন্দপ্রকরণের মধ্যে একদিকে যেমন ক্লাসিক সংযম থাকিবে, তেমনি আবার অপরদিকে লোকজীবনের অনুরূপ বাচনভঙ্গী থাকাও বিচিত্র নহে। মিলটন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে মহাকাব্য রচনা করিবার পর সেই আদর্শই পরবর্তী কালে গৃহীত হইয়াছে। পূর্বতন মহাকবিরা ভাষা ও ছন্দের মধ্যেও সেই গাম্ভীর্য রক্ষা করিতেন। তবে আর্ষ-মহাকাব্য বা মৌলিক মহাকাব্যের ভাষা ও ছন্দের মধ্যে অত্যন্ত বাঁধাবাঁধি নিয়মের সঙ্গে কিছু কিছু শিথিলতাও ছিল, কারণ ঐ যুগের মহাকাব্য লোকমানসের অধিকতর নিকটবর্তী হইত। কিন্তু পরে আলঙ্কারিক মহাকাব্য সারস্বত সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ভাষাভঙ্গিমা ও ছন্দপ্রকরণের মধ্যে সুকঠোর নিয়মানুগত্য ও ক্লাসিক সংযম অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে, যাহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যঙ্গ-মহাকাব্যের (Mock Heroic Epic) সৃষ্টি হইয়াছিল। মৌলিক ও আলঙ্কারিক মহাকাব্যের চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের মধ্যে উপমা অলঙ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাকাব্যের উপমার মধ্যে দীর্ঘবিস্তারী আদি-অন্ত বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ চিত্র থাকে। লীরিক কবিতার উপমার সঙ্গে ইহার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। গীতিকাব্যের উপমা কবিমানসের অন্তর্লোক হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ইহাতে খুঁটিনাটি চিত্রকল্প অনুসৃত হয় না; ব্যঞ্জনা, আভাস বা দুটি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পূর্ণ চিত্রের ছায়ামূর্তি সৃষ্টি গীতিকাব্যের অলঙ্করণের বৈশিষ্ট্য।

১৯ দণ্ডী 'কাব্যাদর্শে' প্রতিনায়ক চরিত্রের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

বংশবীর্যশ্রুতাদীনি বর্ণয়িত্বা রিপোরপি।

তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষকথনং চ ধিনোতি নঃ॥ (প্রথম পরিঃ, ২২ শ্লোক) (অনুঃ—কবি প্রতিনায়কের বংশবীর্য ও বিদ্যাবল প্রথমে ব্যাখ্যা করেন। তাহার পরে প্রতিনায়কের পরাজয় ঘটাইয়া নায়কের মহোৎকর্ষ ফুটাইয়া তোলেন।

২০ "The structure of epic is often like a great arch through which on one side the past may be seen on the other the future."—Cassell's *Encyclopaedia of Literature*, Vol. I

মহাকাব্যের বস্তুগত অলঙ্করণের জন্য উপমা ও অন্যান্য আলঙ্কারিক চিত্রকল্পগুলিকে পুরা আকারে অঙ্কিত করিতে হয়। শুধু একটা উপমাতেও হয়তো সব চিত্রটি ফুটাইয়া তোলা যায় না, তখন মালোপমায় মালা গাঁথিয়া নানা দিক দিয়া ছবিটিকে পূর্ণরূপ দেওয়া হয়। এই কৌশলটি প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক মহাকাব্যে অনুসৃত হইয়াছে। অবশ্য রোমান্টিক ধরনের মহাকাব্যে (স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুইন' এবং কীট্সের 'হাইপেরিয়ান') রোমান্টিক চিত্রকল্প অধিকতর অনুসৃত হইয়াছে। যে যাহা হউক, মহাকাব্য বলিতে পাঠকের মনে যে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয়, ইহার রচনাভঙ্গীর বিশিষ্টতাই তাহার জন্য প্রত্যক্ষতঃ দায়ী।

মহাকাব্যের সর্বশেষ লক্ষণটি ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ—ইহার বিশালতা, জীবন সম্বন্ধে বিরাট তাৎপর্য, যাহাকে 'মহাকাব্যের আত্মা' বলে,—ইহা মহাকাব্য-পাঠকের একমাত্র ফলশ্রুতি, মহাকবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্য, তা সে পুরাতন ব্রিটেনের অর্ধবর্বর মানব-দানবের ভয়াবহ যুদ্ধই হোক, আর হেলেনীয় বিশ্বের জাতীয় গৌরবজ্ঞাপক ট্রয়-যুদ্ধই হোক, অথবা রামায়ণ-মহাভারতের "যতোধর্মস্ততোজয়ঃ"-ই হোক—প্রত্যেক মহাকাব্যের মধ্যেই মানবজীবন সম্বন্ধে একটা বিশালতা থাকে। সমাজ ও জীবনের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও কয়েকখানি মহাকাব্য যে এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহার কারণ কি? কাহিনীর বৈচিত্র্য, না চরিত্রের মহত্ব? এই সমস্তকে এক সঙ্গে লইয়া মহাকাব্যের একটি সামগ্রিক অনুভূতি বা আবেদন আছে। মানুষের মহত্ত্ব, বীরত্বের সুকঠোর আদর্শ, দেশ ও সমাজের জন্য চূড়ান্ত দুঃখবরণ, পুরুষের সুমহৎ কীর্তি, রমণীর পাতিব্রত্য ও গৃহসংসার নিষ্ঠা, নীচাশয় খল ব্যক্তির ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপ —সমস্ত কিছুকে সঙ্গে লইয়া মহাকাব্যের দিগ্‌দিগন্তে অভিযান; এই সমস্ত সমবাদী ও বিষমবাদী জীবনযাত্রার মধ্যে মানবসংসারের এমন একটা রূপ বিকশিত হইয়াছে, যাহার ভূগোল নাই, ইতিহাস নাই। সেই বৃহৎ জীবনের বিশাল গভীর সুরটি কালান্তরের মানুষের কানে যুগান্তরের বার্তা পৌছাইয়া দেয়। যে-কোন যথার্থ মহাকাব্য—তা' সে আদিম মহাকাব্যই (Primitive Epic) হোক, আর অলঙ্কৃত মহাকাব্যই (Ornate Poetry) হোক, প্রত্যেকটির মধ্যে সেই বিশাল অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করা যায়। নাটক, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য ও কথাসাহিত্যের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও এই বিশালতাবোধ এখনও মহাকাব্য ভিন্ন সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে এরূপ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।

প্রাচ্যমতে মহাকাব্য—আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাচ্য আদর্শ বলিতে সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শকেই গ্রহণ করিতেছি। প্রাচ্যের সাহিত্যের মধ্যে চৈনিক সাহিত্য সুপ্রাচীন। তাং বংশের (৬০০-৯০৭ খ্রীঃ অঃ) শাসনকালে চীন সাহিত্য সর্বপ্রথম উৎকর্ষ লাভ করে; অবশ্য ইহার বহু পূর্ব হইতে (১২শ খ্রীঃ পূঃ) চৈনিক সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। হান বংশের বিরাট ইতিহাস রচনা খ্রীস্ট পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ হইলেও মহাচীনে মহাকাব্যের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। ছোট ছোট গীতিকবিতাই চৈনিক সাহিত্যের সম্পদ্।

প্রাচীন ইরাণী সাহিত্যের ('জেন্দাবেস্তা' ভিন্ন) বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পহ্লবী সাহিত্যে 'য়াৎকার-ই-জারিয়ানা' (৬০০ অব্দ) এবং 'কারনামাক্-ই-আর্তখসির' (৬০০ অব্দ) নামক আখ্যানে বীররসের বর্ণনা থাকিলেও মহাকাব্যের কোন লক্ষণ নাই। ইরাণে আরব

মুসলমানের প্রভাবের পর ফারসী ভাষায় মহাকবি ফের্দৌসী (আনুমানিক ৯৪০-১০২০ খ্রীঃ অব্দঃ) 'শাহ্‌নামা' নামক মহাকাব্যে পারস্য রাজাদের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করেন ; সোহ্‌রাব-রুস্তমের গল্প ইহার অন্তর্গত। এই মহাকাব্য একাধারে কাব্য ও ইতিহাস। ফের্দৌসীর যশে ফারসী সাহিত্য এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, এই ভাষায় আর কেহ সাহসের সঙ্গে মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হন নাই। ১৬শ শতাব্দীর আর একজন কবি জামের হাতিফি (Hatifi of Jam) মহাকাব্য লিখিয়া কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ফারসী ভাষায় মহাকাব্য রচনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই সংস্কৃত সাহিতে মহাকাব্য রচনার পালা শেষ হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃতে মহাকাব্য যেমন বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে, তেমনি মহাকাব্য বিষয়ক আলোচনাও কাব্যরসিকের বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে সাহায্য করিয়াছে। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য আমরা প্রধানতঃ দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে'র সাহায্য লইতেছি।

দণ্ডীর (৯ম শতাব্দীর পূর্বে) 'কাব্যাদর্শ' অনুসারে মহাকাব্যের লক্ষণ[২১]—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্ ।
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশো বাপি তন্মুখম্ ॥১৪
ইতিহাস কথাভুতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্ ।
চতুর্বর্গ ফলায়ত্তং চতুরোদাত্ত নায়কম্ ॥১৫
নগরার্ণবশৈলর্তুচন্দ্রার্কোদয় বর্ণনৈঃ ।
উদ্যানসলিলক্রীড়া মধুপানরতোৎসবৈঃ ॥১৬
বিপ্রলম্ভৈর্বিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণ নৈঃ ।
মন্ত্রদূত প্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি ॥১৭
অলঙ্কৃতসংক্ষিপ্তং রসভাব নিরন্তরম্ ।
সর্গৈরনতিবিস্তীর্ণৈঃ শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ ॥১৮
সর্বত্র ভিন্ন বৃত্তান্তৈরুপেতং লোকরঞ্জনম্ ।
কাব্য কল্পান্তরস্থায়ী জায়তে সদলঙ্কৃতি ॥১৯

বংশবীর্য শ্রুতাদীনি বর্ণয়িত্বা রিপোরপি ।
তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষ কথনং চ ধিনোতি নঃ ॥২২

(কাব্যাদর্শ, প্রথম পরিচ্ছেদ)

২১ ১৮শ শ্লোকের 'সর্গৈরনতিস্তীর্ণৈঃ'-এর টীকা--"অষ্টানূনত্রিংশদনধিকত্বং সূচিতং ভবতি। তদুক্তমীশান-সংহিতায়াম্—অষ্টসর্গান্নতুন্যূনং ত্রিংশৎসর্গাচ্চ নাধিকম্। মহাকাব্য প্রযোক্তব্যং মহাপুরুষ কীর্ত্তিযুক্। ইতি"

অর্থাৎ আট সর্গের কম নয়, ত্রিশ সর্গের বেশি নয়। 'ঈশানসংহিতায় বলা হইয়াছে, যে আট সর্গের কম চলিবে না, ত্রিশ সর্গের বেশিও চলিবে না।

অনুবাদ :

'সর্গবন্ধ মহাকাব্য', বলিতেছি তাহার লক্ষণ ;
আশীর্বাদ, নমস্কার, নায়কাদি বস্তু উল্লিখন,—
এ তিনের অন্যতম সর্গবন্ধে প্রারম্ভিক বাণী ;
ইতিহাস উপজীব্য, কিংবা অন্য মহৎ-কাহিনী।
চতুর্বর্গ ফলবান্ মহাবৃক্ষ 'সর্গবন্ধ' নাম,
উদাত্ত ধীমান ধীর এই কাব্যে নায়ক প্রধান।
কবির লেখনী মুখে ফুটে মহাকাব্য দেহময়,
নগর, পর্বত কত, কত চন্দ্রসূর্যের উদয়।
ফোটে নানা বর্ণে পূর্ণ ছয় ঋতু, ভীম মহার্ণব,
উদ্যান-সলিল-ক্রীড়া, মধুপান, সুরত-উৎসব,
দূতযাত্রা, কূটনীতি মন্ত্রণা ও সংগ্রাম ভীষণ,
পুত্রজন্মোৎসব, বিপ্রলম্ভ, কত বিবাহ মিলন।
ঘটনাপ্রবাহ বহে, নায়কের অভ্যুদয় ঘিরে,
বহু স্কন্ধ সর্গবন্ধ পল্লবিয়া বেড়ে ওঠে ধীরে।
নিরন্তর নানাভাবে নানা রসে ঘাতপ্রতিঘাত,
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছন্দেতে ঝঙ্কৃত পদপাত।
অনতিবিস্তীর্ণ তার এক সর্গ শেষ হয়ে আসে,
ইঙ্গিতে শ্রোতার কর্ণে ভাবী কাহিনীর সুর ভাসে।
সর্গান্তে ছন্দের লয় শ্লথ হয় বিরামের তালে,
তারি মাঝে কাহিনীর স্রোত বহে নূতন কল্লোলে।
লোকচিত্ত রঞ্জে নিত্য এই সর্গবন্ধ কাব্যগতি,
কল্পান্তজীবী সে ধরি চিত্তচমৎকারী-অলঙ্কৃতি।[২২]

'সাহিত্যদর্পণ'-ধৃত মহাকাব্যের লক্ষণ—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়োবাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গীরস ইষ্যতে ॥
অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্ ॥

২২ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী মহাশয় কৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব ব॥
কচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্তনম্।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে।
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ॥
সন্ধ্যা-সূর্যেন্দু-রজনী-প্রদোষ-ধ্বান্ত-বাসরাঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-মৃগয়া-শৈলর্তু-বনসাগরাঃ॥
রণপ্রয়াণোপযম মন্ত্র পুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ॥
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যোত্তরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়-কথয়া সর্গনাম তু॥

(ভাবার্থ: সর্গবন্ধে রচিত কাব্যের নাম মহাকাব্য। একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বা অনুরূপ কোন বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণান্বিত ব্যক্তি ইহার নায়ক। যদি একাধিক ব্যক্তি নায়ক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে একই ক্ষত্রিয় বংশজাত হইতে হইবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত—এই তিনের যে-কোন একটি 'অঙ্গিরস' হইবে। ইহার সর্বাঙ্গে রস থাকিবে এবং নাটকবন্ধও ('পঞ্চসন্ধি') থাকিবে। (কোন কোন মতে করুণরসও অঙ্গিরস হইতে পারে।) উপাখ্যানটি হইবে ঐতিহাসিক অথবা সজ্জনাশ্রয়ী। মহাকাব্যে চতুর্বর্গের বর্ণনা থাকিবে; এই চারি বর্গের মধ্যে একটি বর্গ মুখ্য ফল হিসাবে বর্ণিত হইবে।

প্রথমে নমস্ক্রিয়া, আশীর্বাদ অথবা বস্তুনির্দেশ; কখনও খল চরিত্রের নিন্দা, সতের গুণকীর্তন থাকিবে। ইহাতে একই প্রকার ছন্দ থাকিবে, সর্গের শেষে অন্য ছন্দ থাকিতে পারে। প্রতিসর্গে অন্ততঃ পঁচিশটি শ্লোক থাকিবে, কিন্তু কোন সর্গেই তিনশত শ্লোকের অধিক থাকিতে পারিবে না। আটটির অধিক সর্গ থাকা আবশ্যক। (কাহারও মতে, ত্রিশের অধিক সর্গ থাকিবে না।) কোন কোন কাব্যে একটি সর্গ নানাবৃত্তময় অর্থাৎ নানা ছন্দোযুক্ত হইতে পারে (যথা—কিরাতার্জুনীয়ম্-এর ৫ম সর্গ; শিশুপালবধের ৪র্থ সর্গ)। সর্গান্তে ভাবী সর্গের আভাস থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্যচন্দ্র, রজনীপ্রদোষ, অন্ধকার, দিবা, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, স্বর্গ পুরী ও পথ, রণযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, পুত্রজন্ম এবং সাঙ্গোপাঙ্গের (অর্থাৎ মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি) বর্ণনা থাকিবে। কবি বা আখ্যান বা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হইবে, বা সর্গের মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের অনুসারেও কাব্যের নামকরণ হইতে পারে।)

এই আলোচনা হইতে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের বহিরঙ্গগত কলাকৌশল লইয়া অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কয়টি শ্লোক, কত সর্গ, কি কি

অঙ্গিরস, নায়ক চরিত্র, প্রতিনায়ক চরিত্র, নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি বর্ণনা—আলঙ্কারিকগণ এই সব ব্যাপারের নিপুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাকাব্যের আখ্যানগত ঐক্য, নাটকীয়তা, উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের সমন্বয়, নায়কচরিত্রের, ক্রিয়াকর্ম, আদর্শ-উদ্দেশ্য এবং রচনারীতি সম্বন্ধে কোন মৌলিক চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যাইতেছে না। অঙ্গিরস বলিতে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শৃঙ্গাররসকে অঙ্গিরস করিলে মহাকাব্যোচিত বিশালতা সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা আমাদের আলঙ্কারিকগণ বুঝিতেন না। অবশ্য ভারতের মহাকাব্য পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মতো শুধু বীররসের কাহিনী নহে। করুণরসার্দ্র রামায়ণ এবং শান্তরসের মহাভারত যে মহাকাব্য হইয়াছে, তাহার কারণ ইহার সহিত বিশাল জীবনবোধ ও বীররস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। আলঙ্কারিকগণ ছন্দ, সর্গসংখ্যা, শ্লোকের পরিমাণ, বর্ণনার ধারা, নায়ক চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য, ধর্মার্থকামমোক্ষ ফললাভ —প্রভৃতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের আলোচনা হইতে মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করা যায় না। একমাত্র দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' ধৃত শ্লোকে মহাকাব্যের বৃহৎ স্বরূপ খানিকটা ধরা পড়িয়াছে। প্রতিনায়কের প্রতি তিনি যে অবিচার করেন নাই, ইহাতে তাঁহার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়।[২৩] আলঙ্কারিকদের আবির্ভাবের পূর্বে রামায়ণ-মহাভারত রচিত হইয়াছিল; আলঙ্কারিক আদর্শ সূক্ষ্মভাবে অনুসৃত হইলে এই দুই অমর মহাকাব্য কতদূর অমরত্ব লাভ করিতে পারিত, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে। যাহা হউক কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ-ভারবি পর্যন্ত—সমস্ত মহাকবি আলঙ্কারিকদের সূত্রানুসারে ধীরোদাত্ত বীরপুরুষ অথবা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়ের কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে "উদ্যানসলিলক্রীড়া মধুপান রতোৎসব" এবং "সন্ধ্যা-সূর্যেন্দুরজনীপ্রদোষ-ধ্বান্ত-বাসর-প্রাতর্মধ্যাহ্ন-মৃগয়া" প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা "নায়কোভ্যুদয়" বর্ণনা করিয়া নিজেরাও চতুর্বর্গ ফললাভ করিয়াছেন এবং পাঠক-শ্রোতাকেও সে পুণ্যের অংশভাগী করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধু-হেম-নবীন—যাঁহারা মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আঙ্গিকের দিক দিয়া প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই আমরা নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী কাব্য'কে বিচার করিতে হইলে মূলতঃ পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শই অনুসরণ করিব।

নবীনচন্দ্র ও মহাকাব্য

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ জীবনবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল। যদিও তখন ইংলণ্ডে গীতিকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগ চলিতেছিল, তথাপি রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচিত মহাকাব্যগুলি তদানীন্তন বাঙলাদেশে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য এই কবিদের অন্তর্লোকে গীতিকাব্যের প্রচ্ছন্ন ধারা বহমান ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবন, ইতিহাস, দর্শন ও নীতিবোধ বাঙালীর মধ্যযুগীয় নিদ্রালস

---

২৩ ইতিপূর্বে দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' হইতে যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২২ সংখ্যক শ্লোকটি দ্রষ্টব্য।

জড়চিত্তে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিবার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্বোধন করিয়াছিল। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, বাঙ্‌লাদেশে মহাকাব্যের প্রবল আত্মবিস্তারের যুগেও গীতিকাব্যের ধারা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

আমাদের দেশে আলঙ্কারিক বাংলা মহাকাব্যের যথার্থ আরম্ভ মাইকেল মধুসূদন হইতে। মহাকাব্যের আসরে তাঁহার আবির্ভাবের কিছু পূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বীররস ও ইতিহাসকে মিশ্রিত করিয়া পুরাতন ছন্দে ১৮৫৮ খ্রী: অব্দে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশ করেন। ইহার পরেও তিনি অনুরূপ আদর্শ অনুসরণ করিয়া ১৮৬৮ খ্রী: অব্দে 'শূরসুন্দরী' এবং ১৮৭৯ খ্রী: অব্দে 'কাঞ্চীকাবেরী' রচনা করেন। মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' (১৮৬০) এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) প্রকাশিত হইলে আলঙ্কারিক মহাকাব্যের যথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল। রঙ্গলাল ইংরেজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন; তিনি বাংলা কাব্যে যুগান্তর সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হইলেও তাঁহার মহাকবির বিরাট চেতনা কিছুমাত্র ছিল না। মধুসূদন আধুনিক কাব্যে মহাকবি রূপে খ্যাতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্য রচনার ধুম পড়িয়া গেল। হেমচন্দ্রও মধুসূদনকে সাক্ষাৎভাবে অনুসরণ করিয়া ১৮৭৫ খ্রী: অব্দে 'বৃত্রসংহার'-এর প্রথম খণ্ড এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। মধুসূদনের মতো তিনিও মুখ্যত: পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।[২৪] হেমচন্দ্র অত:পর দ্বিতীয় কোন মহাকাব্য রচনা করেন নাই। নবীনচন্দ্রও ইহার দশ বৎসর পরে ১৮৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 'রৈবতক' প্রকাশ করেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্রের পর আর কোন প্রতিষ্ঠাবান ও শক্তিশালী কবি মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।

রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে বলিয়াছেন,—

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন্ তোমার কাঁকন—
কিঙ্কিণিতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি'
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে মহাকাব্যের প্রতি লোভ থাক আর নাই থাক, রবীন্দ্রপ্রতিভা গীতি-কবিতার মধ্যে স্বাভাবিক মুক্তি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, ১৮৬০ খ্রী: অব্দ

২৪ তাঁহার উক্তি স্মরণীয়, "বাল্যাবধি আমি ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি। পুস্তকের (অর্থাৎ বৃত্রসংহার) অনেক স্থলে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।"—'বৃত্রসংহার'-এর বিজ্ঞাপন।

হইতে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ—মোট ছত্রিশ বৎসর বাংলা সাহিত্যে কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ এবং এই যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলিতে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকজন গৌণ মহাকাব্যের কবির[২৫] নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

দ্বারকানাথ রায়—সীতাহরণ (১৮৫৭), হরিশ্চন্দ্র মিত্র—নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১), কীচকবধ (১৮৭২), বনোয়ারীলাল রায়—জয়াবতী (১৮৬৫), দীননাথ ধর—কংসবিনাশ (১৮৬১), মহেশচন্দ্র শর্মা—নিবাতকবচ বধ (১৮৬৯), ভুবনমোহন রায়চৌধুরী—পাণ্ডব চরিত (১৮৭৭), বলদেব পালিত—ভর্তৃহরি কাব্য (১৮৭২), কর্ণার্জুন কাব্য (১৮৭০), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—শক্তিসম্ভব কাব্য, জগদ্বন্ধু ভদ্র—তপতী উদ্ধার, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্বর বিজয় (১৮৬৯), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দানবদলন কাব্য (১৮৭৩), গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী—ভার্গববিজয় (১৮৭৭)।

উল্লিখিত কবিদের অধিকাংশেরই না ছিল কবিত্বশক্তি, আর না ছিল মহাকাব্য সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা। কাজেই এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা পরবর্তী কালে পাঠক সমাজে আসিয়া পৌঁছায় নাই। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কেহ কেহ মহাকাব্য রচনার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরগোবিন্দ চৌধুরীর 'দশানন বধ' (১৯০৩—৪), শশধর রায়ের 'রাঘববিজয়' (১৯০৩—৪), বিশেষতঃ যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বীরাজ' (বাংলা ১৩২২ সন) ও 'শিবাজী' (১৩২৫ সন) মহাকাব্য দুইটি প্রাচীনপন্থী পাঠকসমাজে যৎসামান্য প্রচলিত ছিল।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য প্রসঙ্গে কোন এক সমালোচক বলিয়াছেন : "উপযুক্ত সময়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার উদয় না হইলে ক্লাসিক কাব্যের অনুকরণের ঘনান্ধকারে রোমান্টিক কাব্যের একতারকা কবে লুপ্ত হইয়া যাইত।" একথা কিন্তু ঠিক নহে। কৃত্রিম মহাকাব্যের ধারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুষ্ক হইয়া না গেলেও, মধু-হেম-নবীনের পর যাঁহারা মহাকাব্যে আসর জমাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কিছুমাত্র কবিপ্রতিভা ছিল না। সুতরাং গীতিকাব্যের আবির্ভাবের বিলম্ব হইলেও এই সমস্ত তথাকথিত মহাকাব্যের স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটিত। কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে, ত্রয়ী মহাকবির প্রবল প্রভাবের যুগেও গীতিকাব্য তলে তলে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনজন মহাকবির মধ্যেই গীতি-কবিতা ও গীতিমনোভাবের প্রচুর প্রভাব ছিল; নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র গীতিকবিতায় সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করিতে পারিলে মহাকাব্য রচনার পণ্ডশ্রম হইতে রক্ষা পাইতেন। মধুসূদনও মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "Probably I have got a tendency in the lyrical." হেম-নবীনের প্রথম আবির্ভাব মহাকাব্যের বিশাল প্রাঙ্গণে হয় নাই, খণ্ড কবিতার ব্যক্তিনিষ্ঠ বৃত্তেই তাঁহাদের প্রথম পরিক্রমা। বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক' ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়; ইহার কয়েক মাস পূর্বে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছিল (১ম খণ্ড—জানুয়ারী ১৮৬১, ২য় খণ্ড—১৮৬১ সালের মধ্যভাগ); বিহারীলালের 'বঙ্গ সুন্দরী' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালের প্রথম

২৫ ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) হইতে সঙ্কলিত তালিকা।

দিকে ; ইহার চার বৎসর পূর্বে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) মুদ্রিত হইয়াছিল। বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০) ও 'প্রেম-প্রবাহিণী' (১৮৭০) যখন প্রকাশিত হয়, তখনও হেম-নবীনের মহাকাব্য রচিত হয় নাই। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ১৮৭৫ সালে এবং নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা কাব্য' ১৮৮০-৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়; বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র মুদ্রণের তারিখ—১৮৭৯। অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রথম গীতিকবিতা 'রজনীর মৃত্যু' ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'প্রদীপ' (১৮৮৪) 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) এবং 'ভুল' (১৮৮৭) নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের যুগে প্রকাশিত হয়। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রসূন' (১৮৭০), 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮) এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ফুলবালা' (১৮৮০), 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১) প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হইবার সময় হেম-নবীনের মহাকাব্য জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত থাকিলেও গীতিশাখার প্রাধান্যও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ('ভারতী'তে বাংলা ১২৮৮ সনে প্রথম প্রকাশিত) ও 'প্রভাত সঙ্গীতে'র (১৮৮৩) পূর্বেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিগণের কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হইলে বাঙ্‌লাদেশ ব্যর্থ মহাকাব্য লইয়া মত্ত থাকিত, একথা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের ধারা প্রায় পাশাপাশি চলিয়াছিল, এবং মধু-হেম-নবীনকে বাদ দিলে তথাকথিত 'মহাকবি'দের অকিঞ্চিৎকর রচনা অপেক্ষা বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেনের গীতিকবিতাগুলি অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইবার নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য তিনটির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া দেখা যাক যে, ইহাদিগকে সামগ্রিক ভাবে ধরিয়া কী পরিমাণে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া যায়। নবীনচন্দ্র একটা মহৎ ভাবের বশে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন—নিছক শিল্পসৃষ্টি বা সারস্বত এষণার বশে নহে। শ্রীকৃষ্ণজীবনের মহিমা দর্শনে তিনি এমনই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, মহাকাব্যের আধারে সেই মহাজীবনকথাকে অঙ্কিত করিতে প্রস্তুত হইলেন। বন্ধুজনে সংশয় প্রকাশ করিল, শুভানুধ্যায়ীরা নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। প্রাচীন-যুগের মহাকবিদের অন্তরেও এমনি একটা দিব্যভাবের আবির্ভাব হইত; তখন তাঁহারা স্বর্গ-মর্ত্যবিথারী বিশাল কাহিনী অবলম্বনে সেই অশান্ত বাসনাবেদনা প্রকাশের পথ করিয়া লইতেন। নবীনচন্দ্রের মধ্যেও অনুরূপ একটা বিশাল ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মহাভারত-ভাগবতাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, কৃষ্ণচরিত্রের বিরাট স্বরূপ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণে যথাযথ ভাবে চিত্রিত হইতে পারে নাই। তিনি সেই দুরূহ সাধনায় ব্রতী হইলেন এবং দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরের অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা তিনখানি কাব্য রচনা করিলেন, যাহা পৃথগ্‌ভাবে বিচার করিলে আখ্যান কাব্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাহাকে মহাকাব্য বলিতে হইবে। অন্ততঃ কবি তাই মনে করিতেন, এখনও অনেক পাঠকের তাহাই ধারণা।

তাঁহার অবলম্বিত বিষয়বস্তু যে মহাকাব্যের অনুকূল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক কৃষ্ণের বিশাল-বিচিত্র জীবন, ভারতযুদ্ধ, যদুবংশধ্বংস প্রভৃতি যে কাব্যে চিত্রিত হয়, তাহার বিষয়বস্তুটি যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণের জীবনকথাকে নানাভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে; এই জীবনকথা পৌরাণিক হইলেও ইহার মধ্যে এমন সমস্ত ঘটনা ও গূঢ় তাৎপর্য রহিয়াছে যে, ইতিহাসের সঙ্গে ইহার যোগসূত্র আবিষ্কার এমন কোন দুরূহ ব্যাপার নহে। ভগবান কৃষ্ণ মানুষী দেহ ধারণ করিয়া ভারতের এক যুগসঙ্কটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের ত্রিবেণী ধারায় ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবন আমাদের কবিকে যে মুগ্ধ করিবে, এবং তিনি যে তদবলম্বনে মহাকাব্য রচনায় উন্মুখ হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর বিশালতা মহাকাব্যের সম্পূর্ণ অনুকূল; সেই দিক দিয়া নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের বস্তুনির্বাচন উপযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এই পর্যন্তই। ভাবমুগ্ধ চিত্তে অস্থির হইয়া নবীনচন্দ্র যখন কৃষ্ণজীবন অবলম্বনে মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে সমগ্র কাহিনী নির্বাচন ও পরিমার্জন করিতে হইয়াছিল। আলঙ্কারিক মহাকাব্যের প্রায় সমস্ত কাহিনীই মৌলিক মহাকাব্য হইতে গৃহীত হইয়া থাকে; তিনিও মহাভারত-ভাগবতাদি হইতে কৃষ্ণজীবনকাহিনীকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—তিনি তিনখানি কাব্যে কৃষ্ণলীলা-কথা বর্ণনা করিবেন। 'রৈবতকে' কৃষ্ণজীবনের আদিপর্ব, 'কুরুক্ষেত্রে' মধ্যপর্ব এবং 'প্রভাসে' অন্ত্যপর্ব চিত্রিত করিবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বশেই তিনি বিরাট সাহিত্যকর্মে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণজীবনের আদিপর্ব বলিতে সাধারণতঃ বৃন্দাবনপর্ব নির্দেশ করা হয়। কবি এই মহাকাব্যে বৃন্দাবনলীলা স্বীকার করিয়াছেন, কিয়দংশ বর্ণনাও করিয়াছেন (রৈবতক—সপ্তম সর্গ)। কৃষ্ণের মথুরা পরিত্যাগ এবং দ্বারকায় রাজধানী স্থাপনের পরবর্তী কাহিনী এই তিনখানি কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, প্রথম দুইখানি কাব্যে কৃষ্ণজীবন বিশেষ প্রাধান্য পায় নাই। 'রৈবতকে'র প্রধান ঘটনা অর্জুন-সুভদ্রার পরিণয়; কৃষ্ণ এখানে 'মহাভারত' গঠনের স্বপ্নে বিভোর, প্রায় নিষ্ক্রিয় আদর্শবাদী। 'কুরুক্ষেত্রে'র মূল ঘটনা অভিমন্যুর নিধন; কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার বাহুল্যে কাব্যের মূল বক্তব্য নষ্ট হইয়াছে। কেবল 'প্রভাসে'র কাহিনীতে কৃষ্ণের অন্ত্যলীলা প্রাধান্য পাইয়াছে। তিনখানি কাব্যের মধ্যে ঘটনাসূত্রগত সম্পর্ক থাকিলেও কাহিনীর ঐক্য, পারম্পর্য ও সংহতি নাই। কৃষ্ণলীলা যেখানে মুখ্য ব্যাপার, সেখানে অপ্রধান ঘটনা ও গৌণকাহিনীটির এতটা গুরুত্ব মহাকাব্যের কাহিনীকে শিথিল ও পরস্পর-সম্পর্কহীন করিয়া তুলিয়াছে। মহাকবিদের যেরূপ আত্মসংযম ও বাক্‌সংহৃতি প্রয়োজন, কবির আদৌ সেরূপ শক্তি ছিল না; তাঁহার মস্তিষ্কে যখন কোন একটা 'থিওরি' ভর করিত, তখন তিনি তাহাকে কাব্যে রূপ দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মহাকাব্যের রচনারীতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না, ফলে অধিকারও জন্মায় নাই। সেইজন্য কাহিনীগত ঐক্য প্রায়ই বিপর্যস্ত হইয়াছে। এই তিনখানি কাব্যে কৃষ্ণ নিষ্কামতত্ত্বের প্রতীক বলিয়া তাঁহার সংক্রান্ত ঘটনাও যথেষ্ট সক্রিয় নহে, ঐক্য-সংহতিরও বালাই নাই। আসল কথা, মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ গল্পরসের ঋজুতা, দৃঢ়পিনদ্ধ ঐক্য—একথাটা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি গুটিকয়েক অভিনব তত্ত্বকথা প্রকাশ করিবার জন্য মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার লড়াই, ক্ষত্রিয়দিগকে নিপাত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও অনার্যের সন্ধি ও ষড়যন্ত্র এবং কৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিকধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য হ্রাস করিবার জন্য প্রেমমূলক 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন—এই সামাজিক ও ঐতিহ্যগত তত্ত্বকথা প্রচার করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অবশ্য 'প্রভাসে' এই তত্ত্বের সঙ্গে কবির উচ্ছ্বসিত ভক্তিরসের অতিরেক উহারই মধ্যে একটু অপ্রাসঙ্গিক বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছে। যে যাহা হউক, এই তিনখানি মহাকাব্যের মূল কাহিনী প্রায়শই নিষ্ক্রিয়, বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। কবি মূল কাহিনীকে ঘটনা-সংবেগের মধ্যে ছাড়িয়া না দিয়া কৃষ্ণ ও ব্যাসের বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা কাহিনীর দুর্বলতা পোষাইয়া লইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আলঙ্কারিক মহাকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বস্তু হইলেও তাহাতেও আখ্যানের বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। ভার্জিল হইতে টমাস হার্ডি পর্যন্ত, আলঙ্কারিক মহাকাব্যের সমস্ত কবি নানারূপ শিল্পবৈচিত্র্যের দ্বারা কাব্যদেহ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কেহ-বা তত্ত্বকথা ও সমাজদর্শনের তাৎপর্যও মহাকাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু কাহিনীর দিকে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে দেখা গিয়াছে যে, যখন তাঁহার মনে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অভিনব আদর্শ আবির্ভূত হয়, তখন তিনি প্রত্যেককে সেই বিষয় লইয়া গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন; যখন কেহ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না, তখন স্বয়ং কবি মহাকাব্য লিখিয়া অন্তরের আবেগ প্রশমিত করিতে চাহিলেন। সুতরাং যেখানে মহাকাব্য রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য একটা বিশেষ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা, সেখানে মূল কাহিনীটির প্রতি কবির বিশেষ মমতা বা আকর্ষণ থাকা সম্ভব নহে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীতে মহাকাব্যোচিত বিশালতার অভাব আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ও দুর্নিবার গতি উপলব্ধি করা যায়, নবীনচন্দ্র তাহার কল্পনাও করিতে পারিতেন না। কবিবর বোধহয় নিজেকে হেমচন্দ্র অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অধিকারী মনে করিতেন। কবির আত্মজীবনীতে অগ্রজ কবি হেমচন্দ্রের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় নাই। কিন্তু 'বৃত্রসংহারে'র নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার যে কাহিনীগত বিশালতা আছে, নবীনচন্দ্র তাহার কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে পারিলেও তাঁহার কাব্য তিনখানি অন্ততঃ কাহিনীর দিক দিয়া সার্থক হইতে পারিত। তিনি দুর্বাসা, জরৎকারু, শৈলজা ও বাসুকির কল্পিত কাহিনীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়াছেন; এবং কেন দিয়াছেন, তাহার কারণও সহজে অনুমেয়। কবি যেন একটা তত্ত্বকথা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ এবং ব্রাহ্মণ-অনার্যের সংযোগ) প্রমাণের জন্যই এই বিরাট কাব্য রচনা করিতে বসিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন স্থানে রোমান্টিক আখ্যানের বৈচিত্র্য আছে; যেমন—জরৎকারুর ব্যর্থপ্রেমের দুঃখ, শৈলজার নিষ্কাম প্রেম, ইত্যাদি। কিন্তু মূল কাহিনী অর্থাৎ কৃষ্ণজীবনলীলা মহাকাব্যের নিকটেও পৌঁছাইতে পারে নাই, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। মহাকাব্যের বিশালতা সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক ধারণা ছিল না। তাই কৃষ্ণের অন্তঃপুরের সত্যভামা-রুক্মিণী-সুলোচনার হাস্যপরিহাস উনবিংশ শতাব্দীর জমিদার গৃহের অন্তঃপুরিকাদের অনুরূপ হইয়াছে। বহুস্থলে তিনি গম্ভীর ব্যাপারকে হাস্যকর করিয়া ফেলিয়াছেন; মহাকাব্যের

পটভূমিকায় 'দিদি', 'দাদা', 'বাবা', 'মামা' প্রভৃতি বাঙালীর ঘরোয়া সম্বোধন যে কিরূপ হাস্যকর তাহা কবি বুঝিতে পারেন নাই। ঠাট্টাতামাসা ও লঘুধরনের বর্ণনা কাব্যত্রয়কে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সে যুগের অনেক মনীষী ব্যক্তিও কাব্যের এই অসঙ্গতিগুলি ভাবিয়া দেখেন নাই। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত প্রাজ্ঞ দার্শনিকও কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের তো কথাই নাই। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :

"Babu Nabinchandra Sen's Raivataka is the epic of the Hindu religious revival. This huge epic, in twenty books, is marred by an aesthetic incongruity that is repulsive and fatal·········The simple truth is that ten of twenty books (Books VI, VIII, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII and we may add Books X and XX) must be lopped off, if the Raivataka is to take a place among the great epics."

—B. N. Seal—*New Essays in Criticism*

আমাদের ধারণা, এই তিনখানি কাব্যের দুইচারিটি সর্গ ছাঁটিয়া বাদ দিলেই যে ইহারা তদ্দণ্ডে মহাকাব্য হইয়া উঠিবে, তাহা মনে হয় না। অন্ততঃ কাব্য বিচারে *procrustean* নীতি খাটে না। সমস্ত কাহিনীটি ঢালিয়া সাজাইলে তবে ইহা মহাকাব্য হইতে পারিত।

চরিত্রের দিক দিয়া কবি খুব যে একটা 'কেরামত' দেখাইয়াছেন, তাহাও স্বীকার করা যায় না। মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় নিষ্ক্রিয়। তিনি শুধু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের 'রাজরাজেশ্বরী' মূর্তির স্বপ্ন দেখিতেছেন, ব্যাসের আশ্রমে গিয়া অদৃষ্টবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করিতেছেন, কখনও-বা সত্যভামা-সুলোচনার সঙ্গে রসিকতা করিতেছেন। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি শুধু ব্যাস-সুভদ্রার উক্তি ও আদর্শ হইতে। অভিমন্যু নিহত হইলে শোকসন্তপ্ত অর্জুনকে সান্ত্বনা দেওয়া ভিন্ন তাঁহার আর কোন ক্রিয়াকর্ম নাই। 'প্রভাসে' যখন যদুবংশের মধ্যে কলহ, চারিত্রদুষ্টি প্রভৃতি পাপাচার প্রবেশ করিল, তখনও তিনি নিষ্কাম উদাসীন—"আমি যাদবের নহি, জগতের স্বামী" বলিয়া নির্বাক নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই কৃষ্ণচরিত্রে মহাকাব্যোচিত ব্যাপ্তি, কর্মসংবেগ ও পৌরুষপ্রাধান্য নাই বলিলেই চলে। অন্যান্য চরিত্রে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু মহাকাব্যের গভীর গম্ভীর পটভূমিকায় তাহারা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাসুকি-দুর্বাসা, জরৎকারু-শৈলজা—যাহাদিগকে তিনি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা আখ্যানকাব্যের চরিত্র হইতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যে তাহারা অনাহূত আগন্তুক মাত্র ; সত্যভামা-সুলোচনার কথা না তোলাই ভাল। কোন এক সমালোচক কাব্যত্রয়ের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয়ী যেন চরিত্রের এক বিরাট চিত্রশালা।···সুভদ্রা, উত্তরা, সুলোচনা, শৈলজা—সকলেই যেন অমরীর শ্রীতে মহীয়সী।" হইতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কনে নবীনচন্দ্রের কিছুমাত্র দক্ষতা ছিল না। বড় আদর্শ, গালভরা নীতিতত্ত্ব উদ্ভট সমাজতাত্ত্বিক পরিকল্পনা, নারীধর্ম, নিষ্কাম প্রেম প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপার, তাহারই সঙ্গে সত্যভামার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মতো মান-অভিমান, রঙ্গব্যঙ্গ এবং পাণ্ডবশিবিরে সুলোচনা-বিরাটরাজের অনুচিত হাস্যপরিহাস এই কাব্যের

নারীচরিত্রগুলিকে বিষম অসঙ্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। দুর্বাসা চরিত্রকে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে 'ভিলেন' বা খল চরিত্ররূপে অঙ্কিত করিতে গিয়াছেন; হয়তো খানিকটা সফলও হইতেন। কিন্তু ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী দুর্বাসাকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সুভদ্রার হস্তসঞ্চালন কৌশলে (মেস্মরী বিদ্যাপ্রভাবে?) কৃষ্ণভক্ত হইতেই হইবে, ইহা অতিশয় অশ্রদ্ধেয়। মনে হইতেছে চরিত্রগুলি যেন মূল মহাকাব্য-পুরাণ ছাড়িয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যাশনাল থিয়েটারে পার্শ্বচরিত্রাভিনয়ের জন্য ভিড় করিয়াছে। কবি যাত্রাভিনয়ের প্রভাব যে কোন দিন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহা এই চরিত্রগুলি হইতেই বুঝা যাইতেছে।[২৬]

নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের রচনারীতিও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ভাষার সাত্ত্বিক গাম্ভীর্য, শব্দযোজনার নিপুণতা, ছন্দের মেঘমন্দ্রিত গর্জন ও সমুদ্রকল্লোল, চিত্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং আলঙ্কারিক ঐশ্বর্যে নবীনচন্দ্র অতিশয় দীন। স্বল্পবিত্ত লইয়া তিনি মহাকাব্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নাকি মধুসূদনকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুশিষ্যে এইরূপ বৈসাদৃশ্য কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যোচিত শব্দসম্ভার এবং বৃহৎ জীবনের ঝঙ্কারমুখর বাণী-নির্মিতি নবীনচন্দ্র যে শুধু অনুকরণ করিতে পারেন নাই, তাহা নহে,—সে বিষয়ে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না। তিনি ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য নানা ছন্দের সাহায্য লইয়াছিলেন, ফলে বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু মহাকাব্যের বিশালতা ও গাম্ভীর্য যে কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নাই, তাহা কবির অন্ধ ভক্তও স্বীকার করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্র) মতে 'প্যারাডাইজ লস্ট' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' এক ছন্দে রচিত বলিয়া কাব্য দুইটি একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এ সিদ্ধান্ত যে ঠিক নহে তাহা কাব্যরসজ্ঞ মাত্রেই বুঝিবেন। নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তটি মহানন্দে শিরোধার্য করিয়া কাব্যত্রয়ে নানা প্রকার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন; ফলে মহাকাব্যের রসনিষ্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক সময় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ও চরিত্র প্রভৃতিতে দুর্বলতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলেও শুধু রচনা-রীতির গুণে সে মহাকাব্য পাঠকের বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বক্তব্যবিষয় ও চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে একমত হউন আর নাই হউন, ইহার ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার প্রভৃতির বাহ্য সৌষ্ঠবে পাঠকের কান-মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিবেই। নবীনচন্দ্রের রচনারীতি অতিশয় অসতর্ক ও শিথিল। ছন্দের কারুকলাও তিনি কোনদিন মন দিয়া অনুশীলন করেন নাই—যদিও বাল্যবয়স হইতে কবিতা রচনায় তিনি হাত পাকাইয়াছিলেন।

অবশ্য এক বিষয়ে তিনি প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। মহাকাব্য রচনায় তিনি ব্যর্থ

২৬ একদা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের ভাগবত সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।" তদুত্তরে নবীনচন্দ্র বলিলেন, "উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয় ক্ষতি নাই। আপনি সেইভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কাল পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।"
—আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ (নবীনচন্দ্র রচনাবলী)

হইলেও গীতিকবিতায় তাঁহার যে রীতিমতো অধিকার ছিল, তাহা সানন্দে স্বীকার করিতে হইবে। মহাকাব্যের গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া গীতিকবিতায় সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করিলে তিনি অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় সার্থকতা অর্জন করিতে পারিতেন। তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী'র কয়েকটি খণ্ড-কবিতাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই তিনখানি কাব্যের কোন কোন স্থলে যেখানে গীতিরসের প্রভাব পড়িয়াছে, সেখানে কবির ভাব ও ভাষার আবেগনিষ্ঠা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। 'রৈবতকে'র ৬ষ্ঠ সর্গের প্রথমে সুভদ্রাদর্শনে অর্জুনের স্বগতোক্তি সুখপাঠ্য। 'প্রভাসে' কৃষ্ণের প্রতি ব্যর্থ প্রেমে আজীবন অতৃপ্ত জরৎকারুর উক্তি—

তুমি নয়নের আভা তুমি রসনার সুধা
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল।
তুমি মম চিরসুখ তুমি মম চিরদুঃখ
সুখদুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল।

অত্যন্ত আন্তরিক হইয়াছে, রচনার মধ্যেও সেই আন্তরিক আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। 'প্রভাসে'র সমুদ্রবর্ণনা নিতান্ত মন্দ নহে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, নবীনচন্দ্র নিজস্ব ভাব-ভাবনা ও তত্ত্বকথাকে এই কাব্যত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মহাভারতের কাব্যত্ব অপেক্ষা ইতিহাস-তত্ত্বই অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছিল। কৃষ্ণাবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, বাসুদেবের মানুষীলীলাই ঐ সমস্ত মহাগ্রন্থের মূল বক্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক বৃহদ্‌ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। একদিকে সামন্তচক্র ও রাজন্যবর্গের পারস্পরিক স্বার্থবিরোধ, অপর দিকে বৈদিক যাগযজ্ঞে অতিশয়-আসক্ত ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ ও ক্ষত্রিয়বিরোধিতা এবং ক্ষত্রিয়বিনাশের জন্য শূদ্রের সঙ্গে সহযোগিতা—ইহার মধ্যে কৃষ্ণের রাজনৈতিক ঐক্যসংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধিতা এবং প্রেমধর্ম প্রচার—নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ এই আদর্শই কাব্যত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মহাকাব্যের বিশালতা সৃষ্টির জন্য এই বিরাট পটভূমিকা তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিত; কিন্তু সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বড় বড় চরিত্র, দীর্ঘ কাহিনী ও বিচিত্র বর্ণনার সাহায্যে মহাকাব্যের বিশালতা সৃষ্টি করা যাইবে। কিন্তু মহাকাব্যের আত্মা (epic spirit) বলিতে যাহা বুঝায়, সে সম্বন্ধে তিনি কখনও ধীরস্থির ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই। ভক্তিভাবের প্লাবন, লীরিক উচ্ছ্বাস, পুরাণকথাকে অভিনব ইতিহাস-তত্ত্বের দ্বারা পুনর্লিখনের প্রয়াস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কৌতূহল ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে যে বিশালতাবোধ থাকিলে মহাকাব্যের বিপুল বিস্তার অবধারণ করিতে পারা যায়, সেরূপ কোন অন্তর্দৃষ্টি নবীনচন্দ্রের ছিল কিনা সন্দেহ। কাব্য-পরিকল্পনা যতই বৈচিত্র্যমণ্ডিত হোক না কেন, মোদকের মিষ্টত্ব যেমন স্বাদে প্রমাণিত হয়, মহাকাব্যের কাব্যগুণও তেমনি পাঠকের উপলব্ধিতে সার্থক হয়। নবীনচন্দ্রের তিনখানি কাব্য

একসঙ্গে পড়িলেও পাঠকমনের মধ্যে লংগিনাস্‌-কথিত সাব্লাইম্‌ (*Hupsous*) বা বিরাট অনুভূতি[২৭] সঞ্চারিত হয় না। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' বাদ দিলে ১৯শ শতাব্দীর আর কোন্‌ মহাকাব্যেই-বা বিশাল জীবনরস সঞ্চারিত হইয়াছে? যাহা হউক, কিছু প্রতিভা সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার অন্যতম কারণ—তাঁহার প্রতিভা সে স্তরের ছিল না; আর একটি কারণ, তখন মহাকাব্যের প্রথম কোটালের বান সরিয়া গিয়াছে। পাঠক ও কবিচিত্ত ১৯শ শতাব্দীর অষ্টম দশক হইতে বস্তুপ্রধান কাব্যের বহিরঙ্গণ ত্যাগ করিয়া মন্ময়চেতনার অন্তরঙ্গ গূঢ়ৈষণায় আত্মসমাহিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় নবীনচন্দ্র সীমাবদ্ধ প্রতিভা লইয়া যে মহাকাব্যের অকূল বারিধিতে পাড়ি জমাইতে পারিবেন না, তাহা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পাঁচ

॥ উনবিংশ শতাব্দী ও নবীনচন্দ্র ॥

নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর যুগমানব। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ তদানীন্তন ব্যক্তিমানস ও তাহার আত্মপ্রকাশের নানা পথকে কোথাও প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, কোথাও-বা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়াছে। বস্তুত: উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশ—সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষই সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ একটা বিশেষ সীমা ও মনোভাবের মধ্যে আপনাকে বিবর্তিত ও বিকশিত করিয়াছে; নানা প্রভাব, আক্রমণ প্রভৃতিকে এই বিরাট দেশ ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে, নিজের বিশালতার জারকরসে আগন্তুক সংস্কৃতিকেও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শ ও প্রভাব ভারতে যে বিচিত্র মনোভাবের সৃষ্টি করিল, তাহা পরবর্তী কালের এক শতাব্দীকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। এত দিন ধরিয়া জীবন, ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ-জীবনে ভারতীয় জাতি মধ্যযুগীয় আদর্শকে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে যখন এই পুরাতন জীর্ণ জাতি আধুনিক ইউরোপের আদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রশাসন, ধর্ম ও নীতির সম্মুখীন হইল, তখন তাহার জীবনের মধ্যযুগীয় আদর্শ অপস্থত হইল; রেনেশাঁস ও আধুনিক আদর্শে বলীয়ান পাশ্চাত্য জীবনবাদী সংস্কৃতি মধ্যযুগের গিরিদুর্গে বন্দী ভারতবর্ষকেও আধুনিক জীবনের রাজপথে স্থাপন করিল—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের যেন নবজন্ম হইল। ইউরোপের বিশাল ক্ষেত্রে রেনেশাঁস নামক যে চিত্তজাগরণ ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাঙ্‌লাদেশের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তাহার অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ইহাকে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার রেনেশাঁস বলিয়া থাকেন। ইতিহাসের গতি বিচার করিলে দেখা যাইবে, এইরূপ একটা সর্বাঙ্গীণ

২৭ এই লেখকের 'সমালোচনার কথা'য় লংগিনাসের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

জাতিজাগরণ বাঙ্‌লাদেশের ষোড়শ শতাব্দীতেও ঘটিয়াছিল। চৈতন্যদেবের নামের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'চৈতন্য রেনেশাঁস' বলিয়া থাকেন। (দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধপ্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—"বাঙ্‌লার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা") তাঁহারা মনে করেন যে, ইউরোপে পেত্রার্কা, লুথার, গেলিলিও, বেকন প্রভৃতির আবির্ভাবের ফলে যেমন রেনেশাঁস ত্বরান্বিত হইয়াছিল, তেমনি চৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং রূপসনাতন, রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, রঘুনন্দন প্রভৃতির আবির্ভাবে বাঙ্‌লাদেশেও ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে অনুরূপ জাতিগত নূতন ভাবের অনুপ্রেরণা দেখা দিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই বাঙালী সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রদেশের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত যোগ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। পরিব্রাজক মহাপ্রভু ভারতের চতুঃসীমা পরিভ্রমণ করিয়া যেমন দেশের বৃহদ্ পরিচয় পাইয়াছিলেন, তেমনি বাঙালীর মনেও অনুরূপ বিশাল ভারতের চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তার পরে ১৯শ শতাব্দীতে বাঙালীর দ্বিতীয়বার নবজাগরণ হইল। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী-মানসে এই অভূতপূর্ব চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাসাধনা, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি, সমাজ-মানস ও ব্যক্তি-মানস—১৯শ শতাব্দীর বাঙলাদেশে ইহাদের যে বিচিত্র রূপান্তর হয়, নূতন সৃষ্টি হয়,—তাহার বীজ অবশ্য এই জাতির অন্তর্জীবনে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল; তাহা না হইলে বাহির হইতে আরোপিত কোন তত্ত্ব, দর্শন বা প্রভাব একটা জাতির সমগ্র মনোভঙ্গীকে পাল্টাইয়া দিতে পারে না। বোম্বাই- মান্দ্রাজেও ইংরাজ বাঙলার মতোই কুঠি নির্মাণ করিয়াছিল, শাসনযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। মুৎসুদ্দি ও কেরানিগিরি করিবার জন্য বাঙলা দেশের মতো ঐ সমস্ত অঞ্চলেও ইংরাজী পাঠশালা ও শিক্ষাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙলা দেশে ১৯শ শতাব্দী যেমন অভিনব ফলপ্রসূ হইয়াছিল, ঐ অঞ্চলে সেরূপ হয় নাই কেন? কারণ বাঙলার মানসিক-আধার পাশ্চাত্য জীবনবাদী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, তাহাকে কখনও পুরাপুরি স্বীকৃতি দিয়া, কখনও-বা কিছু বর্জন করিয়া বাঙালী পাশ্চাত্য জীবনধারাকে যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছে, যাহার ফলে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই পূর্ব-প্রত্যন্ত-অঞ্চল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের জীবনতত্ত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাকেই সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসতত্ত্বে বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর 'রেনেশাঁস' বলা হয়।[২৯] চৈতন্যযুগে বাঙালী গ্রামীণ সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বৃহদ্ ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি, ন্যায়

২৯ বাঙালীর ১৯শ শতাব্দীর এই নবজাগরণকে কেহ কেহ 'রেনেশাঁস' বলিতে কুণ্ঠিত। তাঁহারা য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে বাঙলার ১৯শ শতাব্দীর নবজাগরণের রেখায় রেখায় মিল দেখিতে পান না। একজন লেখক (কল্যাণ দাশগুপ্ত, চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৬) বাঙলার এই রেনেশাঁসকে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু নবজীবনের বা নবজাগরণের বাণী কি এত সহজ শ্রোতব্য?……তা হলে তো প্রত্যেক শতকেই একাধিক রেনেশাঁস হয়ে থাকে।" এই আলোচনার আর একস্থানে তিনি নবযুগের লক্ষণগুলিকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, "উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ-জীবনে হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌ম্' সংক্রামিত হয়েছিল এবং তা নবযুগের লক্ষণ—একথা মনে করার হেতু নেই। ইতস্ততঃ যে দুটো একটা ঘটনা পাওয়া যায় তাদের ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করা উচিত।" আবার তিনি প্রসঙ্গান্তরে স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে রেনেশাঁসের লক্ষণ ছিল। তাঁহার উক্তি: "ব্যাপক জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নমনস্কতা, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল, বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব প্রত্যেক জিনিসকে বুদ্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রবৃত্তি, মানবচেতনা রেনেশাঁস-সুলভ বহুগুণ-বৈশিষ্ট্য সেদিন শিক্ষিত সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল বা ইয়ংবেঙ্গলের সভ্যগণ সেই গুণবৈশিষ্ট্যেরই ব্যক্তি-প্রমূর্তি। সমকালীন গ্রন্থজগৎ

প্রভৃতিকে বাঙালীর মনীষার দ্বারা নূতন করিয়া রূপান্তরিত বা পুনর্গঠিত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর নবজাগরণ তাহার জীবনের মূল ধরিয়া টান দিল; এবার আর ভারতবর্ষ নহে, ভারতের বাহিরের বিরাট দেশ ও কাল তাহার চেতনার রূপান্তর ঘটাইল। মধ্যযুগের আলকেমি-বিশারদ পণ্ডিতগণ এমন একটা রসায়নের পরশপাথর খুঁজিতেন, যাহার স্পর্শে হীন ধাতুও সোনা হইয়া যাইবে। তাঁহারা সে পরশপাথর খুঁজিয়া পান নাই, কিন্তু রসায়নশাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তেমনি ঐরূপ পরশপাথর হইতেছে পাশ্চাত্য জীবনতত্ত্ব ও ঐতিহ্য—যাহার স্পর্শে বাঙালীর মনোভাব এক শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ নূতন আকার গ্রহণ করে।

য়ুরোপীয় রেনেশাঁস ও আধুনিকতা

য়ুরোপের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতকের সামান্য পূর্ব হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কালপর্যায়কে সাধারণতঃ মধ্যযুগ বলা হয়। এই যুগে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাধনা ও জীবনাদর্শ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; জার্মান-অরণ্যবাসী রূঢ় বর্বরের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই যুগের প্রথম পাঁচশত বৎসরকে তাই 'তামসযুগ' ('The Dark Age') বলে। অবশ্য সমস্ত মধ্যযুগকে 'তামসযুগ' বলা ঠিক হইবে না। এই যুগের শেষের দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছু উৎকর্ষ ও বিকাশ দেখা গিয়াছিল। অবশ্য এই জীবনাদর্শ খ্রীস্টানী মতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল বলিয়া একটা সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় অনুদারতা প্রাধান্য পাইয়াছিল। তথাপি মধ্যযুগের শেষভাগ নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। সুতরাং মধ্যযুগ বলিতেই সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নহে। এই সময়েই আধুনিক শহর গড়িয়া ওঠে এবং তাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য

বা পত্র-পত্রিকাসমূহ নবীন মানবতার পরিচায়ক।" অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, লেখক তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে রেনেশাঁসের অনেক গুণ লক্ষ্য করিলেও ঐ যুগটাকে কিছুতেই 'রেনেশাঁস' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করিবেন না। য়ুরোপীয় রেনেশাঁস সম্বন্ধে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নাই। এই ধরনের লেখকদের 'রেনেশাঁস', 'হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌ম্' প্রভৃতি বিদেশী শব্দের প্রতি পৌত্তলিক ভক্তি আছে বলিয়া ইঁহারা ইতিহাসের গতিরেখা ধরিতে পারেন না। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর রেনেশাঁসের মধ্যে মুসলমানের উল্লেখযোগ্য অবদান নাই—কারণ মুসলমান সম্প্রদায় এই নবজাগরণ-ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং যেহেতু উক্ত জাগরণ প্রধানতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুর জাগরণ, এই জন্য এই সমস্ত লেখক রেনেশাঁস বিচারে যৌক্তিকতা ও তথ্য বিসর্জন দিয়া মনগড়া থিওরির নৌকায় ভাসিয়া চলিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর পুনর্জাগরণকে রেনেশাঁস বলিলে ইঁহারা বিষম ক্ষেপিয়া যান এবং ইহাকে উড়াইয়া দিবার জন্য অযুক্তি-কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আর একজন লেখক এই বিষয়ে আরও মৌলিক কথা বলিয়াছেন। ১৩৬৬ সালের 'সাহিত্যের খবর' (শারদীয়া সংখ্যা) নামক পত্রিকায় 'নীলকণ্ঠ' নামক এক ছদ্মবেশী লেখক 'উনবিংশ শতাব্দীর ভূত' প্রবন্ধে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ১৯০৫ সালের পূর্বে বাঙলাদেশে রেনেশাঁস আসিতেই পারে না; কারণ দেশে যখন স্বাধীনতার জোরদার আন্দোলন ছিল না, তখন রেনেশাঁস থাকিবে কি করিয়া? সুতরাং ইঁহার মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা রেনেশাঁসের প্রধান লক্ষণ। তাহা যখন সেযুগের বাঙলাদেশে ছিল না, সুতরাং রেনেশাঁসও ছিল না—ইহা তো পরিষ্কার লজিক! এই সমস্ত বালসুলভ অসতর্ক উক্তি বিচার করিবার মত প্রচুর সময় আমাদের নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটুকু বলা যায় যে, বিচারবুদ্ধি কী পরিমাণে খাটো হইয়া গেলে এইরূপ বিচিত্র মৌলিক গবেষণা মাথা হইতে বাহির হইতে পারে! ইঁহারা যদি য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের খোঁজখবর লইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম য়ুরোপের কোন কোন অঞ্চলে সাহিত্য, ধর্মচেতনা, লোকজীবনের আদর্শ প্রভৃতিতে যে অভিনব নূতনত্ব সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ ব্যাপার ১৯শ শতাব্দীর হতভাগ্য বাঙলাদেশেও ঘটিয়াছিল—ইহাই রেনেশাঁস। 'রেনেশাঁস' শব্দটি শুচিবাতিকে আটকাইলে ইহার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে 'নবজাগরণ' প্রভৃতি বাংলা শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৯শ শতাব্দার বাঙালীর জাগরণ—বুর্জোয়া-উত্থান এবং ১৯০৫ সালের পূর্বে বাঙলাদেশে রেনেশাঁসের আবির্ভাব হইতে পারে না—এই ধরনের বিমূঢ় উক্তি পরিত্যাগ করাই ভাল।

অবলম্বন করিয়া একদল স্বাধীনচেতা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে। এই যুগেই সামন্ততান্ত্রিক প্রথার গুরুত্বলাভের ফলে রাষ্ট্রনীতিতে ইহাদের প্রাধান্য সূচিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মযাজকদের প্রভাব সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। শিক্ষা, জ্ঞানবিতরণ, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে ধর্মযাজকগণ কিছু কিছু প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছিলেন। অবশ্য ধর্মের ব্যাপারে ইহারা অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং হানিকর মনোভাব পোষণ করিতেন, এবং যাহা কিছু অখ্রীস্টান, পেগান, হেলেনীয়—তাহার প্রতি ইহাদের প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ছিল। ফলে মধ্যযুগে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও বিজ্ঞানচর্চা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল এবং ধর্মের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন রক্ষণশীলতা স্বাধীন মনোবিকাশকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। এমন কি, অনেক ধর্মযাজক অক্রোশের বশে গ্রীকরোমীয় 'পেগান' শিল্পকলাকে ধ্বংস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বিজ্ঞানের প্রতি ইহাদের আশঙ্কাপূর্ণ ঘৃণা জমিয়া উঠিতেছিল। ৩০৯ খ্রীঃ অব্দে বিশপ থিয়োফিলাস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস করেন; কারণ তাহাতে হেলেনীয় পেগান গ্রন্থই ছিল বেশি। ৪১৫ খ্রীঃ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার উন্মত্ত খ্রীস্টান জনতা হাইপাশিয়া নামক বিখ্যাত গণিতজ্ঞকে হত্যা করে। এইরূপে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে রোম গাঢ় অন্ধকারে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া গেল। ৫২৯ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান এথেন্সে অবস্থিত প্লেটোর বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরকে বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য এই সময়ে য়ুরোপের বহু স্থলে জ্ঞানচর্চা বাধা পাইলেও বাইজান্টিয়ামে (আধুনিক কনস্টান্টিনোপ্‌ল্) তখনও গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞান পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করিতেছিল।

৮ম শতাব্দীতে আরব মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান—বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও গণিত প্রশংসনীয় ভাবে অনুশীলিত হইত। এই মুসলমান পণ্ডিতগণ ভারত ও গ্রীক আদর্শে আণবিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন; ইহাদের অনেকেই আলকেমির গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। ৮ম শতাব্দীর শেষে প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ জবির-ইবুন্ হারিয়ান রসায়ন সম্বন্ধে নূতন কথা প্রচার করেন। ১০ম শতাব্দী হইতে আরব জাতির মধ্যে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইবুন্-অল্-হাইথাস্, অল্-হাজেন, ইবুন্-সিনা প্রভৃতি আরবীয় মুসলমান পণ্ডিতগণ খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এমন সমস্ত মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যে, ইহার লাতিন অনুবাদ একদা য়ুরোপের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র পাঠ্য গ্রন্থরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

আরব মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন চলিতেছিল, তেমনি, মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে য়ুরোপেও কিছু কিছু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা লক্ষ্য করা যাইবে। এই যুগেও নেপ্‌ল্‌সের নিকট সালার্নো শহরে রীতিমত চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্রিটানির একজন তরুণ ধর্মযাজক আবেলার্ড প্যারিসে (১২শ শতাব্দী) ধর্মতত্ত্ব ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদী আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া বহু শিক্ষার্থী প্যারিসে ভিড় করিতে থাকে। পরে এইস্থানে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে। ইতালির অন্তর্গত বোলন শহরের অধিবাসী গ্রাসিয়ান যুক্তির সাহায্যে খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু করেন। তাঁহার যৌক্তিক আলোচনা ও অভিনব মতবাদ শুনিবার জন্য বোলন শহরে নানা দেশ হইতে

ছাত্র-অধ্যাপকের সমাগম হইত ; এখানেও কালক্রমে বোলন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর হইলে একদল অধ্যাপক ছাত্রসহ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইংলণ্ডের টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত অক্সফোর্ড নামক একটি গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন—এই ভাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। মধ্যযুগ অস্ত যাইবার পূর্বে ইতালির আকাশে দান্তের প্রতিভা শেষ রশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া বিদায় লইল। সুতরাং মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নহে।

মধ্যযুগের চিতাভস্ম হইতে য়ুরোপে পুনর্জাগৃতি বা *Rneaissance* এর[৩০] আবির্ভাব হইল। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ তুর্কী কর্তৃক কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ বিজয় (১৪৫৩ খ্রীঃ অঃ)। ইতিপূর্বে রোমসাম্রাজ্য ও সভ্যতা ধ্বংস হইলেও বাইজান্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপ্‌লে (আধুনিক ইস্তান্‌বুলের কাছে) রোম সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক সত্তা দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। ৩৩০ খ্রীঃ অব্দে রোমসম্রাট কন্‌স্টানটাইন এই নগরীকে রোমসাম্রাজ্যের নূতন রাজধানীতে পরিণত করেন এবং তাহার পরে উত্তরোত্তর ইহার সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশ লাভ করে। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নগর তুর্কীর দ্বারা বিজিত হইলে ইহার অধিবাসী গ্রীক-রোমান পণ্ডিতগণ ইতালিতে পলাইয়া গেলেন এবং ইঁহাদের দ্বারা গ্রীকসাহিত্য, দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি আবার নবোদ্যমে য়ুরোপে প্রচারিত হইল ; খ্রীস্টানী গোঁড়ামির স্থলে হেলেনীয় জীবনবাদী সংস্কৃতি য়ুরোপকে নবজন্ম দান করিল—ইহাই রেনেশাঁস। কিন্তু তুর্কী কর্তৃক বসফোরসের তীরবর্তী কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ জয় রেনেশাঁসের অন্যতম প্রধান কারণ হইলেও ইহার আরও অনেক গূঢ় ও সুদূরপ্রসারী কারণ আছে, যাহার দ্বারা রেনেশাঁসের বিচিত্র ঐশ্বর্য এত দ্রুতবেগে য়ুরোপে বিস্তার লাভ করে। তন্মধ্যে প্রধান কারণগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। ভৌগোলিক অভিযান ও নূতন দেশ আবিষ্কার।
২। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া।
৩। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, মুদ্রিত গ্রন্থের জ্ঞানবিস্তারে প্রয়োগ।
৪। কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতন।
৫। 'হিউম্যানিজ্‌ম্' অর্থাৎ গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব।
৬। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা।
৭। মানবচিত্তে সংশয় ও প্রশ্নচেতনার আবির্ভাব।
৮। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া।

মার্কোপোলোর দেশ পর্যটন, ক্রুসেড যোদ্ধাদের ভিন্ন দেশের সংস্পর্শ লাভ, দিয়াজ, কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ম্যাগেলানের দেশদেশান্তরে অভিযান এবং নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে

৩০ লাটিন re শব্দের অর্থ পুনরায় এবং nasci শব্দের অর্থ জন্ম গ্রহণ করা ; ইহা হইতে নিষ্পন্ন renasci (পুনর্জন্ম গ্রহণ করা), এবং তাহার ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য করিয়া renascens (অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ) পদ সৃষ্টি হইয়াছে। ফরাসী renaissance (পুনর্জন্ম গ্রহণ) শব্দটি renaitre, (পুনরায় জন্ম গ্রহণ করা) হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। Renascence ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ।

য়ুরোপের মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা অনেকটা হ্রাস পাইয়া গেল। এই সময়ে নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞানের সীমা ধর্মগ্রন্থ ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইল। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, কেপলার প্রভৃতি পণ্ডিতদের জ্যোতির্বিদ্যা লইয়া গবেষণা এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব সেই জ্ঞানের সীমাকে আরও সম্প্রসারিত করিল। পোল্যাণ্ডের অধিবাসী কোপারনিকাস ১৪৯৩ খ্রী: অব্দে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে নাই, সূর্য কেন্দ্রে বিরাজ করিতেছে এবং পৃথিবী অন্যান্য গ্রহরাজির মতো সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে। ডেনমার্কের টাইকো ব্রাহে এবং জার্মানির কেপ্‌লার এই তত্ত্বকে সুপ্রমাণিত করিলেন। ব্রুনো (১৬৬০ খ্রী: অব্দে ধর্মমতের জন্য তাঁহাকে পোড়াইয়া মারা হয়) প্রমাণ করিলেন যে, সৌরজগতের বাহিরেও বিরাট মহাশূন্য পড়িয়া আছে। পদুয়া নগরের অধিবাসী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন—কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তই ঠিক। রেনেশাঁসের যুগে শুধু জ্যোতির্বিদ্যা নহে, জ্ঞানবিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইবে। এই সময়ে ভেসালিয়াস (১৭শ শতাব্দী) মানুষের শারীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং উইলিয়ম হার্ভে (১৬২৮ খ্রী: অ:) রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই ১৭শ শতাব্দীতেই হেলমণ্ট্‌ রসায়নে এবং গেস্‌নার উদ্ভিদবিদ্যায় অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত করেন। শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান এবং মানবদেহতত্ত্ব নহে, উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব পরীক্ষার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ১৫৪৫ খ্রী: অব্দে পদুয়া নগরে বৃক্ষলতা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য উদ্ভিদ-উদ্যান স্থাপিত হয় এবং লিসবন শহরে প্রাণিতত্ত্ব পরীক্ষার জন্য একটি পশুশালাও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানের নানা শাখা অনুশীলনের জন্য কয়েকটি বিজ্ঞান পরিষদও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৫৬০ খ্রী: অব্দে নেপল্‌স্‌-এ প্রতিষ্ঠিত Accademi Secretorum Natural নামক পরিষদের বিজ্ঞান অনুশীলনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ১৬০৩-৩০ এর মধ্যে রোমে Accademia dei Lincei বর্তমান ছিল এবং ফ্লোরেন্সে Accademia dei Ciments নামক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বিজ্ঞানচর্চা ও অনুশীলন।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও গ্রন্থপ্রচারে ইহার ব্যবহার রেনেশাঁসের একটি সাক্ষাৎ কারণ। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৪০-১৪৫০) জোহান গুটেনবার্গ য়ুরোপে ছাপার অক্ষর আবিষ্কার করেন।* ফলে ছাপাখানার কল্যাণে অতি দ্রুতবেগে জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনগ্রন্থ অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। লোকভাষায় বাইবেল অনূদিত হইলে জনসাধারণকে ধর্মোপদেশের জন্য আর যাজকসম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল না। সকলের মধ্যে ধর্ম-সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ দেখা দিল; লোকের বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে যেমন জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানানুশীলন বাড়িয়া গেল, তেমনি ধর্মীয় রক্ষণশীলতার স্থলে সহনশীলতা, উদারতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইল। কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতনের পর গ্রীক পণ্ডিতগণের ইতালিতে পলায়ন এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রীক সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বা হিউম্যানিজ্‌মের

* গুটেনবার্গ্‌ ১৪৫৬ খ্রী: অব্দের কাছাকাছি সময়ে সর্বপ্রথম 'Vulgate Bible' মুদ্রিত করেন, ইহাই য়ুরোপের প্রথম 'চালা-অক্ষরে' ছাপা বহি। যাজক মাজারিনের সংগ্রহে এই বাইবেল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া গুটেনবার্গের বাইবেল 'মাজারিন বাইবেল' নামেও পরিচিত।

তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের অন্তে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার প্রতি নিষ্ঠাকে 'হিউম্যানিজম্' বলা হয়। ১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পেত্রার্কা ও বোকাচিও গ্রীক হিউম্যানিজমের ধারাটিকে প্রথম জনপ্রিয় করেন। ১৩৯৭ খ্রীঃ অব্দে খ্রাইসোলোরাস নামক এক গ্রীক পণ্ডিত ইতালিতে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন প্রচার করেন। পরবর্তী কালে হিউম্যানিজম্ বলিতে মধ্যযুগের গোঁড়ামিবর্জিত উদার গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন বুঝাইত। ইতিপূর্বে খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে মানুষ পার্থিব জীবনকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিল। আদিম পাপভীতি ('The Original Sin') যে ধর্মের মূলে বর্তমান, তাহাতে যে মানুষের বাস্তব জীবনের শ্রীসৌন্দর্য-আনন্দ-উল্লাস অস্বীকৃত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু রেনেশাঁসের যুগে গ্রীক সাহিত্য-দর্শনাদির ঘনিষ্ঠ অনুশীলন ও অনুসরণে নব দেশ আবিষ্কার, বিজ্ঞানানুশীলন, ঐশ্বর্য-বিলাস-আনন্দের অবারিত আবির্ভাব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের বাঁচিয়া থাকার মধ্যে পরম সার্থকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

হেলেনীয় সংস্কৃতিতে ইহার সঙ্গে আরও একটা বড় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহাই মানুষের অন্তর্জীবনের নূতন আবিষ্কার। মধ্যযুগে খ্রীস্টানী অনুশাসনের ফলে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জিত হইয়াছিল। ধর্মযাজকগণ নির্দেশ দিলেন: ব্যক্তিগত সত্তা বিসর্জন দাও, খ্রীস্টানী "দশ-অনুজ্ঞা" রেখায় রেখায় অনুসরণ কর এবং যত শীঘ্র সম্ভব পাপতাপের পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাও; যাইবার পূর্বে ধর্মযাজকদের কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিয়া স্বর্গপ্রবেশের ছাড়পত্র ('Indulgence' বা ক্ষমাপত্র) সংগ্রহ কর। রেনেশাঁসের ফলে বাস্তব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এই যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, যাহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণাম, তাহাই রেনেশাঁসের সর্ববৃহৎ দান, সমগ্র মানবসত্তার (*l'uomo Universale*) জাগরণই রেনেশাঁসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হইতে প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি। মানুষের ব্যক্তিত্ব যখন মর্যাদা লাভ করিল, তখন সেই ব্যক্তিত্বের বলে মানুষ মধ্যযুগীয় ধর্ম দর্শন-প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করিল, প্রশ্ন করিল—যথার্থ উত্তর না পাইলে পূর্বতন দৃঢ়মূল ধর্মসংস্কারকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই সংশয় ও চিত্তজিজ্ঞাসা ধর্মকেই প্রবলভাবে আঘাত করিল। ইতিপূর্বে জনসাধারণের ভাষায় বাইবেল অনূদিত হইয়াছিল; সুতরাং বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি ধর্মের সাধারণ তাৎপর্য নিজেরাই বুঝিতে পারিল, ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবও হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। যুক্তির পরীক্ষায় যখন রক্ষণশীল খ্রীস্টান ধর্মবিশ্বাস সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তখন অনেকেই এই ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য হারাইয়া ফেলিল। ১৭শ শতকে ইহার সূচনা; ১৮শ শতকের আলোকিত যুগে ('The Age of Enlightenment') অধ্যাত্মতত্ত্বসংশয়ী যুক্তিবাদের প্রবল আধিপত্য লক্ষ্য করা যাইবে। গিবন তাঁহার *Decline and Fall of Roman Empire* গ্রন্থের ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়ে খ্রীস্টান ধর্মকে আক্রমণ করেন। লেসিং তাঁহার *Nathan the Wise* (1779) নাটকে ইহুদি, খ্রীস্টান, ইসলাম—যে কোন ধর্মীয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিলেন। লা মাত্রি-র *Historical and Critical Dictionary*-তে মহানন্দে সংশয়বাদ স্বীকৃত হইল। হিউম *Essay on Miracles* (1747) গ্রন্থে বুদ্ধিবাদকে প্রাধান্য দিয়া যে কোন অর্থনৈতিক ধর্মীয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিলেন। লা মত্রি-র '*Man a Machine*'-এ

মানুষকে অন্যান্য মানবেতর প্রাণী ও জড়বস্তুর সমতুল্য বলিয়া প্রচার করা হইল। দিদেরো-র *Pensees sur l' interpretation de la nature*-এ (1754) জড় দর্শনকেই স্বীকৃত দেওয়া হইয়াছে। ব্যারন হলবাখ্ *System de la nature* গ্রন্থে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বলেন, "If we go back to the beginning, we shall always find that ignorance and fear have created the gods". রেনেশাঁসের পর ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী যুগ। মানবদর্শন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাধারণের রাষ্ট্র ও সমাজে ক্ষমতা লাভ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রশিল্পের অভিনব বিকাশ প্রভৃতির দ্বারা য়ুরোপ রেনেশাঁসের ফসল ঘরে তুলিয়া আধুনিক জীবনের বিশাল প্রান্তরে মহামানবের জগৎসভায় মিলিত হইল।

বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্ক্রিয়া, যন্ত্রবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ, সমাজদর্শনে মানবজীবনের প্রাধান্য এবং রাষ্ট্রে জনসাধারণের আধিপত্য বিস্তার—১৮শ-১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে। ১৮শ শতাব্দীতেই প্রধানতঃ অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান মানবচিত্তের দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারে আলোক নিক্ষেপ করিল। অবশ্য ১৭শ শতাব্দী হইতেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিজ্ঞান প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (pure science), কোথাও বা যন্ত্রবিদ্যামূলক নির্মিতি। ১৮শ শতাব্দীর শেষাংশে (১৭৮৬) গ্যালভানি বিদ্যুৎশক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার মতে জীবদেহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শক্তির যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করেন ভোল্টা (১৭৪৫-১৮২৭)। তিনি গ্যালভানির বিদ্যুৎতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়া সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদক ব্যাটারী নির্মাণ করেন। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন; ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বিমানপোত আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবহৃত হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে কাগজ তৈয়ারীর কলে প্রচুর পরিমাণে কাগজ তৈয়ারী হইতে থাকে; ইহার সামান্য পূর্বে ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে আর্ল অব স্টানহোপ লোহার ফ্রেমের সাহায্যে মুদ্রাযন্ত্রকে আরও কর্মঠ করিয়ে তোলেন। ফলে ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুলভ মূল্যের পুস্তকাদি অতি সহজেই জনসাধারণের হস্তগত হয়। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে ষ্টীফেনসন বাষ্পচালিত ইঞ্জিনকে সর্বপ্রথম রেলপথে চালিত করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে মাইকেল ফ্যারাডে বৈদ্যুৎ-চুম্বকের প্রয়োগ আবিষ্কার করেন; ১৮৪৭ সালে হেল্‌ম্‌হোৎজ শক্তিসংরক্ষণতত্ত্বকে (Conservation of energy) সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন; ১৮৫৯ অব্দে চার্লস্ ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ *The Origin of Species* প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি ঐশ্বরিক সৃষ্টিতত্ত্ব অস্বীকার করিয়া জীববিজ্ঞানে বিবর্তনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ওয়ালেস ও হাক্‌স্‌লি ডারউইনের তত্ত্বকথাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বকে (Theory of special creation) মিথ্যা প্রমাণিত করেন। ইতি-পূর্বে নিউটন জগদ্ব্যাপারকে একটা সুপরিচালিত যন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বকে আপনার অজ্ঞাতসারে খানিকটা দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব মানবজীবনকে বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিল,—ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মাদি ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৮শ শতাব্দীতে জেম্‌স্ হাটন *The Theory of the Earth* (1785) গ্রন্থে সর্বপ্রথম ভূতত্ত্বকে

বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ল্যামার্ক কয়েকটি জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার ও শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া ভূতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রমাণ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মানবচৈতন্যের গভীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ধর্মশাস্ত্রের কবল হইতে মানুষের মনস্তত্ত্বকে উদ্ধার করেন। তিনি যেমন মনের রহস্য ফাঁস করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি তাহার একবৎসর পরে ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে রোন্‌ট্‌জেন 'এক্‌স্‌ রে' আবিষ্কার করিয়া মানুষের দেহের রহস্য পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করিলেন। অতঃপর "দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন" শুধু কবিতাতে বাঁচিয়া রহিল। ১৭শ শতাব্দী হইতে মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল ; ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে তাহার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure science) এবং প্রয়োগসমর্থ যন্ত্রবিজ্ঞানের (Applied science) উন্নতিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন একদিকে সুখকর হইল , অপরদিকে এতদিন ধরিয়া খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্র বিশ্ব এবং মানুষকে যে আধ্যাত্মিক আবরণে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল, ১৯শ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে সে সমস্ত অনৈসর্গিক ব্যাপারের সমাধি হইল ; মানুষ ও পৃথিবী বুদ্ধির নিকট ধরা দিল, মানুষের আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ যুক্তি ও জ্ঞান রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তা হইতে মুক্তি পাইল।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদের উত্থান হইল, তাহার মূল্য অসাধারণ। এই জন্য ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে প্রজ্ঞালোকের যুগে ('The Age of Enlightenment' বা 'The Age of Illumination') বলা হয়। জার্মান ও ফরাসী ভাষায় ইহার নাম যথাক্রমে *Aufklarung* এবং *Eclaircissement*. ১৮শ শতাব্দীতে রিশ্‌লু ফ্রেঞ্চ্‌ এ্যাকাডেমি (Academie Francaise) প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফরাসী দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের বাধা মুক্ত করেন। দিদেরো তাঁহার *Encyclopedie*-তে (১৭৫১) সে যুগের ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করেন। ১৭৫১-৫২ খ্রীঃ অব্দে দিদেরো এবং ডি-এ্যালেম্বার প্যারিস হইতে *Encyclopedie* প্রকাশ করেন ; জ্ঞানভাণ্ডারের নানা রহস্যকথা এই বিশ্বকোষের ২৮টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ভোলতেয়র, দিদেরো, রুশো, মতঁস্কু্য প্রভৃতি বিপ্লবী প্রতিভাধর ব্যক্তির বিখ্যাত রচনাপুষ্ট এই গ্রন্থের প্রভাবকে 'এন্‌সাইক্লোপীডিস্ট' আন্দোলন বলে। ইহারা ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করিয়া ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করেন। ভোলতেয়র[৩১] দিদেরোর মতো প্রখর যুক্তিবাদে বিশ্বাস করিতেন ; তিনিও খ্রীস্টানী মূঢ়তা ও যাজক সম্প্রদায়কে প্রচণ্ড ভাষায় আক্রমণ করেন। রুশো মানুষের কৃত্রিম সভ্যতা ও শোষণকে তীব্র ঘৃণা করিয়া মানুষের সর্ববিধ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাঁহার *Conr Socia* গ্রন্থে। তাঁহার এই গ্রন্থে সমাজের যৌথশক্তির স্থলে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দীতে অতিশয় বিখ্যাত দুইটি সমাজদার্শনিক মতের কথা এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য —একটি অগুয়েস্ত কোঁৎ-প্রচারিত Positivism বা ধ্রুববাদ, এবং অপরটি মিল্‌ প্রচারিত Utilitarianism বা প্রয়োগবাদ। ১৮২৮ সালে কোঁৎ Positivism সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *Cours*

৩১ ভোলতেয়রের আসল নাম—Francois Rarie Arouet তিনি 'ভোলতেয়র' নামটি সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেন।

de philcsophie positive প্রকাশ করেন। তাঁহার দর্শন প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তিনি সেণ্ট সাইমনের আদর্শে ঈশ্বরের স্থলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নীৎশের আদর্শে 'Religion of Man' বা মানবধর্ম প্রচার করেন। এই মতবাদের মূলকথা : মানুষ,—যে মানুষের সহিত ঈশ্বরের কোন পার্থক্য নাই। জন স্টুয়ার্ট মিল্ Utilitarianism বা উপযোগবাদ প্রচার করিলেও তাহার পূর্বে ১৭৮৯ খ্রী: অব্দে বেন্থাম *Principles of Morals and Legislation*এ এই মতবাদ প্রথম ব্যাখ্যা করেন। এই আদর্শের মূলকথা 'The greatest happiness of the greatest number,'-- যাহাতে বহু মানুষের সর্বাধিক সুখ, তাহাই করণীয় ; যাহা মানুষের প্রয়োজনে আসে তাহাই গ্রহণীয়। এই মতে বস্তুর উপযোগ দ্বারা বস্তুর সত্যাসত্য ও গ্রহণবর্জন-গুণ নির্ণীত হয়। স্টুয়ার্ট মিল্ ১৮৬১ খ্রী: অব্দে Utilitarinism গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এই মতের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ফরাসী 'পজিটিভ' দর্শন এবং ইংরাজের 'ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্'—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজ, বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণতত্ত্ব এত প্রাধান্য অর্জন করে যে, এই সমস্ত দার্শনিক মতের দ্বারা মানুষের ভৌমজীবনের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা সূচিত হয়।

১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গণশক্তির অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যাইবে দুইটি ঘটনায়। একটি আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬) এবং অপরটি ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও রাজতন্ত্রের ধ্বংস। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলন স্বাদেশিক মনোভাব সৃষ্টিতে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়া আমেরিকাবাসীরা ইংরাজের শাসনবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে এবং য়ুরোপে এই ঘটনাটি নির্জিত জাতি ও সমাজে আশা-উদ্দীপনা সঞ্চার করে। ফরাসী বিপ্লবের মূলেও আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রচুর উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবই আধুনিক মানুষের নিকট সর্ববিধ বন্ধন-অসহিষ্ণু মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রী: অব্দের ১৪ই জুলাই ব্যাসটিল দুর্গের পতন হয় ; ইহা শুধু একটা সামান্য দুর্গের ধ্বংস নহে ; ইহার সহিত যেন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও তাহার অনুচর সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই বৎসরের ৭ই আগস্ট বিদ্রোহীরা মানব-অধিকারের দাবি ('Declaration of the Rights of Man') ঘোষণা করিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, আইন ব্যবসায়ী, বণিক—ইহারাই প্রধানতঃ ফরাসী বিপ্লবের ধ্বজা ধারণ করিয়াছিল। অবশ্য এই বিপ্লবে রাজতন্ত্র ধ্বংস হইলেও সাধারণ মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হয় নাই ; বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই ক্ষমতার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে অস্তিবাচী লাভ যাহাই হোক না কেন, Liberty, Equality, Fraternity—এই ত্রয়ী বীজমন্ত্র য়ুরোপের জনসাধারণকে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত করিয়াছিল। উক্ত 'Declaration'-এর প্রথম ঘোষণাটি স্মরণীয় :

> 'Men are born and remain free and equal in rights ; social distinctions may be based only upon general usefulness."

ইহাই অবহেলিত য়ুরোপবাসীকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়াছিল, নূতন 'মেসায়া'র আবির্ভাবের জন্য অধীর আগ্রহে দিন গণিতে উৎসাহ দিয়াছিল।

একদিকে যেমন আমেরিকা ও ফরাসী দেশে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার জন্য রাজতন্ত্রবিরোধীরা অধীর আগ্রহে বিপুল আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি ইংলণ্ডেও আমরা জনসাধারণের মধ্যে নানা আন্দোলন লক্ষ্য করিতে পারি। ১৮শ শতাব্দীর শেষে যন্ত্রবিজ্ঞানের আবিষ্কার ও দৈনন্দিন কর্মে ইহার নিয়োগের ফলে যাহারা শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা সংগ্রহ করিত, তাহারা অত্যল্পকালের মধ্যে বৃত্তিচ্যুত হইল। তাহাদের সমস্ত আক্রোশ সঞ্চিত হইল কলকারখানার বিরুদ্ধে; শিল্পযন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া তাহারা ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। শুনা যায়, নেড লুড নামক একজন অর্ধোন্মাদ তাহার প্রভুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রভুর কারখানা ভাঙিতে শুরু করে। এই সময়ে বৃত্তিচ্যুত জনসাধারণের মনে যন্ত্রের বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছিল; তাহারা লুডের এই ব্যাপারকে অনুসরণ করিয়া কলকারখানা ধ্বংস করিতে লাগিল। ১৮১০—২০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই জাতীয় ধ্বংসক্রিয়া ও দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিয়াছিল; লুডের নামানুসারে এই দাঙ্গা 'লুডাইট রায়ট' বা 'লুডাইট হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। ইংলণ্ডে কলকারখানা ধ্বংস সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলাকে সাধারণভাবে 'লুডাইট রায়ট' বলা হইত। দাঙ্গা নিবারণের জন্য অনেক সময় সেনাবাহিনীকে তলব করিতে হইত। কিন্তু কলকারখানা ও শিল্পযন্ত্রকে বাধা দেওয়া গেল না; বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, ফলে জনসাধারণেরও দুঃখের সীমা রহিল না। ফ্যাক্টরী আইন পাস করাইয়াও জনসাধারণের দুঃখ হ্রাস করা গেল না। ইহার ফলে ধীরে ধীরে শ্রমিক আন্দোলন ও সাম্যবাদী সমাজ-জিজ্ঞাসা নূতন দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

১৯শ শতাব্দীতে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, সমাজদর্শন ও জনসাধারণের সঙ্ঘ-শক্তি পীড়নের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই যুগে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের বহুস্থলে জন-অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যাইবে। ১৮৩১-৩২ সালে ইংলণ্ডে রিফর্ম্ বিল লইয়া মধ্যবিত্ত-সমাজে ঘোরতর উত্তেজনা ও আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৩২ সালে ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট্ পাস হইলে কলকারখানায় বালক-মজুর নিয়োগ নিষিদ্ধ হইল এবং ১৮৩৪ সাল হইতে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংস্থার শক্তি-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৩৯ সালে চার্টিস্ট্ আন্দোলনের ফলে শ্রমিক-কৃষাণদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল, নানা স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল। এই সময়ে এবং ইহার কিছু পূর্বে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়া অবহেলিত জনসাধারণের মুক্তির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক সেণ্ট্ সাইমন ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে *Nouvean Christiansme* (বা 'নব খ্রীস্টধর্ম') নামক গ্রন্থে মানবসমাজে ধর্মযাজকদের স্থলে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের প্রাধান্য স্থাপনের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যথার্থ খ্রীস্টান ধর্মের একমাত্র কাজ—দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎসর্গ। সেণ্ট সাইমন ফরাসী দেশে সর্বপ্রথম যুক্তিপূর্ণ সাম্যবাদী আদর্শ প্রচার করেন। প্রুধোঁ ন্যায়বিচার, সাম্য ও সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করিয়া ১৮৪০ সালে *Qu'est-ce que la propriete* নামক গ্রন্থে ঘোষণা করেন—"Property is theft." অবশ্য তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন অপেক্ষা ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বিবর্তনের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। রবার্ট্ ওয়েন ১৮৫৭-৫৮ সালে যে আত্মজীবনী রচনা করেন, তাহাতে

স্পষ্টতঃ সাম্যবাদী মতবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মানবসভ্যতায় যিনি যুগান্তর সৃষ্টি করেন এবং মানুষের চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেন, তিনি হইতেছেন জার্মান পলাতক ইহুদী হেনরিখ্ কার্ল্ মার্ক্স্ (১৮১৮-৮৩); মার্ক্স্ প্যারিসে অবস্থানকালে (১৮৪৫) প্রুধোঁর গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাম্যবাদী মত গ্রহণ করেন। পরে প্যারিস হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৪৮ সালে এঙ্গেলস্-এর সহযোগিতায় তাঁহার *The Communist Manifesto* প্রকাশিত হইলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাম্যবাদী দর্শন সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন। 'The First International' (First International Working Men's Association') নামক আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া ১৮৬৪ সালে সর্বপ্রথম সাম্যবাদী আদর্শকে বিশ্বগত রূপ দিবার চেষ্টা করা হয়। মার্ক্স্ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামক দার্শনিক মতবাদকে অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করিয়া ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে জার্মান ভাষায় *Das Kapital* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনা করেন। ফ্রয়েড যেমন অভাবনীয় আবিষ্কারের সাহায্যে ১৯শ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানকে বিচিত্র রহস্যের সম্মুখে স্থাপন করেন, ঠিক তেমনি কার্ল্ মার্ক্স্ও মানব সভ্যতার বহিরঙ্গকে অনুরূপ বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বদর্শনের দ্বারা রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ১৯শ শতাব্দীতে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, যাহা এতদিন ধরিয়া দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, রহস্যময় বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছিল, তাহা মানবজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়িল। মানবজীবনের ভাগবত মহিমা ও ব্যাখ্যাতীত রহস্যময়তা নষ্ট হইয়া গেল, জীববিজ্ঞানের পুঁথির মধ্যে জীবরহস্যের সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল, মন, চৈতন্য, আত্মা প্রভৃতি চিদ্ব্যাপার মস্তিষ্কজাত শারীর-ব্যাপারের অংশীভূত হইয়া পড়িল। ঈশ্বরতত্ত্বের সমস্ত অলৌকিকতা হয় মিথ্যা হইয়া গেল, আর না হয় জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হইল। স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া না পড়িলেও ঐক্যবদ্ধ জনতার অবিশ্বাস্য শক্তি প্রমাণিত হইল—সর্বোপরি মানবমহিমাই সর্ববিভাগে একাধিপত্য করিতে লাগিল। এখন এই পটভূমিকায় নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য অবলম্বনে কবিচিত্তে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাব আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

নবীনচন্দ্রের চিত্তে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাব

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, কোন্ মনোভাবের বশে কবি মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে এবং তাহার পরেও তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। কেশবচন্দ্রের আদর্শে তিনি কিছুকাল ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ব্রহ্মানন্দের আদর্শ ত্যাগ করেন। যশোহরে কর্ম করিবার কালে অমৃতবাজার পত্রিকার ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মনে স্বাদেশিকতার জন্ম হয়; এই আবেগের বশে তিনি তদানীন্তন বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকার স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। পুরীধামে বদলি হইয়া কেমন করিয়া তিনি মহাভারত ও ভাগবতের কৃষ্ণলীলার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণমহিমাকে নূতন আলোকে উপস্থাপিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রস্তাবিত মহাকাব্যকে "the Mahabharat of the nineteenth century" বলিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, নবীনচন্দ্র এই মহাকাব্য রচনায় ১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ভাবাদর্শের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। যদিও কবি ভগবান বাসুদেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তবু সে লীলাকে তিনি মহাভারত বা অন্য কোন পৌরাণিক কাহিনীর সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত করিয়া দেখিতে চাহেন নাই। য়ুরোপের দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের মাদক রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া কবি কৃষ্ণকথা ও মহাভারতীয় ভারতবর্ষকে ১৯শ শতাব্দীর স্থান-কালের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে; কবি, বিশেষতঃ বস্তুপ্রধান কাব্যের কবি একটা বিশেষ দেশকালের মধ্যে বিচরণ করেন; আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি বস্তুগত শিল্পে প্রায়ই কবির সমকালের ছাপ পড়িয়া থাকে। নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে তদানীন্তন পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে। যে যুগে তিনি বর্তমান ছিলেন, ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে—সেকালে বাঙালীসমাজ ইংরেজী শিক্ষার মারফতে য়ুরোপের রেনেশাঁস ও আধুনিকতার সহিত পরিচিত হইতেছিল। কাজেই উনিশ শতকী বাঙালী-ঐতিহ্যে রেনেশাঁস ও আধুনিক যুগ—উভয়েরই প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপীয় ভাবাদর্শ আমাদের মধ্যে কখনও প্রবল বিরোধিতা, কখনও-বা দুর্নিবার আসক্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। 'ধর্মসভা'র দল যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই বর্জন করিয়াছিলেন; ডিরোজিও-পন্থী 'ইয়ংবেঙ্গল'গণ ভারতীয় ঐতিহ্য অস্বীকার করিয়া ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজদর্শন, যুক্তিবাদ, নৈতিক জীবন প্রভৃতিকে অধিকতর শ্লাঘনীয় মনে করিতেন। সুকঠোর যুক্তিবাদী রামমোহন বাস্তব চেতনাসম্পন্ন আধুনিক জীবনের পোষকতা করিলেও ভারতীয় ধর্মসাধনাকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে যুগজীবন ও মুক্ত মানসের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এক কথায় রামমোহন ঔপনিষদিক ধর্মসাধনা এবং বৈদান্তিক তত্ত্ববাদকে অংশতঃ স্বীকার করিয়াছেন; পৌরাণিক সংস্কৃতি, আবেগ-মূলক ভক্তিবাদ—এ সমস্ত ধর্মপ্রণালীর প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। সমাজ, ধর্মসাধনা, মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রভৃতি ব্যাপারে রামমোহন আধুনিক বিশ্বের মানববাদী ও যুক্তিকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৩২] ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রগতিশীলতা একদিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে, অপর দিকে বিদ্যাসাগরের বিশুদ্ধ মানববাদের আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর চেতনায় ঘোরতর সংশয়ী ছিলেন; মানুষই তাঁহার ধ্যেয় আদর্শ। দলাদলির জন্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ খানিকটা হতবল হইয়া পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নব্য ব্রাহ্মদের মতানৈক্যের ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান এবং ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—এই ত্রিধাবিভক্ত দলাদলির জন্য তদানীন্তন নির্জিত হিন্দুসমাজ ও পৌরাণিক সংস্কৃতি পুনরায় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন করিয়াও আশ্চর্য উপায়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল সত্যে দৃঢ়নিষণ্ণ ছিলেন। বৈদিক, ঔপনিষদিক, পৌরাণিক, ব্রাহ্ম—এইভাবে ভারতীয়

৩২ এ বিষয়ে লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্যে' বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে, অথবা পরস্পরবিরোধীভাবে না দেখিয়া ভারতীয় সমাজ ও গার্হস্থ্য ধর্মের সহিত অন্বিত করিয়া হিন্দুধর্ম প্রণালী, আচার ও আচরণকে তিনি যুগধর্মের সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে ভারতের পৌরাণিক আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, অবশ্য ভিন্ন রূপে। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। 'প্রচার' 'নবজীবন', 'সাধারণী', 'ভ্রমর'— এ সমস্ত পত্রিকাও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে ও প্রভাবে পরিচালিত হইত। এই পত্রিকাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বদর্শনের বাহন হইল। তিনি প্রথম জীবনে কোঁতের পজিটিভিজ্‌ম্, মিল-বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজম্, ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগের ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, রুশোর রোমান্টিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ আদিম ধরনের ভাববাদ এবং সেণ্ট সাইমন-প্রুধোঁ-ওয়েন প্রভৃতির সাম্যবাদী সমাজাদর্শ স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য অভিজ্ঞামূলক জ্ঞানবাদের (Epistemology) বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই ; পজিটিভিজ্‌ম্-এর দ্বারা তিনি ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাই কৃষ্ণজীবনের অলৌকিক কথাকে পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক যুক্তিবাদের দ্বারা কৃষ্ণচরিত্রের মানবমহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমাজ আদর্শ অনুশীলন করিয়া সেই আলোকে প্রাচীন ভারতকে ব্যাখ্যা ও গ্রহণের চেষ্টা—এই পর্বের একটা সাধারণ লক্ষণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মসম্প্রদায় হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শের উপর আঘাত হানিয়াছিলেন ; ইঁহাদের কোন কোন অংশ খ্রীস্টান ধর্মপ্রণালী ও নৈতিক আদর্শের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে দলগত স্বার্থ ও ভাবাদর্শের মূল্যবিনিময় প্রসঙ্গে নবীন-প্রবীণ ব্রাহ্মে বিরোধ ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁহার 'বঙ্গদর্শন'গোষ্ঠীর উৎসাহে এবং চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি ব্যক্তিদের প্রচারের ফলে হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শের প্রতি আবার শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টি ফিরিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতা ব্যাখ্যা, শিশিরকুমার ঘোষের চৈতন্য জীবনলীলা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবভক্তি প্রচার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সজ্জনের পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ স্বীকারোক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল ধর্মবিশ্বাসের উদার আহ্বান, স্বামী বিবেকানন্দের মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক বজ্রবাণী নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজকে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ করিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজদর্শন, রাজনীতি, অর্থনৈতিক, বৈষম্য সম্বন্ধে প্রখর প্রতিবাদ এবং ধর্মনীতি ও আচার-আচরণে উদার মানবধর্মের প্রভাব অনুভূত হইতেছিল। এই শতাব্দীর ৮ম-৯ম দশকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিপুল প্রভাব ধর্মের সঙ্গে উদারনৈতিক সহনশীলতা ও মানববোধকে মিশাইয়া দিল এবং পৌরাণিক সংস্কৃতিকে নূতন মানবমহিমার দ্বারা পরিমার্জিত করিয়া শিক্ষিত জনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যসম্প্রদায়, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার শিকাগো শহরে (১৮৯৩) এবং প্যারিসে (১৯০০) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রথম ঘোষণা বিশ্বজনের শ্রদ্ধা-বিস্ময় উদ্দীপিত করিল। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রীও পশ্চিম বিশ্বে আপনাদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীজী যেমন বিশ্বকে ভারতের দ্বারপ্রান্তে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার সমসাময়িক আর কোন জননেতা বা ধর্মনেতা তাহার নিকটেও যাইতে

পারেন নাই। তাহার একটা বড় কারণ স্বামীজীর বিদ্যুৎপ্রভাধর চারিত্রমাহাত্ম্য। সে যাহা হউক, ১৯শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে যে ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, বিশেষতঃ পৌরাণিক ও বৈদান্তিক সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর মনে শ্রদ্ধা সঞ্চার করিতেছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারততত্ত্ববিৎ ম্যাক্সমূলর সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, সংহিতা, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পশ্চিম বিশ্বে ভারতবাসীর গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ইংরাজ ও ফরাসী পণ্ডিতগণও তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক সিদ্ধান্ত নানা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ ; তথাপি তাঁহারা সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের পরিচয় ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া পরাধীন ভারতের প্রতি পশ্চিমের কৌতূহল এবং কোন কোন স্থলে—শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯শ শতাব্দীর শেষে বাঙলার মধ্যশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সমাজে পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল।[৩৩] প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মানসে প্রধানতঃ পৌরাণিক সংস্কৃতিই নানা রূপান্তর সত্ত্বেও সুদৃঢ় স্থায়িত্ব অর্জন করিয়াছে। ঔপনিষদিক ও বৈদান্তিক তত্ত্বকথা বুদ্ধিজীবী মানুষের চিত্তোৎকর্ষের পরিচয়স্থল সন্দেহ নাই ; কিন্তু গুপ্ত যুগ হইতে ইংরাজ আমল পর্যন্ত—দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসরে ভারতীয় হিন্দুর নানা পৌরাণিক সংস্কারই জনচিত্তে অটল হইয়া আছে। অবশ্য বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনা, তন্ত্রাশ্রিত শক্তিসাধনা, আউল-বাউলের 'কায়াসাধনা', মধ্যযুগীয় সাধুসন্ত-পীরফকির-মুরশিদ-সুফীসাধকগণের মরমী সাধনা—হিন্দুমুসলমানের যৌথ সাধনাকে এক অভিনব রূপ দিতে চাহিলেও ভারতীয় হিন্দুর চিত্তে পৌরাণিক সংস্কার সহজে যাইবার নহে, যায়ও নাই। রামমোহন, ডিরোজিও-পন্থী, দয়ানন্দ, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সকলেই পৌরাণিক ঐতিহ্যকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও সাধারণ বাঙালী যে কিয়দংশে পৌরাণিক সংস্কার ও স্মৃতিগ্রন্থের কিছু কিছু মানিয়া চলে, তাহাতেই এই সংস্কারের দৃঢ়মূল আয়ু বুঝা যাইতেছে।

অবশ্য একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিগত শতাব্দীর বাঙালীর নব-জাগরণে

৩৩ বাঙলাদেশে ১৯শ শতাব্দীর শেষপাদে পৌরাণিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের ইতিহাসটিকে কোন কোন লেখক যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহাকে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামিপূর্ণ 'রিভাইভালিজম্' (Revivalism) নাম দিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে, ব্রাহ্মসমাজ যে প্রগতির বার্তা আনিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপচেষ্টার ফলে নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে মধ্যযুগীয় হিন্দু মনোভাব বাঙালীসমাজে উগ্র হইয়া ওঠে। কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' উক্তিটির ঔদার্য সম্বন্ধেও সংশয়ান্বিত। কাজী আবদুল ওদুদ বলিয়াছেন, " 'সব ধর্মই সত্য' এটি একটি শিথিল চিন্তামাত্র।" ('বাঙলার জাগরণ', ১৪৯) বিবেকানন্দের প্রচণ্ড কর্মশক্তি, বিরাট চরিত্র ও পৌরুষ ওদুদ সাহেব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার উক্তি, "বিবেকানন্দও জাতির ভিতরে বড় রকমের সংস্কারের প্রয়োজন দেখলেন অস্পৃশ্যতা ও জাতি'-অভিমানের ক্ষেত্রে—কিন্তু কাজে এ সবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া বেশি কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হলো না, কেন না, তিনি প্রথম থেকেই দাঁড়িয়েছিলেন সংস্কার-বিরোধীদের দলে।" স্বামীজী যে অলস চিন্তাবিলাসী ছিলেন না, কর্মযোগই তাঁহার জীবনের শেষ কথা, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ওদুদ সাহেব কেন যে বিবেকানন্দকে সংস্কারবিরোধী অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে পংক্তিভোজে বসাইয়া দিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। আসলে ওদুদ সাহেবের মতো কেহ কেহ এক মহা ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে চোখকান বুঁজিয়া সংস্কারপন্থী বলিয়া জয়ধ্বনি করা এবং বঙ্কিম-নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হিন্দু ঐতিহ্যকে সংস্কারবিরোধী বলিয়া গালি দেওয়া আধুনিক কালে একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঐতিহ্যের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনগড়া মানদণ্ড ধরিয়া সংস্কৃতি বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া 'বিসমিল্লায় গলদ' করিয়া বসিয়াছেন। যে জীবন ও সাধনা বায়বীয়, মন ও মৃত্তিকার যোগসম্পর্কহীন, যাহা মূল্যবান্ কাচঘরে দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহার শেষ আশ্রয় স্মৃতির যাদুঘর। যে সংস্কৃতি বহু আঘাত ও পরিবর্তন সহিয়া পরিবেশের সহিত মিলাইয়া চলিতে পারে এবং এইরূপে সমাজে দীর্ঘজীবী হয়, তাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া তুচ্ছ করা মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মুসলমানসম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান লক্ষ্য করা যাইতেছে না। প্রথমতঃ বাঙলাদেশের মুসলমানসমাজ মূলতঃ বাঙালী হিন্দুর বংশধর হইলেও ধর্মান্তরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের ঐতিহ্যকেও বিসর্জন দিয়াছেন; বাঙলায় জন্মিয়া তাঁহারা আরব-ইরানীয় 'তমদ্দুন' লইয়া অধিকতর ব্যস্ত। 'মজ্‌মু' অ অল্‌ বহ্‌রৈন', অর্থাৎ দুই সাগরের সমন্বয়—বাঙলাদেশে, অন্ততঃ ১৯শ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যাইবে না। মুসলমান বিজিত, ইংরাজ বিজয়ী; কাজেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি হইতে আত্মগোপন করিয়া বাঙলার মুসলমান সমাজ প্রায় একশ বছর পিছাইয়া গেল। ওয়াহবি আন্দোলনের উত্তেজনা বাঙলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই মতের মূল লক্ষ্য যাহাই থাকুক, ইহাতে অচিরে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও উগ্রতা আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য ইঁহারা পুরাতন আরবীয় ধর্মানুশাসনের উপর ভিত্তি করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে ওয়াহবি-নেতা শাহ্‌ সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৩১ সালে বাঙলার নারিকেল বেড়িয়ায় (২৪ পরগণা) তিতুমীর সদলবলে হিন্দু জমিদার-গাঁতিদার-তালুকদার ও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ ও ইংরাজ শাসনের সেবক, ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ চাকুরীবিলাসী বাঙালী হিন্দুর প্রতি ওয়াহবিদের বিদ্বেষ জাগাই স্বাভাবিক। উপরন্তু আদালত হইতে ফারসী ভাষা তুলিয়া দিয়া ইংরেজী ভাষার প্রচলন হইলে আরবীফারসীশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের জীবিকার পথ রুদ্ধ হইল। এই সমস্ত কারণে ইংরেজশাসন, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালী মুসলমানের তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হইতেছিল। 'দারুল হার্ব' অর্থাৎ অ-মুসলমানের দেশ ভারতবর্ষ তাঁহাদের মাতৃভূমি নহে, এ কথাটা তাঁহারা অস্বীকার করিতেন না। ১৮৭১ সালে আমিরুদ্দিন নামক এক ওয়াহবিপন্থী রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েদ গিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ২০এ সেপ্টেম্বর আবদুল্লা নামক আর এক ওয়াহবি কলিকাতার প্রধান বিচারপতিকে হত্যা করেন। ১৮৭২ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারি ওয়াহবি কয়েদী শের আলি আন্দামানে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়োকে হত্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমানসম্প্রদায়ের প্রতি ইংরাজ সরকারের কঠিন মনোভাবের কারণ সহজেই অনুমেয়। অবশ্য মধ্যবিত্ত, বিশেষতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান ইংরাজী শিক্ষা-সভ্যতা হইতে মুখ ফিরাইলেও নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহ্‌মদ প্রভৃতি মুসলমান-নেতৃগণ মুসলমান-সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনা করিয়া, ইংরাজসরকারের সহিত সহযোগিতার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন হিন্দুসমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে নবজীবন-বাণীকে অনুভব করিতেছিলেন, তখন মুসলমানসমাজ এই নূতন জাগরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নিখিল ঐস্লামিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের সমাজে ১৯শ শতাব্দী হইতেই যদি ইংরেজী শিক্ষা সভ্যতা হিন্দু সমাজের মতো অভ্যর্থিত হইত, তাহা হইলে ১৯শ শতাব্দীর জাগরণে শুধু হিন্দু সমাজই মশাল ধরিত না, হিন্দুমুসলমানের মিলিত জীবনধারা বাস্তবিক 'মজমু'অ অল্‌-বহ্‌রৈন' হইতে পারিত এবং হয়তো পরবর্তীকালের সর্বনাশা দুই জাতিতত্ত্বের উদ্ভব হইত না।

নবীনচন্দ্র এই আবহাওয়ার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার কবিমানসে

এই শতাব্দীর প্রধান ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করিতে বাধা পায় নাই। প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়িতে যাতায়াত করিলেও পরে ঘোরতর ব্রাহ্মবিদ্বেষী হইয়াছিলেন। মধ্য জীবনে তিনি কৃষ্ণের ভাগবতী লীলা অনুধ্যান করিয়া পুরাণকথাকে পাশ্চাত্য আলোকে নবরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি পুরাণের মধ্যে যে নূতন ঐতিহাসিক তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ভিন্ন আর বড় কেহ সমর্থন করেন নাই। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্যে'[৩৪] (বৈশাখ, ১২৯৭) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'Calcutta Review'-এ কবির পুরাণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য মোটামুটি সমর্থন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবিবর হয়তো বেবর ও ম্যাক্স্‌ম্যুলরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে-নিহিত সমাজ ও সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও ভারত-সংগ্রামের পশ্চাদ্‌পটে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় মধ্যযুগের য়ুরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতেও, য়ুরোপের স্টেট্‌ ও চার্চের দ্বন্দ্বের মতো, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে বিষম সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের প্রতিষেধক রূপে অনার্য জাতির বাহুবলের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়জাতি, বিশেষতঃ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। দুর্বাসা-বাসুকির ষড়যন্ত্রকে সেই ভাবে কবি উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ বিরোধ ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, পরশুরামের ক্ষত্রিয়নিধনের কাহিনীর মধ্যে তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধকে কবি যেরূপভাবে সমাজ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বরূপে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগে সম্ভবতঃ ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজাদর্শের প্রভাবেই তিনি কৃষ্ণের মানবীয় মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন; অবশ্য ইহাতে কবি বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ 'রৈবতক' হইতে 'প্রভাস' পর্যন্ত সর্বত্রই কৃষ্ণের ভাগবত মহিমা অধিকতর প্রকটিত হইয়াছে। তিনি কোথাও পাঞ্চজন্যধারী পার্থসারথি, কোথাও-বা বৃন্দাবনের চিরকিশোর। বিশেষতঃ 'প্রভাসে' তাঁহাকে ভক্তের ভগবান রূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে। সুতরাং কবি যে 'মিসন' লইয়া কৃষ্ণমহিমা প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। অসংযত আবেগ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তি তাঁহার কাব্যপ্রতিভাকে খানিকটা খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত প্রেমের দেবতায় রূপান্তরিত হইলেও কবি তাঁহার চরিত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শের মহৎ গুণগুলি সঞ্চারিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কাভুর, মাৎজিনি, বিস্‌মার্ক প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশনায়কগণ খণ্ড-ছিন্ন স্বদেশকে সামগ্রিক ঐক্যবন্ধনের যে মহৎ প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই স্বাদেশিক আদর্শ ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর নিকট উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই কবি কৃষ্ণকে খানিকটা স্বাদেশিক আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। কবির মতে, কৃষ্ণের যুগে ভারতে আর্য-অনার্যে কলহ,

৩৪ হীরেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে' নবীনচন্দ্রের অভিনব পুরাণ ব্যাখ্যার মৌলিকতা সম্বন্ধে বলেন, "এ স্থলে বলা উচিত যে, এ সকল ঘটনার প্রকৃত তত্ত্বার্থ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্বতঃ প্রতিভাত হয় নাই। রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের কবি নবীনবাবুর মুখে প্রসঙ্গতঃ যে সব ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস পাই, মহাভারতাদির সাহায্যে তাহারই বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।"—বীরেশ্বর পাঁড়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' হইতে উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ, বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠান ও কাম্যকর্মহীন ভক্তিধর্মের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ—সর্বোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতিগণের স্বার্থপরতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যও বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছিল। এই যুগসঙ্কটে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজে শ্রেণীবিদ্বেষ দূর করিয়া একটা মহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ভারতজননীর 'রাজরাজেশ্বরী' মূর্তি নির্মাণ করেন।

কবির কৃষ্ণ তাই আধুনিক ধরনের কর্মবাদে বিশ্বাসী এবং অলস অদৃষ্টবাদের ঘোর শত্রু; তিনি সূর্যচন্দ্র প্রভৃতিকে নৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত কল্পিত দেবতার উপাসনায় তাঁহার আস্থা নাই। জগৎ ও জীবনকে তিনি নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও নিরাসক্ত নৈষ্কর্ম্য সাধনার দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও তিনি সর্বশক্তিমান্ ভগবান, তবু কর্মফলভোগী অপরাধী ব্যক্তি বা সমাজকে নিজ প্রভাবের মধ্যে আনিতে চাহেন নাই। তিনি কোঁতের পজিটিভিজম্ ও সেণ্ট্ সাইমনের সাম্যবাদের ভক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। নরহিত-ব্রতই তাঁহার সাধনা, মানবকল্যাণই তাঁহার দেহধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই একদিকে কবির কৃষ্ণ ১৯শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত, অপরদিকে ভাগবত মহাভারতের আদর্শে পরিকল্পিত। ১৯শ শতাব্দীর মানববাদ এবং প্রাচীন ভারতের ভক্তিতত্ত্ব—এই দুই বিষম ব্যাপারকে কবি কৃষ্ণের চরিত্রে মিলাইতে গিয়াছেন—খুব যে সার্থক হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কবির কৃষ্ণ অদৃষ্টবাদের বিরোধী এবং কর্মফলবাদী; কিন্তু ব্যাসদেবের নিকট অদৃষ্টবাদের নূতন তাৎপর্য শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে উৎসুক। তিনি মানবরূপে ব্যাসদেবকে প্রণাম করেন, অবতাররূপে ব্যাসদেবের প্রণাম গ্রহণ করেন এবং বিশ্বরূপ দেখাইয়া ব্যাসার্জুনকে নিজ আদর্শ গ্রহণে নির্দেশ দেন। পুরাদস্তর গৃহী সাজিয়া তিনি দ্বারকায় লীলা করেন, দুই পত্নীর সঙ্গে যথাযোগ্য রহস্যালাপ করেন, রঙ্গসখী সুলোচনার সঙ্গে হালকা পরিহাস করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। অন্য দিকে তিনি জরৎকারুর বল্লভ; মৃত্যুমুহূর্তে প্রেমার্তা নাগকন্যাকে বক্ষে গ্রহণ করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। ১৯শ শতাব্দীর মানববাদ এবং য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শকে নবীনচন্দ্র পৌরাণিক আদর্শের সহিত মিলাইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যত্রয়ী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গচ্ছলে উক্ত "The Mahabharat of the nineteenth century" অতি নিদারুণভাবে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের মতো শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া সুভদ্রার আর্তের সেবা এবং মদালসার মতো পুত্র অভিমন্যুর নিকট গীতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা, সুলোচনার সঙ্গে নারীধর্ম আলোচনা, পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতেও নিষ্কাম নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্নতা তাহাকে রক্তমাংসের মানবী করিতে পারে নাই। শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্ব তাহার চরিত্রে রূপ গ্রহণ করিয়াছে—এই মাত্র।

নবীনচন্দ্র সুভদ্রা চরিত্রে ১৯শ শতাব্দীর নারী জাগরণের আদর্শটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। গার্হস্থ্য জীবনাদর্শই যে নারী জীবনের একমাত্র আদর্শ নহে, জননী জায়া ছাড়াও নারীর যে আর একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে,—যে রূপে সে পুরুষের সহধর্মিণী নহে, তাহার যোগ্য সহকর্মিণী—সুভদ্রার সেবাব্রতে তাহারই সমর্থন পাওয়া যাইবে। বাঙলা দেশে ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রধানতঃ ব্রাহ্ম মহিলাদের প্রচেষ্টায় নারী স্বাতন্ত্র্যের স্বল্প বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবি কোন কোন বিষয়ে অশোভনভাবে 'ব্রাহ্মিকাদের' ব্যঙ্গ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুভদ্রার চরিত্রে নারী জাগরণ ও নারীর

সামাজিক সত্তার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে নারী স্বাতন্ত্র্য ও নারী জাগরণের বিশেষ আন্দোলন দেখা যায় না। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে জন স্টুয়ার্ট মিল্ *The Subjection of Women* গ্রন্থে এ বিষয়ে শিক্ষিত সহৃদয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংলণ্ডে নারীর ভোটাধিকার লইয়া আন্দোলন দেখা দেয় ১৯১৮ সালে। তৎপূর্বে ১৮৮৬ সাল হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে হাউস অব কমন্সে ছয়বার নারীর ভোটাধিকার সম্পর্কিত বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার প্রতিবাদে ইংরাজ মহিলারা 'সাফ্রাজেট্' ('Suffragette') নামক উগ্র আন্দোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ১৯১৮ সালে মহিলাদের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং পরিশেষে ১৯২৮ সালে স্ত্রীপুরুষের ভোটাধিকারগত সমস্ত পার্থক্য বিদূরিত হয়। আমেরিকায় এ আন্দোলন গ্রেটবৃটেনের কিছু পূর্বেই সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ১৮৬৯ ও ১৮৯৩ সালে আমেরিকার দুইটি প্রদেশে নারী ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯২০ সালে আমেরিকায় স্ত্রীপুরুষের সমান ভোটাধিকার গৃহীত হয়। সুতরাং ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশে বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যে নারী-স্বাধীনতা ও নারী-আন্দোলন লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহার মূল্য নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। নবীনচন্দ্র সেই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়া নারীসমাজের স্বাতন্ত্র্য ও নারীর বৃহত্তর সামাজিক কর্তব্যের পূর্ণ স্বরূপটিকে সুভদ্রার আদর্শের মধ্যে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন, অনেকটা সফলকামও হইয়াছেন।

সার ফিলিপ সিড্‌নের মতো অভিমন্যুর মুমূর্ষু সৈনিককে নিজ তৃষ্ণার জলদান আদর্শ হিসাবে মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু বহুকথিত বিলাতী গল্পের অক্ষম পুনরাবৃত্তি মাত্র। সর্বোপরি কৃষ্ণলীলাবসানে "হরিকুলেশ" (Hercules) বলরামকে লবণ সমুদ্রের উত্তরপূর্বতীরে * নব কৃষ্ণধর্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করিবার কাহিনী ঐতিহাসিক রূপকথা বলিয়া মনে হইবে। এ সম্বন্ধে তিনি যে নজির তুলিয়াছেন তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকের নিকট নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

কবিকে কোন কোন দিক দিয়া প্রশংসা করা উচিত। নবীনচন্দ্র ১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, স্বাদেশিকতা, যুক্তিবাদ, মানবমুক্তির বাণী—প্রভৃতি আধুনিক জীবনাদর্শকে তাঁহার ত্রয়ী মহাকাব্যে স্থান দিয়াছেন। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, আবেগোচ্ছল ভক্তিবাদ প্রাধান্য পাইয়া কবির নূতন আদর্শকে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে দেয় নাই। তিনি যদি মহাভারতকে বা স্তবিক 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতের' রূপ দিতেন, প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শকে কাব্যের অনুরোধে এবং তদানীন্তন সামাজিকতার প্রয়োজনে পুরাতন কাহিনীকে আধুনিক আদর্শের দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া লইতেন, তাহা হইলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ থাকিত না। প্রত্যেক বড় প্রতিভার কবি তাঁহার দেশকালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন ; আমাদের কবিও ১৯শ শতাব্দীর বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার হইতে প্রচুর উপাদান গ্রহণ করিলে প্রাচীন মহাভারতের আধুনিক রূপান্তর কৌতূহলজনক হইত সন্দেহ নাই। তিনি 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রে' ১৯শ শতাব্দীর আদর্শ স্বীকার করিলেও 'প্রভাসে'র আবেগমত্ততার জন্য যুক্তির কূল ছাড়িয়া ভক্তির অকূলে পড়িয়াছেন।

* ভূমধ্যসাগর ?

তাঁহার তিনখানি কাব্য হইতে ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালী সমাজের গতিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যাইবে। কৃষ্ণের জীবনে মানবতার আদর্শ সার্থক হউক আর নাই হউক, কবি এই আদর্শটিকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বস্তুতঃ ১৯শ শতাব্দীতে পৌরাণিক আদর্শকে গ্রহণ করা হইলেও পুরাতন রীতিকে পুরাপুরি মানিয়া লওয়া হয় নাই। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যদের কৃষ্ণের মানবলীলা কীর্তন, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে মানবতা আবিষ্কার প্রভৃতি ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানবধর্মের সাধনা বৃথা হয় নাই। ইঁহারা পৌরাণিক ঐতিহ্যের অবিকল পুনরাবৃত্তির চেষ্টা না করিয়া আধুনিক ভাবধারার দ্বারা প্রাচীন আদর্শকে শোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আবেগব্যাকুল চিত্ত ও ভক্তিপ্রবণতা এই বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে নাই।

সর্বশেষে নবীনচন্দ্র-পরিকল্পিত 'সুখতত্ত্বের' কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। ১৯শ শতাব্দীতে নানা আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর মনে কর্তব্যাকর্তব্য, নৈতিক জীবন, জীবনসম্মুখ সুখদুঃখতত্ত্ব, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোথাও সংশয়, কোথাও বীতরাগ, কোথাও-বা গভীর আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। একদিকে কাণ্টের *Kategorischer Imperativ* (Categorical Imperative) অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রী বিবেকবাদী চৈতন্যের নৈতিক বিধান, অপর দিকে ঐহিক সুখবাদী হেডোনিস্ট্‌বাদ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চতর সুখতত্ত্ব বা এপিকিউরিয়ান মত। প্রাচীন গ্রীসের হেডোনিস্ট্‌রা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ঐহিক সুখের পরিতৃপ্তিকেই সুখতত্ত্বের চূড়ান্ত পরিণতি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এপিকিউরাস (খ্রীঃ পূঃ ৩৪১—২৭০ অব্দ)-এর মতে মানুষের মতো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে ঐহিক সুখ লইয়া দীর্ঘকাল জীবনযাপন করা যায় না। তাই তিনি *Algedonic* (অর্থাৎ দুঃখসুখ)-এর সঙ্গে মার্জিত, কর্তব্যপরায়ণ বুদ্ধি ও বিবেকের সংযোগসাধন করিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের পারবশ্য হইতে মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকে রক্ষা করেন। অপর দিকে ১৯শ শতাব্দীর ইউটিলিটেরিয়ানগণ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোত্তম সুখ ও কল্যাণকেই মানুষের সামাজিক অগ্রগতির মূলমন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং বাঙলাদেশে ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ শেষাংশে কর্তব্যবুদ্ধি ও সুখবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া মতদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছিল। ঔপনিষদিক তত্ত্বদর্শন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেও শিক্ষিত হিন্দুসমাজে গীতার নিষ্কাম কর্মবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে কোঁৎ-মিলের ভক্ত হইলেও শেষজীবনে ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্‌-কে 'উদরদর্শন' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কারণ যে জীবকল্যাণ ও সুখতত্ত্বের সঙ্গে নৈতিকবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত নাই, সমন্বয়কামী বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী জীবনে তাহাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি প্রবৃত্তির বল্‌গাহীন অভিযানকেও ঘৃণা করিয়াছেন, প্রবৃত্তির উন্মূলনকেও প্রশংসা করিতে পারেন নাই। সর্ববিধ প্রবৃত্তির যথোপযুক্ত চরিতার্থতাই পরম পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ। কারণ শাক্যসিংহ ও যিশু খ্রীস্টের মতো বাসুদেব জীবনকে খণ্ডিত করিয়া দেখেন নাই; শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শের মধ্যে মানব-প্রবৃত্তির সুস্থ ও সমানুপাতিক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

কবি নবীনচন্দ্র সুখতত্ত্ব লইয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে'

এ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'রৈবতকে'র তৃতীয় সর্গে ব্যাসদেব কৃষ্ণকে "সর্বত্র অনন্তপ্রীতি" স্থাপনের অনুরোধ করিয়াছেন; ইহাও একপ্রকার বিবেকমার্জিত মানবিক সুখবাদ। এই কাব্যের সপ্তদশ সর্গে কৃষ্ণ এই সুখতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অর্জুনকে বলিয়াছেন,

জগতের সুখ যাহা
আমাদের সুখ তাহা,—
সকলে জগৎ সুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ-অধিষ্ঠান।

এখানে লক্ষণীয় যে, কৃষ্ণের মতে জগৎকল্যাণে আত্মত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মসাধনাই সুখতত্ত্বের মূলপ্রেরণা, সমষ্টির সুখের জন্য ব্যষ্টির সুখবিসর্জনই যথার্থ সুখ।

এক ধর্ম এক জাতি,
এক রাজ্য এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি - সর্বভূত হিত -

ইহাই কৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি। 'কুরুক্ষেত্রের' দ্বিতীয় সর্গ ('নারীধর্ম'), দ্বাদশ সর্গ ('সুখতত্ত্ব') এবং ত্রয়োদশ সর্গে ('সম্মিলন') সুভদ্রা ও ব্যাসদেবের উক্তির সাহায্যে নবীনচন্দ্র সুখতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বধর্মসাধনই পরমপুরুষার্থ এবং পুরুষার্থই সুখাভিমুখে লইয়া যায়। "মিত্রকে যে ভালবাসে সকাম সে ভালবাসা, সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার"—সুভদ্রা নিষ্কাম প্রীতিকেই সুখতত্ত্বের প্রকৃত পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ব্যাসদেবকে এই সুখতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,—
একমাত্র ধর্ম সনাতন
মানবের গৃহে, বনে; ধর্মক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর,—
বন নহে,—গৃহের প্রাঙ্গণ।
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ এই ধর্মপথে
কিবা অবলম্বন সুন্দর।
তাহে ভর করি' উঠি' দেখে সুখস্বর্গ নর,
নারায়ণ সুখের সাগর।

'কুরুক্ষেত্রে'র ত্রয়োদশ সর্গে সুভদ্রা শৈলজাকে সুখতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের সুখতত্ত্ব তাহাতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে—

শৈলজা—কারে বল মনুষ্যত্ব ?
সুভদ্রা— চরিতার্থতায়
বিহঙ্গবৃত্তির বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের।
মানুষ কি লয়ে বল মানুষ, ভগিনি ?—
আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়

এ তিনের মনুষ্যত্ব। যেই নীতিচয়
শারীরিক, মানসিক ; বৃত্তি আধ্যাত্মিক,
—মানবের মানবত্ব,—করিছে ধারণ,
তাহাই মানবধর্ম। স্বধর্ম পালনে,
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়,
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব, সুখ নিরমল।

আত্মা-মন-কলেবরের নিষ্কাম চরিতার্থতা, শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক বৃত্তির অনুশীলন, স্বধর্ম পালন—ইহাই শেষ পর্যন্ত মানুষকে নির্মল সুখের পথে লইয়া যায়। সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের আবরণভঙ্গ এবং বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ--নবীনচন্দ্রের মতে ইহাই যথার্থ সুখ। বলাই বাহুল্য যে, ১৯শ শতাব্দীর এই জাতীয় নৈতিক ও দার্শনিক চেতনা শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্বে' অনুশীলন ধর্ম বা *Religion of Culture* অর্থে এই তত্ত্বকেই সামাজিক ও দার্শনিক পটভূমিকায় ব্যবহার করিয়াছেন। এই যে অনুশীলন ধর্ম অর্থাৎ সর্ববিধ মানববৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন—ইহা ১৯শ শতাব্দীর বাঙলাদেশের একটা বড় প্রেরণা, এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য কাব্য হিসাবে সাফল্য লাভ না করিলেও ১৯শ শতাব্দীর যুগমানসের নানা বাণীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার কাব্যত্রয় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার যোগ্য।

অ-কু-ব

রৈবতক

(প্রথম প্রকাশ—১৮৮৭)

শ্রীশ্রীহরিঃ

১লা ভাদ্র, ১২৯৩ সন।

ভাই ঈশান!

এই এক বৎসর কাল পরে রৈবতকের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইতে চলিল। আমি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তুমি দয়া করিয়া মুদ্রাঙ্কন-কার্য পরিদর্শনের ভার গ্রহণ না করিলে, রৈবতক আরও কত কাল মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ-কবলে কবলিত থাকিত, বলিতে পারি না। তোমার মত বন্ধুর স্নেহ ও স্মৃতি যে এরূপে রৈবতকের অঙ্গে জড়িত হইয়া রহিল, আমার একটি অতীব সুখের বিষয়।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহাভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং বৌদ্ধ-ধর্মের আদিতীর্থ "গিরিব্রজপুর" বা আধুনিক "রাজগৃহে" রাজকার্যে অবস্থানকালে স্থানমাহাত্ম্যে উদ্বেলিতহৃদয়ে কাব্য-জগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর একবার পাঠ করি। সেই অবস্থায় তথায় দেখিলাম, গিরিব্রজপুরের সেই পঞ্চগিরি ব্যূহ, প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধের রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ, বন্ধুর উপলরাশির মধ্যে সেই ভারত-খ্যাত রঙ্গভূমির মসৃণ মৃত্তিকা পর্যন্ত, এখনও বর্তমান রহিয়াছে। ভগবান যে স্থানে "পঞ্চানন নদ" পার হইয়া গিরিব্রজপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখনও প্রতি বৎসর সে স্থানে সহস্র সহস্র নর-নারী অবগাহন করিয়া, আপনাদের জীবন পবিত্র করিয়া থাকে। যে "উরুবিল্ব" নামক গিরিকক্ষে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ থাকিতেন, যে কক্ষে তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধ-ধর্মের আদি নীতিমালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সে পবিত্র কক্ষ এখনও দর্শকের হৃদয় পবিত্র করিতেছে। মহারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল উপত্যকার, সেই শেখরমালার, অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে —সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান্ বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানবজাতির—উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম,—পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত, এবং মধ্যভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার প্রথমাংশ রচিত হইল।

ভাই! আমি জানি—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

তবে জানিয়া শুনিয়া আমার সাধ্যাতীত এরূপ একটি কর্মে হস্তক্ষেপ করিলাম কেন?

উত্তর—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

কথাটি প্রাচীন; কিন্তু বড় গভীর, বড় ভক্তিপূর্ণ, বড় উৎসাহ ও শান্তিপ্রদ।

তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

নবীন

প্রথম সর্গ

প্রভাস

"লক্ষ্মীপূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে"—
প্রভাসের তীরে বসি কৃষ্ণ ধনঞ্জয়,
শিলাসনে ধ্যানমগ্ন। স্থানে স্থানে স্থানে
দুই পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বসি ঋষিগণ,—
স্থির, অচঞ্চল। যেন চারু শিল্পকর
বেদীর প্রস্তর হ'তে তুলেছে কাটিয়া
পবিত্র মূরতিচয়, মহিমামণ্ডিত।
পূরব গগন পানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
স্থিরনেত্রে, মুগ্ধচিত্তে, চাহি আত্মহারা।

কৃষ্ণ

লক্ষ্মীপূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে,
সৃষ্টির প্রথম অঙ্ক করি অভিনয়,
দেখ পার্থ, সিন্ধুগর্ভে উঠিছে কেমন!
পদ্মমুখী পদ্মালয়া ধীরে ধীরে
উঠিলা যেমতি রঞ্জি রূপের বিভায়
নীলসিন্ধু, নীলাকাশ, শ্যামল ধরায়।
হাসিল যেমতি সেই রূপের পরশে
নারায়ণ নীলবক্ষ, হাসিতেছে দেখ
উষার প্রথমালোকে সুনীল গগন,
সুনীল বারিদপুঞ্জ স্তরে স্তরে স্তরে—
স্থির বিজলীতে যেন চিত্ত বিভাসিত!
হাসিতেছে নীল সিন্ধু;—চারু নীলিমায়
কেমন সে হাসি, আহা! যাইছে মিশিয়া!
মধুর অস্ফুটালোকে কি দৃশ্য মহান্
দেখ, পার্থ! ধীরে ধীরে হতেছে বিকাশ,—
নীল সিন্ধু, শ্বেত বেলা, ধূসর আকাশ!
দেখ সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ কেমন
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে,—বিরাট মূরতি!
সত্ত্ব ব্যোম, রজঃ বেলা, তমঃ পারাবার!

অর্জুন

কি গভীর দৃশ্য! অহো! অচল হৃদয়ে
কি গাম্ভীর্য, পবিত্রতা দিতেছে ঢালিয়া!
সম্মুখে অসীম সিন্ধু; অর্ধ-চন্দ্রাকারে
মিশিয়াছে মণ্ডলার্ধ মহাশূন্য সনে।
পশ্চাতে সসীম বেলা; দীর্ঘ প্রান্তদ্বয়
মিশিয়াছে মহাশূন্যে,—কি দৃশ্য গভীর!
জগতের আদি অন্ত উভয় সমান,—
আদি শূন্যে! অন্ত শূন্যে!

কৃষ্ণ

শূন্যে অবস্থান!
মহা যাত্রা শূন্য হ'তে শূন্যেতে প্রস্থান!
সত্য, পার্থ! জগতের প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়।
অনন্তে অন্তের ক্রীড়া, চির সম্মিলন!
এই ক্রীড়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কারণ।
স্থাবর জঙ্গম সব এ ক্রীড়া-প্রসূত;
স্থাবর জঙ্গম সব এই ক্রীড়া-রত;
স্থাবর জঙ্গম সব এ ক্রীড়ায় হত।
অহো কি রহস্য! ক্ষুদ্র —ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
পতঙ্গ হইতে সৌর জগত মহান্,
এই মহা সিন্ধু, ওই মহা মেঘমালা,
সকলি এ ক্রীড়া-রত। সকলই এক
অনন্ত অচিন্ত্য মহাশক্তি সঞ্চালিত।
প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব রজঃ তমঃ
কিন্তু সিন্ধুনীরে ওই বীচিমালা মত,
এ শক্তিতে গুণত্রয় হয় পরিণত।
এই শক্তি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান;
প্রকৃতি এ শক্তি; এই শক্তি ভগবান!
মহাদৃশ্য! মহাধ্যান! নীরবে উভয়
রহিলা সে ধ্যানমগ্ন। চিন্তার প্রবাহ

অনন্তের মহাগর্ভে প্রবেশে যখন,
ভাষা তার—নীরবতা! শরতের মেঘ
অনন্ত আকাশগর্ভে মিশায় যখন,
ভাষা তার—নীরবতা! নীরবতা ভাষা.
পতঙ্গ সাগরগর্ভে পতিত যখন!
উভয় নীরব। স্থির নীরব প্রকৃতি।
কেবল প্রভাতাকাশে স্তরে স্তরে স্তরে
ভাসিছে শারদ মেঘ; স্তরে স্তরে স্তরে
শারদ তরঙ্গমালা নাচিছে সাগরে।
গর্জিছে গম্ভীর সিন্ধু, করি দিঙ্‌মণ্ডল
ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে প্রতিধ্বনিময়।
লহরে লহরে উর্মি আসি ভক্তিভরে,
শ্বেত ফেনপুষ্পাঞ্জলি করি বরিষণ,
প্রণমিয়া বেদীমূল যাইছে সরিয়া।
কচিৎ সমুদ্রবাহী প্রথম অনিলে
ধ্যানমগ্ন ঋষিদের উড়িতেছে ধীরে
উত্তরীয়, উপবীত, শ্বেত শ্মশ্রুরাশি।

অর্জুন

দেখ দেখ, বাসুদেব! হঠাৎ কেমন,
সমুদ্রের পূর্ব প্রান্ত উঠিল জ্বলিয়া!
বাড়ব অনল এ কি? কিম্বা দিক্ দাহ?
সে বহ্নি কেমন, দেখ, লহরে লহরে
ছড়াইছে সিন্ধুনীরে, ধূসর আকাশে!
একটি সিন্দুররেখা, দেখিতে দেখিতে,
মরি, মরি, কি সুন্দর, উঠিল ভাসিয়া,
সেই বহ্নিরাশিমাঝে! তরঙ্গে তরঙ্গে
কেমন ভাসিছে তাহা নিবিয়া জ্বলিয়া!
ক্রমে স্থূল,—স্থূলতর,—এবে সুবঙ্কিম।
তপ্তস্বর্ণ ধনু ধরি, স্বর্ণ শরমালা
ছড়াইছে সিন্ধু যেন বিচিত্র কৌশলে
পয়ঃশোষী মেঘদলে। দেখ এইবার
কি সুন্দর অর্ধচন্দ্র! আবার এখন
সিন্দুর কলসী মত খেলিছে কেমন
সুনীল লহরী সনে নাচিয়া নাচিয়া,
গ্রীবামাত্র পরশিয়া সমুদ্রসলিল!
মিশাইল গ্রীবা; দেখ এইবার রবি
উঠিলেন নীলাকাশে ঝলসি নয়ন।
একেবারে ঋষিদের বহু শঙ্খ মিলি,
নবোদিত প্রভাকর করি আবাহন,
উঠিল ধ্বনিয়া। সেই প্রফুল্ল নিক্কণ
গম্ভীর জলধিমন্দ্রে না হইতে লয়,
আরম্ভিলা ঋষিগণ স্তব সুগম্ভীর!

সৌরাষ্টক

১

পবিত্র গগনে পবিত্র কিরণে,
পবিত্র ভাস্কর ওঁ
নব সমুদিত, বিশ্ব আলোকিত,—
নমো দিবাকর ওঁ!

২

জগত-নয়ন, জগত-জীবন,
জগত-ধারণ ওঁ।
জগত-পালন, জগত-ধ্বংসন,
নমস্তে তপন ওঁ!

৩

তোমার পরশে, ফুটে পুষ্পরাজি,
উপজে প্রস্তর ওঁ!
শোষে সিন্ধুনীর, বরষে বারিদ,—
নমো বিভাকর ওঁ!

৪

গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত অসংখ্য,
ভ্রমে নিরন্তর ওঁ!
বেষ্টিয়া তোমায়,— দাস উপদাস,—
নমঃ প্রভাকর ওঁ!

৫

ঐন্দ্রজালিক— গোলক যেমন,
জ্যোতিষ্কমণ্ডল ওঁ!
ভ্রমে শত শত, নাহি সংঘর্ষণ,
নমঃ কি কৌশল ওঁ!

৬

হেন সৌর রাজ্য, করি আকর্ষণ
ভ্রম অনির্ঘাত ওঁ!
সহস্র যোজন মুহূর্তে মুহূর্তে,—
নমো দিননাথ ওঁ!

৭

অনন্ত হইতে, ছুটিছ অনন্তে;
অনন্ত গরভে ওঁ।
অনন্ত শকতি, অনন্ত ভ্রমণ
অনন্ত গৌরবে ওঁ।

৮

তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা,
বিশ্ব চরাচর ওঁ।
পাপ বিনাশিয়া লও পুণ্য-পথে,—
নমো দিবাকর ওঁ!

আবার ধ্বনিল শঙ্খ। না হতে লয়
কম্বুকণ্ঠ, কৃষ্ণকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া—
তেমতি গগনস্পর্শী, তেমতি গভীর।

মহাষ্টক

ওঁ

পবিত্র গগনে, পবিত্র তপনে,
পবিত্র সাগরে ওঁ।
যাঁহার মহিমা, নিত্য বিভাসিত;—
নমো বিশ্বেশ্বর ওঁ!

২

ক্ষুদ্র সূর্য এই, গ্রহ উপগ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম ওঁ।
ক্ষুদ্র বিশ্ব তব অনন্ত সাগরে,—
নমো নারায়ণ ওঁ।

৩

শত শত সূর্য, সৌর রাজ্য শত
শত সংখ্যাতীত ওঁ।
ছুটিছে অনন্তে, অনন্ত বিদারি,—
নমশ্চিন্তাতীত ওঁ!

৪

অনন্ত দিকেতে, অনন্ত গতিতে
নিত্য সঞ্চালিত ওঁ।
অনন্ত সঙ্গীতে, অনন্ত প্লাবিত,—
নমো জ্ঞানাতীত ওঁ!

৫

অহো! কিবা দৃশ্য! অনন্ত বসুধা,
অনন্ত ভাস্কর ওঁ,
অনন্ত নক্ষত্র, অনন্ত ঝলসি,—
নমো জ্যোতীশ্বর ওঁ!

৬

দিবস যামিনী, হেমন্ত বসন্ত,
ঋতু বিপরীত ওঁ,
শূন্য বিচিত্রিয়া, নিত্য বিরাজিত,—
নমঃ কালাতীত ওঁ!

৭

নিত্য রূপান্তর, নিত্য স্থানান্তর,
নিত্য গুণান্তর ওঁ
যার শক্তি বলে, বিশ্ব চরাচর,—
নমঃ শক্তীশ্বর ওঁ!

৮

ক্ষুদ্র পুষ্প-রেণু, প্রচণ্ড শিখর,
অনন্ত সাগর ওঁ,
যাঁহার অচিন্ত্য শকতি-দর্পণ,—
নমো মহেশ্বর ওঁ!

গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি প্লাবিল গগন,
ভাসিল সমুদ্রমন্দ্রে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে
ছুটিল তরঙ্গপৃষ্ঠে দিগ্ দিগন্তরে।
ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে, মহা জলধি-হৃদয়ে,
সেই মহাধ্বনি সহ শত শঙ্খধ্বনি,
ভাসিল সমুদ্রবাহী প্রভাত-অনিলে।
শঙ্খকণ্ঠ, সিন্ধুকণ্ঠ, নরকণ্ঠ মিলি,
সেই ধ্বনি, সেই ধ্যান, সে দৃশ্য মহান্!—
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভরিল হৃদয়।
ধ্যানান্তে দুর্বাসা ঋষি শিষ্যগণ সহ,
কৃষ্ণার্জ্জুনে সম্ভাষিতে আসি ধীরে ধীরে,
বেদীর পশ্চাৎ হ'তে কহিলা মধুরে —
"হে কৃষ্ণ! দুর্বাসা ঋষি আশীর্বাদ করে।"
একচিত্তে কৃষ্ণার্জ্জুন চাহি সিন্ধু পানে,
আত্মহারা, চিন্তামগ্ন.—চেতনাবিহীন।

কৃষ্ণ

হায় অন্ধ উপাসক! হেন মহাশক্তি
নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে,
সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর—
জ্ঞানহীন, ইচ্ছাহীন, নিয়মের দাস!
যাহার উদয়, অস্ত, শূন্য-পর্যটন,
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন; হেন প্রভাকরে
পূজিবে বীরেন্দ্র! কেন চেতন মানবে?
"অন্ধ উপাসক! পাপি! বিধর্মী নাস্তিক!"—
ক্রোধে দন্তে দন্ত কাটি কহিলা দুর্বাসা—
"হে কৃষ্ণ! দুর্বাসা ঋষি আশীর্বাদ করে।"

কৃষ্ণ

তরঙ্গতাড়িত ওই বালুকার মত,
তপন অনন্ত শূন্যে হতেছে তাড়িত।
সমান নিয়মাধীন, সমান সৃজিত
উভয়; উভয় অন্ধ; চেতনাবিহীন;
উভয় দুর্জ্ঞেয়। তবে পূজিলে তপন,
না পূজিবে কেন নর ক্ষুদ্র বালুকায়!

দুর্বাসা

হে পার্থ! দুর্বাসা আমি আশীর্বাদ করি।

কৃষ্ণ

মানব! চেতনাযুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন,
জড় ওই সূর্য হ'তে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃষ্ট ও চালিত এই বিশ্ব চরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে যাহার,
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর!
ক্ষুদ্র বালুকণা, আর প্রচণ্ড তপন,
এই মহা সিন্ধু, আর এই বসুন্ধরা,—
সেই জ্ঞান সাক্ষী, সেই জ্ঞান মূর্তিমান!
দেখ, পার্থ, বিশ্ব-রূপী বিষ্ণু ভগবান
অনন্ত, অসীম!
ক্রোধে গর্জ্জিয়া তখন
কহিলা দুর্বাসা—"মূঢ় কৃষ্ণ ধনঞ্জয়!
আমি দুর্বাসায় তুচ্ছ! লও অভিশাপ—
'যাদব কৌরবকুল হইবে বিনাশ!'"
ভাঙ্গে যথা অকস্মাৎ তন্দ্রা পথিকের
শুনিয়া শিয়রে ঘোর গোক্ষুরগর্জন,
হঠাৎ ভাঙ্গিল ধ্যান। পার্থ বাসুদেব
ত্রস্তে ফিরাইয়া মুখ দেখিলা বিস্ময়ে,—
ক্রোধভরে ঋষি কেহ যাইছে ছুটিয়া
বেগে শিষ্যগণ সহ। ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন বাসুদেব—"দেখ ধনঞ্জয়!

ব্রাহ্মণের অত্যাচার। কথায় কথায়
অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
শার্দ্দূল যেমন ভাবে প্রাণিমাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য; তেমনি ইহারা
ভাবে অন্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের।
বিনা দোষে, অকারণে করিবে দংশন
অভিশাপ বিষদন্তে; নাহি কি হে কেহ,—
ব্রাহ্মণ-রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ,
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে,
তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন ?"
পার্থের অচলা ভক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি,-
দেখিলা মহর্ষি তাহে,—কহিলা কাতরে—
"বাসুদেব! যদি তুমি দেও অনুমতি
ক্রুদ্ধ মহর্ষিরে আমি আনি ফিরাইয়া।
একে ধ্যানে চিন্তামগ্ন ছিলাম আমরা,
অন্য দিকে এই মহা জলধিগর্জন,
শুনি নাই কেহ অভিবাদন ঋষির।
তাহে এত ক্রুদ্ধ ঋষি; ব্রাহ্মণের ক্রোধ
আশু স্তুতিবাদে কৃষ্ণ! হইবে শীতল।
কি দারুণ শাপ!"
কৃষ্ণ কহিলা হাসিয়া—
"অর্জুন! বালক তুমি। নরের অদৃষ্ট
ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যদ্যপি,
আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান।
উঠিতেছে বেলা। আছে পথ নিরখিয়া—
রৈবতকে পরিজন তব প্রতীক্ষায়।"

দ্বিতীয় সর্গ

ব্যাসাশ্রম

কৃষ্ণ

পবিত্র আশ্রম! দেখ পবিত্র শিখর
রৈবতক স্থিরভাবে,
সুনীল আকাশপটে
স্থাপিয়া শ্যামল বপুঃ,—শান্ত প্রীতিকর,-
সমাধিস্থ প্রকৃতির মহা যোগিবর!
বেষ্টিয়া আশ্রমপ্রান্ত অর্ধচন্দ্রাকারে
ছুটিয়াছে শৈলশ্রেণী উত্তরে দক্ষিণে
নানা অবয়বে। কভু উচ্চ, কভু নীচ,
কভু বা তরঙ্গায়িত আকাশের পটে।
কোথাও প্রাচীর মত
দুরারোহ শৈল-অঙ্গ,
আবার কোথাও পড়েছে ঢলিয়া
সমতল শস্যক্ষেত্রে তরঙ্গ খেলিয়া।

অর্জুন

এই তীর্থ পর্যটনে করেছি দর্শন
বহু তপোবন, কিন্তু এমন সুন্দর,
এমন মহিমাময়
পবিত্র স্বভাবশোভা,
প্রীতিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, দেখিনি এমন—
যেমন মহর্ষি ব্যাস, যোগ্য তপোবন!
কি সুন্দর শত শত বিটপী বল্লরী,
অশোক, কিংশুক, বক, চম্পক, শিরীষ,
কদম্ব, কাঞ্চন, নিম্ব, দাড়িম্ব, বকুল,
পনস, বদরী, বিল্ব, আম্র, আতা, জাম,
ফলবান্ পুষ্পবান্, তরু মনোহর
অধিত্যকা উপত্যকা করি আচ্ছাদিত,
কেহ ফলে, কেহ ফুলে, পল্লবে, মুকুলে
সাজায়ে শ্যামল অঙ্গ, আছে চিত্রার্পিত।
মরি কিবা স্বভাবের বিশৃঙ্খল শোভা!
প্রথম প্রহর বেলা। বালসূর্যালোকে
কোথাও বিশাল বট বিটপী-ঈশ্বর,
প্রসারি পল্লব-ছত্র আছে দাঁড়াইয়া,
সৃজি ছায়াতলে শাখা কক্ষ মনোহর!
স্থানে স্থানে রাজমন্ত্রী অশ্বত্থ, তমাল,
করিছে কানন-রাজ্য-মহত্ত্ব বর্ধন।
দূরদর্শী, শীর্ণকায়, জটাজুট শির
কানন-সমাজ হ'তে বহু ঊর্ধ্বে তুলি,
দাঁড়ায়ে খর্জুর, তাল, বন-ঋষিদ্বয়,
ধ্যানে অবিচল দেহ নির্বাক উভয়।
কেবল কখন বনকুক্কুটের ধ্বনি,
তীব্র শিখিকণ্ঠ, তীব্র কুরঙ্গনিনাদ,
কভু ক্রীড়াসক্ত ঋষি-শিশু কণ্ঠাভাস—
ছিন্ন বাঁশরীর তান,—প্রতিধ্বনি তুলি
কি মধুরে গিরি-অঙ্গে যাইছে উছলি!
কানন-বিহঙ্গ কোথা পত্রে আবরিত
বরষিছে কিবা শান্তি, কি সুধা সঙ্গীত!

কৃষ্ণ

ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব!
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস!
সংসার-সমুদ্রে তীর! আকাঙ্ক্ষা-লহরী-
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা কভু সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনা বৃক্ষে; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টকবৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দাহন।
ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে

স্বর্গের প্রতিকৃতি! কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে; জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা আঁধারে! নীরব, নির্জন,
এই তপোবন হ'তে যখন যে জ্যোতিঃ,
পার্থ! হয় বিনির্গত, সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হতেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ, সকলি—সকলি—
নীরব, নির্জন এই আশ্রমপ্রসূত।
ভারত সমাজদেহ; আশ্রমনিচয়
তাহার হৃদয়যন্ত্র; মস্তক তাহার
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম।
ওই যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেখিছ সম্মুখে
সানুদেশে মহা বট,
চিত্রিয়া আকাশ পট
শোভিতেছে মরকত মুকুটের মত।
সেই মহা 'যোগশৃঙ্গ' বিখ্যাত ভারতে।
মহর্ষি বসিয়া তথা সায়াহ্নে, প্রভাতে,
অনন্ত সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে
অনন্ত জ্ঞানের সিন্ধু করেন মন্থন।
শৈলসুতা "সরস্বতী" সেই শৃঙ্গ হ'তে
অবতরি গিরিপার্শ্বে,—স্থানে স্থানে স্থানে
সুন্দর সলিলখণ্ড করিয়া সৃজন,
ভ্রমিতেছে গিরিমূলে কাননছায়ায়,
বহু নির্ঝরের কর করিয়া গ্রহণ।

আশ্রমের কি মাহাত্ম্য দেখ, বাসুদেব!
কুরঙ্গ, শশক, মেষ, অজ, নীল গাভী,
চরিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়হৃদয়।
নির্ভয়হৃদয়ে দেখ চরিছে কেমন
ময়ূর, কুক্কুট, ঘুঘু, কপোত, শালিক,—
বনচর পক্ষী নানা। কেমন সুন্দর
প্রীতিপূর্ণনেত্রে, দেখ, রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে গ্রীবা হেলাইয়া।

কৃষ্ণ

মহর্ষি ব্যাসের ওই "শান্তি-সরোবর"
দেখ পার্থ সম্মুখেতে কিবা মনোহর।
ঋষিশিশুগণ সহ নানা জলচর
খেলিতেছে কি আনন্দে! ভাই ভগ্নী মত
দেখ শিশুগণ কত করিছে আদর।
শিশুদের উচ্চ হাস্য, পক্ষিকলরব,
থাকি থাকি নানাবিধ মীন-আস্ফালন,
সরসী আনন্দপূর্ণ করিছে কেমন!
জলজ কুসুম তুলি, দেখ পরস্পরে
সাজাইছে কি কৌশলে; সাজিছে কেহ বা;
কেহ বা গাহিছে শুন কি মধুর স্বরে!
চারি তীরে মনোহর দেখ পুষ্পবন,
পুষ্পবনে পুষ্পময়ী ঋষিকন্যাগণ,—
ততোধিক মনোহরা! বল্কলে আবৃতা,
শোভিছে পল্লবে ঢাকা কুসুমিতা লতা।
কেহ তুলিতেছে ফুল; গাঁথিছে কেহ বা
চারু ফুলহার; কেহ আপনার মত
নিরাশ্রয়া বল্লরীরে দিতেছে আশ্রয়।
কেহ পুষ্পবৃক্ষমূলে যোগাইছে জল
মৃন্ময় কলসী কক্ষে; কেহ বা কেমন
সরল নয়নে দেখ রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে, কি দৃষ্টি শীতল!—
পূর্ণিমা গগন যেন চেয়ে ধরাতল।

অর্জুন

আশ্রমের অঙ্কে অঙ্কে পল্লবকুটীর
দেখ ঋষিদের, চারু অবয়বে কত
শোভিতেছে লতাবৃত বন গুল্ম মত।
কুটীরসম্মুখে ক্ষুদ্র মার্জিত প্রাঙ্গণ,
বেষ্টিত সুন্দর ক্ষুদ্র গুল্মের প্রাচীরে,

পুষ্পিত কুসুমে নানা,—শ্বেত, রক্ত, নীল,—
শোভিতেছে কি সুন্দর কারুকার্য মত,
প্রশস্ত কাননে নবদূর্বাবিমণ্ডিত।
প্রাঙ্গণের কোণে কোণে ঋষিপত্নীগণ
নানা কার্যে নিয়োজিতা,—কেহ পুষ্পপাত্র
সাজায় কদলীপত্রে; রাখিছে সাজায়ে
কেহ বা কদলীপত্রে বন ফল মূল।
স্থানে স্থানে তরুতলে বসি ঋষিগণ,—
কেহ ধ্যানমগ্ন স্থির; কেহ মগ্ন পাঠে;
লিখিছেন কেহ; কেহ নিমজ্জিত আর
অন্য ঋষি সহ শাস্ত্রালাপে সুললিত।
করিতেছে অধ্যয়ন ঋষিপুত্রগণ
স্থানে স্থানে; আশে পাশে নিঃশঙ্কহৃদয়
চরিতেছে বনপশু, বনপক্ষিচয়।
দেখি কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ক্ষুদ্র শিশুগণ
আসিল ছুটিয়া রঙ্গে করি কোলাহল।
বালক বালিকাগণ পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া
করিলেক অভ্যর্থনা। আধ আধ কণ্ঠে
পঞ্চমবর্ষীয় এক শিশু কর তুলি
কহে হাসি—"মহারাজ! আশীর্ব্বাদ কলি
হাসিলেন কৃষ্ণার্জুন। ক্রোড়ে করি তারে
পুষ্পনিভ মুখখানি চুম্বিলা আদরে।
কারো কর, কারো পৃষ্ঠ, চিবুক কাহার,
পরশিয়া হাসিমুখে পার্থ পীতাম্বর
জনে জনে শিশুগণে করিলা আদর
খাদ্য, বস্ত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়ার পুতুল,
দারুকের হস্ত হ'তে করিয়া গ্রহণ
বিলাইলা শিশুগণে। চলিলা উভয়ে
দেখিতে দেখিতে, রঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ
চলিল নাচিয়া করি পথ প্রদর্শন।
যাইতে যাইতে, কত ফুল, কত ফল,
কত ছাই পাঁশ, দেখাইল নিরন্তর,—
কত বৃক্ষ, কত লতা, পক্ষী মনোহর।
ভীষণ শার্দূল এক পথ আগুলিয়া
রহিয়াছে নিদ্রাগত। ত্রস্তে অর্জুনের
পড়িল কার্মুকে কর; হাসিয়া কেশব
কহিলেন—"আছে দুই পালিত শার্দূল
মহর্ষির, নাম তার 'সুশীল', 'সুবোধ',
ব্যাঘ্র জাতিমধ্যে শান্ত ঋষি দুই জন।
আশ্চর্য প্রীতির ধর্ম; হিংস্র মাংসাহারী
আপন স্বভাব ভুলি, শোণিতলোলুপ,
ফলমূলাহারী এবে!" জনৈক বালক
কহিল—"সুবোধ! পথ দেও হে ছাড়িয়া!"
মাথা তুলি, শান্তনেত্রে চাহি মুহূর্তেক
আগন্তুক পানে, ব্যাঘ্র করিয়া জৃম্ভণ,
সরি পাদদ্বয় পুনঃ করিল শয়ন।
একটি বালক গিয়া করি আলিঙ্গন
গায়ে বুলাইয়া হাত, বলিল—"সুবোধ!
বড় ভাল ছেলে তুমি।" আনন্দে শার্দূল
চাটিতে লাগিল ক্ষুদ্র অঙ্গ বালকের,
দাঁড়াইয়া কৃষ্ণার্জুন মূর্তি বিস্ময়ের।

কৃষ্ণ

দেখ দেখ ধনঞ্জয়! ওই তরুতলে
কি সুন্দরী ঋষিকন্যা বসি এক জন!
ক্ষুদ্র মৃগশিশু এক দেখ কি সুন্দর
খেলিছে যুবতী সঙ্গে! ছুটিয়া ছুটিয়া
কেমন ফিরিয়া পুনঃ লুকাইছে মুখ
যুবতীর চারু অঙ্কে,—চুম্বি চারু বুক!
দেখ ক্ষুদ্র পা দুখানি রাখি অংসোপরে
চাটিছে কেমন ওই অনিন্দ্য বদন,—
চুম্বিতেছে প্রতিদানে যুবতী কেমন!

অর্জুন

দক্ষিণে কেশব! ওই শেফালিকামূলে
দেখ কিবা চারু চিত্র! বসি একাকিনী
একটি যুবতী শুন
কি মধুর গুণ গুণ

গাহিছে ; গাঁথিছে মালা শেফালিকাফুলে।
রজতকুসুমনিভ ক্ষুদ্র পুষ্পরাশি,
যুবতীর চারি পার্শ্বে রয়েছে পড়িয়া
সংখ্যাতীত ; সংখ্যাতীত রয়েছে ঝরিয়া
পত্রে পত্রে কি সুন্দর!
মধুলোভে পুষ্পোপর
একটি ভ্রমর দেখ গুণ গুণ স্বরে
বসিতে চাহিছে যেই, একে একে একে
পত্র হ'তে ক্ষুদ্র পুষ্প পড়িছে ঝরিয়া
যুবতীর অঙ্গে অঙ্গে কি শোভা খুলিয়া!
আরক্ত বল্কলবাসে, বিমুক্ত অলকে,
অংসে, পৃষ্ঠে, অঙ্কে, ভুজে, হীরকের মত
শোভিতেছে পুষ্পরাশি। করি নেত্র নত
পুষ্পাস্থিতা, পুষ্পাবৃতা, পুষ্পমালা-কর,
শোভিছে কেমন পুষ্পরূপিণী সুন্দর!
"যোগ-শৃঙ্গ" হ'তে কলকলে "সরস্বতী"
যথায় পড়িতেছিলা রজত ধারায়,—
নীরস্তম্ভ পার্শ্বে উর্ধ্ব হস্ত পঞ্চাশৎ,
বসিলেন শিলাখণ্ডে কিরীটী কেশব।
আশে পাশে শিশুগণ বসিয়া আহ্লাদে
কতই সরল কথা—শিশুহৃদয়ের
শিশুভাব, শিশুভাষা বলিতে লাগিল।
চুপে চুপে কাণে কাণে কেহ বা কাহারে
কহিছে কি কথা। কোন শিশু বাখানিছে
কেশবের পীতাম্বর ; কেহ বা কুণ্ডল ;
কেহ কণ্ঠহার ; কেহ দেখে ভীতমন
ফাল্গুনীর গুণভ্রষ্ট মহাশরাসন।
কিছু দিন পূর্বে ভদ্রা এ'লে তপোবনে,
কোন্ শিশু তাঁর কাছে কেমন আদর
পেয়েছিল, জনে জনে কহিতে সুন্দর
বাজিল তুমুল রণ। একটি বালিকা
বাম করে জড়াইয়া কণ্ঠ অর্জুনের,
অন্যতর ক্ষুদ্র করে ধরিয়া চিবুক,
কহিল আহ্লাদে—"দেখ, সুভদ্রা জননী
কেমন সুন্দর বস্ত্র, কুণ্ডল, বলয়,
দিয়াছেন,—আমার যে নাহি মাতা পিতা!"
নিরাশ্রয় বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি,
সকরুণ ভাষা, তার দৃষ্টি সকরুণ,—
ভরিল পার্থের বুক, ভিজিল নয়ন।
ফিরায়ে বদন কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
"কে সুভদ্রা, বাসুদেব?" সজলনয়নে
উত্তরিলা যদুশ্রেষ্ঠ—"আমার ভগিনী,
সারণের সহোদরা, প্রাণের অধিক
আমি ভালবাসি তারে। স্নেহে ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক ; স্নেহসুধারাশি
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্বত্র সমান,
পালিত বনের পশু, বিহঙ্গনিচয়ে,
উদ্যান-কুসুমে,—সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা অজস্রধারায়।
যেইখানে রোগী, শোকী, ভদ্রা সেইখানে,
মূর্তিমতী শান্তিরূপা। অশ্রু যেইখানে,
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পলতা, আছে সেইখানে
সলিলরূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু, পক্ষী, দরিদ্র ভিক্ষুক,
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।
যথায় পুষ্পিত তরু বল্লরী উদ্যানে,
প্রকৃতির উপাসিকা সুভদ্রা তথায়
বসি আত্মহারা সুখে। যথা পক্ষিগণ
বসি তরুডালে গায় সায়াহ্ন কাকলী,
ভদ্রা আত্মহারা তথা। একদা, অর্জুন,
বহিছে ঝটিকা ঘোর রৈবতকশিরে
বিলোড়িয়া বনস্থলী ; আচ্ছন্ন গগন
নব বরিষার মেঘ ;—সুভদ্রা কোথায়?
ছুটিলেক পরিজন ; ছুটিলাম আমি
অন্বেষণে। দেখিলাম শিখরসীমায়
সায়াহ্ন গগনতলে, ঘোর ঝটিকায়,

দশমবর্ষীয়া ভদ্রা বসি একাকিনী
একটি উপলখণ্ডে, স্থির দু' নয়নে
সমেঘ পশ্চিমাকাশ রয়েছে চাহিয়া।
উড়িতেছে ঝড়বেগে মুক্ত কেশরাশি,—
এ কি মূর্তি! মুহূর্তেক হইনু অচল।
পার্থ! প্রকৃতির এই মহা উপাসনা
ভাঙ্গিতে আমার নাহি সরিল বচন
মুহূর্তেক! মুহূর্তেক পরে ডাকিলাম—
'সুভদ্রে!' চমকি ভদ্রা কহিল হাসিয়া—
'দেখ, দাদা! ওই উচ্চ পর্বতশিখরে
কেমন নিবিড় মেঘে খেলিছে কেমন
অনল-ভুজঙ্গ মত বিজলি সুন্দর।'
গৌরবে ভরিল বুক; চুম্বিয়া আদরে,
ধ্যানভঙ্গ করি তারে আনিলাম গৃহে।
আপনি আদরে তারে পড়ায়েছি আমি;
শিখায়েছি অস্ত্রবিদ্যা, সঙ্গীত সুন্দর!
কিন্তু কি যে উদাসীন হৃদয় তাহার
বুঝিতে না পারি। ভদ্রা বাজাইছে বীণা,—
আলাপি' রাগিণী বীণা হইল নীরব,
রহিল বসিয়া ভদ্রা শূন্য নিরখিয়া,—
শেষ তানে আত্মহারা চিত্রিতার মত।
সংসারের স্বার্থ-ছায়া, কুটিলতা-দাগ,
নাহি পায় স্থান পার্থ! তাহার হৃদয়ে,—
নির্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।
চির-উদাসিনী ভদ্রা; দরিদ্র দেখিলে
খুলে দেবে আপনার অঙ্গের ভূষণ
গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রমদর্শন;
আসিলে আশ্রমে, সর্ব অঙ্গ ক'রে যায়
আভরণহীন। যদি কর তিরস্কার,—
সতত সজল দুই আয়ত নয়ন
স্থাপিয়া তোমার মুখে রহিবে চাহিয়া
নিরুত্তরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের,
নহে বালিকার তাহা, নহে মানবীর।"

অর্জুন,—হৃদয়হারা বিহ্বল অর্জুন,—
যোগ-শৃঙ্গ পানে স্থির রহিলা চাহিয়া।
দেখিলা বালিকা এক বসি একাকিনী
সেই উচ্চ শৃঙ্গপ্রান্তে, ঘোর ঝটিকায়,
সায়াহ্ন গগনতলে। আয়ত নয়নে
চাহি আকাশের—না, না,—অর্জুনের পানে।
স্থিরনেত্র; মুক্ত কেশ উড়িছে আকাশে।
অর্জুন ভাবিলা মনে সেই গিরিমূলে,
সেই প্রপাতের পার্শ্বে নির্ঝরিণীকূলে,
বিসর্জিয়া রাজ্য, ধন, বীরত্ব-পিপাসা,
রহিবেন, নির্মাইয়া পল্লবকুটীর,
ওই মুখখানি পানে চাহিয়া চাহিয়া।
মুহূর্ত নীরব কৃষ্ণ শূন্য নিরখিয়া,—
ভদ্রার চরিত্রে, স্নেহে, চিত্ত উচ্ছ্বসিত।
মুহূর্তেক পরে পার্থে ফিরাইয়া মুখ
কহিলা—"অর্জুন, বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মহর্ষির প্রাতর্ধ্যান হইবে এখনি
সমাপন; চল যাই করিগে দর্শন।"

তৃতীয় সর্গ

অদৃষ্টবাদ

ভ্রমিয়া আশ্রমারণ্য পর্যটকদ্বয়
আরোহিতে যোগশৃঙ্গ, কটিদেশে এক
দেখিলেন মনোহর বেদিকা সুন্দর।
অষ্টকোণ শৈলবেদী; চারি প্রস্রবণ
চারি পার্শ্বে, সুশোভিত প্রস্তর-প্রাচীরে।
শোভে তিন দিকে তিন প্রস্তরসোপান
মনোহর; অন্য দিকে বেদীর পশ্চাতে
শোভে গিরিগর্ভে এক কক্ষ মনোহর;
অর্ধ-চন্দ্র-শীর্ষ স্তম্ভে শোভিছে সুন্দর
দ্বারত্রয়। কক্ষ, স্তম্ভ, বেদী, প্রস্রবণ,
সুন্দর সোপানশ্রেণী,—দক্ষ শিল্পকর
কাটি গিরিপার্শ্ব শিল্পে করেছে নির্মাণ
বিচিত্র কৌশলে। সুন্দর বকুল এক,
প্রসারি নিবিড় ছায়া আছে দাঁড়াইয়া,
বেদী-কেন্দ্রস্থলে। আছে স্থানে স্থানে স্থানে
তরু, লতা, ফলে, পুষ্পে বিচিত্র শোভন,
ফলিয়া, ফুটিয়া; করি শান্ত শৈলানিল
পবিত্রিত, সুবাসিত। "বসি এইখানে"—
কহিলা যাদবশ্রেষ্ঠ,—"করিলা মহর্ষি
সঙ্কলন চারি বেদ—চারি কীর্তিস্তম্ভ
সর্ব-ধ্বংসী কালগর্ভে; চারি হিমাচল
চিন্তার জগতে, চারি অনন্ত ভাস্কর
মানবের জ্ঞানাকাশে। সে হেতু ইহার
নাম 'বেদমঞ্চ'; দেখ শোভে চারি পাশে—
'ঋক যজু সামাথর্ব'—চারি প্রস্রবণ।
সম্মুখে তোমার দেখ, 'ধ্যানকক্ষ' ওই।"
দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ পাদপ-ছায়ায়,
সুবাসিত শৈলানিলে জুড়াইলা দেহ।
শুনিলা অমৃতবর্ষী শান্ত সুশীতল
প্রস্রবণ কলকণ্ঠ—ঋষিচতুষ্টয়
গাহিছে পবিত্র বেদ গলা মিলাইয়া,
মৃদু মৃদু কণ্ঠে যেন নির্জনে বসিয়া।
চারিটি পবিত্র ধারা, দেখিলা কেমন,
যজ্ঞ-উপবীত মত, গিরিপার্শ্ববাহী
হইয়াছে সরস্বতী-স্রোতে পরিণত।
আরোহিয়া "যোগ-শৃঙ্গ" দেখিলা উভয়ে
বিশাল প্রভাস সিন্ধু শোভিছে দক্ষিণে,
নীলাকাশে মিশি নীল আকাশের মত,
রবিকরে সমুজ্জ্বল। উত্তরে, পশ্চিমে,
ছুটিয়াছে গিরি-শ্রেণী আনত উন্নত,
চক্রে চক্রে নির্মাইয়া স্থানে স্থানে স্থানে
অধিত্যকা, উপত্যকা, অপূর্বদর্শন।
পূর্বে সমতল ক্ষেত্র রহেছে পড়িয়া,
নানা রঙে সুরঞ্জিত চিত্রপট মত,—
অপূর্বদর্শন! ক্ষুদ্রপরিসর শৃঙ্গে,
বটবৃক্ষ-মূলে, চারু অজিন-আসনে
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস,—ধ্যানে অভিভূত!
এক পার্শ্বে বেদীমূলে "সুশীলা" শার্দূলী
নীরবে শাবক-অঙ্গ করিছে লেহন
অর্ধ-নিমীলিতনেত্রে। অন্য দিকে তথা
অর্ধ-নিমীলিতনেত্রে বসিয়া নীরবে—
"সুলোচন" "সুলোচনা" কুরঙ্গযুগল,
আশ্রমপালিত মৃগ;—নীরব সকল।
নীরব সে প্রকৃতির রাজ্য সুবিশাল।
বহিতেছে ধীরে ধীরে শৈল-সমীরণ
নীরবে। নীরবে কাঁপে বৃক্ষপত্রদল।
সকলই ধীর, স্থির, স্তম্ভিত, গম্ভীর,
অ-বাতবিক্ষুব্ধ স্থির জলধির মত।

নিমীলিতনেত্রে বসি মহর্ষি একাকী।
সমুন্নত কলেবর ; শ্লথ করদ্বয়
ন্যস্ত পদ্মাসন-অঙ্কে ; শ্বেত শ্মশ্রুরাশি
আবক্ষ ; সজ্জিত শিরে জটার কিরীট।
উন্নত ললাট স্বর্গ। মুখে মহিমার
সুপ্রসন্ন হাসি, যেন কোন কূট তত্ত্ব
সরল সিদ্ধান্তে এবে হয়েছে মথিত।
স্তম্ভিতের মত স্থির রহিলা চাহিয়া
পার্থ বাসুদেব, চিত্ত ভক্তিতে অচল,
সেই মহামূর্তি পানে। কিছুক্ষণ পরে
মহর্ষি মেলিলা নেত্র। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
প্রণমিয়া পদধূলি করিলে গ্রহণ,
আশীষি মহর্ষি ধীরে সুপ্রসন্ন মুখে,
কহিলা বসিতে পাতি অজিন-আসন,
লয়ে বৃক্ষশাখা হ'তে। বসিলা দু'জন।

কৃষ্ণ

তীর্থপর্যটনে পার্থ, মধ্যম পাণ্ডব,
এসেছেন প্রভাসেতে। আমন্ত্রিয়া তাঁরে
যেতেছিনু রৈবতকে ; আসিনু উভয়ে
ভক্তিভরে মহর্ষির পূজিতে চরণ।

ব্যাস

তীর্থপর্যটন এই কিশোর বয়সে
কেন, বৎস ধনঞ্জয় ? ভগবান রবি
সমস্ত দৈনিক কার্য করি সমাপন,
যথা অস্তাচলে দেব করেন বিশ্রাম,
তেমতি নৃপতিগণ, নিজ ভুজবলে
পালিয়া আপন রাজ্য, জীবন-সন্ধ্যায়
প্রবেশেন তীর্থাশ্রমে, শান্তির-সদন,
লভিতে বিশ্রাম, শান্তি। তুমি বৎস! এই
সুকুমার অঙ্গ কেন করিতেছ ক্ষয়
সেই বানপ্রস্থক্লেশে জীবনপূর্বাহ্ন
ছায়াময় অপরাহ্নে করি পরিণত ?

অর্জুন

বানপ্রস্থ নহে, প্রভু! উদ্দেশ্য আমার।
যে জ্ঞান ত্রিকালব্যাপী ; যাঁহার নয়ন
সর্বদর্শী ; করস্থিত রুদ্রাক্ষের মত
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহার অধীন ;
লুকায়ে তাঁহার কাছে, আছে কোন্ ফল,
আমি ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতর মন।
এক দিন ইন্দ্রপ্রস্থে জনৈক ব্রাহ্মণ
ঊর্ধ্বশ্বাসে আসি, দেব, কহিল কাঁদিয়া
ত্রাসে, দস্যু কেহ আসি নিতেছে লুটিয়া
ব্রাহ্মণের গাভীগণ। বলিলাম—"যাও
নগরপালের কাছে, পাবে প্রতীকার।"
বলিল কাঁদিয়া বিপ্র—"নগরপালের
সাধ্য নহে, ধনঞ্জয়! করিতে উদ্ধার
গাভীগণ, দস্যুরাজে পরাভবি রণে।"
সারথি আনিল রথ ; ছুটিলাম বেগে
সশস্ত্র ; যুঝিল দস্যু অসম সাহসে।
বহুযুদ্ধে দস্যুরাজে পাড়ি ভূমিতলে,
তাহার বীরত্বে প্রভু হইয়া বিস্মিত
গেলাম দেখিতে কে সে। বলিলাম খেদে—
"তস্কর! ব্রহ্মস্ব এই করিতে হরণ
আসি ক্ষুদ্র অর্থতরে হারাইলে প্রাণ।"
"হারাইনু প্রাণ,"—দস্যু করিল উত্তর,
"অর্জুন! তোমার অস্ত্রে নাহি খেদ মম,
বীরসিংহ তুমি! কিন্তু—তস্কর! তস্কর!
নাগরাজ চন্দ্রচূড়! তস্কর সে আজি!
হা বিধাতঃ! ইহাও কি অদৃষ্টে তাহার
লিখেছিলে ? নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ
ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রসুখে বিহরে যাহারা
সাধু তারা—নাগরাজ তস্কর সে আজি!
অষ্টমবর্ষীয়া শিশু বালিকা তাহার
কাঁদে দুগ্ধ লাগি ; কাঁদে জননী তাহার
অনাহারে—নাগরাজ তস্কর সে আজি!

একটি বিশাল রাজ্য হরিল যাহারা
পশুবলে, নররক্তে ভাসায়ে ধরণী,
করিল খাণ্ডবপ্রস্থ এই বনস্থলী,
হিংস্র নর জন্তু বাস, অগ্নিতে, অসিতে,—
সাধু তারা ; মহাসাধু তাদের সন্তান !
আর যে প্রাচীন জাতি মরিয়া পুড়িয়া,
সাধু আর্যজাতি-ভয়ে লইল আশ্রয়
বনে বন্য শ্বাপদের, তাদের সন্তান
জ্বলিয়া জঠরানলে করিলে গ্রহণ
মুষ্ট্যন্ন সে আর্যদের,—তস্কর তাহারা !
একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী, ভিক্ষাব্যবসায়ী ;
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে
পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা,—
সাধু তারা ! আর সেই জাতি বিদলিত,
আপনার রাজ্যে চাহে মুষ্টিভিক্ষা যদি,—
তস্কর তাহারা ! এই আর্যধর্মনীতি
অসভ্য অনার্য জাতি বুঝিবে কেমনে !
ভূতনাথ ! নাহি জানি করিল কি পাপ
নিরীহ অনার্য জাতি। এত অত্যাচারে
কাঁপিবে না তোমার কি করের ত্রিশূল ?"
নীরবিল নাগপতি। বিশাল ত্রিশূল
আমার হৃদয়ে যেন করিল প্রবেশ ;
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ থর থর থর।
নাগরাজমৃতদেহ করিয়া দাহন,
নিজ হস্তে, আসিলাম গৃহে ফিরি ; কিন্তু
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথ বালিকা
ভাসিতে লাগিল দেব ! নয়নে আমার।
বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীব্র মনস্তাপ হৃদয়ে আমার
বসাইল বিষদন্ত ; সুখ শান্তি মম
হইল বিষাক্ত সব। তীর্থপর্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।
অষ্টম বৎসর আজি দেশদেশান্তরে
বেড়াইনু ; কিন্তু নাই পাইনু সন্ধান
অষ্টমবর্ষীয়া সেই শিশু অনাথার।

ব্যাস

কি ফল তাহার বৎস করিয়া সন্ধান ?
তুমি যে পারিবে সুখী করিতে তাহারে
জানিলে কেমনে বল ? বৎস ধনঞ্জয় !
মানবের সুখ দুঃখ পূর্ণ ইচ্ছাধীন
নহে মানবের। ওই উত্তাল সমুদ্রে,
তরঙ্গে তাড়িত ওই ক্ষুদ্র বালুকণা—
বলিবে কি স্বেচ্ছাধীন ? তেমতি—তেমতি
মানব, মানব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,
বালুকার কণা এই সৃষ্টির সাগরে,
ঘটনা-তরঙ্গে, খর অবস্থার স্রোতে !

কৃষ্ণ

সে কি কথা, ভগবন্ ! জড় ও চেতন
উভয় কি সমভাবে অবস্থার দাস ?
নাহি কি স্বাধীন ইচ্ছা জড়-চেতনের,
জড়-চেতনের শ্রেষ্ঠ, নাহি মানবের ?
এই বিশ্বব্যাপী চিন্তা মুহূর্তেকে যাহা
অনন্ত জগত রাজ্য বেড়ায় ঘুরিয়া,
যাহার প্রভাবে গণি সৌররাজ্য-গতি,
বুঝি সূক্ষ্ম ধর্মনীতি, তত্ত্ব সমাজের,
গড়ি রাজ্য অবহেলে, ঘটাই বিপ্লব,—
যেই চিন্তা-শক্তিবলে মহর্ষি আপনি
ত্রিকালজ্ঞ, স্বাধীনতা নাহি কি তাহার ?
"আছে"—ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ব্যাস—
"আছে। মানবের চিন্তা, ইচ্ছা যে স্বাধীন
মানি তাহা বাসুদেব ! কার্য ইচ্ছাধীন ;
কভু ইচ্ছার স্বাধীন। ঘটনার স্রোতে
—দুর্লঙ্ঘ্য, অপ্রতিহত—নিয়া ভাসাইয়া
অনিচ্ছায় কার্যমগ্ন করিতে মানবে
দেখিয়াছ। দেখিয়াছ ঝটিকার বেগে

অকালে অপক্ক ফল পড়িতে ঝরিয়া
ভূমিতলে। মানি তবু কার্য ইচ্ছাধীন।
কিন্তু তার সফলতা, শেষ পরিণাম
নহে মানবের জ্ঞান ইচ্ছার অধীন।
জানিতেন অর্জুন কি চলিলেন যবে
বিপ্রের গোধন বলে করিতে উদ্ধার,
এই উদাসীন-ব্রত হবে পরিণাম?
জানিলেন কিসে তবে, পাইলে সন্ধান
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালার
হবে কোন্ পরিণাম? নহে অসম্ভব
বিষম অশুভ তার সেই দরশনে,
শিশিরের সম্মিলনে পদ্মিনীর যথা।
যেমতি রজনীগন্ধা ভানুর উদয়ে
ক্রমে শুকাইয়া বৃন্তে পড়ে ভূমিতলে,
হয় ত তেমতি বালা ক্রমে শুকাইয়া
জীবনের বৃন্ত হ'তে পড়িবে ঝরিয়া!
নহে অসম্ভব কৃষ্ণ! পার্থ হুতাশন,
প্রবেশিয়া অনাথার জীবন-উদ্যানে,
পোড়াইবে একে একে আশার কুসুম
দুঃখিনীর। পোড়াইবে পতঙ্গের মত
তারে। নহে অসম্ভব হইবে অর্জুন
হন্তা সেই অনাথার।
উঠিল শিহরি
অর্জুনের কলেবর। হৃদয়ে তাঁহার
তুষারের ধারা যেন কে দিল ঢালিয়া।
মহর্ষির মুখ পানে স্থির দু'নয়নে
রহিলেন নিরখিয়া

ব্যাস

না, না, ধনঞ্জয়!
এই উদাসীন-ব্রত করি উদ্‌যাপন
যাও ফিরে ইন্দ্রপ্রস্থে! করগে পালন
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম,—রাজত্ব শাসন।
ওই বীরকান্তি তব করে তিরস্কার
রক্তবাসে; তিরস্কার করে কমণ্ডলু
কার্মুক-অঙ্কিত তব বাহু সুবিশাল।
আপন কর্তব্য পথ রয়েছে তোমার
সম্মুখেতে প্রসারিত, ত্যজিয়া তাহায়
অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ।

কৃষ্ণ

"অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ।"—
মহর্ষি! অদৃষ্টবাদ মানিব কি তবে?
মানব-অদৃষ্ট-লিপি, কপাল-লিখন,—
সত্য সঙ্গত, কি তবে? পাপ পুণ্য সব
মিথ্যা কথা? এত আশা, এতই উদ্যম,
এত ধ্যান, এত জ্ঞান, নিষ্ফল সকল,—
যা আছে কপালে তাহা ঘটিবে নিশ্চয়?
ভাবিলেও মনে প্রভু! কি যেন জড়তা
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আসি হয় সঞ্চারিত।
নিষ্ঠুর সৃষ্টির কর্তা! মানিব কি তবে
দারুণ অদৃষ্টবাদ, ললাট-লিখন?

ব্যাস

মানিবে অদৃষ্টবাদ। ললাট-লিখন,
মূর্খের সান্ত্বনা, কৃষ্ণ, অলসের আশা!
মানিবে অদৃষ্ট। দুই অনন্ত জগৎ,—
মানস ও জড় সৃষ্টি,—রয়েছে পড়িয়া।
ক্ষীণপ্রাণ, ক্ষুদ্র নর, খদ্যোতের মত,
একটি বালুকা নাহি পারে বুঝিবারে,
সেই দুই অনন্তের। রয়েছে পড়িয়া
কত তত্ত্ব-রত্ন-রাশি গর্ভে উভয়ের,—
অদৃষ্ট তাহার নাম; মানিবে না কেন?
মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত।
কি ঘটিবে কোথা হ'তে মুহূর্তেক পরে
নাহি জানে অন্ধ নর। দেখিয়াছ তুমি,
মানবের কত মহা কার্যের তরণী

উড়াইয়া বৈজয়ন্তী পাইতেছে কূল,
একটি ঘটনা-ঊর্মি আসি আচম্বিতে
অমনি অতলগর্ভে ডুবাইল তারে,—
হে কৃষ্ণ, অদৃষ্ট তবে মানিবে না কেন?
পাপ পুণ্য ধর্মাধর্ম নহে মিথ্যা কথা।
দেখিবে কর্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে,—
সেই ধর্ম, সেই পুণ্য; চল সেই পথে।
ততোধিক মানবের নাহি অধিকার।
হইলে নিষ্ফল যদি, জানিবে নিশ্চয়
সেই নিষ্ফলতা-বীজ ছিল লুক্কায়িত
কার্যে তব জ্ঞানাতীত,—অদৃষ্ট তোমার।
সৃষ্টিকর্তা বাসুদেব! নহেন নিষ্ঠুর!
বলিবে কি তবে, তত্ত্ব অনন্ত ভাণ্ডার
নাহি করিলেন কেন নরজ্ঞানাধীন?
অশীতিবর্ষীয় জ্ঞান না দিলা শিশুরে?
একই উত্তর তার,—অদৃষ্ট নরের
সেই মহা তত্ত্ব। ওই মহা পারাবার
পতঙ্গের করায়ত্ত হইবে কেমনে!
মানবের জ্ঞানালোকে দৃশ্যমান যাহা
আপনি পুরুষোত্তম! দেখ তুমি সব;
কি কাজ আমাকে বল জিজ্ঞাসিয়া আর?
যাও বৎস! রৈবতকে; করি আশীর্বাদ।
ইন্দ্রপ্রস্থে সব্যসাচী ফিরিবে যখন,
জনে জনে পরিজনে বলিও ব্যাসের
আশীর্বাদ। নিরন্তর করি আশীর্বাদ,
কৌরবকুলে এই সুখসম্মিলন
হয় যেন চিরস্থায়ী,—গঙ্গা-যমুনার
পুণ্য সম্মিলন যথা—এক স্রোতে সদা
আর্যাবর্তে শান্তিসুধা করি বরিষণ।

অর্জুন

"হইবেক চিরস্থায়ী!"—কত দিন আর
রবে ভগবান! এই বালির বন্ধন
দুর্যোধন-দ্বেষ-স্রোতে? পূর্বকথা সব
জানেন আপনি প্রভু! অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত;
পিতা বর্তমানে তাঁর নাহি অধিকার
সিংহাসনে; সেই হেতু পিতৃদেব মম
হইয়া যৌবনে যোগী পশিলেন বনে,
রাজরাণী পত্নীদ্বয় হইলা যোগিনী।
হতভাগ্য পঞ্চ ভাই জন্মিলাম বনে।
বনে বনে কাটাইনু সুখের শৈশব
কত কষ্টে, কত কষ্টে পালিলেন পিতা।
রাজপুত্র মোরা,—হায়! ছিল আমাদের
ক্রীড়াভূমি বনস্থলী। বন্যপশুচয়
ক্রীড়াসহচর; শয্যা বনদূর্বাদল;
বসন বল্কল। কভু কণ্টকেতে ক্ষত
হ'লে কলেবর; কভু অনাহারে শুষ্ক
হইলে বদন; কভু যোগী মুখ চাহি
কাঁদিতা জননী দুঃখে, কিন্তু জনকের
সতত প্রসন্ন সেই প্রশান্ত বদনে
একটি কষ্টের রেখা দেখি নাই কভু।
সেই সুপ্রসন্ন মুখে সম্বরিলা লীলা
পিতৃদেব; বনস্থলী কাঁদিল বিষাদে।
হেন ভ্রাতৃভক্তি, হেন সর্ব-সহিষ্ণুতা,
নিঃস্বার্থতা, অকাতরে আত্ম-বিসর্জন,—
এমন দৃষ্টান্ত প্রভু আছে কি জগতে?
স্বর্গীয়া বিমাতা সাধ্বী আরোহিলা চিতা
অকাতরে; পঞ্চ ভাই কত কাঁদিলাম
বেষ্টিয়া তাঁহারে! সেই সকরুণ মুখ,
স্নেহের গগন সেই, শান্ত সুশীতল,
সে চুম্বন, আলিঙ্গন, সেই স্নেহ-ভাষা,
পড়ে যবে মনে, প্রভু!—
হলো কণ্ঠ-রোধ।
দুই অশ্রু ধারা বেগে ঝরিতে লাগিল
পার্থের বিশাল বক্ষে। মুছিয়া নয়ন
মুহূর্তেক পরে পার্থ আরম্ভিলা পুনঃ—
"অনাথিনী মাতা সহ অনাথ আমরা
ফিরিলাম হস্তিনায়, দীন নিরাশ্রয়।

হস্তিনায়!—না, না, প্রভু! পশিলাম বনে,-
অরণ্য ভীষণতর! পড়িলাম হায়!
যেই হিংস্রজন্তুদন্তে, অরণ্যে দুর্লভ।
সে অবধি ছলে, বলে, অস্ত্রে ও অনলে
বিনাশিতে আমাদের ক'রেছে কৌশল
দুর্যোধন কতরূপে, জানেন আপনি।
অতুল কৌরবরাজ্য ত্যজিলেন পিতা
যেই জ্যেষ্ঠতাত তরে, সেই ধৃতরাষ্ট্র
একটি উচ্ছিষ্ট অন্ন না দিলা তাঁহার
অনাথ সন্তানগণে। প্রতিদানে শেষে
প্রেরিলা বারণাবতে মরিতে পুড়িয়া
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত!"
পুনঃ অর্জুনের
হলো কণ্ঠরোধ ক্রোধে। সম্বরিয়া ক্রোধ,
বলিতে লাগিলা পুনঃ—
"দ্বাদশ বৎসর
ভ্রমিলাম বনে পুনঃ। শৈশব, কৈশোর
এইরূপে আমাদের গিয়াছে কাননে।
কি করিব? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধার্মিক সুশীল,
পিতৃগুণে অলঙ্কৃত, না দিবে কখন
জ্ঞাতিরক্তে কলুষিতে পবিত্র বসুধা।
এখন যে ইন্দ্রপ্রস্থ ক'রেছে অর্পণ,
কে বলিবে ষড়যন্ত্র, নিগূঢ় মন্ত্রণা,
নাহি পাপিষ্ঠের মনে! সেই বিষধর
থকিতে কৌরবগৃহে, শান্তি অসম্ভব।
তাহার হিংসার স্রোত দেখিতে দেখিতে
বাড়িতেছে সিন্ধুমুখী ভাগীরথী মত,
বালির বন্ধন তাহে রবে কত দিন?"

কৃষ্ণ

শুধু হস্তিনায় নহে। এই হিংসা-বিষ
সমস্ত ভারতবর্ষে, মগধে, চেদিতে,
হইতেছে বিধূমিত। প্রত্যেক নৃপতি,
ক্ষুধার্ত শার্দুল মত, রয়েছে চাহিয়া
নিজ-প্রতিবাসী পানে! ভাবিছে সুযোগ
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কখন।
দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদাশ্রিত বাণিজ্য-কমল,
জ্ঞানের সহস্রদল ভারতী-আশ্রয়,
শুকাইছে; পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্য-সভ্যতার রবি। আর্য-ধর্ম-নীতি
—প্রীতিময়, প্রেমময়, শান্তিসুধাময়,—
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।
রাজ্যভেদ, গৃহভেদ, জাতিভেদ, প্রভু!
ভারতের যে দুর্দশা ঘটাইছে হায়!
বলবান কোনো জাতি পশ্চিম হইতে
আসিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্যজাতি তৃণরাশি মত,—
অহো! কিবা পরিণাম!

ব্যাস

সত্য, বাসুদেব
বড় শোচনীয় দশা আজি ভারতের!
স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি, জানিও নিশ্চয়
স্বেচ্ছাচারে নহে, বৎস, চালিত, রক্ষিত।
কিবা জন, কিবা জাতি, উভয় সমান
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড
যত বলে নিক্ষেপিবে শিলা অন্তরে,
তত বলে প্রতিক্ষেপ হইবে নিশ্চয়।
যেইরূপে আর্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য দুর্বলে,
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
এক দিন। বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব,
রাজত্বের মহাদর্শ। নহে পশুবল
ভিত্তি, কিম্বা হে কংসারি! নিয়ম ইহার।
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য, রাজত্ব দয়ার।
বিশ্বরাজ্য ন্যায়-রাজ্য, রাজত্ব নীতির।
ক্ষুদ্র বন-পুষ্প হ'তে অনন্ত গগন—

সর্বত্র অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল,
সর্বত্র অনন্ত প্রীতি। হেন মহারাজ্য
যত দিন, যদুশ্রেষ্ঠ, না হবে স্থাপিত,
তত দিন আর্য-রাজ্য, জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ কালের স্রোতে বালির সৃজন।
"মহারাজ্য!"—ধীরে ধীরে দেবকীনন্দন
চাহি দূর সিন্ধু পানে বলিতে লাগিলা—
"হে মাতঃ ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায়।
তুষার-কিরীট-শীর্ষ, বিরাট-মূরতি,
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে,
প্রসারিত ভুজদ্বয় করি সম্মিলিত
পদতলে কুমারীতে ভীষণ মুষ্টিতে,
আপনি ভারতবর্ষ করেন রক্ষণ।
ভীষণ ভুজাগ্রদ্বয়—মহেন্দ্র, মলয়,—
তুচ্ছ মানবের কথা, সমুদ্র আপনি
না পারি লঙ্ঘিতে বলে মানি পরাজয়,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে শোভিছে কেমন
ভারতের পদতল করি প্রক্ষালন!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈলপ্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,—
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

ব্যাস

বড়ই দুরূহ ব্রত

কৃষ্ণ

জননী ভারত!
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী!
ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জুনের,
তোমার সেবায় মাতঃ! হ'লে নিয়োজিত,
কোন্ কার্য নাহি পারে হইতে সাধিত!
রহিলেন তিন জন চিত্রার্পিতপ্রায়
চাহি দূর সিন্ধু পানে। চাহি কিছুক্ষণ,
বন্দি মহর্ষির পদ, কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
চলিলেন রৈবতকে হইয়া বিদায়।
কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া,
শৃঙ্গ হ'তে অবতীর্ণ হইলে উভয়,
কহিলা মহর্ষি ধীরে,—
"দুর্জ্জেয় মানব!
আশৈশব স্থিরভাবে গ্রন্থের মতন
তোমার ঘটনাপূর্ণ বিচিত্র জীবন
করিয়াছি অধ্যয়ন। বিপুল ভারতে
যদি কেহ কদাচিৎ পারে সাধিবারে
হেন মহাব্রত, তবে, হে কৃষ্ণ! সে তুমি!
ব্যাস অর্জুনের সাধ্য নহে কদাচন।"

চতুর্থ সর্গ

মহাসন্ধি

পশ্চিমজলধিগর্ভে সেই পুণ্যভূমি
শোভিতেছে মনোহর অঞ্জলির মত,
—রাজরাজেশ্বরীরূপা ভারত-জননী
চাহিছেন যেন চারু অঞ্জলি পাতিয়া
রত্নকরে রত্নকর, রত্নাকর কাছে,—
বেষ্টিয়া যে করপদ্ম জলধি সতত
বর্ষিছে হীরকরাশি, প্রকোষ্ঠে তাহার
রৈবতক গিরিমালা, কারুকার্যময়
শোভিতেছে মরকত-বলয়ের মত।
পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে শৈল-বলয়ের
শোভিতেছে স্বর্গসম ব্যাসের আশ্রম।
পূরব উত্তর প্রান্তে, শিলাকক্ষে এক
নিবিড় নিশীথে, ঘন নিবিড় কাননে,
বসিয়া দুর্বাসা ঋষি ধ্যানে নিমজ্জিত।
অতি দুরারোহ কক্ষ; স্বভাব-সৃজিত
বিশাল প্রস্তরখণ্ডে; প্রবেশের দ্বার
সঙ্কীর্ণ সঙ্কটময় বিবরের মত।
ব্যাঘ্রের বিবর ভাবি বনচরগণ
দিবসেও কভু নাহি আসিত নিকটে।
ইদানীং বিধূমিত দেখি কক্ষদ্বার,
অপদেবতার ভয়ে, দিবা দ্বিপ্রহরে,
হয়েছিল বনস্থলী মানববর্জিত।
  সে কক্ষে দুর্বাসা ঋষি বসিয়া একাকী
চিন্তামগ্ন; কুব্জপৃষ্ঠ, ক্ষুদ্র কলেবর
ঘোর কৃষ্ণ,—কক্ষতলে শিলাখণ্ড যেন!
একটি অনলশিখা সম্মুখে তাঁহার
খেলিতেছে কক্ষতলে সর্পজিহ্বা মত,
ইন্ধন-বিহীন অগ্নি,—জ্বলিয়া নিবিয়া
ছায়াবাজি প্রায়, ক্ষীণ আলো-অন্ধকারে
করিয়া ভীষণ কক্ষ দ্বিগুণ ভীষণ।
ভৌতিক অনলক্রীড়া চাহিয়া চাহিয়া
জ্বলিতেছে কোটরস্থ যুগল নয়ন,
ভুজঙ্গের নেত্র মত বিষাক্ত উজ্জ্বল।
বলিতে লাগিলা ঋষি,—"দেব বৈশ্বানর!
এই গিরি-কোটরেতে মূর্তিমান তুমি।
কহ, দেব, কোন্ দোষে করিল পাপিষ্ঠ
শিষ্যের সম্মুখে মম এত অপমান!
বলিলাম—'বাসুদেব! আশীর্বাদ করি!'—
যত বার, তত বার তুচ্ছ করি দম্ভী
অবজ্ঞায় নিরুত্তর রহিল যে ভাবে,
হে অগ্নি! তুমিও তাহে হইতে দাহিত।
সেই রাবণের চিতা হৃদয়ে আমার
জ্বলিতেছে দুর্বিষহ সেই অপমানে,—
সপ্তম দিবস আজি, জলবিন্দু নাই
পশিয়াছে দেহে মম। সপ্তম বৎসর
থাকে যদি অনাহারে এই ঋষিদেহ,
রাখিব তা। যদবধি না করি উপায়
এই প্রতিহিংসা-ব্রত করিতে সাধন,
জলবিন্দু নাহি দেব! করিব গ্রহণ।
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি, এত অপমান
নীচ গোপজাতি হস্তে, সহিব কেমনে?
বহিব কেমনে বুকে? শুধু সেই দিন?—
নহে এক দিন। দেখি যেখানে সেখানে
তুচ্ছ করে মহাপাপী ঋষি ব্রাহ্মণেরে,
তুচ্ছ করে যাগ যজ্ঞ। ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়ি
গোবর্ধন পূজা ব্রজে করিল প্রচার;—
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন!
জন্ম নীচ গোপকুলে, কর্ম ক্ষত্রিয়ের;
চাহে জ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব। পূজামাত্র তার
জারজ ম্লেচ্ছজ সেই ব্যাস দুরাচার,—

শিষ্য-উপযোগী গুরু! সহিব কেমনে
গোপের ক্ষত্রিয়-গর্ব, ব্রাহ্মণ্য ম্লেচ্ছের?
কাকের এ কোকিলত্ব? থাকিতে জীবন,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে রসাতল,
সহিব কেমনে তাহা? যেই ব্রহ্মতেজে
হে তাত পরশুরাম! করিলে ভারত
একাক্রমে নিঃক্ষত্রিয় একবিংশ বার,
ব্রাহ্মণের সেই তেজ গেছে কি নিবিয়া?
নাহি ভুজবল সত্য; কিন্তু বুদ্ধিবলে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য রক্ষিব নিশ্চয়
অচল, অটল, এই রৈবতক মত।"
নীরবেতে অন্যমনা থাকি কিছুক্ষণ
কহিলা,—"হইল নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
আসিল না তবে বুঝি?" কক্ষের দুয়ারে
শুনি শুষ্কপত্র-শব্দ মুদিয়া নয়ন
বসিলা কৃত্রিম ধ্যানে। বহুক্ষণ পরে
কহিলা বিরক্ত কণ্ঠে—"এখনো ত কই
আসিল না? নীচ জাতি অনার্য অধম
ভাঙ্গিল প্রতিজ্ঞা বুঝি। মহামূর্খ আমি
হেন ইতরের কথা,—সলিলের লেখা,—
করেছি বিশ্বাস। মনে করিয়াছি স্থির
এই ভগ্ন কাষ্ঠে সিন্ধু করিতে লঙ্ঘন
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ।" আবার সে শব্দ!
আবার তেমতি ধ্যানে বসিলা দুর্বাসা।
রহিলেন বহুক্ষণ;—আসিল না কেহ।
এ বারেও বন্যজন্তু-পদ-সঞ্চালন
কক্ষদ্বারে শুষ্ক পত্রে। এবার ঋষির
ক্রোধ-মহাসিন্ধু ধৈর্য-বালির বন্ধন
নিল উড়াইয়া, বেগে ত্যজিয়া আসন
উন্মত্তের মত কক্ষে লাগিলা ঘুরিতে;—
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয় বারেক পশ্চাতে,
বারেক নিরত দীর্ঘ-শ্মশ্রু-উৎপাটনে।
অঙ্গভঙ্গী, মুখভঙ্গী, কর-সঞ্চালন,
ভীষণ-ভ্রূকুটী, কভু দন্ত কড়মড়ি
অনাগত জনোদ্দেশে,—দেখিত সে যদি
নিশ্চয় ভাবিত মনে প্রেতযোনি কেহ
মন্ত্রবলে আছে বদ্ধ এই কারাগারে।
ভ্রষ্টাহার বিষধর হয় বদ্ধ যদি
গৃহস্থের গৃহে, যথা করে ছুটাছুটি
গরজি নিষ্ফল ক্রোধে, তেমতি দুর্বাসা
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কক্ষে, গরজিয়া ক্রোধে
বলিতে লাগিলা—"সত্য, পাপী নরাধম!
আমি দুর্বাসার সঙ্গে এই প্রতারণা?
পার্থ কৃষ্ণ গণনায় নাহি আসে যার,
তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা? ধরিস্ রে তুই
এক দেহে ক'টি প্রাণ? পঞ্চ প্রাণ তোর
হয় যদি পঞ্চশত, পঞ্চদশ শত,
নাহিক নিস্তার তোর দুর্বাসার ক্রোধে!
যেই বজ্রানলে দগ্ধ হয় গিরিচূড়া
তার কাছে তুই তৃণ! বিধর্মী তস্কর!
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে এবে বন্যজন্তু মত
ভ্রমিস কাননে ভয়ে, দুর্বাসার ক্রোধে,
পৃথিবীর গর্ভে যদি করিস প্রবেশ,—
নাগের উচিত বাস,—জানিস তথাপি
নাহি পরিত্রাণ তোর। নাগ নাম কেন,
বুঝিলাম এত দিনে। ওরে নরাধম!
সর্প-উপাসক তোরা! নীচ সর্প মত
লুকায়ে নিবিড় বনে, পর্বত-গহ্বরে,
দংশিবি রে তুই নীচ তস্করের মত
নিদ্রাতুরে, অসতর্কে! সাজিবে কি তোরে
এই বীরব্রত, এই বীরের উদ্যম?"
কক্ষদ্বার পানে ক্রোধে কহিলা চাহিয়া—
"আসিলি না? আসিলি না? আসিলি না তুই?
ভাঙ্গিলি প্রতিজ্ঞা তোর? ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র মত
এক লম্ফে পড়ি তোর বক্ষের উপরে,
হৃদয়শোণিত তোর না করিব পান
যত দিন না জুড়াবে এই ক্রোধ মম;
তত দিন নহে নাম দুর্বাসা আমার।"

কি শব্দ আবার! উঠি ত্রস্তে সর্পবেগে
ছুটিয়া আসনে বসিলেন ঋষি ধ্যানে।
একটি মানবমূর্তি ধীরে ধীরে ধীরে
প্রবেশিয়া কক্ষদ্বারে, ধীরে ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইল ঋষিপার্শ্বে,—শৈলকক্ষে যেন
দৃঢ় শৈলস্তম্ভ এক হইল স্থাপিত।
বর্ণ কৃষ্ণ, দেহ খর্ব, বলিষ্ঠ শরীরে
স্থানে স্থানে মাংসপেশী উঠিছে ফাটিয়া।
স্থূল অঙ্গ, স্থূল নাসা, স্থূল ওষ্ঠাধর,
নেত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল! ব্যাঘ্রের মতন
কি যে এক বিভীষিকা মুখভঙ্গিমায়
গাম্ভীর্যের সনে যেন রয়েছে মিশিয়া,
দেখিলে হৃদয়ে হয় ভীতির সঞ্চার।
কটি বদ্ধ রক্তবাসে; ক্ষুদ্র রক্তবাসে
আবরিয়া বাম ভুজ শোভে উত্তরীয়!
রক্তবাসে বিমণ্ডিত মস্তক উপরে
শোভে বেণীবদ্ধ কেশ উষ্ণীষের মত।
চাহিয়া চাহিয়া সেই অগ্নিশিখা পানে
—আশ্চর্য, অদৃষ্টপূর্ব অযোনিসম্ভব!—
ঈষৎ কাঁপিল সেই নির্ভীক হৃদয়।
"কেমনে জ্বলিছে অগ্নি নিবিছে কেমনে,"—
ভাবিল সে মনে,—"কিছু বুঝিতে না পারি,
পড়িয়াছি আমি কোনো অপদেবতার
নিদারুণ ছলনায়; কে দেখেছে কোথা
পাষাণে জ্বলিতে অগ্নি ইন্ধনবিহীন।
নহে মিথ্যা তবে এই বিবরের কথা
শুনিয়াছি যাহা,"—শিখা নিবিল হঠাৎ,
আবার তাহার বুক উঠিল কাঁপিয়া,
সেই ঘোর অন্ধকারে। আবার যখন
জ্বলিল সে অগ্নি; ধীরে ধ্যানান্তে দুর্বাসা
চাহি আগন্তুক পানে হাসিলা ঈষৎ।
হাসি!—কেন এই হাসি? আরো ভয় মনে
হইল সঞ্চার তাহে। ভাবিল সে মনে
হাসিতেছে করায়ত্ত দেখিয়া আমায়।
মহাদেব! মহাদেব!—কম্পিতহৃদয়ে
লাগিল জপিতে। ধীরে উঠিয়া দুর্বাসা
দাঁড়াইয়া কক্ষদ্বারে, অতি সাবধানে
বহুক্ষণ সসন্দেহে দেখিলা বাহিরে,
শুনিলা নীরবে স্থির শ্রবণ পাতিয়া।
ফিরিয়া আসনে পুনঃ ঈষৎ হাসিয়া
বলিলা—"বাসুকি! তুমি করেছ পালন
প্রতিজ্ঞা তোমার! দেখ তপস্যায় যার
মূর্তিমান্ এই কক্ষে দেব বৈশ্বানর,
কর প্রবঞ্চনা যদি, বল মিথ্যা কথা,
তার কাছে নাগপতি! জানিও নিশ্চয়
এক লম্ফে অগ্নিশিখা পশিয়া হৃদয়ে
পোড়াবে হৃদয় তব,—পোড়াও যেমতি
মৃগমাংস মৃগয়ায় অনার্য তোমরা,
হোমানলে যজ্ঞশেষে পোড়াই আমরা।
কি ছিল প্রতিজ্ঞা সব আছে তব মনে,—
এসেছ একক তুমি?"

বাসুকি

একক।

দুর্বাসা

নিরস্ত্র?

বাসুকি

নিরস্ত্র।

দুর্বাসা

আসিতে পথে দেখেছ কি কিছু?

বাসুকি

দেখেছি। শুনেছি যাহা, দেখেছি সকল।
নিজে বনচর আমি, নির্ভয়হৃদয়ে
ভ্রমি যথা তথা বনে দিবসে নিশীথে,
কিন্তু হেন ভয়ানক প্রেতপুরী আর
দেখি নাই কদাচিৎ, শুনি নাই কভু।
যেই এই বনপ্রান্তে করিনু প্রবেশ,
কি যেন দারুণ শীত হইল সঞ্চার
সর্বাঙ্গে, পড়িল বুকে বৃহৎ পাষাণ।

ফেলি এক পদ, শুনি পদশব্দ দুই,
আসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে কি যেন
পশ্চাতে !
কহিতেছে কাণে কাণে কি যেন সতত !
দাঁড়াইলে সে দাঁড়ায়, ছুটিলে সে ছুটে,
কাশিলে সে কাশে সঙ্গে, হাসিলে সে হাসে
কত বার মনে ভাবি দেখিব ফিরিয়া
কিন্তু নাহি সাধ্য, গলা কে যেন ধরিয়া
রাখিয়াছে, কর তার মৃতের মতন
দৃঢ়, হিম, সেই করে ঠেলিছে সম্মুখে।
সেই কর ; সে পরশ, করিয়া স্মরণ—
তুষারের সর্প এক বেষ্টিয়া গলায়
কসিতেছে চক্র যেন,—এখনো আমার
হইতেছে রুদ্ধশ্বাস, কাঁপিতেছে বুক।
সহিতেছি যে যন্ত্রণা, শত গুণ তার
সহি যদি, দেও যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,
বল যদি মৃত্যুমুখে করিতে গমন,
যাইব নির্ভয়ে, কিন্তু এই বনে ঋষি !
প্রাণান্তে কখন আমি আসিব না আর।

দুর্বাসা

ভগবান্ ভূতনাথ, অনার্য-ঈশ্বর,—
এই তাঁর ক্রীড়াভূমি। প্রেতগণ সহ
বিরাজেন নিত্য প্রভু এই মহাবনে,
সদাশিব সদানন্দে। মহাভক্ত তাঁর
তুমি হে অনার্যপতি ! প্রেতগণ হ'তে
নাহি তব ভয় ; তব দরশনে তারা,
বায়ুর সৃজন, যাবে বায়ুতে মিশিয়া।
প্রথম পরীক্ষা তব হইয়াছে শেষ,—
উত্তীর্ণ বাসুকি তুমি !

বাসুকি

প্রতিজ্ঞা আপন
আপনি মহর্ষি কর পালন এখন।
আপন প্রতিজ্ঞামতে দেও হে বলিয়া
কিরূপে হইবে মম বৈরনির্যাতন।
নিষ্ফল যে হিংসা-বহ্নি হৃদয় আমার
দহিতেছে অনুক্ষণ, দেও হে বলিয়া
কিরূপে আহুতি তাহে করিব প্রদান।

দুর্বাসা

ভুলিয়াছ প্রতিশ্রুতি, নাগেন্দ্র বাসুকি !
আছিল প্রতিজ্ঞা এই,—একে একে তিন
কঠিন পরীক্ষা তব করিব গ্রহণ,
দেখিব সে ব্রতযোগ্য আছে কি হে তব
দৃঢ়তা, সাহস, শক্তি, সর্বত্যাগী পণ।
একে একে একে তিন সেতু ক্ষুরধার
পার, তবে যথা ইচ্ছা মম,
যথাস্থানে, যথাকালে, করিব দীক্ষিত
সেই মহামন্ত্রে আমি যাহাতে নিশ্চিত
তব প্রতিহিংসা-ব্রত হবে উদ্‌যাপিত।

বাসুকি

যে পরীক্ষা ইচ্ছা তব করহ গ্রহণ
এই দণ্ডে, আর প্রাণে সহিতে না পারি
এই আত্ম-ধ্বংসী ক্রোধ। বৃক্ষের কোটরে
অগ্নিকণা কেহ যদি বিক্ষেপে কখন,
অলক্ষিতে যথা বহ্নি দহে অন্তঃস্থল
ক্রমে ক্রমে, ক্রমে ক্রমে শুকায় পল্লব,
শুকায় বল্কল শাখা, ক্রমে ক্রমে শেষে
সুবিশাল বনস্পতি করে ভস্মীভূত।
তেমতি এ ক্রোধ-বহ্নি দহিছে আমায়
তিল তিল ; নিরন্তর সহিতে না পারি
হৃদয়ে হৃদয়ে এ বৃশ্চিকদংশন।

দুর্বাসা

কি সে ক্রোধ ? কেমনে তা হইল সঞ্চার ?
পারি আমি যোগবলে, দেখেছ বাসুকি !
পড়িতে পরের চিত্ত গ্রন্থের মতন।
তথাপি যে তব মুখে শুনিতে বাসনা—
কি সে ক্রোধ, কোন্ রূপে হইল সঞ্চার,
দেখিব এ ক্রোধ তব গভীর কেমন।
দাবানল মত তাহা যাইবে বুঝিয়া

যদবধি ভস্ম নাহি হইবে কানন ;
কিম্বা দীপশিখা মত যাইবে নিবিয়া
একই ফুৎকারে তাহা। বহে বজ্রানল
বরষার মেঘ মত ; কিম্বা যাইবে উড়িয়া
শরতের মেঘ মত, গরজি নিষ্ফল।

বাসুকি

কি সে ক্রোধ, কোন্ রূপে হইল সঞ্চার ;
যেই উগ্র বহ্নি ভস্মে আছে আচ্ছাদিত,
যেই বিষ বিষদন্তে আছে লুক্কায়িত,
উত্তেজিত করি তারে লভিবে কি ফল ?
কেবল হইবে ভস্ম অধিক ভস্মিত,
কেবল হইবে সর্প উন্মত্ত অধিক।
বলিতেছি—মথুরায় কংস নরপতি
দুরাচার যেইরূপে দলিল চরণে
অসহায় নাগজাতি অসুরসহায়,
কাটিয়া অনার্যগ্রীবা অনার্য অসিতে
করিল দুর্ধর্ষবলে রাজ্যের বিস্তার,
জান তুমি সব। বহু বর্ষ গত আজি,
শুনিলা জনক মম স্বর্গীয় বাসুকি
সেই মহাবল কংস দৈবজ্ঞের বাণী—
শুনিয়াছি—দেবকীর অষ্টম কুমার
করিবে বিনাশ তার ; বিনাশিতে শিশু
সসত্ত্বা-ভগিনীপুরী রাখিয়াছে ঘেরি
সশস্ত্র অনার্য-সৈন্যে দিবস যামিনী।
নিরাশ্রয় বসুদেব মাগিলা আশ্রয়।
কৌশলে প্রহরিগণে করি প্রতারিত,
অপহৃত শিশু এক রাখিয়া কৌশলে,
হরিলেন পিতা সদ্যঃপ্রসূত কুমার।
ভাদ্র মাস, কৃষ্ণাষ্টমী, নিবিড়া রজনী ;
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন নিশীথ-গগন ;
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন মথুরা নগরী।
ঘন বর্ষিতেছে মেঘ ; স্বনিছে পবন
রহিয়া রহিয়া ঘন ; বিদারি তিমির
দৃপ্ত অগ্নি-শররাশি ছুটিছে বিজলী।
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ যমুনাহৃদয়,—
বিলোড়িত, বিঘোষিত ; ভূতনাথ যেন
উন্মত্ত ভীষণ নৃত্যে ভূতগণ সহ।
অতিক্রমি বহু কষ্টে, প্রবেশি গোকুলে,
অপহৃত সেই শিশু আসিল রাখিয়া
বসুদেব, পুত্রহীন শূন্য নন্দালয়ে,
পিতার সহায়ে মম সে ঘোর নিশীথে।
কিরূপে সহায়ে মম প্রথম যৌবনে
বিনাশি কংসের বীর সেনাপতিচয়,
আক্রমি মথুরা, কৃষ্ণ কংসে বিনাশিল—
শুনিয়াছ ঋষি সেই বীরত্ব-কাহিনী।

দুর্বাসা

শুনিয়াছি আমি সেই বীরত্ব কাহিনী,—
বস্ত্র-চুরি, জলস্থলে সতীত্ব-বিনাশ
গোপীদের, অনূঢ়ার প্রতি ব্যভিচার!

বাসুকি

মিথ্যা কথা। শত্রু কৃষ্ণ পরম আমার!
শত্রুর অযথা নিন্দা কিন্তু অনার্যের
নহে বীরধর্ম ঋষি! যমুনার জল
নহে তত সুশীতল পবিত্র নির্মল,
জানি আমি গোবিন্দের চরিত্র যেমন।
তাহার প্রশস্ত বক্ষে, উন্নত ললাটে,
গর্বিত অধরপ্রান্তে, উজ্জ্বল নয়নে,
দীর্ঘ বীর-অবয়বে আছে বিরাজিত
যে দেবত্ব, দেখি নাই মানবে কখন।
সে কিশোর দেবমূর্তি দেখেছি যখন
বনে কিবা রণক্ষেত্রে, জানু পাতি ভূমে,
স্থির উর্ধ্ব নেত্রে চাহি গগনের পানে,
জ্ঞানশূন্য ধ্যানমগ্ন ; শুনেছি যখন
সহচরগণ-মধ্যে করিতে প্রচার
সে অপূর্ব নব ধর্ম আনন্দে বিহ্বল,
ভাবিয়াছি, নহে কৃষ্ণ মানব কখন।
নীল নীরদের মত সেই কলেবর
বীরত্ব বিদ্যুতে পূর্ণ, প্রেমের সলিলে।

বিশ্বব্যাপী সেই প্রেম, নীরদের মত,
বরষেন বাসুদেব প্রাণিমাত্র সবে,
অভিন্ন অনার্যে আর্যে সর্বত্র সমান।
বনের শার্দূল আমি, আমার হৃদয়,
যখন তাহার আমি হই সম্মুখীন,
ভয়েতে ভক্তিতে হয় বালকের মত।
কি প্রতিজ্ঞা, কি দৃঢ়তা, বীরতা অতুল!
বল যদি কেশরীর হ'ব সম্মুখীন,
কিন্তু বিমুখিতে কৃষ্ণে না সরে চরণ;
দেব কি মানব কৃষ্ণ বুঝিতে না পারি।

দুর্বাসা

সত্য কথা, নাগরাজ, পার নাই তুমি
বুঝিতে সে প্রবঞ্চকে। দয়া ধর্ম তার
সকলই প্রবঞ্চনা। সমস্ত ভারতে
আপন একাধিপত্য করিবে স্থাপন,
বাঁধিয়া অনার্য আর্য দাসত্বশৃঙ্খলে।

বাসুকি

তবে কেন মথুরার লব্ধ সিংহাসন
অর্পিল সে উগ্রসেন?

দুর্বাসা

সে গূঢ় রহস্য,—
সে বিড়াল-তপস্বিতা,—বুঝাব তোমায়
অন্য দিন; ক্রমে তুমি পারিবে বুঝিতে।
বল কি ঘটিল পরে।

বাসুকি

হইলে সাধিত
মথুরা-বিজয়, দুষ্ট কংসের নিধন,
দুরাশায় মত্ত আমি হায়! ভাবিলাম
মথুরার সিংহাসন লইব মাগিয়া,—
প্রাচীন অনার্য রাজ্য; লইব মাগিয়া
সুভদ্রার করপদ্ম,—কমলকলিকা
ফুটে নাই ফুট ফুট; তাহে ভর করি
সমস্ত অনার্য-রাজ্য করিব উদ্ধার।
বলিলাম—"বাসুদেব! এই দুই দান,
জীবনদাতার পুত্রে দেও প্রতিদান,
আপন অনন্ত ঋণ করহ উদ্ধার।"
স্থিরকণ্ঠে ধীরে কৃষ্ণ করিলা উত্তর—
"বাসুকি! অনন্ত ঋণে ঋণী আমি তব।
জান তুমি উগ্রসেন ভোজবংশপতি,
এই সিংহাসন তাঁর; করিতে অর্পণ
তিলার্ধ তাহার, মম নাহি অধিকার।
তবে যেই রাজ্য তব হরেছিল বলে
কংসরাজ, প্রত্যর্পণ মাগিব তাহার।
সন্ধির সুখদ সূত্রে বন-সিংহাসন
মথুরার সিংহাসনে করিয়া বন্ধন,
উভয়ে অক্ষয় শান্তি করিব বিধান
এখনো বালিকা ভদ্রা, কেমনে তাহারে
অর্পিব পাশব বলে? হে নাগেন্দ্র! হেন
পৈশাচিক পরিণয় আর্যধর্ম নহে।"
যেই তরু এত দিন অঙ্কুর হইতে
পালিলাম, হইল কি সম্পূর্ণ নিষ্ফল?
তীরে এসে এত দিনে আশার তরণী
ডুবিল কি এইরূপে? গেল পলাইয়া
আশার পালিত মৃগ বিদ্যুতের মত?
হইনু অধীর ক্রোধে;—কৃতঘ্ন! আমার
জীবনের সব আশা করিলি বিফল!
লও প্রতিফল তার," উলঙ্গিয়া অসি
হানিলাম বক্ষে তার। বজ্র পদাঘাতে
বলরাম মুহূর্তেকে ফেলিয়া ভূতলে,—
উড়িয়া পড়িল অসি,—বসাইয়া বুকে
তালবৃক্ষ সম জানু, বলিল, চাপিয়া
শার্দূল মুষ্টিতে গ্রীবা,—"অসভ্য দুর্মুখ!
জীবনের সব আশা হইবে সফল
এইক্ষণ। বনরাজ্য ছাড়ি, যম-রাজ্যে
যাও এবে! মিশাইব যাদবশোণিত
বন্য জন্তু রক্ত সহ?" দ্রুত সরাইয়া
সেই কাল মুষ্টি কৃষ্ণ কহিলা কাতরে—
"কি কর! কি কর দাদা! নাগরাজ মম

প্রাণদাতা। উঠ, ক্রোধ কর সংবরণ।"
করে ধরি শান্তভাবে তুলিয়া আমায়
বলিলা—"যে প্রাণ তুমি করিয়াছ দান,
কেন কলঙ্কিবে অসি বিনাশিয়া তারে
নাগপতি?" না শুনিনু কি বলিলা আর।
মস্তক ঘুরিতেছিল কণ্ঠনিষ্পীড়নে;
অবশ ইন্দ্রিয় ক্রোধে। আসিল না কথা
মুখে; সঘৃণ নয়নে উত্তরিয়া দর্পে,
আসিনু চলিয়া বেগে। কত বর্ষ আজি,
সেই ক্রোধবহ্নি ঋষি! জ্বলিছে তেমন।

দুর্বাসা

শুধু কৃষ্ণ বলরাম শত্রু তবে তব?

বাসুকি

শত্রু মম আর্য জাতি ব্যক্তি নির্বিশেষে,
—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,—আসমুদ্র গিরি
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা,
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্য-শোণিতে।
এখনো যে দিকে দেখি, তপ্ত রক্ত জ্যোতিঃ
জ্বলিতেছে প্রজ্বলিত দাবানল মত
তীব্র আর্যরবিকরে। সেই রক্তে স্নাত
সমুদিত সেই রবি; সেই রক্তে স্নাত
হইবে কি অস্তমিত? সেই রক্তার্ণবে
শত শত আর্য-রাজ্য হয়েছে স্থাপিত;
সেই রক্তার্ণবে তাহা হতেছে বর্ধিত;
সেই রক্তার্ণবে তাহা হবে কি ধ্বংসিত?
আছিল যে জাতি এই ভারত-ঈশ্বর,
আজি তারা, হা বিধাতঃ! বিদরে হৃদয়,
অস্পৃশ্য উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর-অধম!
তাহাদের শূদ্র নাম; দাসত্ব ব্যবসা
অর্ধাহার, অনাহার, জীবন নিয়ম;
পরমার্থ আর্যদের চরণ-লেহন!
পদ-চিহ্ন পুরস্কার! দেখিবে যখন
পবিত্র আর্যের মূর্তি, যাইবে সরিয়া
শত হস্ত; প্রণমিবে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া;
কেবল সঞ্চিবে অর্থ, ধরিবে জীবন,
আর্যের সেবার তরে! তিরস্কার ভাষা!
পদাঘাত সদাচার! করে হত্যা যদি
আর্য কেহ, নরহত্যা নহে কদাচন!
দুর্বল অনার্য জাতি; শক্তি, সভ্যতায়,
নহে আর্য-সমকক্ষ; অন্তর-বিগ্রহে
ক্ষত, খণ্ডকৃত; কিন্তু একই শোণিত
বহিছে অনার্য আর্য উভয় শরীরে,—
এই নির্যাতন তবে সহিব কেমনে?
দেখিয়াছ ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ অধম,
হইলে আহত ক্রোধে হয় উত্তেজিত;
আমরা মানব হায়! তবু জিজ্ঞাসিবে,—
কি সে ক্রোধ? কেমনে তা হইল সঞ্চার?
কিন্তু বৃথা; তব কাছে প্রকাশি কি ফল
এ গভীর ক্রোধশিখা? যেই নীতিচক্রে
হতেছে অনার্য জাতি এত নিষ্পেষিত,
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার
শীর্ষস্থানে ঋষিগণ! তুমি কি হে তবে
করিবে আহুতি দান এই হুতাশনে
আপন হৃদয়-রক্তে? কি স্বার্থ তোমার?
কহ তবে কি কারণে এ ঘোর নিশীথে,
এমন ভীষণ স্থানে আনিলে আমায়?
প্রতিহিংসা-পথ তুমি দিবে কি বলিয়া?
বলিবে কেমন তাহা, বলিবে যে কেন,
বুঝিতে না পারি; তাহে কি স্বার্থ তোমার?
প্রবঞ্চনা ষড়যন্ত্র থাকে যদি মনে,
নিরস্ত্র যদিও আমি এক পদাঘাতে
করিব বিচূর্ণ ওই অস্থির পঞ্জর।

বাসুকি সক্রোধে উঠি স্থিরনেত্রে চাহি
দুর্বাসার মুখ পানে, কহিল গর্জিয়া—
"এক পদাঘাতে করিব বিচূর্ণ ওই
অস্থির পঞ্জর।" ঋষি ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা স্থিরকণ্ঠে—"নাগেন্দ্র বাসুকি!
নাগ যে জাতির নাম, সেই জাতিপতি

হবে ক্রোধহিংসাধীন, না ভাবি বিস্ময়।
কিন্তু শান্ত কর ক্রোধ। জানিল যে জন
তোমার হৃদয়তত্ত্ব; আনিল হেথায়
বলিতে উপায়-মন্ত্র; যার তপোবলে
ওই দেখ জ্বলিতেছে প্রস্তরে অনল;
পদাঘাতে বিচূর্ণিত হবে না সে জন।
শান্ত কর ক্রোধ; শুন কি স্বার্থ আমার।
ষড়যন্ত্র সত্য কথা, নহে প্রবঞ্চনা!
কি স্বার্থ আমার? এই বিপুল ভারত
হয় নাই আজি কিম্বা কালি আর্যাধীন।
শত শত বর্ষ গত; তথাপিও যদি
পূর্ব-আধিপত্য-স্মৃতি হৃদয়ে তোমার
জ্বালায় এ মহাবহ্নি, পার কি বুঝিতে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ব্রাহ্মণ যে বলে
ভারতের শীর্ষস্থানে, রাহুগ্রস্ত দেখি
জ্বলিয়াছে কি অনল হৃদয়ে আমার?
বিধর্মী নাস্তিক ওই গোপের কুমার
বেদদ্বেষী, নবধর্মে যেই ক্ষুধানল
জ্বালায়েছে এই প্রান্তে, পার কি বুঝিতে
অঙ্কুরেতে যদি নাহি হয় নির্বাপিত,
ভস্মিয়া ব্রাহ্মণধর্ম, সেই পাপানল
প্লাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত?
পড়িলে ব্রাহ্মণ, সেই স্থান ক্ষত্রিয়ের!
আনন্দে ক্ষত্রিয় জাতি অনন্ত অসিতে
অনার্যের, ব্রাহ্মণের, পার কি বুঝিতে,
কাটিয়া ধর্মের তরু, করিবে বিস্তার
সেই অনলের পথ? পার কি বুঝিতে,
হবে ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ, ধরার ঈশ্বর?
শীর্ষস্থানে তার,—সেই ভণ্ড নারায়ণ!
সুশীল ব্রাহ্মণ, নহে শত্রু অনার্যের!
ব্রাহ্মণ না ধরে অস্ত্র, নাহি লয় বলে
রাজত্ব কাহারো, নহে যুদ্ধব্যবসায়ী।
ব্রাহ্মণের নীতিবলে পার্থক্য জাতীয়
না থাকিত যদি, যথা প্রবল সলিলে
মিশিয়া সলিল ক্ষুদ্র হয় বর্ণহীন,
হইত অনার্য জাতি বিলুপ্ত তেমন।
নবীন ধর্মের এই তরঙ্গে যখন
জাতীয় ধর্মের রেখা ল'বে উড়াইয়া,
হবে কিবা পরিণাম পার কি বুঝিতে?
এক কৃষ্ণ, এক ধর্ম, সমস্ত ভারতে!
দুই জাতি,—প্রভু, দাস। প্রভু ক্ষত্রিয়েরা;
দাস বৈশ্য, শূদ্র, আর পতিত ব্রাহ্মণ!
নিস্পেষণী যন্ত্রে যথা করে নিস্পেষিত
দুই শিলামধ্যস্থিত তণ্ডুলনিচয়,
আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য শিলায়,
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।
তোমরা অনার্য জাতি যুদ্ধ ব্যবসায়ী,
নহ ভীত রণে, বনে, অস্ত্রসঞ্চালনে।
লও ক্ষত্রিয়ের স্থান! হইলে চালিত
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় অনার্যের অসি,
ব্রাহ্মণ-মস্তিষ্ক সহ হইলে মিশ্রিত
অনার্যের ভুজবলে, হইবে নিহত
বর্বর ক্ষত্রিয়-জাতি তৃণরাশি মত।
পারিবে কি নাগরাজ?

বাসুকি

পারিব।

দুর্বাসা

পারিবে?
আইস নাগেন্দ্র! তবে, অগ্নি সাক্ষী করি
এই মহাসন্ধি করিব স্থাপন।

প্রসারি দক্ষিণ কর উভয়ে তখন
ধরি করে কর, মুষ্টি করিলা স্থাপন
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে,— নিবিল অনল।
ভীষণ বিষাণধ্বনি উঠিল ধ্বনিয়া
ঘোর অন্ধকার কক্ষে, আবার যখন
জ্বলিয়া উঠিল বহ্নি, দেখিলা বিস্ময়ে
সম্মুখে বিরাটমূর্তি! একি অকস্মাৎ

ধবলা গিরির চূড়া পড়িল কি খসি !
শুভ্র ভীম কলেবর ভস্মে আচ্ছাদিত ;
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম ; নাগ উপবীত ;
ত্রিনয়ন ; জটাজুট ; ললাট উপরে
শোভিতেছে অর্ধ-চন্দ্র, অষ্টমীর চন্দ্র
ধবলা গিরির শিরে, শোভিতেছে যথা।
সেই অর্ধ-চন্দ্র মাঝে ভুজঙ্গ দ্বিতীয়
সমাসীন ; সর্পদ্বয় তীব্র বিষধর,
শোভে মুহুর্মুহু ফণা সঙ্কোচি বিস্তারি,
সঞ্চালিয়া বিষজিহ্বা অগ্নিশিখা সম।
শোভিছে দক্ষিণ করে ভীষণ ত্রিশূল,
ধরি অন্য করে এক প্রচণ্ড বিষাণ
ধ্বনিতেছে মেঘমন্দ্রে। ভয়ে ও বিস্ময়ে
বাসুকি পড়িতেছিলা মূর্চ্ছিত হইয়া,
দুর্বাসা ধরিলা ত্রস্তে ; বলিলা গম্ভীরে—
"বাসুকি ! সম্মুখে দেখ দেবদেবেশ্বর
মহাদেব ! ভক্তিভরে কর প্রণিপাত।"
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে ভূমে, করি করযোড়,
দাঁড়াইলা দুইজন। গম্ভীরে তখন
কহিতে লাগিলা মূর্তি—"দুর্বাসা ! বাসুকি !
সাধু সন্ধি ! সাধু ব্রত ! এই সন্ধিবলে
আর্য অনার্যের ধর্ম, জাতি উভয়ের,
পবিত্র প্রণয়সূত্রে করিয়া বন্ধন,
নাস্তিক এ নবধর্ম নাশিয়া অঙ্কুরে,
নাশিয়া ক্ষত্রিয় জাতি, করহ স্থাপন
অনার্যের মহারাজ্য ! বাসুকি আপনি
সমগ্র ধরার ভার করহ বহন।
অন্যথা, হ'তেছে যেই চিতা বিধূমিত
দুষ্ট গোপসুত করে, জাতি ধর্ম সহ
করিবে উভয়ে ভস্ম—অনার্য, ব্রাহ্মণ !
সতর্ক দুর্বাসা—শত সতর্ক বাসুকি !"
আবার নিবিল বহ্নি। ধ্বনিল বিষাণ
বিদারিয়া গিরিকক্ষ, প্রতিধ্বনি তুলি
স্থির নিশীথিনী গর্ভে নিবিড় কাননে।
আবার সে বহ্নিশিখা জ্বলিল যখন,
উভয়ে বিস্ময়ে, ভয়ে, দেখিলা সে মূর্তি
বিষাণনিনাদ সহ গেছে মিশাইয়া।

পঞ্চম সর্গ

অনুরাগ

রৈবতক শৃঙ্গে বিচিত্র কানন,
বিচিত্র পাদপচয় ;
স্বভাবে রোপিত, স্বভাবে বর্ধিত,
স্বভাবের শোভাময় ।
কোথাও তমাল, কোথাও বা তাল,
কোথাও অশ্বত্থ বট ;
ফল-বৃক্ষ নানা, ফুল-বৃক্ষ সহ
সাজায়ে বিচিত্র পট ।
কোথাও দীর্ঘিকা সরসী কোথাও,
নীল নভঃ অনুকারী ।
ঝরিছে নির্জনে, মধুর নিক্কণে
কোথাও নির্ঝরবারি ।
বন-অন্তরালে পুষ্পের উদ্যান,
পুষ্পবাটী মনোহর,
মর্মরে নির্মিত, কোথায় লতায়,
পুষ্পিত নিকুঞ্জ থর ।
শৃঙ্গ প্রান্তভাগ লজ্ঘনীয় যথা
শোভিছে তোরণ দৃঢ় ;
শোভে মধ্যস্থলে পুরী মর্মরের
গগন পরশি শির ।
পুরীর পশ্চাতে একটি উদ্যানে,
একটি নিকুঞ্জে বসি,
সখী সুলোচনা গাঁথে ফুলমালা,—
মেঘমাখা মুখ-শশী ।
শ্যামা সুলোচনা, মধ্যমযৌবনা
মধ্যম শরীরখানি ;
লাবণ্য মাধুরী অজ্ঞাতেতে চুরি,
কে যেন করিছে হানি ।
কৈশোরে তাহার প্রেমের কলিকা
পড়েছে ঝরিয়া বালা
শূন্য বৃন্ত বহে, শূন্য হৃদয়েতে,
সহে না কণ্টকজ্বালা ।
নিরজনে যথা বসি একাকিনী
কপোত-কূজনে নীড়ে,
নিকুঞ্জে বসিয়া নিরজনে তথা
গাঁথে মালা, গায় ধীরে ।

গীত

১

ফুলের প্রণয়-ভাষা মরি কি মধুর রে !
আঁধারে আঁধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি মরে থাকে সরমে ;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে, উহু বাজে তার মরমে !
কিবা নব অনুরাগে কামিনী কুসুমে রে !

২

প্রেমের কৈশোরভাগ রজনীগন্ধায় রে !
আঁধারে আঁধারে থাকে,
আঁধারে লুকায়ে রাখে
শীতল সৌরভভরা সুকোমল শরীরে ;
কিন্তু সহে দরশন,
সুকোমল পরশন,
তোল তারে,—প্রেমভরে কাঁদিবেক শিশিরে।
প্রেমের কৈশোর ভাষা রজনীগন্ধায় রে !

৩

প্রেমের যৌবন দেখ বিকচ গোলাপে রে !
প্রীতিময়, প্রেমময় ;
শোভাময়, সুধাময় ;

ব্রীড়ায় ঈষৎ হাসি ভাসিতেছে অধরে !
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে,
তথাপি কোমল প্রাণ,—ঝড়বেগে ঝরে রে !
প্রেমের যৌবনভাব বিকচ গোলাপে রে !

৪

প্রেমের প্রৌঢ়তা-মূর্তি পদ্মিনী সুন্দরী রে !
সুখ শান্তি স্বরূপিণী,
প্রীতিপূর্ণ সরোজিনী,
যৌবনসৌরভ আছে হৃদয়েতে লুকায়ে ;
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়া নাই,
সেই চঞ্চলতা নাই,
প্রীতি-পারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে,
ঝড়ে বজ্রে নাহি টলে পদ্মিনী সুন্দরী রে !

৫

প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে !
গলায় গলায় থাকে,
হৃদয়ে হৃদয় মাখে,
শয্যায় পড়িয়া থাকে অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া ।
বিরহতাপিত প্রাণে
কি যে শীতলতা আনে,
সুকোমল সৌরভেতে মন প্রাণ মোহিয়া !
প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে !

৬

প্রেমের দুরাশা ব্রতী ওই সূর্যমুখী রে !
কোথায় গগনে রবি,
প্রচণ্ড অনল ছবি,
কোথা গন্ধহীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়া !
কি দুরাশা হৃদে বহে !
অনিমেষনেত্রে রহে,
যায় শুকাইয়া সেই রবিপানে চাহিয়া,
প্রেমের দুরাশা ছবি ওই সূর্যমুখী রে !

৮

প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে !
আঁধারে আঁধারে ফুটে,
আঁধারে ভূতলে লুঠে
কাঁদি সারা নিশি, পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া ।
মাটিতে রাখিয়া বুক,
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া ;
প্রেমের বিধবা হায় ! ওই শেফালিকা রে !

পশ্চাত হইতে কে আসে অজ্ঞাতে,
নয়ন চাপিয়া ধরি,
রহিলা নীরবে । কহে সুলোচনা
হাসিয়া—"আ মরি ! মরি !
হেন সুবাসিত, বিকচ গোলাপ,
কে বর্ষিতে পারে আর,
বিনা সত্যভামা ফুলকুলেশ্বরী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ রূপে যার !"
ঠোনকা মারি গালে, ভ্রূকুটি করিয়া,
বলিলা আসিয়া আগে—
"ঠাট্টা, পোড়ামুখি ! গোলাপের কাঁটা
ফুটিতে কেমন লাগে ?"
"তোর মাথা খাই ঠাট্টা নহে দিদি !
সত্য বলি এই বার—
বিনা সত্যভামা, দুর্জয় মানিনী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ মানে যার ।"
সুন্দরী কাড়িয়া লয়ে ফুলমালা,
বলিলা কৃত্রিম রাগে,—
"ছিঁড়ি ফুলমালা, দিব ফেলাইয়া,
দেখিব লাগে না লাগে !"
হাসি সুলোচনা, কহিলা তখন,—
"সত্যভামা হার,
গলায় যাহার,
কি কাজ তাহার,

ফুলের মালা ?
আছে কোন ফুল,
সাজাতে এমন
ভূতলে অতুল
রূপের ডালা ?"
পুন ঠোন্‌কা গালে পড়িল হঠাৎ,
বাড়িল দ্বিগুণ ক্রোধ,
বাড়িল সখীর হাসির তরঙ্গ,
হাসির নাহিক রোধ।
বাম কর কক্ষে, দক্ষিণ করেতে
শোভিছে মোহিনী মালা,
মালা করে নিজে শোভিছে মোহিনী
কানন করিয়া আলা।

গৌরাঙ্গ গৌরবে ঈষৎ রক্তিমা,—
তরুণ অরুণাভাস ;
সুগোল বদন বালার্কমণ্ডলে,
মহিমার পরকাশ।
বিলাস-বিহ্বল বিস্তৃত নয়নে
মদালস দুই তারা ;
যৌবন তরঙ্গ ছুটিয়া, ফাটিয়া,
অঙ্গে অঙ্গে মাতোয়ারা।
ঈষৎ ফুল্লান রক্তিম অধরে
বাসনা সমুদ্র জাগে ;
সুপ্ত ক্রোধানল, মানের ঝটিকা,
সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগে।
ভুবন-মোহিনী দাঁড়ায়ে নীরবে
দেখিছে সখীর হাসি ;
হাসি হাসি সখী, নয়ন ভরিয়া,
দেখিছে রূপের রাশি।
"মার দিদি! মার!"—কহে সুলোচনা,-
মার পুন ধরি পায় ;
রক্ত শতদল মরি! আরবার
লাগুক আমার গায়।

যে কর-পরশে রমণীর প্রাণে
এমন অমৃত ঢালে!
আলিঙ্গনে তার, পুরুষের প্রাণে
না জানি কি শিখা জ্বালে!
মুখ-ভঙ্গিমায়, করিয়া উত্তর
স্থির কণ্ঠে কহে রাণী,—
"কাঁদ্‌ছিলি তুই বল্‌ পোড়ামুখী
তোর সব আমি জানি।
মিথ্যা যদি তুই বলিবি আবার,
নিশ্চয় খাইবি মার!"
"মিথ্যা তবে বলি,—না দিদি এবার
সত্য ভিন্ন নহে আর।
কর কোকনদ পরশে তোমার,
যুগল নয়ন মম
আনন্দে শিশির করিল বর্ষণ ;—
ক্ষম! পায় পড়ি ক্ষম!"
দু'হাতে সাপটি কেশরাশিভার
ধরিলা মহিষী পুনঃ,—
"ছাড়! দিদি ছাড়! উহু বড় লাগে,
সত্য বলিতেছি শুন।"
মুক্ত হ'ল কেশ, ধীরে সুলোচনা
বলিল ঈষৎ হাসি—
"সত্য সত্য দিদি, কাঁদিতেছিলাম,
কান্না বড় ভালবাসি!"
"কিসের রোদন ?"—"মধুর প্রেমের।"
"কার প্রেম ?"—"নাথ মম।"
"বালবিধবার, নাথ কে আবার ?"
"হৃদয়েতে যেই জন।"
"অসম্ভব কথা, বালিকা-হৃদয়ে
কেমনে রহিবে ছায়া ?"
"নাহি ছিল দিদি! কিন্তু তুমি হায়!
জান না প্রেমের মায়া।

বুঝিবে না তুমি এ প্রেম আমার,
 শরীরে বিমুগ্ধ তুমি ;
তোমার প্রলয় বাসুদেব যদি
 যান পঙ্ক পদ ভুমি।
সম্মুখ-সমরে পড়িলেন পতি,—
 এইমাত্র জানি আমি ;
সম্মুখ-সমরে পড়িলেন পতি,—
 এই স্মৃতি মম স্বামী।
এ চারিটি কথা শরীর তাহার,
 তাহার অতুল মুখ।
জিনি কৃষ্ণার্জুন সে রূপ তাহার
 জুড়ায় আমার বুক।
সমস্ত শর্ব্বরী সেই পতি মম
 আমারে হৃদয়ে রাখে।
সমস্ত দিবস সেই পতি মম
 আমার হৃদয়ে থাকে।
আমার এ প্রেমে মুহূর্ত বিরহ
 নাহি ঘটে কদাচন ;
নাহি উঠে কভু ঈর্ষার গরল ;
 মানের ঝটিকা রণ।
আমার এ প্রেম শান্তি-পারাবার,
 হৃদয় ভরিয়া যায়,"—
"মর্ গিয়া তুই, সেই পারাবারে !
 সত্যভামা নাহি চায়।
এলো পোড়ামুখী বালিকা বিধবা
 আমায় শিখাতে প্রেম,
আসিল কাঙ্গাল দেখাতে ধনীরে
 কাহাকে যে বলে হেম।
তরঙ্গ-বিহীন সে প্রেম কি প্রেম ?—
 ক্ষুদ্র সরসীর জল !
মহাপারাবারে কভু শান্তি, কভু
 উত্তাল তরঙ্গদল।
শান্তি ঝটিকায়, আঁধারে জ্যোৎস্না,
 জলদে বিজলী-খেলা,
নাহি যেই প্রেমে ; না পারে যে প্রেম,
 প্লাবিয়া পর্বতবেলা,
নিতে ভাসাইয়া, তৃণের মতন,
 উন্মত্ত সংসার করি ;
না ছুটে বিদারি হৃদয়-ভূধর
 গৈরিক-মুরতি ধরি ;
হাসিতে জ্যোৎস্না, ধাঁধিতে বিদ্যুৎ,
 গর্জিতে অশনিপ্রায়,
না পারে যে প্রেমে ; সেই তুচ্ছ প্রেম
 সত্যভামা নাহি চায়।"
বলিয়া গরবে বসি গরবিণী
 লাগিলা গাঁথিতে হার।
কিছুক্ষণ পরে, ধীরে সুলোচনা
 আরম্ভিলা আরবার,—
"সত্যভামা-প্রেম বুঝি বা না বুঝি,—
 বজ্রর বিদ্যুৎ গাঁথা,
বুঝিয়াছি আমি আর এক জন
 খেয়েছে আপন মাথা।"

সত্যভামা

কে সে ছিন্নমস্তা ?

সুলোচনা

 সুভদ্রা আমার।

সত্যভামা

 বুঝিয়াছ ভাল তবে।
সেই উদাসিনী ? তারো প্রাণনাথ
 চারিটি কথাই হবে।

সুলোচনা

 কথা নহে দিদি ! তার চিত্তচোর
 সেই বীরচূড়ামণি।

সত্যভামা

 বাসুদেব তবে,—বিনে সেই চোর,
 বীর কারে নাহি গণি।

সুলোচনা

 বাসুদেব বীর ! এ সংবাদ, দিদি !

কোথায় পাইলে তুমি ?
সেই দিনে সেই অস্ত্র-অভিনয়,
ভুলিলে সে রঙ্গভূমি ?
তব বাসুদেব দাঁড়াইয়া পাশে
ছিলা ফেল্ ফেল্ চেয়ে ;
"ধন্য ধনঞ্জয় !"—যবে বারম্বার
উঠিল আকাশ ছেয়ে।
বাঘিনীর মত পড়ি বক্ষে তার,
সখীরে ভূতলে ফেলি,
"ছোট মুখে তোর, এত বড় কথা।"—
বলিয়া চরণে ঠেলি।
"ছাড়্ দিদি ছাড়্ তোর মাথা খাই,
এমন কর' না আর।"
ব'লি সুলোচনা হাসিতে হাসিতে
বাঁধিল কেশের ভার।

সত্যভামা

বল্ তবে তুই বুঝিলি কেমনে,
সুভদ্রার অনুরাগ ?

সুলোচনা

বুঝ তুমি কিসে বীণায় আমার
বাজে কি রাগিণী রাগ ?

স্যতভামা

বুঝিয়াছি আহা ! বুঝাবি আমায়
কোকিলের কুহুস্বনে,—
তাহাও ত নাই, দুরন্ত শরতে,
গেছে মলয়ের সনে।
ভ্রমর গুঞ্জনে, কুসুম-কাননে,
বলিবি ভদ্রার জ্ঞান
যায় হারাইয়া, পদ্মপত্রে শু'য়ে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
অন্ন নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়,
দিবানিশি কাঁদে বসি ;
জ্যোৎস্না দেখিলে, উহু উহু বলে,
বরণ হয়েছে মসী।
পড়িছে খসিয়া প্রকোষ্ঠ-বলয়,
বিশুষ্ক অধরদল ;
না যতনে আর পশুপক্ষিগণে,
নাহি দেয় বিন্দু জল।

সুলোচনা

এ সব লক্ষণ নহে সুভদ্রার,
ছাড় উপহাস, বলি,—
নিশ্চয় জানিও ফোট ফোট ফোট
ভদ্রার প্রণয়-কলি।
সেই উদাসীন নয়ন তাহার
নহে লক্ষ্যহীন আর ;
অথচ সে লক্ষ্য চাহে লুকাইতে
অন্তর অন্তরে তার ;
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ নীলিমা
নয়ন-তারায় ভাসে,
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ রক্তিমা
অধরকোণায় হাসে।
কি যেন হয়েছে কোমলতা আরো
সন্ধার কোমল মুখে ;
কি যেন কি ভাব, কোমলতা আরো
হয়েছে সন্ধার বুকে।
ফুট ফুট ফুট কমল-কলিতে
পড়েছে অরুণাভাস,
স্থির সিন্ধু-জলে হয়েছে ঈষৎ
জ্যোৎস্নার পরকাশ।
বরঞ্চ অধিক যতনে সুভদ্রা
আপনার পক্ষীগুলি ;
দিতেছে আহার কিন্তু চেয়ে দেখ
কি যেন ভাবিছে ভুলি।
কোমলতাময় মুরতি তাহার
হয়েছে কোমলতর ;—
যাই আমি তারে আনিব এখনি,
মুহূর্ত অপেক্ষা কর !"

ছুটিল রমণী, বারিভরা মেঘ
ছুটিল পবনে যথা ;
মুহূর্ত্তেক পরে হাসিতে হাসিতে
ফিরিয়া আসিল তথা।
পশ্চাতে সুভদ্রা, ক্ষুদ্র দুই কর
বাঁধা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে,
হাসি সুলোচনা, চোরের মতন
টানিয়া আনিছে বলে।
"জয় মহারাজ! অখণ্ড-প্রতাপ!"—
নমি বামা ভূমিতলে,
কৃতাঞ্জলিপুটে, বলিতে লাগিল,—
"নিবেদি চরণতলে,—
রাজপ্রাসাদের, রুদ্ধ এক কক্ষে
নির্জ্জনে বসিয়া চোর,
করিতেছে চুরি, ধরিয়াছি আমি
পুরস্কার হ'ক মোর।
চোরাধন সহ, আনিয়াছি চোর,
হউক বিচার তার!
সত্যভামা-রাজ্যে হয় হেন চুরি,
স্বয়ং কৃষ্ণ চোর যার!"
অঞ্চল হইতে চিত্রপট এক
দিল সত্যভামা-করে ;
মহিষীর মুখ হইল গম্ভীর,
চলিলা আপন ঘরে।

"ছবি,—ছবিখানি,—দিয়ে যাও দিদি!"—
সুভদ্রা বলিলা ডাকি।
ফণিনীর মত মুখ ফিরাইয়া,—
"ভদ্রা! হেন ছবি আঁকি,
চাহিস্ আবার নিতে ফিরাইয়া!"—
বলিলা মহিষী রোষে,
"দেখাব ভ্রাতারে ভগিনীর গুণ ;
গেল কুল তোর দোষে!"
বলে সুলোচনা,—"সাধু পুরস্কার
নাহি এই ভূমণ্ডলে।"
চলিল গাহিয়া, আপনার মালা
পরিয়া আপন গলে।

গীত

ফুলের প্রণয়-ভাষা মরি কি মধুর রে।
আঁধারে আঁধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি ম'রে থাকে সরমে ;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে উহু! বাজে তার মরমে,
কিবা নব অনুরাগ কামিনী কুসুমে রে!

ষষ্ঠ সর্গ

পুরোদ্যানে

"গগনের মধ্যস্থলে দেব অংশুমালী,
সৌর রঙ্গভূমে যথা সৌরেন্দ্র কেশরী", —
বলিলা ফাল্গুনী ধীরে,
আরোহিয়া শৃঙ্গশিরে,—
"বর্ষিছেন কি অনল! বন অন্তরালে
সে প্রখর কররাশি পড়ি শত শত,
জ্বলিতেছে যেন খণ্ড দাবানল মত।
শারদীয়া দিন,—
জীবনের প্রতিমূর্তি! প্রভাত তাহার
হাস্যময়, সুকোমল,
সমুজ্জ্বল, সুশীতল;
মধ্যাহ্নে হৃদয়ে জ্বলে জ্বলন্ত অনল;
অপরাহ্নে,—হায়! এই মানব জীবন,
হয় কি তেমনি শান্ত, তেমনি শীতল?"
বসি এক তরুতলে,
শরাসন শরদলে,
রাখিয়া ভূতলে; ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণে
রহিলেন কিছুক্ষণ চাহি শূন্য পানে।
"নাহি জানি আজি,
কি ভাবিলা বাসুদেব! একি বিড়ম্বনা!
সম্মুখে রয়েছে মৃগ দেখিতে না পাই,
মৃগ এক দিকে, আমি অন্য দিকে যাই।
মৃগ লক্ষ্য করি যত হানিলাম শর,
—হাসিলেন বাসুদেব—হলো লক্ষ্যান্তর।"
কিছুক্ষণ অন্যমন;
ল'য়ে তূণ শরাসন,
ধীরে অট্টালিকামুখে চলিলা যখন,—
কুঞ্জগৃহে ও কি মূর্তি!—থামিল চরণ।
সুন্দর একটি শ্বেত মর্মর-আসনে,
বসি একাকিনী ভদ্রা! সেই আসনের
শ্বেতপৃষ্ঠ উপাধানে
রয়েছে অসাবধানে
অধোমুখ; সদ্যঃস্নাত কেশরাশি পড়ি,
রাখিয়াছে তনু মুখ সর্বাঙ্গ আবরি।
একটি হরিণশিশু বসি পদতলে,
কভু ঘ্রাণিতেছে পদ রক্তশতদল
কভু নিরখিছে লুপ্ত বদনমণ্ডল।
দূর হ'তে স্থিরনেত্রে পার্থ বহুক্ষণ
সেই মূর্তি, সেই রূপ, করিলা দর্শন।
"আকাশের অন্তরালে রয়েছে ত্রিদিব,"—
বলিতে লাগিলা পার্থ,—
"তথাপি সে স্বর্গশোভা নিরখি যেমন;
কেশরাশি-অন্তরালে রহিয়াছে পড়ি
যেই স্বর্গ দীনভাবে, নয়নে আমার
তাহার অতুল শোভা ভাসিছে তেমন,
পবিত্রতা, শীতলতা, করি বরিষণ।
পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত,
অলক-আঁধারে ওই অতুল আনন
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা বিকাশি,
নিদ্রার আঁধারে যেন স্বপনের হাসি;—
অতীতের সুখ-স্মৃতি; ভবিষ্যৎ আশা;
নিরাশার অন্ধকারে যেন ভালবাসা।"

সুভদ্রা

ছি ছি কি লজ্জার কথা! বাসুদেব আজি
দেখিবেন সেই চিত্র! পুরবাসিগণ
দেখিবে, হাসিবে সবে। ভাবিবে কি,—কেন
আমি ত কতই চিত্র করেছি অঙ্কিত,
—কত বীররূপ,—কই কেহ ত কখন,
সত্যভামা কখনো ত, দোষে নি এমন?

অর্জুন

ঈষৎ ঈষৎ ওই আরক্ত অধর
সুধাসিক্ত কাঁপিতেছে ; মন্দ সমীরণে
কাঁপিতেছে দুই ফুল্ল গোলাপের দল,
পল্লবের অন্তরালে, শিশির সজল ?
না পাই শুনিতে কণ্ঠ ; তবু কাণে মম
কি সঙ্গীত প্রেমময় হতেছে বর্ষণ,
নিশীথে স্বপনশ্রুত দূর বংশীমত,—
মধুর অশ্রুতপূর্ব ! হৃদয় কঠিন
নৈশ সমীরণ মত হতেছে বিলীন
অজ্ঞাতে তাহাতে ; কোনো পুণ্যের জীবন
ত্রিদিব-জ্যোৎস্না-গর্ভে মিশিছে যেমন !

সুভদ্রা

নাহি কোনো দোষ ? তবে হৃদয় আমার
এমন হইল কেন ? আঁকিয়াছি আমি
কত চিত্র, কত রূপ, এই চিত্র খানি
কেন লুকাইয়া আঁকি ?
কেন লুকাইয়া রাখি ?
কেন ইচ্ছা হয় সদা লুকাইয়া দেখি ?
কত আবরণে রাখি,
কত আবরণে ঢাকি,
ঢাকিলেও কেন পুনঃ ভয় হয় মনে
দেখা যাইতেছে চিত্র ? ভূতলে, গগনে,
প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে, হৃদয়ে আমার,
দেখি সেই ঢাকা চিত্র ভাসে অনিবার !
কত দেখি ! তবু কিছু দেখিতে না পাই।
কিসে মম দু' নয়ন
করে আসি আবরণ,
কি ভয় হৃদয়ে মম হয় সঞ্চারিত,
কাঁপে দুরু দুরু বুক, হারাই সম্বিত !

অর্জুন

নিশ্চয় ভুলেছি পথ ; এই পুষ্পোদ্যানে
পুষ্প-স্বরূপিণী, যত পুর-নিবাসিনী
করেন বিহার। কিন্তু নাহি শক্তি মম
যাই অন্য পথে। মেঘ আবরণে থাকি
শশাঙ্ক যেমতি করে সিন্ধু বিচঞ্চল,
কেশ আবরণে ওই শশাঙ্ক বদন,
করেছে তেমতি মম হৃদয় বিহ্বল !
যাই স্থানান্তরে,—কই নাহি চাহে মন।
যাই তার কাছে,—কই চলে না চরণ।
কিবা রণে, কিবা বনে,
পশেছে নির্ভয় মনে
যেই জন ; আজি তার কাঁপিছে হৃদয়,
একটি বালিকা কাছে করিতে গমন ;
কাঁপিতেছে পদ ভীত শিশুর মতন।

সুভদ্রা

কত বার কত যত্নে সেই মুখখানি
আঁকিলাম, কিন্তু কই হ'ল না তেমন !
হইবে কেমনে ? আমি—আমি ত কখন
দেখি নাই সেই মুখ ভরিয়া নয়ন।
দেখিতে কি জানি হয় হৃদয়ে সঞ্চার,
না পারি তুলিতে মুখ চাহিতে আবার।
সেই বীরত্বের রেখা, গর্বিত ভঙ্গিমা,
সে গৌরব, সে গাম্ভীর্য, অনন্ত মহিমা,
উজ্জ্বল নয়নে সেই বীর্য-কালানল,
—দয়াতে মণ্ডিত, সদা স্নেহেতে সজল,—
কঠিনতা সনে পর-দুঃখ-কাতরতা,
সেই দৃঢ়তার সনে সেই সরলতা,
সুনীল গগন সেই বদনমণ্ডল,
আলিঙ্গি মধ্যাহ্ন-রবি শশী পূর্ণিমার,—
আতপ-জ্যোৎস্না-মাখা,—চিত্রে সাধ্য কার
অর্জুন !—ফাল্গুনী !—পার্থ !
"সুভদ্রে ! সুভদ্রে !"—
আসি লতা-গৃহদ্বারে ধীরে ধনঞ্জয়
কহিলা তরল-কণ্ঠে—"এ কি ! কে তোমারে
এমন নিষ্ঠুররূপে করিল বন্ধন ?"
চমকি উঠিলা ভদ্রা ; সম্বরি বসন
ভাবিলেন যাই চলি। ঘুরিল মস্তক ;

আশ্রয়বিহীনা দীনা লতার মতন,
আসনে অর্ধ-মূর্ছিতা পড়িলেন ঢলি।
কালীদহ সম আলুলায়িত কুন্তল
পড়িল তরঙ্গে খেলি, আঁধারি ভূতল।

অর্জুন

দেও অনুমতি, কর-কমল যুগল
বন্ধন হইতে, ভদ্রা, করি বিমোচন!
কে দিবে উত্তর?
বালিকার অবসন্ন প্রাণে ধীরে ধীরে,
ক্লান্ত বিশ্বে প্রদোষের ছায়ার মতন,
সুকোমল নিদ্রা যেন করিছে প্রবেশ!
ভদ্রা ভাবিতেছে মনে—"দেবি বসুন্ধরে!
তোমার হৃদয়ে মাতা লুকাও আমায়!"
সেই নিরাশ্রিতা ক্ষুদ্র লাবণ্যের লতা
নিপতিতা, অর্ধসুপ্তা কেশ-অন্ধকারে,—
মুহূর্তেক ধনঞ্জয় দেখিলা নীরবে
অচলহৃদয়ে। জানু পাতি ভূমিতলে
বসি পার্শ্বে; ধীরে—ধীরে—বদ্ধকরদ্বয়
লইয়া আপন করে। মধুর পরশে
কি অমৃত উভয়ের শিরায় শিরায়
বহিতে লাগিল ধীরে,—স্রোত জ্যোছনার!
নিবিল মধ্যাহ্ন রবি, ডুবিল সংসার!
দেখিলা উভয়ে,—
কৌমুদী-মণ্ডিত এক অপূর্ব উদ্যান,—
ফুলময়, ফলময়; বৃক্ষলতারাজি
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে হাসে চন্দ্রালোকে
ছায়াহীন! চন্দ্রালোকে, স্ফটিকের মত,
বিভাসিত স্বচ্ছ দেহ শ্যাম শোভাময়।
সেই চন্দ্রকর স্থির; সেই ফল ফুল
সদ্যস্ফুট, সুধাপূর্ণ সুসৌরভময়।
সেই মৃদু সমীরণ, জাগায় হৃদয়ে
কি যেন কি সুখস্মৃতি, সুখের স্বপন।
শান্ত, নিরজন, স্থির সেই উপবনে
অর্জুন দেখিলা ভদ্রা,—বিমুক্ত-কবরী
বসি একাকিনী স্থির, কানন-ঈশ্বরী,
সেই স্থির জ্যোছনায় স্থির পূর্ণ শশী!
সুভদ্রা দেখিলা পার্থ, একক সে বনে।
নীল নভঃ সম বপু মনোহর
গৌরব-জ্যোছনা-পূর্ণ করিছে কানন।
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়, দেখিলা উভয়
প্রেম-চন্দ্রালোকে, সেই হৃদয়-কানন,
উভয়ে উভয়মূর্তি অতৃপ্ত নয়নে।
বেঁধেছিল সুলোচনা এতই কি দৃঢ়?
নাহি জানি। কিন্তু জানি বীর ফাল্গুনীর
বহুক্ষণ সে বন্ধন লাগিল খুলিতে।
বহুক্ষণ করে কর, কমলে কমল,
আলিঙ্গিল, আলিঙ্গন কতই মধুর!
কি যেন কহিল,—ভাষা নীরব সুন্দর!
বহুক্ষণ করে কর, আত্ম সমর্পিল
নীরবেতে,—সমর্পণ অতি মনোহর!
কিছুক্ষণ পরে ভদ্রা, স্বপ্নান্তে যেমন,
নিলা সরাইয়া কর। জাগিয়া অর্জুন
জিজ্ঞাসিলা হাসি,—"ভদ্রে, করিল বন্ধন
কে তোমারে?" জিজ্ঞাসিলা আবার আবার,
বহুবার। ধীরে ভদ্রা কুন্তল-কাননে
লুকাইয়া অধোমুখ উত্তরিলা ধীরে—
"সুলোচনা"
"সুলোচনা,"—জিজ্ঞাসিলা পুনঃ
ধনঞ্জয়,—"সুলোচনা! কেন—কোন্ দোষে?"
নীরব,—শুনিলা প্রশ্ন পাষাণ-প্রতিমা।
জিজ্ঞাসিলা বহুবার,—ভদ্রা নিরুত্তর।
হাসিয়া কহিলা পার্থ,—"তবে পুনর্বার
বাঁধিব বন্ধন যাহা করেছি মোচন!"
চমকি সরিয়া ভদ্রা, মেঘখণ্ড মত,
উত্তরিলা ধীরে—"চিত্র।"
"বিচিত্র উত্তর!"—
হাসিয়া হাসিয়া পার্থ, কহিলা আবার—

"কি চিত্র ? কাহার চিত্র ? কি হয়েছে তার ?"
এবার বিপদ ঘোর ! দিবেন উত্তর
—কি লজ্জা !—কেমনে ভদ্রা ! নাহি দেন যদি
অর্জুন বাঁধিবে,—অঙ্গ উঠিল শিহরি।
পুনঃ বসুধায় বালা ডাকিলা কাতরে
লুকাইতে এই লজ্জা ;—শুনিলা ধরণী,
আনিলা সহায় এক বীরচূড়ামণি।
পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্র শিশু মনমথ,
অবতীর্ণ রঙ্গভূমে !
ফুলধনু ফুলতূণ, শরফুলাঙ্কুর,
বাজাইছে রণবাদ্য কিঙ্কিণী নূপুর।
অঙ্গে পুষ্প আভরণ
শোভিতেছে অগণন,
কুঞ্চিত কুন্তল শোভে ললাট উপর,
শোভে তদুপরে পুষ্প কিরীট সুন্দর।
ফুল চোক, ফুল মুখ, ফুল তনুখান,
ফুলের পুতুল যেন ফুলে শোভমান।
হাসি হাসি ফুলরাশি
আনন্দে ছুটিয়া আসি,
জলদ-চিকুরজালে পশি, বাম করে
ধরিল ভদ্রার গলা ; পরম আদরে
ভদ্রা ফুলরাশি বক্ষে করিয়া ধারণ
বরষিলা ফুলে ফুল, সহস্র চুম্বন।
চুপে চুপে কাণে কাণে ফুলে ফুল রাখি—
"সেই ছবিখানি—সেই, এঁকেছিলে তুমি !
ছোট মা করিল চুরি !"—আরো চুপে চুপে
"এই দেখ, চুরি করি আনিয়াছি আমি !"
বলিয়া হাসিয়া শিশু, পুষ্পতূণ হ'তে
টানিয়া লইয়া চিত্র, করিল অর্পণ
সুভদ্রার করে,—পার্থ লইলা কাড়িয়া
দ্রুত হস্তে। এ কি চিত্র ! পড়িল যেমন
দৃষ্টি চিত্রে, আর নাহি ফিরিল নয়ন !
চিত্র অর্জুনের। চিত্রে, যাদবসভায়
অর্জুন সপ্তাহপূর্বে, যেই অস্ত্রক্রীড়া
দেখাইলা রৈবতকে, রয়েছে অঙ্কিত।
রঙ্গভূমি চক্রাকারে করিয়া বেষ্টন
বসিয়াছে বীরগণ ইন্দ্রধনু মত,
যাদব-ঐশ্বর্যে বীর্যে ঝলসি নয়ন
এক দিকে ; অন্য দিকে পুরনারীগণ
শোভিতেছে যেন ফুল্ল কুসুম-কানন।
অসংখ্য দর্শকবৃন্দ পশ্চাতে তাহার
শোভিছে অনন্ত ঘন আকাশের মত,—
প্রশান্ত গম্ভীর স্থির ! পার্থ কেন্দ্রস্থলে
আকর্ণ টানিয়া ধনু করিছে গগন
অদ্ভুত আয়ুধপূর্ণ অদ্ভুত কৌশলে,—
মহিমার প্রতিমূর্তি ; পুরনারীগণ—
সুভদ্রা নাহিক তথা,—ছাইয়া গগন
পুষ্প-করে করিতেছে পুষ্প বরিষণ।
রঙ্গভূমি এক প্রান্তে শ্লথ-শরাসনে
হেলাইয়া বীর দেহ, ত্রিভঙ্গ মুরতি,
দাঁড়াইয়া বাসুদেব—স্থির দু'নয়ন
অধরে ঈষৎ হাসি। যদুবীরগণ
স্থানে স্থানে প্রান্তভাগে, স্তম্ভিত-বদন।
অর্জুন অনন্যমনে লাগিলা দেখিতে
আপনার প্রতিকৃতি। চিত্র যেন তাঁরে
নীরবে কহিতেছিল,—"দেখ ধনঞ্জয়,
প্রত্যেক রেখায় তব, দেখ চিত্রকর
কি হৃদয়, কি প্রণয়, দিয়াছে ঢালিয়া
ভাষাপূর্ণ,—গীতিপূর্ণ।" উচ্ছ্বসিত চিতে,
সে গীত, সে ভাষা, পার্থ লাগিলা দেখিতে।
অর্জুনের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া
জিজ্ঞাসিল শিশু,—"কাম,—কাম সঙ্গে তুমি
করিবে কি রণ ?" ভদ্রা হাসিয়া বদন
লুকাইলা পৃষ্ঠে তার। হাসিয়া অর্জুন
উত্তরিলা—"বৎস ! তুমি যেই ফুলবাণ
ধরিয়াছ, সাজিয়াছ যেই রণবেশে,
পশিয়াছ যেই দুর্গে কামারি আপনি
নাহি সাধ্য তব সনে করিবেন রণ।"

মন্মথ

কেমন সুন্দর বাণ, কেমন ভূষণ,
দিয়াছে আমায় দেখ পিসীমা আমার ;
তোমার ধনুক কই ? আছে কি এমন ?

অর্জুন

না বৎস। কোথায় পাব ? পিসীমা তোমার
যেই ফুলবাণে বৎস ! সাজান তোমারে,
করেন আহতমাত্র হৃদয় আমার।
উচ্চ হাসি হাসি' শিশু বলিল তখন—
"তবে—তবে—পিসীমার সঙ্গে রণে,- তবে
নাহি পার তুমি ?"

অর্জুন

বাছা ! তাহা মিথ্যা নয়,
বিনা যুদ্ধে তাঁর কাছে জিত ধনঞ্জয়।
তখন আনন্দে শিশু হাসি পিসীমার
জড়াইয়া ধরি গলা, বলিল আবার—
"দেখ পিসীমায় আমি কত ভাল বাসি,
তুমিও কি বাস ?"

অর্জুন

বাসি, বৎস মনমথ !
আমায় কি পিসী তব বাসে সেই মত ?
বাম করে ধরি গলা, চিবুক দক্ষিণে
সুভদ্রার, জিজ্ঞাসিল শিশু কাম—"বাস ?"
লজ্জা-ম্রিয়মাণা ভদ্রা ; অধোমুখ যত
করেন আনত, শিশু তত অধোমুখে
জিজ্ঞাসে—"পিসীমা বাস ?" না পেয়ে উত্তর
"পিসীমাও বাসে।"—বলি হাসিল সত্বর।

পারি অকাতরে এই জীবন আমার,
দিতে বিনিময়ে ওই একটি কথার।
অকস্মাৎ চিত্রপট কে নিল কাড়িয়া ?
উচ্চ বংশীরবে হাসি শিশু মনমথ
লুকাইল পুষ্পবনে পুষ্পরাশি মত।
ফাল্গুনী ফিরায়ে মুখ দেখিলা বিস্ময়ে,—
সত্যভামা ! প্রণিপাত করিলা চরণে
সসম্ভ্রমে। ভদ্রা ধীরে যেতেছে চলিয়া।
সুলোচনা দ্রুতগতি আনিলা ধরিয়া।

সত্যভামা

না জানি কি ভাগ্য আজি। মধ্যাহ্ন সময়
অন্তপুর-উদ্যানেতে পার্থের উদয় !

সুলোচনা

ভাগ্য বটে ! এক চোর আসিনু খুঁজিতে,
মিলে গেল দুই চোর—

অর্জুন

পেতেছি দেখিতে।
দুই চোরচূড়ামণি। পারিনু বুঝিতে
চোরের উদ্যান এই ; পশি একবার
হৃদয় লইয়া যায় সাধ্য আছে কার ?
মহিষি ! প্রভাতে আজি মৃগয়ার তরে
পশিলাম মহাবনে। বিদ্যুৎ-বিক্রমে
ছুটিল মৃগেন্দ্র এক ; ছুটিলেন বেগে
বাসুদেব এক পথে, অন্য পথে আমি।
পশিয়া নিবিড় বনে হারাইনু মৃগ,
হারাইনু পথ আমি,—

সুলোচনা

"আসিলাম শেষে
রমণী-উদ্যানে ভ্রমে !" বীর ধনঞ্জয়,
মৃগ তাঁর নারী জাতি,—

অর্জুন

না, সখি ! তা নয় ;
ওই চারি নেত্র ব্যাধ, মৃগ ধনঞ্জয় !
আপনি গোবিন্দ বদ্ধ মৃগের মতন
যার রূপজালে ; যার যুগল নয়ন
অনন্ত অস্ত্রের তূণ ; সাধ্য আছে কার
তাহার উদ্যানে করে মৃগয়া আবার।
আপনি আহত আমি !

সুলোচনা

বল, মৃগরাজ!
খুলিল বন্দিনী মম, কাহার এ কায?

অর্জুন

আগে বল কোন দোষে বন্দিনী হইল—

সুলোচনা

সু-ভদ্রা, বাজিল নাম গলায় পার্থের!
ভদ্রা চোর।

অর্জুন

জানি আমি, কিন্তু সুলোচনে!
কেমনে জানিলে তুমি?

সুলোচনা

একি বিড়ম্বনা!
যে অভাগী জেনে শুনে গোপনে গোপনে,
আপন সর্বস্ব দেয় হইতে হরণ
সে যদি না হবে চোর? রাগে অঙ্গ জ্বলে,
না জানি ধরিতে অস্ত্র; অন্যথা এখন
হেন অভাগীর ধন হরিল যে জন,
বাঁধিতাম নাগপাশে মনের মতন,
সেই সুচতুর চোরে।

অর্জুন

চোর আমি তবে,
আপনসর্বস্বহারা। কিবা কায আর
অন্য অস্ত্রে? ব্রহ্ম-অস্ত্র জিহ্বাগ্রে তোমার!
"চুরি করে, গালি পাড়ে, চোকের উপর
রাজার সম্মুখে চোর! হেন রাজ্যে আর
থাকিব না, চল ভদ্রা।" ক্রোধে সুলোচনা
জড়াইয়া সুভদ্রারে চলিল ঝঙ্কারি।
হাসি হাসি সত্যভামা চলিল পশ্চাতে,
অর্জুন কহিলা হাসি—"মহারাজ্ঞি! মম
হইয়াছে গুরু দণ্ড; কেন দণ্ড আর?
দেহ ভিক্ষা ছবিখানি!"

সত্যভামা

বিনিময়ে তার
কি দিবে?

অর্জুন

সপত্নী এক।

সত্যভামা

এক লক্ষ আর।
কত তারা ছায়াতলে থাকে চন্দ্রিকার!
মহিষী চলিলা গর্বে। স্থির দু' নয়নে
অবলম্বি বৃক্ষ এক দেখিলা অর্জুন
ধীরে তিন শশিকলা বন-অন্তরালে
গেলা অস্ত। বৃক্ষ হ'তে পড়িল ভূতলে
এ কি অকস্মাৎ? পার্থ দেখিলা চমকি
ভীষণ উরগ এক পড়ি পদতলে
বিদ্ধফণা তীক্ষ্ণ-শরে। দিক লক্ষ্য করি
গেলে পার্থ কিছু দূর, দেখিলা বিস্ময়ে
কিশোরবর্ষীয় এক বালক সুন্দর
কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকৃতি, ধনুর্বাণ-কর।
"দেখিতে বালক তুমি,"—কহিলা অর্জুন—
"কিন্তু যে কৌশলে বিদ্ধি ভীষণ উরগে
রক্ষিলে জীবন মম, মানিনু বিস্ময়,—
অসামান্য শিক্ষা তব! কি নাম তোমার?
আসিয়াছ কেন হেথা, আসিলে কেমনে?
দিয়াছ জীবন মম, কি দিব তোমায়?"
জানু পাতি করযোড়ে পড়ি পদতলে
সম্ভ্রমে কহিলা যুবা—"বীরচূড়ামণি!
মৃগয়া হইতে তব পদ অনুসরি
আসিয়াছে এই দাস। শৈল নাম তার;
সেবিবে চরণাম্বুজ, ভিক্ষা চাহে আর।"

সপ্তম সর্গ

পূর্বস্মৃতি

শারদীয় শুক্লাষ্টমী। সন্ধ্যা সুশীতল
ধীরে মিশাইছে ছায়া কাঞ্চন-বিভায়
দিবসান্তে আতপের ;—মিশিতেছে ধীরে
সুখশান্তি ছায়া যেন সন্তাপ-শিখায়।
উঠিছে পূরবে ভাসি ধীরে নীলতর
নীলাম্বর ; নীলাম্বরে শুক্ল শশধর।
শারদীয় শুক্লাষ্টমী। কৃষ্ণের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সেই রজত-তিলক
প্রকৃতিললাটে,—স্থির নীলিমা-সাগরে
শুক্ল ফেনাখণ্ড যেন। পার্থের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সান্ধ্য নীলাম্বরতলে
সায়াহ্ন ভূধরশোভা, প্রীতিফুল্ল মন ;—
পুরশৃঙ্গ পূর্বপ্রান্তে বসিয়া দু'জন।
"কেশব!" ফিরায়ে মুখ বলিলা ফাল্গুনী,
"শুনিয়াছি জনরব সহস্র-জিহ্বায়
কহিতে সহস্ররূপে জীবন তোমার।
বড় সাধ শুনি সেই অদ্ভুত কাহিনী
তব মুখে, সেই সাধ পূরাও আমার।
সেই বাল্যক্রীড়া, সেই কৈশোর-প্রমোদ,
যৌবনের সে বীরত্ব, দেবত্ব তোমার,
সর্বশেষ প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার
রৈবতকে এ দুর্ভেদ্য দুর্গের নির্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারাবতী অলকা সমান,—
অদ্ভুত কাহিনী সব! আকুল এ মন
শুনিতে তোমার মুখে ; কহ নরোত্তম?
কহ লীলাপূর্ণ তব বিগত জীবন!"
কানন কাকলীপূর্ণ ; বিহঙ্গনিচয়
গাইতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে ; পালে পালে পালে
গোদল মহিষদল ফিরিছে আলয়।
তাহাদের হাম্বা রব, গল-ঘণ্টা-ধ্বনি,
রাখালের উচ্চ বংশীরবে সম্ভাষণ,
ইন্ধনবাহিনী ইন্দুমুখীর সঙ্গীত,
হলবাহী অন্যমনা কৃষকের গীত,
দূরবাহী শৈলানিলে মধুর হইয়া
করিতেছে গিরিশৃঙ্গে অমৃত বর্ষণ!
একটি উপলখণ্ডে পৃষ্ঠ হেলাইয়া
কেশব বসিয়া ; স্থির বিশাল নয়নে
নীরবে দেখিতেছিলা শুক্ল শশধর,—
ক্রমে শুক্লতর! সেই রজত-দর্পণে
রয়েছে বিম্বিত যেন বিগত জীবন।
নীরবে শুনিতেছিলা,—কাকলীর স্বনে
বিগত জীবন যেন হতেছে কীর্তন।
সে গোপাল, সে রাখাল, গীত সুললিত,—
হতেছিল যেন সেই কাব্য অভিনীত ;
"অদ্ভুত কাহিনী"—ধীরে ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা—"সত্য পার্থ! অদ্ভুত-কাহিনী
আমার জীবন। মিলি শত্রু মিত্র সব
করেছে অদ্ভুততর ; পার্থ! সর্বশেষ
করেছে অদ্ভুততম অন্ধ জনরব।
কিন্তু ধনঞ্জয়! এই মহা বিশ্ব ক্ষেত্রে
কি নহে অদ্ভুত বল? অনন্ত সংসারে
অসংখ্য কুসুম মাঝে একটি কুসুম,
—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—শোভা-সৌরভ-বিহীন,
কোথায় যে অরণ্যের নিভৃত কোণায়
ফুটিয়া রয়েছে হায় অনন্ত নক্ষত্রে
খচিত অনন্ত ওই গগনের তলে,
অসংখ্য জোনাকিমাঝে, একটি জোনাকি
কোথায় যে প্রান্তরের নিভৃত আঁধারে
জ্বলিয়া নিবেছে হায়! অনন্ত জগতে
সংখ্যাতীত পরমাণু, কোথা যে একটি

ক্ষুদ্রতম পরমাণু রহিয়াছে পড়ি
অনন্ত সিন্ধুর গর্ভে! অনন্ত সাগরে
অসংখ্য তরঙ্গমাঝে কোথায় নীরবে
ক্ষুদ্র জলবিম্ব এক সিন্ধু বিলোড়নে
ফুটিয়া মিশিছে হায়! তাদের জীবন
নহে কি অদ্ভুত পার্থ! তাহারাও এই
নর-জ্ঞানাতীত, এই বিস্ময়-পূরিত,
অনন্ত বিশ্বের অংশ। অহো কি রহস্য!
এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রে তাহারাও হায়!
কোনো গূঢ় কার্য ধ্রুব করিছে সাধিত
অচিন্ত্য; নিষ্ফল সৃষ্টি নহে বিধাতার।
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব হইতে
হতেছে তেমতি কোনো কার্যের সাধন,
নহে যাহা ক্ষুদ্র নর-জ্ঞানের অধীন!
ভাব যদি এইরূপ, ভাব যদি মনে,
যেই মহারঙ্গভূমে সৌর-জগতের
হতেছে অনন্তব্যাপী মহা অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, তুমিও তথায়
করিতেছ রূপান্তরে কত অভিনয়
অনন্ত কালের তরে; আত্মগরিমায়
ভরিবে হৃদয়, পার্থ। তখন তোমায়
পতঙ্গ বলিয়া আর নাহি হবে জ্ঞান।
তখন,—অনন্ত এই অভিনয়স্থানে,
অনন্ত এ অভিনয়ে, তুমিও অনন্ত
অভিনেতা! কি অদ্ভুত! মধ্যম জীবনে
দাঁড়াইয়া এস তবে দেখি, ধনঞ্জয়
পশ্চাৎ ফিরায়ে মুখ,—দেখি ভবিষ্যৎ
জীবনের ছায়া ভূত-জীবন দর্পণে।
দেখি তাহে জীবনের কর্তব্যের রেখা
পড়িয়াছে কোন রূপ; জীবন-তরণী
সেই রেখা অনুসারি দিব ভাসাইয়া।
ঝটিকা তড়িত যেই অরণ্য অর্ণব,
বিশাল ভূধরমালা, হইয়াছি পার,
দেখিয়া হৃদয়ে, পার্থ! পাইব শকতি।
দেখিয়াছি মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত
যেই সুখ-স্নেহ মুখ—নির্মল, শীতল,—
করিবেক ভবিষ্যৎ আশায় পূরিত।
এস তবে, ধনঞ্জয়! রাখিব লিখিয়া
প্রশস্ত হৃদয়ে তব, বীরচূড়ামণি,
আজি মম জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস,—
শত্রুর অযথা নিন্দা, মূর্খতা মিত্রের,
সত্যের বিমলালোকে হইবে বিনাশ।
"স্থান বৃন্দাবন; দৃশ্য যমুনার তীর;
সন্তাপ-হারিণী শান্ত বরিষার শেষ;—
খুলিল জীবন কাব্য। প্রথমাঙ্কে তার
অভিনেতা,—পিতা নন্দ, জননী যশোদা,
সহচর দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
শুনেছি শৈশবে, ছাড়ি গোকুল নগর
নানা অমঙ্গল ভয়ে ভীত গোপগণ
প্রবেশিল বৃন্দাবন নবীন কানন,—
অস্পৃষ্ট নবীন তৃণপল্লবে শ্যামল
অশ্রান্ত যমুনানিলে সতত শীতল!
গোবর্ধনপদমূলে, যমুনার কূলে,
তরুলতা-সুশোভিত সেই বৃন্দাবনে,
শৈশবের উষা-অন্তে হইল আমার
প্রকৃতি-প্রভাত সনে জীবন প্রভাত।

"জীবনে প্রথম স্মৃতি,—প্রভাতে জননী
বাঁধিয়া মস্তকে ক্ষুদ্র চূড়া মনোহর,
সাজায়ে বিচিত্র বাসে ক্ষুদ্র কলেবর,
খাওয়াইয়া সর ননী, চুম্বিয়া বদন,
বলিতেন—'যাও বাছা! কর গোচারণ!'
শুনিতাম শিঙ্গাস্বরে শ্রীদাম বলাই,
ডাকিতেছে—'আয়! আয়! আয়রে কানাই।"
দেখিতাম হাম্বা রবে ডাকি গাভীগণ,
চেয়ে আছে মুখপানে স্থির দু' নয়ন।
পাঁচনি দক্ষিণ করে, বাম করে বেণু,
পৃষ্ঠে শৃঙ্গ, যাইতাম চরাইতে ধেনু।
গোপাল, মহিষপাল বিচিত্র-বরণ,

অজ মেষ নানা জাতি, উড়াইয়া ধূলি
যাইত ; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া।
শত শত শৃঙ্গ বেণু উঠিত বাজিয়া,
শত শত গোপশিশু মিলিত আসিয়া
নিজ নিজ পাল সহ, সেই সম্ভাষণে,
নবীন উৎসাহে সবে পশিতাম বনে।
সকলি নবীন। নীল নবীন গগনে
হাসিত নবীন রবি ; নীলিমা নবীন
ভাসিত কালিন্দী-নীল-নবীন-জীবনে।
নবীন প্রভাতানিল বহিত কাননে
নবীন পল্লবে চুম্বি নবীন শিশির,
নবীন কুসুমরাশি ; চুম্বি গোবর্ধনে
নবীন কিরণে ধৌত সৌন্দর্য নবীন।
প্রকৃতির নবীনতা,—সদ্য, সুধাময়,—
প্রভাতে করিত পূর্ণ নবীন হৃদয়।
"পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গোপাল,
শ্যাম-মকমল-সম তৃণ সুকোমলে,
চরিত আপন মনে ; আপনার মনে,
গাইতাম, খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত-ক্রীড়া-হাস্য-মধুর পঞ্চমে,—
অনুকরি গোবর্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত, ব্যঙ্গ করি তত
গাইতাম হাসিতাম আনন্দে আমরা।
'কুশল ত গোবর্ধন !'—প্রভাতে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলে গিরিবরে,—ত্রস্তে গিরিবর
'কুশল ত গোপগণ !'—করিত উত্তর।
শাখায় শাখায় কভু শাখা-মৃগ মত
ছুটিতাম খেদাইয়া একে অন্য জনে ;
দুলিতাম কভু শাখে ফল ফুল মত ;
কভু খাইতাম ফল ; আবার কখন
করিতাম মধ্যাহ্নের তাপ নিবারণ
নিবিড় ছায়ায়। তুলি কভু বনফুল
সাজিতাম বনমালী। কভু শৃঙ্গে উঠি
দেখিতাম বৃন্দাবন বিশাল কানন,
যেন ক্ষুদ্র উপবন ; রহিয়াছে ফুটি
তৃণাহারী নানা জীব পুষ্পের মতন।
পুণ্য অদ্রি-পদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন ! সৌধ-সুশোভিত
শোভিত মথুরাপুরী নৈবেদ্যের মত।
অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টি ত্রিবলী সুন্দরী
শোভিত যমুনা,—দুই যূথিকা-মালায়
মধ্যে সুশোভিতা মালা অপরাজিতার।
"সায়াহ্নে আবার বন হইত পূরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
'শামলী', 'ধবলী', 'লালী' ?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ ; আসিত ছুটিয়া
'শামলী,' 'ধবলী,' 'লালী,' লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস ; দ্রাণিত আদরে
আপন রাখাল-দেহ ;—কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্বাক উত্তর।
উড়াইয়া ধূলি, খণ্ড-জলধর মত
চলিত মন্থরে গৃহে পালে পালে পালে।
মন্দ মন্দ গরজন ঘন হাম্বা রব,
বিজলী রাখালবালা, গোপশিশুগণ
নাচাইয়া ধড়া চূড়া পক্ষ প্রসারিত
শোভিত আবদ্ধ মালা বলাকার মত।
আসি স্নেহময়ী মাতা যশোদা আপনি
গৃহের বাহিরে, ঝাড়ি ক্ষুদ্র কলেবর,
কহিতেন—'বাছা মোর ননীর পুতুল,
পড়িছে ঝরিয়া যেন গোচারণশ্রমে।
ছাড়িয়া মায়ের কোল থাকিস কেমনে
কণ্টক-কাননে যাদু ? আমি অভাগিনী
থাকি সারা দিন তোর পথ নিরখিয়া,
বৎসহীনা গাভী মত !' চুম্বিতেন মাতা
সিক্ত নেত্রে ; চুম্বিতাম মায়ের বদন
—স্নেহের ত্রিদিব সেই—সস্নেহে যেমন

চুম্বে পরস্পরে পদ্ম সান্ধ্য সমীরণ।
কত কি যে রাখিতেন তুলিয়া আদরে,
খাইতাম কত কি যে; দুই ভাই মিলি
কহিতাম কত কথা; শুনিতে শুনিতে
কতই সরল গীত, স্নেহসম্ভাষণ,
পড়িতাম ঘুমাইয়া আনন্দে অধীর
স্নেহের ত্রিদিব সেই অঙ্কে জননীর
"দশম বৎসর যবে, যমুনার তীরে
একদা মধ্যাহ্নে বসি ভাই দুই জন
একটি বকুলমূলে, শান্ত নীল নীরে
দেখিতেছি নভোনিভ শান্ত নীলিমায়
মধ্যাহ্ন কিরণখেলা। ক্ষুদ্র ঊর্মিগণ
সুবর্ণ শফরী মত খেলিছে কেমন
সংখ্যাতীত! অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ মহামতি!
মার্জিত রজত সম শ্বেত শ্মশ্রুজালে
শোভিতেছে, শ্বেত আলুলায়িত কুন্তলে,
বিভূতিমণ্ডিত শ্বেত প্রসন্ন বদন,
শারদ-জলদাবৃত শশাঙ্ক যেমন।
শ্বেত পরিধান; শ্বেত উত্তরীয় বুকে;
সংখ্যাতীত! অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে
পদতলে যমুনার বেলা মনোহর,
শ্বেত মর্মরের বেদী পবিত্র সুন্দর।
"দেবমূর্তি স্থিরভাবে চাহি মম পানে
কহিলেন—'বৎস, কৃষ্ণ! যেই গ্রহগণ
আছে ঝলসিত তব অদৃষ্ট-বিমানে
তব পরিণাম বৎস! নহে গোচারণ।
জন্মি আর্য-হিমাদ্রির সর্বোচ্চ শিখরে
দুই কীর্তিস্রোতস্বতী দুইটি নির্ঝরে,
উড়াইয়া বিঘ্নরূপী শত ঐরাবত,
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত,
গঙ্গা যমুনার মত তটিনী-যুগল
মিলিবেক অর্ধপথে;—সেই সম্মিলন
মানবের মহাতীর্থ! স্রোতসম্মিলিত
ছুটিবে অপ্রতিহত, করিয়া বিলীন
শত শত কীর্তিস্রোত, করিয়া মোচন
দলিত ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহা পারাবারে,—
অনন্ত অতলস্পর্শ! ব্যাপি ভবিষ্যৎ
ঢালিবেক শত মুখে অজস্র ধারায়
পতিত-পাবন সুধা অনন্ত অমৃত।
তব গোচারণক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা;
সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হ'য়ে দিকহারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।
স্থির ভাবে স্বর্গ মর্ত্য করিয়া মিলিত—
নর-নারায়ণ-মূর্তি;—রহিবে সতত
সর্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।
গ্রহগণ মিথ্যাবাদী নহে কদাচন।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি! আইস গোপাল!
আজি শুভক্ষণে আমি করিব দীক্ষিত
পূত-যমুনার জলে নিভৃতে দু'জনে।
শস্ত্রে, শাস্ত্রে, যথাবিধি করিব শিক্ষিত
উভয়ে নিভৃতে; বৎস! গোপের কুমার,
তোমাদের অধ্যয়নে নাহি অধিকার।'
"এ কি ভবিষ্যদ্বাণী! মধ্যম জীবনে
যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিনি এখনো,
শিশু গোরক্ষক তাহা বুঝিবে কেমনে?
অবগাহি যমুনার পবিত্র সলিলে,
পড়ি দুই ভাই চরণে ঋষির
করিলাম প্রণিপাত। পবিত্র সলিলে,
চাহি আকাশের পানে গলদশ্রুনীরে,
করিলেন সংস্কার; ভাই দুই জন
পাইলাম যেন পার্থ! নবীন জীবন।
গোচারণ-অবসরে, অদূরে আশ্রমে
মহর্ষির, শিখিতাম নিভৃতে উভয়ে
নানা শস্ত্র, নানা শাস্ত্র। সেই শিক্ষাবলে
শুনিয়াছ ধনঞ্জয়, কৈশোরে কেমনে

'বধিলাম অঘ, বক, প্রলম্ব, পুতনা,
হিংসাকারী পশু পক্ষী ; অনার্য তস্কর
করিলাম কোন মতে কালীয় দমন,—
মহাপরাক্রমী নাগ,—ভয়েতে যাহার
গোপ-গাভী না পারিত ভ্রমিতে কাননে
নির্ভয়ে, করিতে পান যমুনার জল।
"কিশোর বয়স যবে, পার্থ! এক দিন
পশিয়াছি গোচারণে নিবিড় কাননে
বহু দূর। অকস্মাৎ ছাইল গগন
নিবিড় জলদজাল, হইল পতিত
ঘোর সন্ধ্যা-ছায়া যেন কাননশোভায়।
তট-বিঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে
আসিতেছে বারিধারা ; দুই, চারি, দশ,—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা ; ছুটিল গোপাল
হাম্বারবে উচ্চপুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালক বালিকা,—
কেহ গিরিকোটরেতে, কেহ তরুতলে
প্রশস্ত পল্লবছত্রে,—লইনু আশ্রয়।
কেহ বনকদলীর, কচুর, পাতায়
নিবারিছে বৃষ্টিধারা ; মেঘ প্রস্রবণ
অবিরল জলধারা করিছে বর্ষণ।
সেই ঘন বরিষণ, ঘন গরজন,
প্রতিধ্বনি শৃঙ্গে শৃঙ্গে শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘ,
মেঘেতে বিজলী খেলা, সজল সে হাসি,
গিরিবাহী প্রপাতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
সদ্যঃস্নাত কাননের পরিমলময়
সুশীতল মন্দ শ্বাস,—করিল হৃদয়
উচ্ছ্বসিত, সুবাসিত, প্লাবিত, পূর্ণিত।
কোটরেতে পার্শ্বে সঙ্গী সঙ্গিনী বসিয়া
বর্ষিতেছে কত মত মেঘের কাহিনী
প্লাবি সেই গিরি-কক্ষ। কহিতেছে কেহ
ইন্দ্র গজযূথ যবে চরান আকাশে,
ডাকে হস্তী, বর্ষে শুণ্ড ; বিজলী-সঞ্চার—
রাখাল ইন্দ্রের স্বর্ণ-বেত্রের প্রহার।
একটি বালিকা ধরি চিবুক আমার
বলিল—'গোপাল, দেখ ওই গিরিশিরে,
ইন্দ্রের একটি হস্তী রয়েছে বসিয়া!
হস্তী,—মেঘ ; শুণ্ড তার, সলিলপ্রপাত!'
"থামিল বর্ষণ ; বেলা তৃতীয় প্রহর।
হাসিল কাননশোভা সজলা শ্যামলা
মেঘমুক্ত রবি-করে। কাতরে আমারে
কহিল রাখালগণ—'গোষ্ঠ বহুদূর ;
কি খাইব বল, প্রাণ ক্ষুধায় আকুল?'
দেখিনু অদূরে বহু ঋষির আশ্রম ;
বলিলাম—'ভিক্ষা তরে যাও সখাগণ।'
ব্রাহ্মণ যজ্ঞের অন্ন না দিল রাখালে,—
নীচ গোপজাতি! শ্রান্ত বালক বালিকা
ক্ষুধাতুর ম্লানমুখে আসিল ফিরিয়া।
ক্রোধে বলরাম গর্জি বলিলা তখন—
'লুটিব আশ্রম চল!' নিবারিয়া তারে
কহিনু—'গোপনে ঋষিপত্নীগণ কাছে
চাহ গিয়া ভিক্ষা সবে। রমণী-হৃদয়,
শৈলময় সংসারের জাহ্নবী-আলয়।
দ্রবিল ; বহিল গঙ্গা,—ঋষিপত্নীগণ,
দেখিতে অসুর-ত্রাস কৃষ্ণ বলরাম,
গোপনেতে অন্ন সহ আসিয়া কাননে
করিলেন শিশুদের ক্ষুধা নিবারণ।
সেই দয়া, সেই প্রীতি, স্নেহ-পারাবার,—
কাননে দ্বিতীয় বর্ষা হইল সঞ্চার।
চিকুর প্রপাত মেঘ ; বিজলী সে হাসি ;
সুশীতল বারিধারা স্নেহসুধারাশি!
কেবল দুইটি শিশু না করিল পান
বারিবিন্দু! কে তাহারা? কৃষ্ণ, বলরাম।
"একাকী নির্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি,—জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব ; একই শরীর ;

একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম মৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?
চারি বর্ণ, চারি বেদ ; দেবতা তেত্রিশ ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর ;
জন্ম মৃত্যু ; ধর্মাধর্ম ;—ভাবিতে ভাবিতে
হইলাম তন্দ্রাগত। ক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল
কোটী কোটী চন্দ্রালোকে উঠিল ভাসিয়া।
দেখিলাম সুশীতল আলোক সাগরে
শোভিছে সহস্রদল। মৃণাল তাহার
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যামা, রয়েছে স্থাপিত
অনন্ত আলোক-গর্ভে। শতদল-দল
শোভিতেছে সংখ্যাতীত সবিতৃমণ্ডল।
নয়নে নয়নে লাগিল ধাঁধা। দেখিলাম যেন
বিরাট-মূরতি এক পদ্মে অধিষ্ঠিত।
চতুর্ভুজ, চতুর্দিক ; শোভিতেছে করে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ; শোভে সমুজ্জ্বল
কিরণ কিরীট হার কুণ্ডল কেয়ুর।
কিরণের পীতবাস, অনন্ত অসীম,
শোভে নীলমণিময় মহা কলেবরে,—
কিরণের উৎস সেই কিরণ সাগরে।
অনন্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্
সেই মহাবপুঃ হ'তে হইয়া নিঃসৃত,
রবি-করে যথা স্ফটিক দীপিত,
করিতেছে মহাপদ্ম নিত্য বিমথিত।
মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষুদ্র পরমাণু তার
হইতেছে রূপান্তর ; কিন্তু অনির্বাণ,
প্রভাকর-কর স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমতি।
সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ,
অবিচ্ছিন্ন সর্বত্রই আছে বিদ্যমান,
করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ব বিধান
হইল বিরাট-ধ্বনি—'দেখ, অন্ধ নর!
প্রকৃতির পুরুষের মহা সম্মিলন,—
একমেবাদ্বিতীয়ং !—পূর্ণ সনাতন!
প্রকৃতি পদ্মিনী ; শক্তিরূপী নারায়ণ,—
নরের আশ্রয়, বিষ্ণু, সর্বভূতময়।
উভয় অনন্ত, নিত্য, উভয় অব্যয়!
জন্ম মৃত্যু রূপান্তর। দেখ অধিষ্ঠিত
বিশ্বাম্বুজে বিশ্বেশ্বর! হ'তেছে স্থাপিত
জ্ঞান পাঞ্চজন্যে নীতিচক্র সুদর্শন।
নীতির লঙ্ঘন-পাপ হতেছে দণ্ডিত
ভীষণ গদায় ; পুণ্য নীতির পালন
শত-সুখ-শতদল করিছে বর্ধন।'
শুনিলাম—'এক জাতি মানব সকল ;
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয় ;
একমাত্র মহাযজ্ঞ – স্বধর্ম-সাধন ;
যজ্ঞেশ্বর—নারায়ণ। সন্দিগ্ধ মানব!
আপনার কর্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর,
দেখিয়া কর্তব্য-রেখা, জ্ঞানের আলোকে,
বিস্তৃত সম্মুখে পুণ্য ভাগীরথী মত
সুদর্শন নীতিচক্র নমি ভক্তিভরে,
কর্মস্রোতে জীব তরী দেও ভাসাইয়া!'
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে শতদল-দল
মিশাইল গ্রহে গ্রহে, মৃণাল, ধরায় ;
নীল অনন্তের সনে নীল কলেবর।
"সুখস্বপ্নশেষে শিশু জননীর কোলে
জাগিয়া যেমতি দেখে মায়ের বদন
প্রেমপূর্ণ, দেখিলাম জাগিয়া তেমতি
বন-প্রকৃতির মুখ, প্রীতি-পারাবার।
কি এক নবীন শোভা, আলোক নবীন,
কিবা এক কোমলতা, শান্তি, পবিত্রতা,
পড়িতেছে উছলিয়া! বালক-হৃদয়,
বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ, গেল মিশাইয়া,
সেই প্রকৃতির সনে ; মিশিল তুষার
অনন্ত সলিলে, গীত, যন্ত্রের সুতানে
হইল মধুর লয়! সমস্ত জগৎ
আমার শরীর। আহা! সমস্ত প্রাণীতে

আমার হৃদয়, প্রাণ। গাইল সমীর
কি যেন গভীর গীত! কহিল প্রকৃতি
কি যেন গভীর কথা! ভরিল হৃদয়
কি উচ্ছ্বাসে, কি উৎসাহে! জানু পাতি ভূমে
বহুক্ষণ রহিলাম কি যেন চাহিয়া
অনন্ত আকাশপটে। অশ্রু দুই ধারা
নীরবে বহিতেছিল—যমুনা, জাহ্নবী।
'কৃষ্ণ!'—কে ডাকিল? ত্রস্তে ফিরায়ে নয়ন
দেখিনু অসুর এক স্তম্ভিতের মত
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে মম। লইনু সাপটি
শরাসন। স্থিরমূর্তি ঈষৎ হাসিয়া
কহিল—'বীরেন্দ্র! কর ত্যাগ শরাসন;
নহি শত্রু আমি তব। অন্যথা তোমার
হইত না নিদ্রাভঙ্গ আজি কদাচন।
চাহি সন্ধি; নহে যুদ্ধ বাসনা আমার।
শুনিয়াছ তুমি কৃষ্ণ! দুরন্ত কংসের
অত্যাচার?

আমি

শুনিয়াছি।

অসুর

এস তবে মিলি
শার্দুলের রক্ততৃষ্ণা করি নিবারণ।

আমি

কংস মথুরার পতি; গোরক্ষক আমি;—
পতঙ্গ হিমাদ্রি কাছে।

অসুর

যেই পরাক্রম
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হয়েছে অঙ্কিত,
নাগেন্দ্র কালীয়বক্ষে, অসুর-হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

অসুর

অসহায় আমি!

আমি

হইবে সহায়। হবে সহায় তোমার
গোপজাতি যথা তথা শতসংখ্যাতীত,
সমগ্র মথুরাবাসী।

আমি

বিনা দেবকীর
অষ্টম-গর্ভের পুত্র, শুনেছি অসুর,
অবধ্য অন্যের কংস।

অসুর

কোথায় সে শিশু?

আমি

শুনিয়াছি, নাগরাজ বাসুকি আপনি
রাখিয়াছে লুকাইয়া।

অসুর

তাঁর পুত্র আমি!
"হইলাম প্রতিশ্রুত করিব না আর
নাগজাতি বিদলিত। কাঁদিত হৃদয়
কংস অত্যাচারে ঘোর, স্বজাতি নিগ্রহে,
উগ্রসেন কারাবাসে; কাঁদিত সতত
বসুদেব দেবকীর নিদারুণ শোকে;—
মানব-হৃদয়-ধর্ম, রহস্য নিগূঢ়,
কে বুঝিতে পারে আহা! হইনু দীক্ষিত
মথুরা-উদ্ধার-ব্রতে; কর্তব্যের রেখা
স্বপ্নাদিষ্ট দেখিলাম অঙ্কিত হৃদয়ে।
"অনুসারি সেই রেখা, হইয়া চালিত
কি অজ্ঞাত শক্তিবলে বলিতে না পারি,
নিবারিনু ইন্দ্রযজ্ঞ। যজ্ঞে জীবঘাতী
পাইতাম বড় ব্যথা। করিনু প্রচার,—
'কেবা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত,
সঞ্জীবনী সুধারাশি; স্বভাবে চালিত
ভ্রমে রবি, শশী তারা; বহে সমীরণ।
স্বভাব-নিয়ন্তা এক বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর,
স্বভাবের অনুবর্তী বিশ্ব চরাচর।
গোপালন আমাদের স্বভাব সুন্দর;
গো-ব্রাহ্মণ গোবর্ধন পূজ্য আমাদের।
পূজ তাহাদের, কর স্বধর্ম-পালন;

পূজি বিশ্ব, পূজ বিশ্বরূপ নারায়ণ।
দেও গো-মহিষে নব তৃণ সুকোমল!
দিয়া গোবর্ধনে নানা অন্ন উপহার,
কর বিতরণ তাহা ব্রাহ্মণে চণ্ডালে!
সাজায়ে গোপাল, সাজি গোপ গোপীগণ,
আনন্দে শকটে কর গিরি প্রদক্ষিণ।”
ভাদ্র মাস; যমুনার সদ্যো'বিপ্লাবিত,
সদ্য বরিষায় ধৌত, সদ্য সুসজ্জিত
স্বভাব-মন্দিরে, উচ্চ স্বভাবের বেদী
পুণ্য গোবর্ধনশিরে, হইল পূজিত
স্বপ্নদৃষ্ট মহামূর্তি! হলো প্রতিষ্ঠিত
গোপদের নিরমল হৃদয়গগনে
নবীন ধর্মের বীজ নক্ষত্রের মত।
ইন্দ্র-উপাসক অজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল
অন্ধ অনুচর সৈন্যে, মেঘমালা মত,
আচ্ছাদিল গোবর্ধন; করিল বর্ষণ
শরজাল অনিবার মুষলধারায়।
কি যে শক্তি নারায়ণ করিলা প্রদান
অশিক্ষিত গোরক্ষকে, করিয়া সহায়
বলদেব, গোপগণ, সপ্ত দিবানিশি
মূঢ় ইন্দ্র-উপাসক সৈন্য প্রতিকূলে
বাহুবলে গোবর্ধন করিনু ধারণ।
সপ্ত দিন শত্রুগণ হইয়া মথিত
গোপমথনের দণ্ডে, পৃষ্ঠ দেখাইয়া
পলাইল বায়ুভরে মেঘদল যথা,
নবীন ধর্মের ধ্বজা হইল স্থাপিত
গোবর্ধন শিরে পার্থ! উড়িল আকাশে
সুনীল পতাকা বক্ষে শ্বেত সুদর্শন।
সেই পুণ্য-পতাকার ছায়া সুশীতল
করিবে কি আচ্ছাদিত সমস্ত ভারত
আ-হিমাদ্রি-পারাবার? হইয়া স্থাপিত
ভারতসাম্রাজ্যগর্ভে ধ্বজা দণ্ড তার
পতিত ভারতবর্ষ করিবে উদ্ধার?
সে দিন হইতে সেই কিশোর গোপাল
হইল সরল গোপ-আরাধ্য ঈশ্বর।
সে দিন হইতে যেই ভক্তি-প্রস্রবণ
বহিতে লাগিল, গোপ গোপাঙ্গনাগণ
গেল ভাসি সেই স্রোতে; ভাসিলাম আমি
সরল ভক্তির সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে
“গেল বর্ষা, ধনঞ্জয়! আসিল শরৎ।
মেঘভাঙ্গা পৌর্ণমাসী কত মনোহর
নীল যমুনার তীরে, শ্যাম বৃন্দাবনে!
ঈষৎ ঈষৎ হাসি আসিল যখন
শরতের সুশীতল সুচন্দ্র শর্বরী,
যূথিকা জ্যোৎস্নামাখা কাননবিতানে
যূথিকা জ্যোৎস্নারূপা গোপাঙ্গনা সহ,
রাসোৎসবে গোপগণ হইল মগন।
বনফলে বনফুলে, ফুল্ল শতদলে,
ফুল্ল যমুনার জলে, হইলা পূজিত
নারায়ণ শতদল-আসনে আসীন,—
বন-শোভা ফুল ফলে নবীন পল্লবে
নির্মিত মন্দিরে সদ্য, সদ্য মনোহর
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত বেদীর উপরে,
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত মূরতি সুন্দর।
নরনারী শিশু বৃদ্ধ নাচি সংকীর্তনে
গাহিতেছে ‘হরিনাম’ আনন্দে মধুরে।
সরল পবিত্র কণ্ঠ প্লাবিছে পুলিন,
প্লাবিছে যমুনাগর্ভ, শারদ গগন।
প্রেমেতে অধীর নরনারী সংখ্যাতীত
কেহ বা মূর্ছিত, কেহ বা আকুল হৃদয়ে
সেই হরিনামামৃত করিতেছে পান।
বৃদ্ধে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী,
কিশোর কিশোরী, করে ধরাধরি করি.
অধীর অধীরা প্রেমে, বেষ্টিয়া আমারে
নাচিতেছে চক্রে চক্রে, শত পুষ্পহার
ভাসিছে জ্যোৎস্নাস্নাত যমুনাপুলিনে,
সংকীর্তন তালে তালে; নাচিতেছি আমি
অধরে মধুর বাঁশী, প্রেমে আত্মহারা।

"প্লাবিয়া সঙ্গীত-পূর্ণ আনন্দের ধ্বনি,
শারদ-কৌমুদী-ধৌত নির্মল গগনে
সহসা ধ্বনিল শঙ্খ; সুদর্শনরূপে
চলিল সুধাংশু আগে; চলিলাম আমি
স্বপনে চালিত ক্ষুদ্র বালকের মত
আত্মহারা; পশিলাম নিবিড় কাননে।
মিশাইল শঙ্খধ্বনি, মিশাইল ধীরে
সুদর্শন সুধাংশুতে, সুধাংশু আকাশে,—
মূর্ছিত হইয়া পার্থ পড়িনু ভূতলে।
"তৃতীয় প্রহর নিশি মূর্ছান্তে অর্জুন!
দেখিলাম যমুনার পুলিনে বিবশা
আত্মহারা গোপাঙ্গনা খুঁজিছে আমায়,
জননী যশোদা সহ, উন্মাদিনী প্রায়।
আমাকে পাইয়া পুনঃ প্রেমেতে অধীরা
নাচিতে লাগিল সবে ধরি করে কর,
মম নাম, কীর্তি গান, গাইয়া গাইয়া;
পড়িল পুলিনে কেহ মূর্ছিত হইয়া।
কেহ দাসীভাবে মম সেবিল চরণ;
কেহ মাতৃস্নেহে মম চুম্বিল বদন;
কেহ সখীভাবে বক্ষে করিল ধারণ,
কেহ বা বিবশা প্রেমে দিল আলিঙ্গন।
পতি পুত্র পিতা মাতা ভুলেছে আলয়,
আমি পতি, আমি পুত্র, সখা প্রেমময়।
সেই ভক্তি, সেই প্রেম,—ভক্তির চরম,—
কিশোর শিশুতে সেই আত্ম সমর্পণ;
নাহি জ্ঞান, নাহি ইচ্ছা হৃদয় তন্ময়,—
অর্জুন! ধর্মের ক্ষেত্র রমণী-হৃদয়!
"হেমন্তে সামন্ত সজ্জা করিতে পাতালে*
দূর সিন্ধুনদ তীরে, আসিল বসন্ত
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ। হাসিল কানন;
গাইল বিহঙ্গকুল; ফুটিল কুসুম
স্তবকে স্তবকে; ধীরে বহিতে লাগিল
নবীন উৎসাহ ঢালি দক্ষিণ অনিল।
আসিল বসন্ত পার্থ! দেখিতে দেখিতে
বসন্তের প্রীতিপূর্ণ শেষ পৌর্ণমাসী,—
পূর্ণচন্দ্রমুখী বামা। বিমুক্ত কবরী
নীলাকাশ; কুন্তলাগ্র সজ্জিত কুসুমে
ব্যাপিয়াছে ধরাতল; অলক-আঁধারে
মাজিত রজতকান্তি প্রীতি-প্রস্রবণ।
প্রীতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল হৃদয়।
প্রীতিভরে নারায়ণে পূজিয়া আবার
বসন্তের ফলে পুষ্পে, পলাশে, মন্দারে,
করিলাম প্রতিষ্ঠিত বসন্ত-উৎসবে
কিশোর কিশোরী, ফুল্ল যুবক যুবতী,
প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, সাজি সবে বাসন্তী বসনে
আনন্দ উৎসবে পূর্ণ করিল কানন!
ফাল্গুনের ফল্গূৎসব দেখেছ ফাল্গুনী!—
কি আর কহিব আমি? আবির, কুঙ্কুম,
আবরিয়া বৃন্দাবন, ছাইল গগন,
সায়াহ্নে সিন্দুরমাখা মেঘমালা মত;
ভাসিল কালিন্দীবক্ষে; বহিল সমীরে;
ছুটিল অসংখ্য জলযন্ত্র (১) প্রস্রবণে।
জলে, স্থলে, দলে দলে, রহিয়া রহিয়া
হইতেছে মহারণ। এক দিকে নারী,
আর অন্য দিকে নর। এক দিকে ফুল্ল
কমল আনন, আলুলায়িত কুন্তল,

* পাতাল ভূগর্ভে নহে। ভারতবর্ষের পুরাতন মানচিত্রে উহা সিন্ধুনদ তীরে সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এখনও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নাগপুর, ছোট নাগপুর প্রভৃতি স্থানে নাগজাতির রাজ্যের চিহ্ন আছে, এবং এখনও নাগজাতি ভারতের পার্বত্যাঞ্চলে বাস করে। (কবি কর্তৃক সংযোজিত)

(১) পিচ্‌কারী।

উন্নত উরস, ভুজ কনক মৃণাল
রঞ্জিত কুঙ্কুমরাগে; রণ-রঙ্গিণীর
প্রেমে অনুরাগে, ছল ছল দু' নয়ন।
অন্য দিকে সেইরূপে রঞ্জিত কুঙ্কুমে
শোভিতেছে সূর্যপ্রভ বদনমণ্ডল,
প্রশস্ত উরস, ভুজ তালবৃক্ষসম
এক দিকে কোমলতা; বীর্য অন্যতরে।
জ্যোৎস্না আতপে রণ। ভুজ শরাসন;
আবির কুঙ্কুম শর উভয়ে বর্ষণ;
করিতেছে অবিরল। কভু বামাগণ
করিতেছে পলায়ন মানি পরাভব,—
নিবিড় কুন্তল-মেঘে, মেঘনাদ মত,
বিদ্যুৎ বরণ ঢাকি; উচ্চ হাস্যধ্বনি
বাজিছে বিজয়-শঙ্খ পূরিয়া কানন।
ধীর সমীরণে, তীরে, নীরে যমুনার,
বহিছে সঙ্গীতস্রোত রহিয়া রহিয়া।
কেহ নাচে, কেহ গায়, শাখায় শাখায়
দুলিতেছে নর নারী বিচিত্র দোলায়
শত শত; দুলিতেছে বসন্ত অনিলে
জীবন্ত কুসুমগুচ্ছ। কুসুমদোলায়
দোলাইছে বনমালী সাজায়ে আমায়,
সুমধুর সংকীর্তনে নাচিয়া নাচিয়া,
বরষিয়া সুবাসিত আবির কুঙ্কুম
অজস্র ধারায়, প্রেমে বিবশ অধীর।
বহিছে যমুনা প্রেমে, হাসিছে জ্যোৎস্না,
হাসিতেছে বৃন্দাবন প্রেমে ফুল্লমন।
"প্রেমে উচ্ছ্বসিত সেই আনন্দ-কাননে
আসি ছদ্ম গোপবেশে নাগ শত শত,
সেই উৎসবের স্রোত করিল বর্ধন
দিবানিশি ধীরে ধীরে। গভীর নিশীথে
নাগ গোপ-সেনা দশ সহস্র দুর্জয়,
ধীরে যমুনার মত বহিল নীরবে
নিদ্রিত মথুরা পানে; হইল সঞ্চিত
নগর অদূরে ঘন নিবিড় কাননে।
বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি পোহাল যখন,
পোহাল কংসের পাপ জীবন-স্বপন।
"কেমনে নগরে পশি দধিদুগ্ধবাহী
আক্রমিনু দুর্গদ্বার; ঘোর ভেরীনাদে
ছদ্ম ক্ষুদ্র সেনা সহ কিশোরযুগল
প্লাবিনু মথুরা দশ সহস্র সেনায়;
ভাঙ্গিলাম যজ্ঞধনু; বধিলাম শেষে
কংসরাজে দ্বন্দ্বযুদ্ধে; হাসিতে হাসিতে
করিলাম বিনা যুদ্ধে মথুরাবিজয়;—
শুনিয়াছ সব্যসাচী! মুহূর্তে তখন
পশিনু বিদ্যুদ্বেগে কংস-কারাগারে।
অহো; কি যে শোকদৃশ্য দেখিনু নয়নে!
অষ্ট সন্তানের শোকে শোকাতুর মুখ
অশ্রুতে অঙ্কিত, ঘোর-যন্ত্রণা-মণ্ডিত,
দীর্ঘ জটা-সমাচ্ছন্ন! অশ্রুরেখাবাহী
তখনো দুইটি ক্ষীণ ধারা অবিরল
বহিতেছে শোকপূর্ণ! কহিল বাসুকি—
'বীরেন্দ্র! সম্মুখে তব জনক জননী!'
জনক জননী মম!—মূর্ছিত হইয়া
উভয়ের পদমূলে পড়িতে ভূতলে,
পড়িলাম সেই স্বর্গে,—হতভাগ্য আমি!—
জীবনে প্রথম সেই জননীর কোলে!
"শুনিয়াছ ধনঞ্জয়। জামাতার শোকে
শোকার্ত মগধেশ্বর সপ্তদশ বার
আক্রমি মথুরাপুরী, হ'ল পরাজিত
সপ্তদশ বার রণে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে,
তরঙ্গে তরঙ্গে এই সমরপ্রবাহ
ষোড়শ সহস্র মম বীর অনুপম
নিল ভাসাইয়া; পূর্ণ হইল মথুরা
অনাথার হাহাকারে; পড়িল সরিয়া
নাগপতি সৈন্য সহ ঘোর মনোবাদে।
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, নহে উগ্রসেন
শত্রু মগধের। পার্থ! দেখিলাম শেষ,
বৃথা শোণিতের স্রোতে, কালের প্রবাহে,

জীবনের ব্রত মম যেতেছে ভাসিয়া।
রৈবতকে এই দুর্গ করিয়া নির্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে ওই পুরী, বিদীর্ণহৃদয়ে
ষোড়শ সহস্র সেই অনাথার সহ
ত্যজিলাম ব্রজভূমি। ত্যজিলাম হায়!

শৈশবের স্নেহ-স্বর্গ অঙ্ক যশোদার;
কৈশোরের ক্রীড়াঙ্গন চারু বৃন্দাবন;—
যমুনাপুলিন; সেই মথুরা নবীন
যৌবনের রঙ্গভূমি; জীবন-নাটকে
খুলিল দ্বিতীয় দৃশ্যে অঙ্ক অন্যতর!

অষ্টম সর্গ

দলিত ফণিনী

নীলাকাশে মেঘাকার মিশিয়াছে পারাবার ;
মিশিয়াছে সেরূপে যথায়,
সিন্ধুনদ পারাবারে,— তাহার পশ্চিম পারে
পাতাল প্রদেশ শোভা পায়।
অনন্ত সমুদ্র মত, ব্যাপিয়া অনন্তায়ত,
শোভে মহাবন ভয়ঙ্কর ;
শোভে বনে মহাগড়, গড়ে পুর মনোহর,
পুরে শোভে চারু সরোবর।
ফলে পুষ্পে তরুগণ, শোভে তীরে অগণন,
শোভে শৈল-ঘাটে সুহাসিনী,
যেন নীলোৎপল চারু, রূপবতী জরৎকারু,
বাসুকির কনিষ্ঠা ভগিনী।
প্রফুল্ল নীলাব্জ মুখ, ফুটন্ত নীলাব্জ বুক,
শোভে অঙ্গ নীলাব্জ বরণ,—
কাদম্বিনী মনোহরা বারি বিদ্যুতেতে ভরা,
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে নয়ন।
গর্বপূর্ণ রক্তাধরে সবারি বিদ্যুৎ ঝরে,
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে হৃদয় ;
হৃদয় ভরিয়া হায়! তরঙ্গ খেলিয়া যায়,—
উত্তাল, উন্মত্ত, ফেনময়।
আকর্ণ সে যুগ্ম ভুরু পূর্ণ সে নিতম্ব উরু
কি লাবণ্য-লীলা স্থূলতায়!
নবীন যৌবন রঙ্গে ছুটিয়াছে যে তরঙ্গে,
কে বলিবে পূর্ণতা কোথায়।
তরঙ্গিত রূপরাশি শেষ সোপানেতে বসি ;
পড়িয়াছে দীর্ঘ কেশভার
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে পশ্চাতে সখীর অঙ্গে,
শৈল-ঘাটে, করিয়া আঁধার!
উরু পরে বাম কর, কর-পদ্মে শশধর ;
এক গুচ্ছ কেশে অন্য কর ;
নীরব নয়ন স্থির, চেয়ে আছে নীল নীর,
নীল নীরে প্রতিমা সুন্দর।
"আ মরি! আ মরি! মরি! নীল নভঃভ্রম করি"
ভাবে মনে মনে জরৎকারু,—
"সরসীর নীল নীরে ভাসিছে শশাঙ্ক কি রে!
ফুটেছে কি নীলাম্বুজ চারু
মরি! মরি! কিবা মুখ! এত কি পীবর বুক!
এমন শফরী দু' নয়ন!
এমন কি আঁকা ভুরু! নিতম্ব এমনি গুরু!
স্থূল উরু এমন গঠন!
কি গঠন ক্ষীণ কটি! হৃদয়ে তরঙ্গ দুটি
উথলিছে ছড়া'য়ে উচ্ছ্বাস!
আপনার পূর্ণতায়, আপনি উন্মত্তপ্রায়
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস!
প্রতিবিম্বে এত শোভা যে রূপের মনোলোভা
নাহি জানি সে রূপ কেমন!
কেমন সে রূপরাশি জলে প্রতিবিম্ব ভাসি
মোহে আমি মহিলার মন,
তথাপি একটি রেখা, নাহি কি গেল রে লেখা,
তাহার হৃদয়ে এক দিন ?
সলিল হইতে হায়— হেদে বুক ফেটে যায়,—
পুরুষ কি রূপ-জ্ঞানহীন ?"

সখী

রাজবালা মরি! মরি! দেখ কেশারাশি পড়ি
ঢাকিয়াছে শরীর আমার।
সে যে কত ভাগ্যবান বাঁধিবে বিমুগ্ধ প্রাণ
এই কেশপাশে তুমি যার।

জরৎকারু

হেন কেশ যদি মম, হতভাগ্য তার সম
কে আছে জগতে তবে আর,

ইহার বন্ধনে পড়ি যেই জন, সহচরি!
নব-জন্ম পাইবে উদ্ধার?
অন্যথা নিশ্চয় তব, চাটুবাক্য এই সব;
তুচ্ছ সেই ক্ষীণ কেশভার,
পুরুষ বন্ধনে যার নাহি করে হাহাকার,
নাহি দেয় বাতাসে সাঁতার।

সখী

ছাড় ব্যঙ্গ রাজকন্যা, তোমার যৌবন-বন্যা
এইরূপে কবিবে কি ক্ষয়?
অতুল কুন্তলপাশ পুরাবেনা কারো আশ,
বাঁধিবে না কাহারো হৃদয়?

জরৎকারু

সখি যে বন্যার টান্ সহস্র অর্ণবযান
ভাসাইতে পারে সুখ পার,
ভাসাইয়া এক তরী, এক ভেলা বক্ষে ধরি
কি সুখ হইবে বল তার?
যেই মহা জলধর, এই বিশ্ব চরাচর
ভাসাইতে পারে বরিষণে,
একটি চাতক-প্রাণে ক্ষুদ্র বারিবিন্দুদানে
তার তৃপ্তি হইবে কেমনে?

সখী

এ কি কথা! সতী নারী জুড়াবে কেমন করি
একাধিক চাতকের প্রাণ!

জরৎকারু

ক্ষুদ্র মুখ ক্ষুদ্র ভাষা, ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র আশা,
ক্ষুদ্র তুই, নাহি তোর জ্ঞান,
যে প্রেম হৃদয়ে মম পারে পারাবার সম,
প্লাবিবারে বিশ্ব চরাচর;
যে পিপাসা প্রাণে বহি বিশ্ব চরাচর দহি,
পোড়াইতে পারি বৈশ্বানর!
অনন্ত সিন্ধুর জল একটি গোষ্পদ, বল,
ধরিবে, বহিবে সহচরি?
পিপাসার দাবানল একটি গোষ্পদ জল
নিবাইবে জুড়াইবে, মরি?

ক্ষুদ্র স্রোত এক মুখে পড়ে ক্ষুদ্র নদীবুকে,
ক্ষুদ্রত্বের ক্ষুদ্র সম্মিলন!
গঙ্গা পড়ে পারাবারে শত মুখে শত ধারে,
সখি! সেই মিলন কেমন!

সখী

তুমিও জাহ্নবী মত, ত্যজিয়া কৌমার্যব্রত,
নাহি কেন বর পারাবার?

জরৎকারু

সখি, হেন জলনিধি কোথা মিলাইবে বিধি?
জুড়াইবে পিপাসা আমার?

সখী

মহা সিন্ধু কুরুবংশ সে কুলের অবতংস
রাজচক্রবর্তী দুর্যোধন।
কেন নাহি বর তারে?

জরৎকারু

বাঁধ পরিণয় হারে
অরণ্যের শার্দূল ভীষণ
দুর্যোধন? সে দুরন্ত অভিমান মূর্তিমন্ত?
অধর্মের সেই অবতার?
হিংসায় শ্মশান মত জ্বলিতেছে অবিরত,
তাহে প্রাণ সঁপিব আমার?

সখী

সে কি কথা, জলনিধি একটি শ্মশান, দিদি,
পারে না কি করিতে নির্বাণ?

জরৎকারু

রাবণের চিতানল কে পারে নিবাতে বল?
অনির্বাণ হিংসার শ্মশান!

সখী

বর অঙ্গ-অধিপতি রূপে কর্ণ রতি-পতি,
বীরত্বে তুলনা নাহি যার!

জরৎকারু

বরিব সে ক্ষুদ্রমতি, দিতেছে যে ঘৃতাহুতি
সেই শ্মশানেতে অনিবার!
হিংসার সে দাস দম্ভ, অহৃদয় অগ্নিস্তম্ভ,

তারে দিব—

সখী

আচ্ছা, দুঃশাসন।

জরৎকারু

বনের ভল্লুক কেন করি না বরণ?

সখী

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

জরৎকারু

এই বার চক্ষুঃ স্থির!
বিড়ালতপস্বী সুবচন!
দিব্য কথা—ধর্মরাজ! সে ধর্মে পড়ুক বাজ,
যে ধর্মে স্বার্থের আবরণ।

সখী

তবে ভীমসেনে বর!

জরৎকারু

তুমি এ মুহূর্তে মর!
জরৎকারু আহার্য ত নহে?
পড়ি সেই বৃকোদরে, দিবে তৃপ্তি পতিবরে?—

সখী

সে কি! সিন্ধু নাহি কিহে সহে
একটি উদর টান? বর তবে বীর্যবান
ধনঞ্জয় পাণ্ডব মধ্যম;
পূর্বাহ্ন কিরণসম, যার কীর্তি অনুপম
ছাইতেছে ভারতগগন।

জরৎকারু

বরং এ কথা ভাল, সতীত্বের এ জঞ্জাল
সহিতে হবে না কদাচন!
পাব পতি পঞ্চবীর, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
অর্জুনেরে পাঠাবেন বন।
ঠাট্টা ছাড়ি বলি তবে, পার্থ-প্রণয়িনী হবে
যেই নারী, ভাগ্যবতী সেই।
সে স্থির ধীর বীরত্বে কে আঁটিবে আর্যাবর্তে
ভূতলে তুলনা তার নেই।

কিন্তু জরৎকারু যদি কৈশোর যৌবনাবধি
বীরত্বে বিকা'ত মন প্রাণ,
অনার্য-বীরত্ব-খনি ধরে তবে কত মণি
পরাক্রমে পার্থের সমান।
বিভিন্নতা এইমাত্র— তারা অমার্জিতগাত্র,
অবস্থার আঁধারে নিহিত।
পার্থের মার্জিত প্রভা, স্ফটিকে যেমতি জবা
সৌভাগ্যে কিরণে ঝলসিত।
সখীরে, অবস্থা যারে গড়িয়াছে, গড়িবারে
পারে সেইরূপে অন্য জন;
গাধা পিটে হয় ঘোড়া, যষ্টিভরে চলে খোঁড়া
ভেলা করে সমুদ্র লঙ্ঘন।
অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত ক্ষুদ্র দীপ কত শত
এইরূপে জ্বলে নিবে হায়!
প্রভাকর নিজ করে বিশ্ব সমুজ্জ্বল করে,
জরৎকারু হেন রবি চায়।

সখী

হেন রবি, পারাবার, কোথায় মিলিবে আর
নাহি তবে এই ধরাতলে।

জরৎকারু

আছে।

সখী

সত্য কথা?

জরৎকারু

সত্য, অন্যথা সৃষ্টির তত্ত্ব
নিষ্ফল কি অবনীমণ্ডলে?
আছে,—সখী কমলিনী সৃজিলা যে, দিনমণি
সৃজিয়াছে সেই বিধাতায়;
তটিনী সৃজন যার, সৃজিলা সে পারাবার,
উভয় উভয় দিকে ধায়!
আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষিত, দরশন দরশিত
সৃজিলা সে, জল পিপাসার;
আছে,—যোগ্যপাত্র মম; জানি নহে কদাচন
অভাবের সৃষ্টি বিধাতার।

সখী

আছে যদি, তবে কেন দুর্লভ যৌবন হেন
করিতেছে বৃথা উদ্‌যাপন ?
বনের মালতী ফুটি, বনেতে পড়িছে লুটি
তারে কেন কর না বরণ !

জরৎকারু

বরেছিনু।
"বরেছিলে ? সে কি কথা ? কি কহিলে ?"—
সহচরী ছাড়ি কেশভার
দাঁড়া'য়ে বিস্ময়ান্বিতা, চাহি কেশ-মেঘাবৃতা
জরৎকারু পানে, আরবার,
জিজ্ঞাসিল,—"বরেছিলে! কাহারে, কোথায় দিলে,
প্রেম, প্রাণ, এ তব যৌবন ?
কিবা হ'লো পরিণাম ? পুরেছে কি মনস্কাম ?
কেনই বা করিলে গোপন ?"

জরৎকারু

কারে?—শিবতুল্য শূরে। কোথায়?—পাতালপুরে
কোন্ মতে ?—পতঙ্গ যেমন
প্রজ্জ্বলিত বৈশ্বানরে আনন্দে উড়িয়া পড়ে।
পরিণাম ?—ভস্মও তেমন !

সখী

কি কথা রাজকুমারি ! কিছু না বুঝিতে পারি,
প্রহেলিকা ছাড় ধরি পায়।
একি কথা অসম্ভব, আমি চির-দাসী তব,
আমাকেও লুকাইলে হায় !
ঈষৎ ঈষৎ হাসি উঠিল অধরে ভাসি,
স্থির নেত্র ভাসিল কোথায়।
চাহি বাপীজল পানে, সেরূপ বসিয়া ধ্যানে,
জরৎকারু কিবা শোভা পায়।

জরৎকারু

প্রেম সখি ! লুকান কি যায় !
প্রেমের তরঙ্গ-ভঙ্গ, উন্মত্ত লীলারঙ্গ,
লুকাইতে পারে যেই জন ;
লুকাইলে, দেখিবারে যেই জন নাহি পারে ;
উভয় লো কাষ্ঠের সৃজন !
বলি তবে,—একদিন অপরাহ্নে ক্রমে লীন
হইতেছে নৈদাঘ কিরণ ;
দিবাশেষে সন্ধ্যাবেলা খেলাই কৈশোরখেলা,
পত্র পুষ্প করিয়া চয়ন,
এই ঘাটে, এই স্থানে ; সহসা কি যেন কাণে
শুনিলাম, ফিরায়ে বদন
মরি কিবা দেখিলাম ! সেই ক্ষণে মরিলাম,—
সহোদর সঙ্গে কোন জন ?
নীল রত্নোজ্জ্বল অঙ্গে যৌবন প্রভাত রঙ্গে
খুলিয়াছে কি অরুণ আভা !
ভঙ্গিমায় কি গাম্ভীর্য কিবা বীর্য অনিবার্য
কি সৌন্দর্য নারী-মনোলোভা !
প্রভাত গগন সম সে ললাট নিরূপম,
কি জ্যোতি-তরঙ্গ খেলে যায় !
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি, তীরস্থিতা লতারাশি,
সরোবরে শোভিছে ছায়ায় ,
ভুরু ইন্দ্রধনুর্দ্বয়, শুদ্ধ নীল-মণিময়,
আকর্ণবিশান্ত সমুজ্জ্বল।
প্রদীপ্ত গগন সম, নেত্রদ্বয় নিরূপম,
তারা নীল ভানুর মণ্ডল।
প্রশস্ত ললাটে নেত্রে, প্রশস্ত উরস-ক্ষেত্রে
—বীরত্ব-মহত্ত্ব-রঙ্গাঙ্গন ;—
বীরত্বের প্রভাকরে, মহত্ত্বের শশধরে,
সমুজ্জ্বল করেছে কেমন !
করে ধনু শ্লথগুণ, পৃষ্ঠে শৃঙ্গপূর্ণ তূণ,
মৃগয়ার বেশে সুসজ্জিত।
কি উষ্ণীষ পরিধান, নহে কিছু মূল্যবান,
নহে মণিমুক্তায় খচিত।
তথাপি সে রূপনিধি মুহূর্ত্তেক দেখ যদি,
নিরবধি ভুলিবে না আর ;
নিশ্চয় ভাবিবে মনে, দেখিতেছ দু' নয়নে
পৃথ্বীপতি সম্মুখে তোমার।

শিলাঘাটে শৈলাসনে বসিলা ভ্রাতার সনে।
এ কি ভাব, হা হত হৃদয়!
গাঁথিতেছিলাম মালা, ছিঁড়িলাম একি জ্বালা!
গাঁথা মালা, কুসুমনিচয়।
মরমে পশিলা দৃষ্টি কি যেন বিদ্যুৎবৃষ্টি
করিতেছে হৃদয়ে আমার।
অন্তরের অন্তঃস্থল দেখিতেছে, যেন জল
আবরণমাত্র আছে তার।
সেই দৃষ্টি! সেই হাসি - যেন তুষারের রাশি
যাইতেছি মাটিতে মিশিয়া।
লাজে চাহি ধরাতল,— দেখি ফুল, ফুলদল,
সেই মুখ, সে হাসি মাখিয়া!
নিক্ষেপি বাপীর জলে শেষে ছিন্ন ফুলদলে,
বেগে গৃহে করিয়া গমন,
উপাধানে রাখি মুখ, শয্যায় রাখিয়া বুক,
দেখিলাম কতই স্বপন!
অতঃপর সেই শূর আসিলে পাতালপুর,
করিবারে যুদ্ধ-আয়োজন,
সৈন্য-শিক্ষা-অবসরে আসি এই সরোবরে
এই ঘাটে বসিত কখন।
ক্রমে দেখা, ক্রমে কথা, অঙ্কুরিতা আশালতা
ক্রমে ক্রমে হ'লো পল্লবিত।
ক্রমে নিত্য দরশন; নাহি সহে অদর্শন
ক্রমে ক্রমে পল পরিমিত।
গৃহে, কক্ষ-বাতায়নে, সরোবরে. উপবনে,
ছায়াময় কাননে কখন,
কভু বসি জ্যোৎস্নায়, চিত্র নভ; প্রতিমায়
বাপীজলে করি দরশন,
দিবসের যামে যামে, এ পুরের স্থানে স্থানে,
নিরজনে বসি দুই জন,
শুনিতাম, কহিতাম, কত কথা, দুটি প্রাণ
ঐকতান সঙ্গীত যেমন।
সেই কণ্ঠ, সহচরি; প্রেমে, বীণা মুগ্ধকরী;
বীরত্বেতে, ভেরীর ঝঙ্কার;
জ্ঞানে, জলধর-স্বন মৃদু মন্দ গরজন;
কি বিদ্যুৎ-খেলা প্রতিভার!
বীরত্ব-উচ্ছ্বাসে ভাসি, কভু যেন অগ্নিরাশি
ধক্ ধক্ বেষ্টিছে তোমায়;
আবার স্নেহেতে গলি, কভু পড়িতেছে ঢলি
জুড়াইয়া অমৃতধারায়।
কভু কর্মজ্ঞানতত্ত্ব উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে মত্ত,
বুঝাইত জলের মতন;
ঊর্ধ্ব দৃষ্টি, শান্ত মূর্তি সখি! সেই প্রীতিস্ফূর্তি,
মানবের নহে কদাচন।

সখী

নিশ্চয় সে যাদুকর! অন্যথা সম্ভবপর
নহে, জরৎকারু-অহঙ্কার
অটল অচল সম, পারাবার-পরাক্রম,
ভাসাইবে সাধ্য আছে কার?

জরৎকারু

জরৎকারু-অহঙ্কার অতি তুচ্ছ; ত্রিসংসার
ত্রিপাদ সমান নহে তার,—
ভাবিতাম, পদমূলে বসি যবে বিশ্ব ভুলে
দেখিতাম মূর্তি প্রতিভার।

সখী

এরূপে হইল গত কতকাল?

জরৎকারু

স্বপ্ন মত
একটি বৎসর,—এক পল।

সখী

তার পর পরিণাম?

জরৎকারু

সুখ-স্বপ্ন-অবসান,
আশা-মেঘ বর্ষিল গরল।
একদিন মধুমাসে, মধুরে চাঁদনি হাসে,
মাধুরী ঢালিয়া নীলিমায়

সরসীর নীল নীরে, ঢালিয়া মাধুরী তীরে
উপবন শ্যামল শোভায়।
বহে সন্ধ্যানিল ধীরে চুম্বি ক্ষুদ্র উর্মি-নীরে,
চুম্বি উর্মি প্রাণের ভিতর।
কি অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসের, কি অজ্ঞাত নিশ্বাসের
উচ্ছ্বাসেতে পূর্ণিত অন্তর!
এই ঘাটে এইখানে, বসি উচ্ছ্বসিত-প্রাণে,
—এক বৃন্তে কুসুমযুগল,—
কহিতে কহিতে কথা, কি যে এক কোমলতা,
কিবা এক বিষাদ তরল,
মিশিতেছে ক্রমে ক্রমে সেই মুগ্ধ আলাপনে,
সরোবরে মেঘছায়া যথা!
কি যেন হৃদয়ব্যথা চাপিয়া রাখিছে কথা!
হৃদয় কহিবে অন্য কথা।
দেখিয়াছ সিন্ধুনীরে যখন অজ্ঞাত ধীরে
জোয়ারের হয় সমাবেশ,
উজান বহিয়া জল, মন্দ হয় স্রোতোবল,
ক্রমশঃ নিশ্চল হয় শেষ।
তেমতি ক্রমশঃ ধীর কথা, কণ্ঠ সুগভীর,
ক্রমে ক্রমে হইল নীরব;
হৃদয়ের সে পূর্ণতা, না পারে কহিতে কথা,
ভাষা ভাব কল্পনা-বিভব।
এইরূপে মুগ্ধ-প্রাণে, চাহি চন্দ্র শূন্য, পানে,
নীরবে বসিয়া দুই জন।
বাড়িল জোয়ারবল, বহিল নিশ্চল জল,
ধীরে কর্ণে শুনিনু তখন—
"জরৎকারু, ফাটে বুক নাহি জানি এই সুখ,
এ জীবনে পাইব কি আর?
পূর্ণ মম আয়োজন, যে সমুদ্রে এইক্ষণ
দিব ঝাঁপ, কোথা কূল তার?
ডুবি যদি দিতে ঝাঁপ, রবে এই মনস্তাপ,
এ অতুল স্নেহের তোমার,
—পারাবার পরিমাণ,— বিন্দুমাত্র প্রতিদান,
হইল না জীবনে আমার।
যদি ভাসি,—স্রোতোবল,— ঘটনা তরঙ্গদল,
কোথায় যে নিবে ভাসাইয়া;
কে কহিবে ভবিষ্যৎ,— পূর্ণ হবে মনোরথ?
পুনর্বার আসিব ফিরিয়া?
আসি কি না আসি আর; ডুবি, ভাসি, অনিবার
হৃদয়েতে রহিবে অঙ্কিত
তব স্নেহমাখা মুখ, তব স্নেহপূর্ণ বুক,
তব মূর্তি স্নেহেতে সৃজিত।
চিন্তা, শ্রান্তি, অবসরে, অবসন্ন কলেবরে,
করিতাম যবে দরশন,
কি যে স্বর্গ সুশীতল, প্রীতিপূর্ণ নিরমল;—
চলিলাম, বিদায় এখন!"
"বিদায়!"—জোয়ার-জল, ধরিল ভীষণ বল,
—পড়িলাম ঢলিয়া চরণে,—
"বিদায়!—হৃদয়নাথ! দাসীরে এ বজ্রাঘাত
করিও না অকরুণ মনে
এই বালিকার প্রাণ একটি বছর দান
করিয়াছি চরণে তোমার;
না পারি সহিতে আরে পরস্ব প্রাণের ভার,
পাদপদ্মে লও উপহার।
তোমার অযোগ্যা আমি জানি আমি, আরো জানি
নাহি যোগ্যা রমণী তোমার।
এত রূপ গুণ কভু যোগ্যতা করিতে, প্রভু,
রমণীতে সাধ্য আছে কার?
দাসী তব পদাশ্রিতা; নির্গন্ধা অপরাজিতা,
দেবগণ করেন গ্রহণ!
তেমতি এ দীন ফুলে স্থান দিয়ে পদমূলে,
চরিতার্থ কর এ জীবন।"
শিহরিল কলেবর। দাঁড়াইয়া প্রাণেশ্বর,
প্রেমভরে তুলিয়া আমায়,
বক্ষে রাখি নরোত্তম, চুম্বিল ললাট মম,—
চারি অশ্রু বহিল ধারায়।
আকাশ পাতাল ধরা অমৃতে হইল ভরা,
হইল অমৃত-পারাবার;

মুহূর্ত ভরিয়া প্রাণ সখি! করিলাম পান,
দেখিলাম স্বরগ আমার।
সখি! মুহূর্তেক মাত্র,—

সখী

শুনিতে শুনিতে গাত্রে
অমৃতে করিল মম স্নান।
কি হ'লো মুহূর্তপর? কেন র'লে নিরুত্তর?
শুনিতে আকুল মন প্রাণ।

জরৎকারু

সে অমৃত-পারাবার মরীচিকা আবিষ্কার
করিলেক মুহূর্তেক পর
জ্বালিল যে তীব্রানল, দহিতেছে অন্তঃস্থল,
অনির্বাণ এই বৈশ্বানর!
"জরৎকারু!"—হ'লো রোধ প্রাণেশ্বর-কণ্ঠরোধ
হলো যেন মুহূর্তেক তরে,—
"জরৎকারু! অভাগিনি—হায় রে অভাগ্য আমি।
এই ছিল বিধির অন্তরে!
একটি বছর আমি, যেন তব অন্তর্যামী
দেখিয়াছি হৃদয় তোমার,—
কি অমূল্য রত্নাধার, কি যে প্রেম-পারাবার,
কি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস তাহার!
কি গুরুত্ব, কি মহত্ত্ব, বিলোড়নে কি উন্মত্ত,
শান্তিতে কি সুধার আধার!
যে রত্ন হৃদয়ে জ্বলে, নিত্য দেহ-লতাফলে,
জগতে তুলনা নাহি তার।
জরৎকারু, তব কাছে, আর কোন্ ফল আছে
লুকাইয়া হৃদয় আমার?
একটি বছর আমি পূজেছি প্রতিমাখানি,—
পুষ্পে ঢাকা, রত্নের ভাণ্ডার।
কিন্তু যেই মহাব্রতে, করিয়াছি যেই মতে,
এই ক্ষুদ্র আত্ম-সমর্পণ,
করিলে সে ব্রত ভগ্ন, তুমি কি রমণী-রত্ন!
হেন পাপ ক্ষমিবে কখন?"
চুম্বিয়া ললাট মম,— "এস! সহোদরা সম
হও ব্রতে সহায় আমার;
এস ভগ্নি, দুই প্রাণ নারায়ণে করি দান,—
আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার!"
অশ্রুজল ধারা চারি,— দুই বহ্নি, দুই বারি,—
মিশাইল মুহূর্ত আবার।
দেখিলাম অন্ধকার, মনে কিছু নাহি আর,—
অঙ্কে শুয়ে মূর্চ্ছান্তে তাহার।
দাঁড়াইয়া তীরবৎ,— সংসার শ্মশান মত
জ্বলিতেছে, গর্জিছে ভীষণ—
"বুঝিলাম, নিরমম! তব ব্রত, তব পণ"—
স্থিরকণ্ঠে কহিয়া তখন,—
"বুঝিলাম, নিরমম! তব ব্রত তব পণ।
অনার্যের শোণিতে অধম,
আর্য-রক্ত কলুষিত করিবে না কদাচিত,—
এই ব্রত, এই তব পণ!
কমলিনী জন্মে পঙ্কে, দেবগণো তারে অঙ্কে
দেয় না কি সমাদরে স্থান?
মুক্তা ফলে সিন্ধুতলে, পৃথ্বীপতি তারে গলে
পরি কত ভাবে ভাগ্যবান।
নিব ব্রত? লইলাম,— দিব ঘোর প্রতিদান,
পাইলাম যেই অপমান!
জ্বালাইলে যে শ্মশান, করিবে অনার্যপ্রাণ
তব তপ্ত রক্তে নিরবাণ!"
যাইতেছিলাম ছুটে, পড়িনু ভূতলে লুটে
মূর্চ্ছিত হইয়া আরবার,—

সখী

কি কষ্ট! নাগেন্দ্রবালা স্মৃতির দংশন-জ্বালা
সহিও না কায নাহি আর।
বলি আর আরবার একমাত্র পারাবার
মরীচিকা হইয়াছে শেষ,
আছে সপ্ত পয়োনিধি,—

জরৎকারু

আছে,—একমাত্র দিদি, ভাগীরথী করেন প্রবেশ!

সখী

তাহাতে ত দিয়া ঝাঁপ, পেলে এই মনস্তাপ,
তুলিলে এ ঝটিকা কেবল,
আর কি করিবে, আহা!

জরৎকারু

জাহ্নবী করিল যাহা।

সখী

কি করিবে?

জরৎকারু

ডুবিব অতল।

সখী

এ দাসীর প্রগল্‌ভতা ক্ষম যদি রাজসুতা,
শুনিতে আকুল বড় মন,—
ধরাতমে দেবোপম কেবা সেই নরোত্তম?

জরৎকারু

কৃষ্ণ।

সখী

নাগ-শত্রু!

জরৎকারু

নারায়ণ!

নাগরাজ ধীরে ধীরে, আসি সেই বাপীতীরে,
ভগিনীর বসিলা নিকটে।
দাসী গৃহে গেল ফিরে, বাসুকি বলিলা ধীরে—
"এসেছিল ঋষি আজি।"

জরৎকারু

বটে!

বাসুকি

তৃতীয় পরীক্ষা মম, করিয়াছে বিজ্ঞাপন,—

জরৎকারু

কি?

বাসুকি

জরৎকার পাণিপ্রার্থী তব।
(এক রেখা মুখোপর নাহি হলো রূপান্তর,
জরৎকারু রহিল নীরব।)
ভগ্নি, তুমি ভাগ্যবতী, ভাগ্যবান্ নাগপতি,
হেন মহাব্রতে, সহোদরে
আত্মবলিদান তুমি, উদ্ধারিতে নাগভূমি,
দেও যদি প্রফুল্ল অন্তরে।
তুমি প্রাণাধিকা মম,— করিনু যে বিসর্জন
এ অনলে জীবন তোমার,
আমার শোণিত তপ্ত বহে তব হৃদে নিত্য,
তোমারে কহিব কিবা আর!
আবার একটি রেখা নাহি অন্তর দেখা
গেল ভগিনীর স্থিরাননে,
বুঝি সে নীরব-ভাষা, বিধুমিত সে নিরাশা,
নাগেন্দ্র চলিলা অন্যমনে;
কার্তিকের শুক্লাষ্টমী, উঠিলেন নিশামণি,
হাসিল উদ্যান সরোবর।
জরৎকারু কিছুক্ষণ, দেখি হাসি চিত্রোপম,
উচ্চ হাসি হাসিল সত্বর।

জরৎকারু

সকলই মহাব্রত! সকলই স্বপ্ন মত!
দুরাশার কি ক্রীড়া সুন্দর!
যে রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা তব,—যে রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা মম,—
কে বলিবে কোন্ মহত্তর!

নবম সর্গ

আত্ম-বিসর্জন

পূর্ণ-চন্দ্র-কিরীটিনী শারদ-শর্বরী
কৌমুদী অমৃতরাশি হাসিয়া হাসিয়া
ঢালিতেছে রৈবতকে! শোভিতেছে গিরি
স্থির-বিজলীতে মাখা মেঘমালা মত।
কিম্বা যথা নারায়ণ-মূরতি বিশাল,
অমল শ্যামল, শ্বেত চন্দনে চর্চিত।
রাসোৎসবে জনস্রোতে করিছে পূরিত
অধিত্যকা, উপত্যকা। শত রঙ্গভূমি,
শত শত নাট্যশালা, শোভে স্থানে স্থানে,—
কুসুমে পল্লবে চারু কেতনে সজ্জিত.
ঝলসিত দীপালোকে। ফুল্ল-চন্দ্রকরে,
ততোধিক ফুল্লতর রূপের কিরণে,
জ্বলিতেছে বিমলিন জোনাকির মত
পত্রে পুষ্পে দীপমালা। শোভিতেছে যেন
বনে চারু উপবন, চারু উপবনে
চারুতর উপবন সজীব সুন্দর।
বহিছে আনন্দধ্বনি ঝটিকার মত,—
নৃত্য, গীত, বহুকণ্ঠ, বহুযন্ত্রধ্বনি।
সর্বশেষ সে জ্যোৎস্না, তরল নির্মল,
হৃদয়েতে কি জ্যোৎস্না করিছে সঞ্চার।
  অর্জুনের আবাসের কক্ষ-বাতায়নে,
দাঁড়াইয়া ভৃত্য শৈল—বিষাদ-মূরতি।
বাম ক্ষুদ্র ভুজ কাষ্ঠে, ক্ষুদ্র করে মুখ,—
কিবা ক্ষুদ্র মনোহর! কর অন্যতর
স্থাপিত অসাবধানে কাষ্ঠের উপর।
অনিমেষনেত্রে পূর্ণ-সুধাংশুর পানে
রয়েছে চাহিয়া—দৃষ্টি স্থির, সুকোমল,
সচিন্তা বিষাদমাখা। উৎসব-ঝটিকা
তোলে নাই হৃদয়ের ক্ষুদ্র সরোবরে
একটি হিল্লোল ক্ষুদ্র; পড়ে নাহি তাহে
একটিও ক্ষুদ্র রেখা সুখ-চন্দ্রিকার।
এক দণ্ড, দুই দণ্ড, ক্রমে দণ্ড চারি
বহিল শর্বরী-স্রোতে,—দরিদ্র বালক
সেই ভাবে সেইখানে আছে দাঁড়াইয়া।
দ্বিতীয় প্রহর ক্রমে; নিবিল ক্রমশঃ
উৎসবের কোলাহল; রৈবতক ক্রমে
সেই ফুল্ল জ্যোৎস্নায় হইল নিদ্রিত;—
বালক দাঁড়ায়ে স্থির প্রতিমার মত
সেই ভাবে সেইখানে!
                    বহুক্ষণ পরে
কক্ষান্তরে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ
ভাঙ্গিল শৈলের ধ্যান! উৎসবান্তে পার্থ
ফিরি কক্ষে শিরস্ত্রাণ রাখিয়া শয্যায়
নীরবে ভ্রমিতেছিলা চাহি কক্ষতল।
অর্জুন স্বগত ধীরে বলিতে লাগিলা—
"কি শোভা ভদ্রার আজি! ফুলের কিরীট
শিরে; কর্ণে ফুল-দুল; কণ্ঠে ফুল-হার;—
পূর্ণিমার চন্দ্র বেষ্টি নক্ষত্র বিহার!
  বিমুক্ত অলকাকাশে,
  নক্ষত্রের মত ভাসে,
ফুলদল; ফুলদল লহরে লহরে
  দুলিছে সুচারু-বক্ষে;
  ফুলহার ক্ষীণ কক্ষে;
ফুলদাম চন্দ্রহার; ফুলের নূপুর;
প্রকোষ্ঠ বাহুতে ফুল-ভূষণ মধুর!
  শোভিছে সুভদ্রা যথা
  কুসুমিতা বিদ্যুল্লতা;
রূপের সাগরে ফুল্ল লহরী সুন্দর;
জ্যোৎস্না-মণ্ডিত ফুল-বন মনোহর।"
কিছুক্ষণ অধোমুখে ভ্রমিয়া নীরবে

বলিতে লাগিলা পুনঃ—"অহো" সেই কণ্ঠ
সুভদ্রা গাইলা যবে কৃষ্ণ-কীর্তি-গাথা,
কি মূর্ছনা সুললিত, প্রকম্প মধুর!
প্রীতি, ভক্তি, অভিমান, এক স্রোতে মিশি,
কি সুধা বহিতেছিল,—ত্রিদিব-দুর্লভ,—
সেই কণ্ঠে, সেই উর্ধ্ব নয়নে তাহার!
কখন তারায় কণ্ঠ বিহারি গগনে
সুধাংশুর সুধারাশি করিল হরণ,
মূদারায় মধ্যলোকে, মর্ত্যে উদারায়,
সেই সুধা জ্যোৎস্নায় করিল বর্ষণ।
সেই ত্রিতন্ত্রীতে প্রেম মিশিবে যখন,
হবে কিবা শান্তি, সুখ, পুণ্য-প্রস্রবণ!
দাঁড়াইয়া অন্তরালে মুক্ত কপাটের
অধোমুখে, প্রাচীরেতে হেলায়ে শরীর,
শুনিতেছে শৈল সেই প্রণয়-উচ্ছ্বাস।
যতই শুনিতেছিল, ততই তাহার
নবজলধরনিভ বদনমণ্ডলে,
কি যেন গভীরতর ছায়া জলদের
হতেছিল ধীরে ধীরে মৃদুলে সঞ্চার,
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে।
বহুক্ষণ ধনঞ্জয় করিয়া ভ্রমণ
প্রকোষ্ঠে, খুলিতেছিলা অঙ্গের ভূষণ,
শৈল ধীরে কক্ষ পশি লাগিল খুলিতে
প্রভুর ভূষণ বাস। সস্নেহে অর্জুন
জিজ্ঞাসিলা মৃদু হাসি—"শৈল! এতক্ষণ
উৎসব দেখিতেছিলে বুঝি নানা স্থানে?"
শৈল কোমলতা পূর্ণ স্থির দু' নয়নে
চাহি অর্জুনের পানে উত্তরিল ধীরে—
"দেখিনি উৎসব প্রভু।" অর্জুন বিস্ময়ে
চাহি স্থির মুখপানে—"তবে কি কারণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত শৈল এতক্ষণ?"
স্থিরনেত্র পলকেতে নামিল ভূতলে,
উত্তরিল অধোমুখ—"প্রভু-প্রতীক্ষায়
আছিল এ দাস।" সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,
অর্জুন আদরে তুলি নিজ বাম করে,
অন্য করে সরাইয়া কুঞ্চিত-কুন্তল
দেখিলা সে ক্ষুদ্র মুখ; যথা সমীরণ
সরাইয়া লতা, দেখে কানন-কুসুম।
সেই মুখখানি!—পার্থ অতৃপ্ত নয়নে
দেখিলা সে মুখে, সেই বিস্তৃত নয়নে,
সেই ঘন ভ্রূ-রেখায়, ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে,
প্রভাত-শিশির সিক্ত অপরাজিতার
করুণামণ্ডিত সেই বর্ণ নীলিমায়,
কি মহত্ব, কি সৌন্দর্য, কিবা কোমলতা,—
কিবা নিরাশ্রয় ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!
স্বপ্নে কল্পনায় যেন হেন মুখখানি
দেখেছেন ধনঞ্জয় পড়িতেছে মনে
ছায়াময়। উঠিয়াছে অজ্ঞাতে হৃদয়ে
কি যেন উচ্ছ্বাস মৃদু; ভাসিয়াছে মনে
কি যেন স্মৃতি ছায়া! বলিলা অর্জুন—
"শৈল! এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন মতে আমি?" পড়িল বালক
প্রভুর চরণতলে। পাতি ভূমিতলে
এক জানু, পা-দু'খানি ধরি দুই করে,
ঢল ঢল নেত্রে চাহি উর্ধ্বে প্রভু পানে
উত্তরিল—"বীরশ্রেষ্ঠ দিবা নিশি দাস
পাইতেছি যে পবিত্র পদ-পরশন,
অনার্যের পরমার্থ; ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান অনার্যকুমার।"
আদরে সে পদানত প্রীতির মুরতি,
নেত্রে করুণার ভিক্ষা, অধরে বিষাদ,—
তুলিলেন ধনঞ্জয়। আদরে বালক
পার্থের প্রমোদসজ্জা করিল মোচন
সুকোমল করে; পার্থ করিলা শয়ন
সুবর্ণ পর্যঙ্ক-অঙ্কে। পদমূলে তার
বসি শৈল ধীরে ধীরে সুকোমল করে
করিতেছে পদসেবা। ভাবিলা অর্জুন
দুইটি কুসুম ফুল্ল, কোমল, শীতল,

আলিঙ্গিয়া পদমূল, চুম্বিয়া চুম্বিয়া,
করিতেছে যেন অঙ্গে অমৃত বর্ষণ।
"ত্যজ পদসেবা শৈল"—কহিলা অর্জুন,—
"তৃতীয় প্রহর নিশি, করগে শয়ন।"
মানিল না আজ্ঞা শৈল। পাণ্ডব তখন
পুষ্পনিভ শয্যা-অঙ্কে, পুষ্প-পরশনে,
চারু পুষ্পানন এক ভাবিতে ভাবিতে
হইলেন নিদ্রাগত। প্রীতি-সঙ্কুচিত
পুষ্প-আয়ত লোচনে দেখিল বালক,
প্রফুল্লিত পুষ্পনিভ সেই বীরানন
সমুজ্জ্বল দীপালোকে। সেই সুপ্ত-বীর্যে
শান্ত বীরত্বের সেই আকাশমণ্ডলে,
মিশায়েছে হৃদয়ের কোমল উচ্ছ্বাসে
কি কৌমুদী, কি সৌন্দর্য! দেখিতে দেখিতে
শৈলের শিথিল শির পড়িল হেলিয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে; হইল স্থাপিত
পদ্মরাগে নীলমণি অতীব সুন্দর।
অর্ধেক ললাট ক্ষুদ্র, অর্ধেক কপোল,
অর্ধ ওষ্ঠাধর, করস্থিত পদাম্বুজ
আছে পরশিয়া। আছে শান্ত মুখে শৈল
চাহি শূন্য পানে,—ঢল ঢল দুটি নেত্র,
অধরে প্রসন্ন হাসি, কি অঙ্গমহিমা!—
নীলমণি-নিরমিত ভক্তির প্রতিমা!
কি আনন্দ! যেন বহু তপস্যার পর,
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর।
বহুক্ষণ এইরূপে বসি আত্মহারা
উঠিল বালক ধীরে; ধীরে একবার
চাহি সেই বীরমুখ, চিত্রিত নিদ্রায়,
প্রবেশিল পার্শ্বস্থিত নিবিড় কাননে।
অতীত তৃতীয় যাম; সুপ্ত রৈবতক;
দাঁড়াইয়া তরুগণ নিদ্রাগত যেন
শারদ জ্যোৎস্নাতলে। আগন্তুক এক
বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে হইয়া বাহির
দাঁড়াইল ছায়াধারে শৈলের সম্মুখে।
প্রণমিল শৈল; আশীষিয়া আগন্তুক
চুম্বিল ললাট ক্ষুদ্র, ছায়ার আঁধারে
বসিল দু'জনে এক বৃক্ষের শিকড়ে।

আগন্তুক

বহুক্ষণ বসিয়াছি তব প্রতীক্ষায়;
বল, শৈল! করেছ কি উদ্দেশ্যসাধন?

শৈল

করিয়াছি।

আগন্তুক

বুঝিয়াছ পাণ্ডবের মন?

শৈল

বুঝিয়াছি।

আগন্তুক

প্রেমাকাঙ্ক্ষী পার্থ সুভদ্রার?

শৈল

প্রেমাকাঙ্ক্ষী।
আগন্তুক হইল নীরব।
আঁধারে আঁধারতর ছায়া মেঘমত
ছাইল বদন তার জ্বলিল নয়ন
অন্ধকারের যেন দুই জ্বলন্ত অঙ্গার।
শিকড় হইতে উঠি বেগে কিছুক্ষণ
ভ্রমিল সে অন্ধকারে। "ভেবেছিনু যাহা"—
বলিতে লাগিল ক্রোধে হইয়া অধীর,—
"বটে? ক্রমে ঊর্ণনাভ পাতিতেছে জাল!
একই ফুৎকারে তাহা দিব উড়াইয়া।"
জিজ্ঞাসিল শৈলে পুনঃ—"ভদ্রা কি তেমন
অনুরাগিণী তাহার?" নিম্নে নভঃপ্রান্তে
পূর্ণ শশধর পানে চাহি উত্তরিল
শৈল—"নবাগত ক্ষুদ্র ভৃত্যমাত্র আমি,
অন্তঃপুর-নিবাসিনী সুভদ্রা সুন্দরী,
কেমনে বুঝিব আমি হৃদয় তাঁহার॥
কিন্তু ভ্রান্তঃ! ওই দেখ পূর্ণ শশধর,
বসি সিন্ধুবক্ষোপরে, দেখ, কি সুন্দর
করিছেন আকর্ষণ! প্রস্তর যেমন,

নিরুচ্ছ্বাস নীরনিধি আছে কি এখন ?"
আগন্তুক পুনঃ ক্রোধে ফিরাইয়া মুখ,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে। বহুক্ষণ পরে
বসি শৈলপার্শ্বে, ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
জিজ্ঞাসিল—"কহ, শৈল! অন্য সমাচার।"
পড়ি পদতলে শৈল, ধরি দুই করে
আগন্তুক দুই পদ, করুণ-নয়নে
চাহি ভীম মুখ পানে, কহিল কাতরে—
"হেন পাপ অভিসন্ধি কর পরিহার।
নহ নিরমম তুমি। অভাগ্য অনার্য
হয়েছে কঙ্কাল সার; তথাপি এখন
আছে শান্তি, বনছায়া আছে অগণন।
কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্জলিত
ভস্মিবে কঙ্কালরাশি ? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি ?"
"পাপানল!"—পদাঘাতে নিক্ষেপিয়া দূরে
উত্তরিল আগন্তুক ক্রোধে—"পাপানল!
অবহেলি আজ্ঞা মম, এই ধর্মনীতি
শিখেছিস্ রৈবতকে, শিখাতে আমারে
কৃতঘ্নতা"—ক্রোধে নাহি সরিল বচন।

পদাঘাতে যেই ধৈর্য হয়নি চঞ্চল,
টলিল তা "কৃতঘ্নতা" একটি কথায়,
শৈলের ভরিল বুক ভরিল নয়ন।
জড়াইয়া ধরি গলা, রাখি ক্ষুদ্র মুখ
বিশাল প্রস্তর-বুকে, সিক্ত বালকের
অশ্রুর ধারায়, কষ্টে কি কহিল শৈল;—
চলি গেল আগন্তুক নক্ষত্রের মত।

সেই শিকড়েতে শৈল বসি পুনর্বার
চাহি অস্তগামী সেই শশধর পানে,
বৃক্ষে হেলাইয়া শির করিল রোদন।
সেই "কৃতঘ্নতা" শেল! সেই পদাঘাত!—
বালকের পূর্বস্মৃতি অশ্রু-স্রোতে তার
বহুক্ষণ তীব্রবেগে যোগাল জোয়ার।
এ অজস্র বরিষণে, হৃদয়-ঝটিকা
হলে ক্রমে প্রশমিত, বালক তখন
কহিল স্বগত—"কিন্তু এই মহাপাপে
ডুবিতে আপনি ভাই! ডুবাতে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি হইবে নিষ্ফল
তোমা জীবনব্রত, আমার জীবন।
কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন,
কিবা ঘোর পাপ-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আনিলাম! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্র পুরে; যেই দেখিনু নয়নে
সে পবিত্র মুখ,—বীরত্বের প্রতিকৃতি
দয়ার আধার; নিবিল সে হিংসানল।
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে। বহিল হৃদয়ে
কি অমৃতমন্দাকিনী! হোক সব স্বপ্ন,
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন।
এ জগতে স্বপ্ন শান্তি,—দুঃখ জাগরণ।"
ক্রমে পূর্ণ শশধর, নিরখিল শৈল,
পশিল জলধিগর্ভে আঁধারি জগৎ;
উষার প্রথমালোকে উঠিল ভাসিয়া।
ক্রমে পূর্ণ শশধর নিরখিল শৈল,
ডুবিল অতলে, হায়! আঁধারি তাহার
অতুল হৃদয় স্বর্গ কাতরে বালক
ফিরাইয়া মুখ পূর্ব-গগনের পানে,
প্রণত হইয়া, বুক পাতিয়া ভূতলে,
ডাকিল,—"অনাথনাথ! আশা-অস্তকালে
দেও শক্তি এ হৃদয়ে! যাপিব জীবন,
নিরাশার উষালোকে দেখিয়া স্বপন।"
পুষ্প-স্তর-সুকোমল সুবাস শয্যায়,
সব্যসাচী! কোন্ স্বপ্ন দেখিছ এখন ?
সেই সুখ রাস দৃশ্য, সেই রাসেশ্বরী,
সেই নৃত্য সেই গীত, হ'য়ে অভিনীত
দীর্ঘ স্বপ্নে, ক্রমে ক্রমে নিবিল আলোক
আঁধারিয়া রঙ্গভূমি; কিন্তু বিকাশিল

আশার যে উষালোক হৃদয়ে তাঁহায়,
উৎসাহে ভরিল প্রাণ। উৎসাহে ফাল্গুনী
বসিয়া শয্যায়, পার্শ্বে দেখিলা বিস্ময়ে
বসি করোযোড়ে শৈল জানু পাতি ভূমে,—
মুখ শান্ত, দৃষ্টি শান্ত, অঙ্গ অবিচল।

শৈল

এক ভিক্ষা চাহে দাস।

অর্জুন

কোন্ ভিক্ষা শৈল?

শৈল

একটি প্রতিজ্ঞা। দাস নিবেদিবে যাহা
নাহি জিজ্ঞাসিবে তারে জানিয়াছে তাহা
কার্ কাছে, কোন্ মতে; সেই কথা আর
শ্রবণগোচর নাহি করিবে কাহার।

অর্জুন

করিনু প্রতিজ্ঞা শৈল।

বালক তখন
ধীরে ধীরে যা কহিল, ভয় ও বিস্ময়
হইল অঙ্কিত তাহে পার্থের বদনে।
অর্জুন ভাবিলা এ কি গুপ্তচর কেহ?
চাহিলা বালক পানে তীব্র দু' নয়ন
দেখিলা সে মুখ শান্ত; শান্ত দু' নয়ন,
সরল ও সুশীতল, উষার মতন।
ত্রস্তে মৃগয়ার সজ্জা করি বীরবর,
হইলা নির্গত, যেন প্রভাত-ভাস্কর।

দশম সর্গ

কুমারী ব্রত

হেলিয়া ছুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
কিশোরী যাদবী কুমারী যত,
অবগাহি প্রাতে 'শান্তি-সরোবরে',
চলেছে করিতে কুমারী-ব্রত।
হেলিয়া ছুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
যেন ফুল-মালা অনিলে ভাসি,
কিশোরী কুসুমমালা মনোহরা
অরুণ-তরঙ্গে ছুটিছে হাসি।
ফুল্ল ফুল কেহ,—ষোড়শী সুন্দরী,—
কেহ বা ফুটন্ত, কলিকা কেহ।
কেহ বা চম্পক, কেহ বা গোলাপ,
কেহ বা নীলাব্জ, কোমল দেহ।
হেলিলা ছুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া
চলেছে যাদবী কিশোরীগণ ;
রাস-জাগরণে আঁখি ঢুলুঢুলু,
প্রেমে ঢল ঢল কাহারো মন।
সঙ্গে সখীগণ, শোভে করে শিরে
মঙ্গলের ডালা, মঙ্গল-ঘট ;
কটাক্ষ নয়নে কটাক্ষ বচনে,
অন্তরে বাহিরে কতই নট।
বিচিত্র বসন ; বিচিত্র ভূষণ ;
রক্ষিগণ পিছে ; বাদিত্র আগে।
বাদ্যধ্বনি সহ উঠে হুলুধ্বনি,
তুলি প্রতিধ্বনি পঞ্চম রাগে।

২

শৃঙ্গান্তরে এক চারু উপবনে
'শান্তি সরোবর', বিস্তৃত সর,
শোভিতেছে যেন বন-প্রকৃতির
পুষ্পিত কাঠামে আরসী বর।
বাঁধা চারি ঘাট ; এক তীরে তার
ফলে, ফুলে, পত্রে, ঢাকিয়া বুক
বিষ্ণুর মন্দির, দেখিছে নীরবে
অমল-দর্পণে নির্মল মুখ।
শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গে পথ মনোহর,
পথপার্শ্বে দুই পাদপশ্রেণী—
চাঁপা নাগেশ্বর,—রহিয়াছে পড়ি
যেন পার্বতীর মোহিনী বেণী !

৩

হেলিয়া ছুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
এই চারু-পথে কুমারীগণ
পশি উপবনে পড়িল ছড়ায়ে,
করি নব-পুষ্পে পুষ্পিত বন।
কেহ তোলে ফুল, কেহ গাঁথে মালা,
কেহ পরে হাতে ফুলের বালা ;
কেহ স্বর্ণ-পাত্রে, আপনার মত,
সাজায় ফলের ফুলের ডালা।
কেহ করে গান,—বাঁশরীর তান
বাজে উপবন করিয়া ভরা ;
ভ্রমর-গুঞ্জন, বিহঙ্গ-কূজন
অনুকারে কেহ পাগলপারা।
ওটী ও কি ?—এক শূকের শাবক
পড়ি বৃক্ষমূলে, আহত-দেহ।
চ'লে গেল সব, তৃষ্ণা, কাতরতা,—
সেই ভিক্ষা, নাহি বুঝিল কেহ !
দেখিল সুভদ্রা সেই কাতরতা,
সে করুণ ভিক্ষা শুনিল তার ;
কাঁদিল পরাণ, ভিজিল নয়ন,
ছুটিল লইয়া সরসী পার ;

৪

করুণা-পুরিত নয়নে হৃদয়ে,
করুণামণ্ডিত কোমল করে,
মুখে দিল জল ; অঙ্গে শান্তি বল,
বুলাইয়া কর পরমাদরে।
চঞ্চু প্রসারিয়া বিহঙ্গশাবক
কহিছে নীরবে যাতনা-কথা ;
করুণাময়ীর কমল-নয়ন
ভিজিছে, শিশিরে কমল যথা!
দেখে অন্তরাল হ'তে তিন জন
সেই মূর্তিমতী করুণাময়ী।
দেখিতেছে আর সখী সুলোচনা,
অধরে আনন্দ ভুবনজয়ী।

৫

ধীরে ধীরে সখী আসিয়া নিকটে
জিজ্ঞাসিল—"ভদ্রা ; একি লো তোর
কুমারীর ব্রত?" "জীবনের ব্রত"—
উত্তরিলা ভদ্রা—"স্বজনি, মোর।"

সুলোচনা

চল বিহঙ্গিনী, চল যাই তবে
নারায়ণ কাছে মাগি গে বর—
বিহঙ্গম পতি, কানন যৌতুক,
গাছের আগায় বাসরঘর।

সুভদ্রা

না, দিদি! মাগিব—সর্বপ্রাণী পতি,
জগত যৌতুক, স্বভাব ঘর।
বল দিদি! বল,—কেমন বিবাহ,
কেমন যৌতুক, কেমন বর!

সুলোচনা

খেয়েছিস্ লাজ,—"সর্বপ্রাণী পতি!
এত পতি-সাধ আছে না জানি।

সুভদ্রা

এত কোথা দিদি! সমস্ত জগতে
এক মহাপ্রাণ, একই প্রাণী!

সুলোচনা

কে সে?

সুভদ্রা

নারায়ণ। সেই মহাপ্রাণ
তোমার, আমার, জগতময়।
পতঙ্গে, বিহঙ্গে, পাদপে, লতায়,
এক মহাপ্রাণ,—দ্বিতীয় নয়।

সুলোচনা

হরি! হরি! হরি! এখনকার মেয়ে,
বুঝিতে না পারি, কি কথা কয়।
পাঁচটি তবে সোনা, মাথার উপরে!
এঁর পতি নাহি গণনা হয়!
একটিও নাই কপালে আমার,
অনন্তের সুখ বুঝিব কিসে?
বল্, পোড়ামুখি পাখীটিরে জল
দিলি কেন? অঙ্গ জলিছে বিষে।

সুভদ্রা

তাহার আমার একই পরাণ,
তাহার ব্যথায় ব্যথিত হই।

সুলোচনা

আমি যে আকুল দারুণ-তৃষ্ণায়,
আমি বুঝি আর প্রাণীটি নই?

সুভদ্রা

রহিয়াছে দিদি, সম্মুখে তোমার
নির্মল সরসী পবিত্রাসার।

সুলোচনা

মর পোড়ামুখী! বিনা জলতৃষ্ণা
নারীর পিপাসা নাহি কি আর?

সুভদ্রা

আছে,—ধর্ম, পরদুঃখ-কাতরতা,
করিতে জগত আনন্দময়।
জগতের পত্নী, জগতের মাতা,
জগতের দাসী রমণীচয়।

সুলোচনা

আমার পিপাসা প্রেমের কেবল ;
আমি জানি প্রেম রমণী প্রাণ।

সুভদ্রা

আমিও তা জানি,—সমস্ত জগত
গাউক তাঁহার প্রেমের গান।

সুলোচনা

আমার প্রেমের নাহি সে বিস্তার,
শুধু ক্ষুদ্র এক মানবগত।

সুভদ্রা

বড় ক্ষুদ্র তবে ;—কিন্তু সে কি দিদি ?
(দেখিলা সুভদ্রা বিস্মিতা মত)—
কে সে ভাগ্যবান্ ?

সুলোচনা

বীর ধনঞ্জয় !

আবার বিস্ময়ে দেখিলা চাহি
সুভদ্রা সে মুখ, স্থির বাপী যেন,
একটি ব্যঙ্গের হিল্লোল নাই।
কি অরুণ-আভা যুগল কপোলে
ভাসিল ভদ্রার, ছাইল মুখ ;
রহিলা চাহিয়া সরোবর পানে,
দুরু দুরু দুরু কাঁপিল বুক।

সুভদ্রা

তৃষ্ণা কেন দিদি ? সম্মুখে তোমার,—
দেখিতেছ নিত্য নয়ন ভ'রে,
রূপগুণামৃত করিতেছ পান,
তথাপি পিপাসা কিসের তরে ?

সুলোচনা

দেখিয়া কি সুখ ? করিব বিবাহ !
বিবাহের তরে আকুল প্রাণ।

সুভদ্রা

মর তবে ডুবি এই সরোবরে,
করগে সলিলে শ্রীকর দান !
বিবাহ ! বিবাহ ! বিবাহ কেমন !
কারে বল তুমি বিবাহ ছার !
হৃদয়েতে যবে করেছ স্থাপন,
আছে বাকি কিবা বিবাহ আর ?
বিবাহ ! বিবাহ ! দুইটি হৃদয়
মিলি যবে গঙ্গা যমুনা মত,
আপনা ভুলিয়া, অমৃত ঢালিয়া,
চলিল হইতে সমুদ্রগত ;
পতিতে প্রথম, অপত্যেতে পরে,
পরে পরিজনে শতেক মুখে ;
শেষে সীমা ছাড়ি, ঢালি প্রেমবারি
অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে ;—
সেই সে বিবাহ ! পতি পুত্র-লাভ
উপাদান মাত্র, বাণিজ্য ছার !
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়াছে যদি,
কিবা তবে তব পিপাসা আর ?

সুলোচনা

কিন্তু যে সপত্নী !

সুভদ্রা

দেও পতি তারে,

থাকুক গার্হস্থ্য-কৈলাসে সুখে।
কাটিয়া স্নেহের কঠোর বন্ধন
পড় দিয়া ঝাঁপ অনন্ত মুখে।
ভাব সর্বপ্রাণী পতি পুত্র তব,
পতি পুত্র তৃণ-পাদপদল ;
ঢালি প্রেম-বারি, পতিতে উদ্ধারি,
তাপিতে জুড়ায়ে বহিয়া চল।
আনন্দ-রূপিণী,—জন্ম বিষ্ণুপদে,—
করি পতিশির আনন্দময়,
পড়ি পদতলে, অনন্তের কোলে,
নারায়ণপদে হইও লয়।

৬

আর সুলোচনা কহিল না কথা
রহিল চাহিয়া সরসী পানে।
কি যেন হৃদয়ে খুলিল অনন্ত

কি অমৃত যেন বাজিল কাণে।
"ভাগ্যবতী আমি,"—ভাবিল হৃদয়ে—
"ভাগ্যবতী আমি ইহার দাসী।
কিবা মহাতীর্থ চরণ ইহার,
হৃদয় ত নয়,—অমৃত রাশি!"
উঠিয়া বসিল বিহঙ্গশাবক,
আনন্দে ভদ্রার ভরিল প্রাণ
হৃদয়ে লইয়া, কত কি কহিয়া,
কতই করিলা, চুম্বন দান।
যেতে পারে পাখী, নাহি ছাড়ে তবু
করুণাময়ীর স্নেহের ক্রোড়।
দেখে সুলোচনা সজল নয়নে,
আনন্দের তার নাহিক ওর!
কর বাড়াইয়া কহিলা সুভদ্রা—
"যাও বাছা! যাও আপন নীড়ে!
কাঁদিতেছে কত জননী রে তোর,
যারে বাছা; তার বুকেতে ফিরে।"

৭

উড়িল পাখীটি, ভদ্রা সুলোচনা
রহিলা চাহিয়া তাহারি পানে।
ক্ষুদ্র পাখী ক্রমে অনন্তের সনে
মিশাইল, ভদ্রা রহিলা ধ্যানে!

সুভদ্রা

দেখ দিদি ক্ষুদ্র পাখীটি কেমন
অনন্তের সনে হইল লয়।
পারি না আমরা মিশিতে তেমন
করিয়া এ প্রাণ অনন্তময়?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখিতে মায়ের প্রফুল্ল মুখ!
মুখের ভিতরে লুকাইয়া মুখ,
বুকের ভিতরে রাখিয়া বুক?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখি যত গ্রহ নক্ষত্র তারা,—
কি অনন্ত শক্তি! কি অনন্ত জ্ঞান!
অনন্ত প্রেমের অজস্র ধারা।

সুলোচনা

আমারও সে সাধ; পারিতাম যদি
উড়িতে পাখীটি আকাশময়,
ক্ষেপাতেম সত্যভামায় আনন্দে,
থাকিত না কর-কমল-ভয়।
চল বেলা হ'ল—

৮

ওকি কোলাহল?

দেখিলা উভয়ে বিস্মিত মন।
রক্ষিগণ সনে যুঝে দস্যুদল,
ছুটিয়াছে ত্রাসে কুমারীগণ।
ফিরাইতে মুখ দেখিলা সত্রাসে
দস্যু অন্য জন আসিছে ছুটি;
বাড়াইল কর ধরিতে ভদ্রায়,—
সরিল অজ্ঞাতে চরণ দুটি।
করিল কি তারে বিদ্যুতে আঘাত?
দাঁড়াইয়া ভদ্রা প্রশান্ত মুখ;
চাহি স্থিরনেত্রে তস্করের পানে,
কি যেন গরবে গর্বিত বুক।
কি যেন কিরণ, শান্ত সুশীতল,
দীপিছে কানন উজ্জ্বল করি।
হইল অচল প্রসারিত কর,
অজ্ঞাতে তস্কর পড়িল সরি।
আঁখি পালটিতে দেখিল তস্কর,—
সম্মুখে কিরীটী কৃপাণ-কর;
কহে সুলোচনা—"দস্যু নাহি মরে
কটাক্ষে,—সুভদ্রা এ বেলা সর্।"

৯

দস্যু ধনঞ্জয়ে বাজিল সমর,
নহে প্রতিযোগী অযোগ্য কেহ।
বিনাশি প্রহরী আসে দস্যুদল,
প্রহরী-শোণিতে আরক্ত দেহ।
আশ্রয়বিহীনা কুসুমকলিকা

উঠিল কাঁদিয়া কিশোরীগণ।
"যাও দেবীগণ! প্রবেশ মন্দিরে।"—
কহিল ডাকিয়া এ কোন জন?
পশিয়া মন্দিরে কিশোরী সকল
দেখিলা দুয়ারে কিশোর এক,
দৃঢ় করে ধনু, পৃষ্ঠে পূর্ণ তূণ।
কহে সুলোচনা—"সুভদ্রা দেখ্!
আ মরি! আ মরি! কি মুখমাধুরী।
কি বঙ্কিম ভুরু নয়ন কিবা!
কিবা মনোহর সুগোল গঠন,
মরি! মরি! কিবা উন্নত গ্রীবা!
রাজহংস মত দাঁড়ায়ে কেমন
যুঝিছে গৌরবে ঈষৎ হাসি।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম শোভিছে কেমন
নীল উতপলে শিশির ভাসি।
দেখ ভদ্রা দেখ!"—ভদ্রার নয়ন,
যথা ধনঞ্জয় করিছে রণ।
"দেখ ভদ্রা! দেখ—মুখ ফিরাইয়া
কহে সুলোচনা ব্যাকুল-মন।

১০

দেখিলা সুভদ্রা অদ্ভুত কৌশলে
যুঝিছে বালক, তুলনা নাই।
ভক্তিতে, বিস্ময়ে, ভরিল হৃদয়,
কাছে গিয়া ভদ্রা কহিলা,—"ভাই।
বহে স্রোতধারা কিশোর বদনে,
রক্তধারা ক্ষত শরীরে বহে।
দেও শরাসন, করি আমি রণ,
অস্ত্রেতে অক্ষম যাদবী নহে।"
কটাক্ষে যুবক দেখিলা ভদ্রায়,—
প্রীতির প্রতিমা দাঁড়ায়ে পাশে।
"পার্থ-প্রণয়িনী অস্ত্রে পরাঙ্মুখ
নহে কভু, তাহা জানে এ দাসে।
আমি বনবাসী,—অস্ত্র আভরণ,
মৃত্যু সহচর ছায়াতে রহে।
শত অস্ত্রাঘাত সহিবে পাষাণ,
কাঁটাটিও নাহি গোলাপ সহে।"
কহিয়া বালক অপূর্ব কৌশলে
বর্ষিল ধারায় অজস্র শর।
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বিঁধিল দস্যুর,
হইল অশক্ত, অবশ, কর।
পলাইল সব ভঙ্গ দিয়া রণ,
বিজয়ী বালক ঈষৎ হাসি
ফিরাইল মুখ; দেখিল সুভদ্রা,—
প্রীতির প্রফুল্ল কুসুমরাশি!
আত্মহারা ভদ্রা রয়েছে চাহিয়া
যথায় অর্জুন করিছে রণ।
আত্মহারা শৈল রহিল চাহিয়া
সেই রূপরাশি কুসুমবন।
রূপের স্বপনে রয়েছে নিদ্রিত
কি শান্ত মহিমা প্রীতির ধারা!
রূপের স্বপনে কি স্বর্গবিকাশ—
দেখিল বালক হৃদয়হারা!

১১

মুহূর্তে সুভদ্রা ফিরাইয়া মুখ
সকৃতজ্ঞ করে লইয়া কর,
বলিলেন—"চাহি জীবনদাতার
পরিচয়, দেও বীরেন্দ্রবর!"
"পরিচয় কিবা"—উত্তরিল শৈল—
"দিব দেবি! আমি কাননচর!
"দিব কিবা তব যোগ্য উপহার।"—
খুলিয়া সুভদ্রা কণ্ঠের হার,
অর্পিয়া শৈলের গলায় কহিলা—
"লও তুই কর ভগ্নীর আর।"
"লইলাম,"—বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে শৈল
কহিল—"ভগিনি প্রতিজ্ঞা মম,—
যেই এক হার তপস্যা আমার,
নাহি দিল যদি পাষাণ-মন
নিদারুণ বিধি, অন্য হার দিদি!

পারিব না কভু গলায় আর,
বিনা তাঁর স্মৃতি। লও উপহার,
দিলাম তোমারে তোমারি হার,
মম পূর্ণ প্রীতি মাখিয়া তাহাতে,—
আমি বনবাসী কি দিব আর?"
সুভদ্রার হার পরাইয়া গলে
চুম্বিল বালক ভদ্রার কর।
দেখিয়া সুভদ্রা,—অমূল্য রতন
করে দুই বিন্দু উজ্জ্বলতর!

১২

ঘোর সিংহনাদ উঠিল হঠাৎ
ছাড়িলা চীৎকার সুভদ্রা ত্রাসে,—
শরাসনভ্রষ্ট দাঁড়ায়ে অর্জুন,
দস্যু-সেনাপতি ছুটিয়া আসে,
উত্থিত কৃপাণ! বিদ্যুৎগতিতে
মুষ্টিতে তাহার লাগিল শর।
খসিল কৃপাণ; সম্বরি ফাল্গুনী
লইয়া তুলিয়া ধনুকবর।
দূরে শঙ্খধ্বনি প্লাবিয়া কানন
উঠিল আকাশে জীমূতস্বন।
পলাইল দস্যু, দেখিলা অর্জুন,
সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ।
কিশোরী সকল মন্দির হইতে
আনন্দে ছুটিয়া আসিছে ওই!
পড়িলা সুভদ্রা কৃষ্ণের গলায়,
কিন্তু কি বিস্ময়, বালক কই!

১৩

যতেক কুমারী বহু কণ্ঠে মিলি
গাইল তাহার বীরত্ব-গান।
বিস্ময় শুনিলা যতেক যাদব,
ব্যথিত হইল পার্থের প্রাণ।
বুঝিলা সে শৈল, গুপ্ত শরে যার
দস্যু-কর-অসি পড়িল খসি।
বুঝিলা সে শৈল, অপূর্ব কৌশলে
রক্ষিল তাঁহার হৃদয়-শশী।
ধীরে সুলোচনা, গল-লগ্ন বাসে,
করি করযোড়, আসিয়া আগে
কহে,—"মহারাজ! মরি কিবা রূপ!
মরিলেও তাহা হৃদয়ে জাগে।
আধখানি পতি,—যদি সত্যভামা
বারেক দেখিত সে রূপরাশি,
দেড়খানি পতি হইত তাহার!
কিন্তু কাছে এই থাকিতে দাসী,
প্রভুর সে বিঘ্ন হইল না কভু।
চাহে দাসী তার, হৃদয়চোর!
নহে পাঁচ সাত, একমাত্র সেই
মন-চোরে দিব হৃদয় মোর।"
"তথাস্তু"—বলিয়া হাসিয়া কেশব,—
"চল ধনঞ্জয় দেখিয়া আসি,
পৃষ্ঠে কত পুরু চর্ম তার সবে
এই জিহ্বাঘাত তরঙ্গরাশি।"
কহে সুলোচনা—"তবে এত শ্রম
প্রভুর লইতে হবে না আর।
দুই জিহ্বাঘাতে, প্রভুর সমান,
চর্ম পুরু কভু হবে না তার।
প্রভু যে প্রয়াগ; যমুনা জাহ্নবী,
যে তরঙ্গে নিত্য আঘাতি যায়!"
"তুমি সরস্বতী মিশিয়াছ তাহে,"—
কহিলা কেশব—"ত্রিবেণী প্রায়।"—
"যাই পোড়ামুখী সত্যভামা কাছে,
করি তিন ভাগ লইব কাটি;
আধ ভাগ তোরে দিব ভদ্রা চল্"—
চলিল ভদ্রায় ধরিয়া আঁটি
লজ্জায় কংসারি লইয়া অর্জুনে
পুর-দুর্গ-মুখে চলিলা ধীরে।
চলিল কুমারী ব্রত করিবারে
অবগাহি সবে সরসী-নীরে।

১৪

কহিলা কেশব—"রক্ষিগণমুখে
শুনিয়াছি আমি ঘটনা যত।
চিনিয়াছি আমি দস্যুর নায়কে,
তার অপরাধ ক্ষমিব শত।
কিন্তু সে বালক,—শৈল কি তোমার
বুঝেছ কি তুমি হৃদয় তার?"
"বুঝিয়াছি,—ক্ষুদ্র প্রীতির নির্ঝর,"—
কহিলা অর্জুন,—"অমৃতাধার।"
তথাপি সন্দিগ্ধ রহিলা কেশব,
চলিলা চিন্তিত ভূতল চাহি।
কহিলা,—"হেথায় থাকিব না আর,
চল শীঘ্র সবে দ্বারকা যাই।"

১৫

হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া
বিমুক্ত-কবরী কুমারীগণ,
পশিয়া মন্দিরে নারায়ণ কাছে
মাগে পতি যার যেমন মন
কেহ চাহে ইন্দ্র, কেহ চাহে চন্দ্র,
কেহ চাহে বায়ু, বরুণ কেহ।
বৃদ্ধা ভূতি দাসী পালিতা বালিকা
কহে, "ভূতি পচি আমালে দেও।"
কৈশোর যাদের পড় পড় পড়,
জাগিছে যৌবন-তরঙ্গ বুকে,
করে কাণাকাণি, আঁখি ঠারাঠারি,
ঈষৎ ঈষৎ সুহাসি মুখে।
কেবল সুভদ্রা দাঁড়ায়ে কোণায়
প্রাণশূন্য যেন প্রতিমাখানি।
দেখি সুলোচনা, জানু পাতি বসি,
কহে করি যোড় যুগল পাণি,—
"দুই রূপে প্রভু! চাহি দুই বর;
নিজ রূপে,—সেই বনের শুক।
প্রতিনিধিরূপে চাহি সুভদ্রার,"—
সুভদ্রা চাপিয়া রাখিলা মুখ।

একাদশ সর্গ

মানিনীর পণ

১

বিগত প্রহর নিশি,
রৈবতক-অঙ্কে মিশি
হাসিছে চন্দ্রিকা, কিবা হাসি মনোহর!
অঙ্গে মাখি সেই হাসি
হাসিছে হাসির রাশি
শ্বেত প্রস্তরের চারু নিকুঞ্জ নিথর,—
কিবা মনোহর!

২

শোভিছে পুষ্পিত বন
চারি দিকে নিরুপম,
জ্যোৎস্নার পটে চিত্র, কিবা মনোহর;
নিশিগন্ধা শেফালিকা,
কোথায় ফুল্ল মল্লিকা,
করিয়াছে সুবাসিত সুধাকর কর,
সুধাকর-করে স্নাত নিকুঞ্জ সুন্দর।

৩

নিকুঞ্জ-পর্যঙ্ক-অঙ্ক
আলো করি, নিষ্কলঙ্ক
সুবাসিত জ্যোৎস্নার মুরতি সুন্দর,—
সত্যভামা নিদ্রা যায়,
সুবাসিত জ্যোৎস্নায়
খেলিয়া তরঙ্গ কিবা স্থির মনোহর।
উপাধানে বাম কর,
শোভিতেছে তদুপর
সুবাসিত শশধর—চিত্র কল্পনার!
সুবাসিত দীপমালা,
নিকুঞ্জ করিয়া আলা,
দেখায় অতুল সেই সৃষ্টি বিধাতার,—
ত্রিভঙ্গ, তরঙ্গায়িত, জ্যোৎস্নার হার!

৪

চাঁদনি-চর্চিত বন
অতিক্রমি, ফুল্লমন
দাঁড়াইলা বাসুদেব নিকুঞ্জ-দুয়ারে;
পদ না সরিল আর,—
শয্যাশায়ী প্রতিমার
দেখি অবিচল চিত্র পর্যঙ্ক আধারে,
কি অমৃতে প্রাণ মন
হইল যে নিমগন।
কি যে ফুল্ল জ্যোস্নায় ভরিল পরাণ!
কৃষ্ণ স্থিরনেত্রে রূপ করিলেন পান।

৫

কৃষ্ণ

আকাঙ্ক্ষার মরীচিকা,
জ্বলন্ত পাবকশিখা,
কোন কায অনুসারি? ইহার ছায়ায়,
সুশীতল জ্যোৎস্নায়,
সুখের স্বপনপ্রায়,
মানব-জীবন কি হে বহিয়া না যায়?
তবে কেন এত আশা?
তবে কেন এ পিপাসা?
না, না,—একি মোহ মম হতেছে সঞ্চার!
জীবনে যে আছে মিশি,
অর্ধ দিবা, অর্ধ নিশি,
অর্ধেক আতপ, অর্ধ জ্যোৎস্না আবার;
মানব-জীবন,—চিত্র শান্তি পিপাসার!

৬

ধীরে অন্তরালে থাকি,
করেতে অধর ঢাকি

কহে স্থলোচনা—"শান্তি, আজ বড় নয়.;
হও আরো অগ্রসর,
অলক্ষিতে যেই ঝড়
রহিয়াছে লুকাইয়া শান্তির ছায়ায়,
দেখিব কেমনে হাল রাখিবে তাহায়!"

৭

ক্রমে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে
দাঁড়াইয়া শয্যাশিরে,
চুম্বিলেন রক্তাধর সরস সুন্দর।
কই চমকিয়া বামা
উঠিল না, সত্যভামা
নিদ্রা যায় সংজ্ঞাহীন প্রতিমা মৃন্ময়,
কৃষ্ণ কহিলেন,—"এত নিদ্রা তবে নয়!"

৮

স্থলোচনা

না, তা ত নহেই নয়;—
আমার সন্দেহ হয়
এই বোকা কংসে কিহে করিল নিধন?
তবে বড় কৃপাপাত্র
ছিল কংস; দহে গাত্র!
হা বিষ্ণু! পুরুষজাতি বোকা কি এমন?
ভাল, পড়ে নাহি মম ভাগ্যে কোনো জন।

৯

কৃষ্ণ

উঠ সত্য, এ কি ঘুম!
ফুটিয়া কত কুসুম
হাসিতেছে চন্দ্রালোকে, ফুলকুলেশ্বরী
সত্যভামা নিমীলিতা
রহিবে কি বিষাদিতা?
হাসে জগতের চন্দ্র অনন্ত আকাশে,
রবে কি আমার চন্দ্র মান-রাহু-গ্রাসে?
বসি পার্শ্বে প্রেমভরে,
আলিঙ্গিয়া দুই করে
কতই কহিল কৃষ্ণ, করিলা বিনয়,—
নীরব, নড়ে না দেবী, কথা নাহি কয়।

১০

স্থলোচনা

যাদুমণি যদি পার,
রৈবতক-শৃঙ্গ নাড়,
তবু এ মানের ঢেঁকি নড়িবে না কভু!
কেমন এ স্থলোচনা,
লেজে চড়ি ধানভানা
এই প্রেম-যন্ত্র তব পারে নাচাইতে,
তাহাতে সে মন্ত্রসিদ্ধ—ইন্দ্রজিতে জিতে।

১১

কৃষ্ণ

কেন এই অভিনয়?
এই ত সময় নয়,
দিবসের চিন্তাশ্রমে অবসন্ন প্রাণ;
চেয়ে দেখ মিলি আঁখি,
শুন কে আড়ালে থাকি
হানিতেছে তীক্ষ্ণ শর,—ছাড় অভিমান,
লও বীণা, কি জ্যোৎস্না, গাও দুটি গান।

১২

স্থলোচনা

একমাত্র গোবর্ধন
চাপি রাখে বৃন্দাবন;
এই রূপ-বৃন্দাবনে দুই গোবর্ধন!
আরো দুই গিরিভারে,
মানিনী উঠিতে পারে;
মানভরা সত্যভামা উঠিবার নয়;
এখনি যমুনা দুই বহিবে নিশ্চয়।

১৩

সখীর সে ব্যঙ্গ-স্বর,
যেন শব্দভেদী শর,

বিঁধিছে সত্যভামায় ; ক্রোধে মানিনীর
ফাটিছে পীবর বুক,
তবু নাহি ফুটে মুখ,
ফুটিলে যে টুটে মান,—উভয় সঙ্কট !
রুদ্ধ ক্রোধে মানিনীর
সত্য সত্য নেত্রনীর
বহিল নীরবে দুই যমুনা-ধারায়,
করকণ্ডুয়নে মান রাখা হলো দায়।

১৪

দেখিয়া নীরব ধারা,
কৃষ্ণ ভাবিলেন,—সারা
ক্ষুদ্র পালা, ভাগ্য ভাল বেশী কিছু নয়।
মান ঝটিকায় তাঁর
ছিল দীর্ঘ সংস্কার,
জানিতেন বর্ষে যবে, ঝড় নাহি বয়।
মান শেষ, সাক্ষী তার অশ্রুধারাদ্বয়।

১৫

অধর টিপিয়া হাসি,
অন্তরাল হ'তে আসি,
অঞ্চলে বেষ্টিয়া গলা কৃতাঞ্জলি-করে
"কহে সুলোচনা হাসি—
প্রভুর কুশল দাসী
জিজ্ঞাসে, মানের ডালা সেজেছে কেমন ?
দাসীর জিহ্বার ধার,
কিবা তেজ কল্পনার,
অধিক, জানিতে দাসী চাহে বাঁকা শ্যাম ?"
কৃষ্ণ উত্তরিল হাসি—"উভয় সমান।"

১৬

"পোড়ামুখি ! আমি ঢেঁকি !
ঘাড়ে কত রক্ত দেখি !"—
উঠি বাঘিনীর মত এক লম্ফে রাণী,
ধরিয়া চুলের রাশ
ছিঁড়িল কেশের পাশ,
তরঙ্গ খেলিয়া চুল চুম্বিল চরণ,
ছুটিলেক মুক্তকেশী বিজলি যেমন।
ছুটিল পশ্চাতে রাণী,
তরঙ্গিত তনুখানি
রূপের লহরী কত তুলিতে লাগিল,
দুইটি রূপ-তরঙ্গে নয়ন ভরিল।

১৭

কহে ডাকি সুলোচনা—
"এই তব বীরপণা,
দূতীর এ অপমান হাসিছ দেখিয়া ?
পারিলে না, বোকারাম !
ভাঙ্গিলাম আমি মান,
এত প্রতিফল কি হে ঘটিল আমার ?
হা বিষ্ণু !—নিষ্কামধর্ম মানিব না আর।"
সুলোচনা পদদ্বয়
জিহ্বা হতে ন্যূন নয়
ক্ষিপ্রতায়, সত্যভামা মন্থর-গামিনী।
ভঙ্গ দিয়া রণে, ধীরে
নিকুঞ্জে আসিলা ফিরে ;
ঘন শ্বাসে পীবরাঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া
করিতেছে লীলা কিবা !
কিবা আরক্তিম বিভা !
বিকাশে কপোলযুগ্ম ! স্বেদবিন্দু, মরি !
শিশিরের বিন্দু যেন রক্তোৎপলে পড়ি
দুই বাহু প্রসারিয়া
প্রেমভরে আলিঙ্গিয়া,
লইলেন অঙ্কে কৃষ্ণ প্রেমের প্রতিমা,
শোভিল জ্যোৎস্না-অঙ্ক গগন-নীলিমা।
বসিতে না চাহে রাণী,
প্রাণেশ রাখেন টানি,
হাসি কহেন—"মিছে, ত্যজ আজি রোষ ;
আপনি পাগল সাজ, কাহার কি দোষ ?"

১৮

"আপনি পাগল সাজি ?"—
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ মাজি
অশুক অশ্রুতে, দেবী কহিলা সকোপে—
"ছাড় উপহাস, প্রাণে সহে না আমার,
কাটা গায়ে নুন তুমি দিওনাকো আর।
সত্য আমি রাগিয়াছি"—

কৃষ্ণ

তা ত চক্ষে দেখিতেছি।

সত্যভামা

আবার ? কেবল ঠাট্টা ?

কৃষ্ণ

দোহাই তোমার
কহ, ছাড়িলাম ব্যঙ্গ,
আজি কেন এই রঙ্গ ?

সত্যভামা

ভদ্রার বিবাহ দিব।

কৃষ্ণ

এ কথা ? কি জ্বালা
আমি ভেবেছিনু আজ কিষ্কিন্ধ্যার পালা।
কেন হলো এই সাধ ?

সত্যভামা

পাছে সাধে মম বাদ ?

কৃষ্ণ

তাহা ত বাতাসে মাত্র পারে সাধিবারে ;
তাতেও আদর্শ তুমি, অন্যে কি তা পারে ?

সত্যভামা

ছেড়ে দাও গৃহে যাব,
কেন মিছে গালি খাব ;—

কৃষ্ণ

সে বাণিজ্যে একেশ্বর তব অধিকার।
তাহে তুমি নিঃসম্বল
হবে যবে, ধরাতল
হবে এক হস্ত উচ্চ ; থাক্ সেই কথা।
যদি তব নিজ ধনে
প্রীতি না উপজে মনে
খাও অন্য কিছু তবে—
বলিয়া কেশব
চুম্বিলেন পুষ্পাধারে কুসুম আসব।
কৃত্রিম মানেতে ভার,
করি মুখ পুনর্বার
কহিলেন রাণী—"দিব বিবাহ ভদ্রার
মধ্যম পাণ্ডব সনে
স্থির করিয়াছি মনে।"

কৃষ্ণ

কখন ?

সত্যভামা

এখন !

কৃষ্ণ

তুমি পাগল নিশ্চয়।
ব্রহ্মচর্য ব্রতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়।

সত্যভামা

মরি ! মরি ! কি আশ্চর্য !
পুরুষের ব্রহ্মচর্য !
হউক সলিল দৃঢ়, তুষার শীতল,
তথাপি আতপ-তাপে যে জল সে জল।
সুভদ্রার রূপে গলি,
সেই ব্রহ্মচর্য টলি,
রৈবতক-গহ্বরেতে করিছে বিশ্রাম ;—
পুরুষের ব্রত, আর, পুরুষের প্রাণ।

কৃষ্ণ

মানিলাম পরাজয়,
পুরুষ কিছুই নয়।
কিন্তু তুমি জান, সত্য ! প্রতিজ্ঞা আমার,—
ভদ্রা উদাসিনী যারে
চাহিবে বরিতে তারে

দিব সুভদ্রার পাণি। জানিলে কেমনে
ভদ্রা যে হৃদয়ে স্থান
পার্থে করিয়াছে দান?

সত্যভামা

তিষ্ঠ, দার্শনিক! দিব প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
কি সরল! কিছু যেন দেখিতে না পান!
চলিলেন রাজবালা,—
পুষ্পবনে পুষ্পমালা,
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নার তরঙ্গ তুলিয়া,
ভূতলে দ্বিতীয় চন্দ্র চলিল ভাসিয়া।
অতৃপ্ত সে রূপ শোভা,
দেখি কৃষ্ণ মনোলোভা
কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ বসিয়া উদ্যানে
রহিলা চাহিয়া স্থির সুধাকর পানে।

কৃষ্ণ

চরণে যে ভিক্ষা যাচি,
আনিলাম সব্যসাচী,
ভগবন্! সে ভিক্ষা কি হইবে সফল
এ তব মহিমা-রাজ্য,
সকলি তোমার কার্য,
উপাদান মাত্র নাথ! মানব সকল।
যেই সুপ্রসন্ন হাসি
আজি নীলাম্বরে ভাসি
করিয়াছে সুধাময় বিশ্ব চরাচর;
তেমতি প্রসন্ন হাসি
এ উদ্বাহে পরকাশি,
যমুনা জাহ্নবী সহ করিয়া মিলিত
আর্য-ইতিহাস কর সুধায় প্লাবিত!
আভরণ রণ-রণ,
ভ্রমরগুঞ্জন সম,
অমৃত বর্ষিল কর্ণে; দেখিতে দেখিতে
যেন উল্কাখণ্ড ভাসি,
রূপের অমৃতরাশি,
রূপের অমৃতে পূর্ণ করি পুষ্পবন,
আসি এক চিত্র করে
প্রাণেশের অঙ্কোপরে
রাখিলেন, কহিলেন—"ভগিনীর গুণ
দেখ ভ্রাতা চক্ষু মেলি,—চিত্র মনাগুন!"

কৃষ্ণ

কিছু না বুঝিনু আমি,
চিত্রমাত্র একখানি,
বাতাসের অর্থ করা সাধ্য মম নয়।
কৃষ্ণের বদন তুলি,
টিপিয়া চম্পকাঙ্গুলি,
কহে সত্যভামা—"তবে প্রেম-অভিনয়
দেখিবে কি ভগিনীর?
এই বার চক্ষুঃস্থির!"

কৃষ্ণ

আনিতে ভ্রাতায় তব পাঠাইব দূত।
কিন্তু যদি বলরাম,
হন এ বিবাহে বাম?

সত্যভামা

টলিতে টলিতে পারে পৃথিবী গগন,
চরাচর,—টলিবে না সত্যভামা-পণ!

দ্বাদশ সর্গ

সোঽহং

অপরাহ্ন বেলা, কৃষ্ণ বসিয়া নির্জনে
মন্ত্রকক্ষে ; এক পার্শ্বে বসন ভূষণ,
অন্য পার্শ্বে স্তূপাকার রজত কাঞ্চন।
আসি এক রাজদূত নমিলে চরণে,
সুপ্রসন্ন মুখে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা হাসি—
"কহ দূত মগধের কহ কি সংবাদ ?
কি দেখিলে কি শুনিলে গিরিব্রজপুরে ?
মগধের রাজধানী দেখিলে কেমন ?"
কহে দূত যোড়করে—"প্রভুর প্রসাদে
অতিক্রমি বিন্ধ্যাচল, অনন্ত কান্তার,
মধ্য মরুভূমি ক্লেশে, জুড়াল জীবন
গোপালের লীলাভূমি দেখি বৃন্দাবন,
দেখিয়া মথুরাপুরী ; পান করি সুখে
প্রভুর চরণামৃত যমুনা-সলিল।
অবগাহি গঙ্গানীরে, লইয়া মস্তকে
রামচন্দ্র-পদরেণু সরযূর তীরে,
দেখিলাম জানকীর পবিত্রা জননী
মিথিলা জাহ্নবী-তীরে, দেখিলাম শেষে
মগধের মহারাজ্য স্বর্ণ-প্রসবিনী।
সলিল অমৃতনিভ ; অমৃত অনিল ;
অসংখ্য পার্বতী নদী সুধা-প্রবাহিণী।
স্থানে স্থানে অবরুদ্ধ সে সুধা-প্রবাহ
সাজায়ে তড়াগ শত, করিছে মগধ
নিরন্তর সুধাসিক্ত, শস্যসুশোভিত।
মনোহর আম্রবন পল্লবে ভূষিত
অনন্ত হরিত ক্ষেত্রে ; অনুর্বর দেহ
শোভে কৃষ্ণকায় শৈল মৈনাকের মত,—
তুলনায় নিরুপম। শোভে উপত্যকা
অগণন গাভীগণে পুষ্পিত সুন্দর,
শৈল-স্রোতস্বতী মত সুধা-প্রবাহিনী।
বরাহ, বৈভারাচল, বৃষভ, চৈত্যক,
ঋষিগিরি, সম্মিলিত পঞ্চগিরি মাঝে,[1]
ওই দেখ !"—কহে দূত অর্পিয়া কেশবে
মগধের মানচিত্র [2] —"ওই দেখো, প্রভো !
শোভে 'পঞ্চানন'-তীরে গিরিব্রজপুর
মগধের 'রাজগৃহ,'—পর্বতপ্রাচীরে
সুরক্ষিত মহাপুরী ; অজাগর মত
ছুটিয়াছে তদুপরে দুর্গের প্রাচীর।
প্রাচীরে প্রহরিগণ ; অদৃষ্ট অরাতি
কি সাধ্য মগধ-সীমা করিবে লঙ্ঘন ?
একটি তোরণমাত্র শোভিছে উত্তরে
রক্ষিত বিপুল সৈন্যে, দুই পার্শ্বে তার
মগধের বীর্যসাক্ষী উষ্ণপ্রস্রবণ
ছুটিতেছে বহুতর অপূর্বদর্শন।
এক কুণ্ডে 'সপ্তধারা' বহিছে সলিল
ঈষদুষ্ণ, মূর্তিমান দেব বৈশ্বানর
'ব্রহ্মকুণ্ডে,' অন্য কুণ্ডে বহে অবিরল
সুশীতল দুই ধারা 'যমুনা', 'জাহ্নবী' !
জরাসন্ধ-পরাক্রম গোবিন্দ আপনি
দেখিয়াছ ; দেখিয়াছি অশীতি নৃপতি

---

১ মহাভারতে জরাসন্ধপুরীবর্ণনায় এই পাঁচটি পর্বতের উল্লেখ আছে। উহারা এখনও বর্তমান আছে। (কবি কর্তৃক সংযোজিত)

২ রৈবতক রচনার ২০ বৎসর পরে সেদিন কোথায় পড়িয়াছি যে, রামচন্দ্রাদি ভারতবর্ষীয় রাজাদের সিংহাসনের পার্শ্বে রাজ্যের মানচিত্র থাকিত। (কবি কর্তৃক সংযোজিত)

জিনি ভুজবলে বন্দী করি কারাগারে
রাখিয়াছে ; শত জন হইলে পূরণ
দিবে বলিদান রুদ্রে”—“নৃশংস শার্দূল !”
সক্রোধে কহিয়া কৃষ্ণ উঠিলা শিহরি।
“আরো যাহা শুনিলাম ভয় হয় মনে
নিবেদিতে পাদপদ্মে।”—আরম্ভিল দূত,—
“শুনিলাম, ভগদত্ত যবন ভূপতি,
চেদীশ্বর শিশুপাল, নাগেন্দ্র বাসুকি,
করিতেছে সন্ধি প্রভো ! মাগধের সনে।
অর্বুদ, স্বস্তিক, শক্রবাপী, মুনি নাগ,—
বাসুকির সেনাপতি বীরচতুষ্টয়
আসিয়াছে গিরিব্রজে, উত্তর-ভারত
আশু সন্ধিসূত্রে প্রভো হইবে গ্রথিত
সজ্জিত করিয়া এক মহা অনীকিনী,
শত নৃপতির রক্তে পূজি রুদ্রদেবে,
আক্রমিবে জরাসন্ধ দ্বারকা প্রথম।
উড়াইয়া ভারতের যত সিংহাসন
সেই ঝটিকার পরে, সমস্ত ভারতে
উড়াইবে মগধের বিজয়কেতন।”
নীরবিল দূত। কৃষ্ণ বহু উপহারে
করিলে বিদায়, দূত আসিল দ্বিতীয়।
“কহ দূত ! কহ শুনি চেদীর সংবাদ।”—
জিজ্ঞাসিলা বাসুদেব। যোড়করে দূত
নিবেদিলা প্রণমিয়া সাষ্টাঙ্গে চরণে,
“বণিকের বেশে প্রভো ! ভ্রমিয়াছে দাস
সুবিশাল চেদীরাজ্য। জগৎ-জননী
যমুনা জাহ্নবী যারে করি আলিঙ্গন,
সঞ্জীবনী সুধারাশি অজস্রধারায়
ঢালিছেন দিবানিশি,—সেই পুণ্যভূমি,
তাহার সমৃদ্ধি সুখ কি কহিবে দাস ?
চেদী নহে, প্রকৃতির প্রমোদ-উদ্যান !
বিরাজিতা অঙ্কে অঙ্কে কমলা আপনি,—
সুবর্ণনলিনী চেদী। গঙ্গা সুখ-ধারা
সুনীরা যমুনা শান্তি ; সুখ-শান্তি-নীরে
ভাসমানা পুণ্যবতী চেদী গরবিনী !
শোভিছে সঙ্গমস্থলে রাজহংস যেন,
পবিত্র প্রয়াগপুর। উচ্চ গ্রীবা শির
শোভিতেছে মহাদুর্গ, ভ্রূকুটিবিক্ষেপে
সৃজিয়া আতঙ্ক দূর অরাতি হৃদয়ে।
বিধাতার কি যে লীলা বুঝিতে না পারি,
এমন অমরাবতী করিলা অর্পণ
ক্ষিপ্ত বানরের করে ; হিংসিয়া প্রভুরে
ক্ষিপ্তমতি চেদীশ্বর। শঙ্খ চক্র ধরি
কখন পুরুষোত্তম, কভু বাসুদেব,
কভু বিষ্ণু অবতার ! করিছে শৃগাল
কেশরীর অভিনয়, বানর নরের,
কত যে কৌতুকাবহ কহিতে না পারি।
প্রভুর অজস্র নিন্দা কণ্ঠেতে তাহার
বহে কর্মনাশাস্রোতে। করেছে গ্রহণ
মাগধের সৈন্যাপত্য ; কহে নিরন্তর
আক্রমিবে দ্বারবতী, সমরতরঙ্গে
ভারতের যত রাজ্য ল'বে ভাসাইয়া।”
চেদীরাজ্য-মানচিত্র সমর্পিয়া করে,
লভিয়া প্রসাদ, দূত হইল বিদায়।
এইরূপে বহু দূত প্রণমিয়া পদে,
একে একে কত রাজ্য-গুহ্য-সমাচার
নিবেদিয়া, সমর্পিয়া মানচিত্র করে,
লভিয়া প্রসাদ সুখে হইল বিদায়,
চলিলেক রাজ্যান্তরে। মগধের দূত
চেদীতে, চেদীর দূত চলিল মগধে।
সমস্ত ভারত-বার্তা যথাসময়েতে
এরূপে দিগন্তব্যাপী তটিনীর মত
ঢালিত অনন্ত রত্ন অনন্ত বদনে
একমাত্র রত্নাকরে। ভারতের সর্ব
ধর্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের
সর্বশক্তি, এক কেন্দ্রে হইতে কেন্দ্রিত,
বিমথিত এক দণ্ডে,—সমগ্র ভারত
করিয়া একই নখ-দর্পণে স্থাপিত।

চলি গেল দূতগণ লইয়া আদেশ,
উঠিয়া কেশব ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা
অধোমুখে চিন্তামগ্ন। কক্ষপ্রাচীরেতে
দেখিলা না দুই ছায়া পড়িল যে ধীরে।
দেখিলা না ব্যাসদেব, বীর ধনঞ্জয়,
দাঁড়াইয়া দ্বারে স্থির, রহেছে চাহিয়া
সেই চিন্তামগ্ন মূর্তি প্রতিভা-মণ্ডিত।
কবিলেন আশীর্বাদ ঈষৎ হাসিয়া
ব্যাসদেব,—সুপবিত্র একটি হিল্লোলে
করিল নির্জন কক্ষ পবিত্রতাময়।
চমকিলা বাসুদেব,—হাসিলা ঈষৎ,
চিন্তার নিবিড় মেঘে জ্যোৎস্নাসঞ্চার
ভক্তিভরে প্রণমিয়া মহর্ষিচরণে,
বসাইয়া দুই জনে, বসিয়া আপনি,
কহিলেন বাসুদেব—"শুভ আগমন
মহর্ষির রৈবতকে! পদপরশনে
চরিতার্থ এই পুরী, চরিতার্থ দাস।
এইমাত্র ভগবান্! স্মরিতেছিলাম
পবিত্র চরণাম্বুজ, ভাবিতেছিলাম
যাইয়া আশ্রম তীর্থে, যে ঘোর সঙ্কট
ভারতের চারি দিকে উঠিছে ভাসিয়া
নিবেদিব পাদপদ্মে, লইব মাগিয়া
মহর্ষির উপদেশ!" ধীরে দ্বৈপায়ন
উত্তরিলা সুপ্রসন্ন মুখে মৃদুস্বরে,—
"কহ বৎস বাসুদেব! এ কোন্ সঙ্কট
ব্যাসের মন্ত্রণা যাহে চাহে বাসুদেব!
বিশ্ব উপদেশ চাহে আশ্রমের কাছে,
সরসীর কাছে সিন্ধু! ব্যাধের কৌশলে
ভীত হয় মৃগ, বৎস! ডরে কি কেশরী?"

কৃষ্ণ

ভারত অদৃষ্টাকাশে চারি দিকে, প্রভো
হইতেছে যে বিপ্লব-নীরদ-সঞ্চার
খণ্ড খণ্ড; ছুটিতেছে মন্থর গতিতে
মিলিতে কোথায় ভীমাকারে, কোথায় বা
আঘাতিয়া পরস্পরে হইতে বিনাশ,
করিতে ভারতভূমি, মহর্ষি! আবার
ঝটিকায় বিদলিত, শোণিতে প্লাবিত।
সাজিতেছে জরাসন্ধ,—দুই পার্শ্বে তার
শিশুপাল, ভগদত্ত, উত্তর-ভারত
সুসজ্জিত পৃষ্ঠদেশে,—বিপুল বিক্রমে
ডুবাইয়া দ্বারবতী সমুদ্রের জলে,
সমুদ্র-প্রতিম সৈন্যে প্লাবিতে ভারত।
হস্তিনা হিংসায় মত্ত ক্ষিপ্ত গ্রহ মত
আঘাতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ! ভারত তখন
হইবেক কেন্দ্রভ্রষ্ট, আর রাজ্য যত
গতিভ্রষ্ট গ্রহ মত একে অন্যতরে
আঘাতিবে,—কিবা ঘাত! কিবা প্রতিঘাত!
কি ভীষণ সংঘর্ষণ, বিপ্লব ভীষণ,
ঘটিবে তখন, প্রভো ভাবিতে না পারি।
এ রাষ্ট্রবিপ্লব, এই ঘোর নির্যাতন
জননীর, আত্মহত্যা, সাধুর দুর্দশা,
অসাধুর আধিপত্য, ধর্মের বিলোপ,—
সহিব কেমনে শৈলপ্রতিমূর্তি মত?

ব্যাসদেব

এই এক দিক মাত্র; দিক অন্যতর,
বাসুদেব! এ চিত্রের আরো ভয়ঙ্কর।
শঙ্কিত কুরঙ্গ মত গ্রীবা ঊর্ধ্ব করি
গৃহবাসী বিপ্রগণ, বনবাসী ঋষি,
ঊর্ধ্বকর্ণে তব কার্য করিছে শ্রবণ;
ভ্রাণিতেছে অভিসন্ধি; ভাবিছে বিপ্লব
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্মে, উদ্দেশ্য তোমার,—
তুমি এ বিপ্লবকারী।"—

হাসিয়া কেশব,—

"আমি এ বিপ্লবকারী! মহর্ষি! মহর্ষি!
সরল বৈদিক ধর্ম, পূজা প্রকৃতির,
সারল্য সৌন্দর্য মাখা, আর্য-শৈশবের,
—সে সরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ,—
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত,—

মহর্ষি ! বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা ?
পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্র ঋক্‌, গাই সামগান,
আসিলা ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি ? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহ বা,
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন
কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ বা মস্তক ;
আছিল কি জাতিভেদ ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ,—মূরতি প্রীতির,—
করিতেছে চারিখণ্ড, প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হ'তে অঙ্গান্তরে শোণিতপ্রবাহ,—
মহর্ষি, বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা ?
নাহি দিবে যারা, প্রভো ! ভবিষ্যৎ ব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূরে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা,—
মহর্ষি ! বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা ?

ব্যাসদেব

মানিলাম বাসুদেব ! কিন্তু, বৎস ! বল,
কালের অনন্ত বক্ষ হইতে মুছিয়া
ফেলিবে দুইটি যুগ ? লবে ফিরাইয়া
উত্তর-কুরুতে আর্যজাতি পুনর্বার ?
প্রকৃতির গতি-স্রোত ল'বে ফিরাইয়া
আদিম নির্ঝরে পুনঃ ? করিবে প্রচার
আবার বৈদিক ধর্ম, বৈদিক সমাজ ?

কৃষ্ণ

না, প্রভো, উদ্দেশ্য তাহা নহে কদাচন
এ দাসের। প্রকৃতির ফিরাইবে গতি
নহে সাধ্য মানবের, নহে বিধাতার।
সৃষ্টিরাজ্য নীতিরাজ্য। জানি ভগবান্‌
যথা ওই ক্ষুদ্র ফুল অঙ্কুরিয়া ফুটে,
ফুটিয়া শুকায় বৃন্তে, শুকাইয়া ঝরে,
তথা মানবের আছে শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্ধক্য, মৃত্যু, তেমতি জাতির
মানবের সমাজের, শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্ধক্য, মৃত্যু, আছে নির্বিশেষে।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নীতি সর্বত্র সমান
অলঙ্ঘ্য, অপরিহার্য। শৈশব, সমাজ
হাসে দেখি চন্দ্রমুখ, কাঁদে বজ্রাঘাতে,
কাঁপে ঝটিকায় ত্রাসে। সমাজ কৈশোরে
যাগ, যজ্ঞ, নানা ক্রীড়া। যৌবনে তাহার
শৈশবের হাসি ত্রাসে, কৈশোর ক্রীড়ায়,
ভরে না হৃদয় আর। তখন মানব
দেখে সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, নিয়মের দাস,—
কর্মের শৃঙ্খলে গাঁথা। মানব হৃদয়
হইয়া পিপাসাতুর চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার,
মহান বিজ্ঞান বিশ্ব ! আর্য-সমাজের
শৈশবের সত্য যুগ, ত্রেতা কৈশোরের,
হয়েছে অতীত দেব ; এবে উপস্থিত
যৌবনের যুগান্তর। অভিনেতা তার,—
ব্যাসদেব, কৃষ্ণ, পার্থ। কাটিয়া সঙ্কট,
—বলের যৌবন পার্থ, মহর্ষি জ্ঞানের,
আর্যের জাতীয়-তরী ল'ব ভাসাইয়া
শান্তির বৈকুণ্ঠে সুখে ; আছে প্রসারিত
সম্মুখে কর্মের পথ, শিরে নারায়ণ।

ব্যাসদেব

ভুজবল, জ্ঞানবল ক্ষুদ্র মানবের
বালকের বালুখেলা, দেবকী-নন্দন,
অনন্তের সিন্ধু-তীরে। একটি কুসুম
না পারে ফুটাতে নর, না পারে সৃজিতে
একটি পতঙ্গ, কৃষ্ণ ! একটি জাতির
বিপুল অদৃষ্ট বল গঠিবে কেমনে ?
অশ্রান্ত প্রকৃতি দেবী দুই যুগ ধরি
যেই স্রোত ধীরে ধীরে আনিছে বহিয়া

কেমন রোধিবে তুমি? করিবে বিফল
মানবের জ্ঞানবলে নীতি প্রকৃতির?

কৃষ্ণ

রোধিবে সে স্রোত, শক্তি নাহি মানবের!
জাতীয় জীবন-স্রোত কিন্তু স্বার্থবলে
অনন্ত মরুর দিকে ল'তেছে ঠেলিয়া,
প্রকৃতির গতি, দেব! করি অবরোধ,—
করিব নিষ্ফল তাহা! ল'ব ফিরাইয়া
অনন্ত সিন্ধুর দিকে—নিষ্কাম আমরা,—
সেই সিন্ধু নারায়ণ! সরল সুন্দর
এই প্রকৃতির গতি; অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো! নহে অবনতি!
মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ!
পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে,
অপূর্ণ আমরা, প্রভো! যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে; ল'ব ভাসাইয়া
সমস্ত মানবজাতি উন্নতির পথে!
অনন্ত অভাব-ফল অনন্ত উন্নতি,—
এই মহামন্ত্র, দেব! রয়েছে অঙ্কিত
প্রস্তরে উদ্ভিদে, জীবে মানব-হৃদয়ে,
সর্বত্র অমরাক্ষরে। সৃষ্টির বিজ্ঞান
ঘোষিতেছে এই মন্ত্র। সৃষ্টির যখন
যেরূপ অভাব ঘটে, উন্নতি তেমন।
মানবের দুই যুগ; কিন্তু জগতের
এইরূপে কত যুগ গিয়াছে বহিয়া
কে বলিবে ভগবন্? যুগ-উপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে, মৎস্য। এই নীতিবলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম অবতার।
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,
হইল বরাহ-সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর,
নরসিংহ অবতার। বিস্ময় মূরতি!—
অর্ধ পশু অর্ধ নর! ক্রমে পশুভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানব মূর্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহায়,—
জগৎ অরণ্যময়, হিংস্র জন্তু-বাস!
ঘুরিল উন্নতি-চক্র,—সকুঠার কর
আসিলা পরশুরাম। বাধিল সমর
বন, বনচর সহ। নাহি শরীরেতে
পশুভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,—
পশু-নির্বিশেষে নর! সেই পশুভাব
যে দিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,
সেই দিন জগতের যুগ বর্তমান
হইল সঞ্চার। সেই দিন মহা দিন
প্রকৃত মানব জন্ম হইল সে দিন।
অশ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর,
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি-অবতার,—
ত্রেতার চরমোন্নতি! যৌবন তাহার
আসিবে না ঋষি-শ্রেষ্ঠ? উন্নতির চক্র
সুদর্শন এখানে কি হইল অচল?
না, না, দেব! নাহি তার মুহূর্ত বিশ্রাম।
উন্নতির পথ ছায়া-পথের মতন,
—প্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতাময়,—
রহিয়াছে প্রসারিত; সেই পথে, প্রভো,
জাতীয় জীবন-তরী লব' ভাসাইয়া।

ব্যাসদেব

একক কি তুমি বৎস! পারিবে সাধিতে
বিশ্বব্যাপী এই ব্রত? সাধিবে কেমনে?
সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি ঋষি নির্বিশেষে,
চারি বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি,—অচল অটল
হিমাচল, নহে তাহা বালুকাবন্ধন,
সলিলে কি তাহা কৃষ্ণ যাইবে মিশিয়া?
অনন্ত তোমার জ্ঞান, শক্তি সীমাহীন,
কিন্তু—কিন্তু—বাসুদেব! একটি জাতির
অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া! গ্রহ, তারাগণ

দেশ, কাল, কত মতে অদৃষ্ট নরের
অলক্ষিতে সঞ্চালন করে অহরহ
নাহি জানি, নাহি জানি মানস জগৎ
—দুর্জ্ঞেয় তাহার ক্রীড়া!—করে রূপান্তর
কত মতে; কত মতে অনন্ত সৃষ্টির
অনন্ত অজ্ঞেয় নীতি করে বিলোড়িত
মানব-অদৃষ্ট সিন্ধু; করে সঞ্চালিত
কোন্ মতে, কোন্ পথে। নীর-বিম্ব নর
কেমনে গঠিবে সেই সিন্ধু পরিণাম!

কৃষ্ণ

একক;—একক আমি নহি ভগবান্!
যাহার সহায় স্রষ্টা, বিষ্ণু বিশ্বরূপ,—
নারায়ণ!—একক সে নহে কদাচন।
আমি কে মহর্ষি? আমি—আমরা সকল,—
জগৎ,—তাঁহার অংশ। তাঁর অবতার!
সোঽহং, আমি নারায়ণ। একক ত নহি
আমি একত্ব তাঁহার। সর্বভূতময়
আমি, আমি সর্বপ্রাণী, আমি বিশ্বরূপ!
আমার সে বিশ্বরূপ, দেখ ভগবন্।
দেখ ধনঞ্জয়! দেখ ওই মহাশূন্যে
বিশ্ব-পদ্মে বিশ্বনাথ! দেখ শতদল,—
শত গ্রহ, উপগ্রহ, সবিতৃমণ্ডল!
বিশ্ব-পদ্ম-ব্যাপী দেখ মম অধিষ্ঠান!
বিশ্বের জীবন আমি, আমাতে জীবিত
চরাচর; জন্ম, মৃত্যু স্থিতি-রূপান্তর।
নাহি ব্রহ্মা, নাহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান্!
একমেবাদ্বিতীয়ং—আমি ভগবান্।
দেখ এক করে মম, দেখ সুদর্শন
অনন্ত নীতির চক্র; দেখ অন্য করে
মহাশঙ্খ বিশ্বকণ্ঠ,—অশ্রান্ত কেমন
অনন্ত সে নীতিচক্র করিছে জ্ঞাপন!
সেই মহাশঙ্খ ওই অনন্ত প্লাবিয়া
ডাকিতেছে অবিশ্রান্ত,—"ভ্রান্ত নরগণ!
ত্যজি সর্বধর্ম, লও আমার শরণ!"
আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্মের মন্দির;
ভিত্তি সর্ব-ভূত-হিত; চূড়া সুদর্শন;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম; লক্ষ্য নারায়ণ।
এই সনাতন ধর্ম; এই মহা নীতি,—
ব্যাসদেব জ্ঞানবলে, পার্থ বাহুবলে,
ভারতে, জগতে, কর সর্বত্র প্রচার,
নারায়ণে কর্মফল করি সমর্পণ।
বিনাশিয়া স্বার্থ-জ্ঞান, করিলে নিষ্কাম
সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম, হইবে অচিরে।
খণ্ড এ ভারতে "মহাভারত" স্থাপিত,—
প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময়!
লও এই মহাব্রত!"—

চাহি উর্ধ্বপানে

দাঁড়ায়ে মহিমাময় মূর্তি নারায়ণ,—
বিগলিত অশ্রুধারা, প্রীতির প্রবাহ,
ঝরিছে কপোল বাহি, কহিলা গম্ভীরে—
"লও এই মহাব্রত!" চাহি উর্ধ্বপানে
দেখিলেন ব্যাসার্জুন, গোধূলিতিমিরে।
দীপিছে মহিমাময় কি মূর্তি মহান্!
নহে মানবের তাহা; সুধাংশুকিরণ
করিতে যেন নীলবপু বিকীরণ।
বাহি বাসুদেব আর; দেখিতে দেখিতে
দীপ্তিমান্ বপু যেন হইয়া বর্ধিত
ছাইল এ চরাচর। সবিতৃমণ্ডল
শোভিতেছে পদতলে, শতদল মত,—
অনন্ত অসংখ্য! রাজরাজেশ্বর মূর্তি!
কিবা শোভা সে বদনে! কি জ্যোতিঃ নয়নে!
শোভে করে কিবা শঙ্খ, চক্র সুদর্শন!
অপার্থিব কি আলোক, সঙ্গীত, সৌরভ,
ভাসিছে অনন্ত-ব্যাপী! কিবা অধিষ্ঠান
প্রকৃতিতে পুরুষের—মিলন মহান্!
কি একত্বে পরিণত বিশ্বচরাচর!
"লইলাম মহাব্রত।"—স্থির কণ্ঠে ধীরে
কহিলেন ব্যাসদেব,—আঁখি ছল ছল,

আনন্দে উজ্জ্বল মুখ, হৃদয় নির্মল
প্রীতিপূর্ণ সমুজ্জ্বল। করি করযোড়
ভক্তি-গদগদকণ্ঠে চাহিয়া বিস্ময়ে,
"লইলাম মহাব্রত।"—কহিলা অর্জুন ;
সরিল না কথা আর। আনন্দে তখন
আত্মহারা বাসুদেব বসিয়া ভূতলে
জানু পাতি মধ্যস্থলে। আনন্দে তখন
গলদশ্রু তিন জন পাতি ছয় কর,
গাহিলেন ঊর্ধ্ব নেত্রে পুলকে গম্ভীরে—
"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ;"

অমর ত্রিমূর্তি! দাসে দেও পদধূলি,
পবিত্র চরণামৃত! নয়ন ভরিয়া
দেখিব ত্রিগুণ রূপ, তিষ্ঠ এক পল!
সর্ব-ধ্বংসী মহাকাল বহিছে মস্তকে
যে পবিত্র পদচিহ্ন যুগ-যুগান্তরে,
সেই পদাম্বুজ দাস করিয়া ধারণ
ভক্তিভরে শিরোপর, গাহিবে ভারতে
অক্ষয় কীর্তির গান, অমৃত সমান,
বিহ্বল হৃদয়ে দাস—দেও পদাশ্রয়!
কহ দেবত্রয় দাসে, কহ দয়া করি
সশরীর আবির্ভাব আবার কখন
হইবে ভারতে? কহ হবে কি কখন?
নারায়ণ নরোত্তম! কহ দয়া করি
তবে ভাগবত, প্রভো! হবে কি বিফল?—
"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
"অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
"ধর্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
পূর্ণ কাল; পূর্ণব্রহ্ম; আসিবে কখন?

ত্রয়োদশ সর্গ

দুর্বাসার দৌত্য

নিমীলিত দু' নয়ন অপরাহ্ণে বলরাম,
বলদেব বল-অবতার
সুকোমল উপাধানে হেলাইয়া মহাবপু,—
কি সৌন্দর্য মহিমা আধার!—
অপরাহ্ণ-রবিকরে শোভিছে ঝলসি যেন
হিমাদ্রির শিখর তুষার।
কিবা সে বিশাল বক্ষ, কি বিশাল দুই ভুজ
কি বিশাল ললাট-গগন!
চন্দনে চর্চিত বপু, গলায় ফুলের মালা,
পরিধান কৌষিক বসন।
শিরে, সুরধুনী মত বিরাজিতা কাদম্বরী;—
কি রঙ্গ তরঙ্গ তাহার!
কি সুখ-তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে হৃদয়েতে,—
ঢল ঢল সুখ-পারাবার!
এইরূপে নিরজনে বসি, নিমীলিত-আঁখি,
ভাবিছে কি রেবতী-রমণ
রেবতীর মুখশশী? কিম্বা কত সুধারাশি
কাদম্বরী করেন বহন?
নাহি জানি। অকস্মাৎ থক্ থক্ থক্ থক্
সম্মুখেতে ধ্বনিল কর্কশ;
সুখভঙ্গে হলায়ুধ, বিস্তৃত পলাশ-আঁখি
মেলিলেন ক্রোধেতে অবশ।
কোথায় বা মুখশশী? কোথায় বা সুধারাশি,
কাদম্বরী-তরঙ্গ তরল?
সম্মুখে বিকট মূর্তি,— কাশিছে বিকট কাশি,
কাশিরই তরঙ্গ কেবল।
উঠিয়া বিরক্তিভরে প্রণমিল বলরাম,
—কৃষ্ণ মূর্তি বসিল যখন,—
কহিলা,—
"কি ভাগ্য আজি! কি পুণ্যে, কোথায় হ'তে
মহর্ষির হলো আগমন?"
দুর্বাসা স্বগত কহে,— "পুণ্য বড় মিথ্যা নহে—
কি দুর্গন্ধ রাম! রাম! রাম!
পুণ্য বিনা আসে কভু, দুর্বাসা নরকে হেন,
নরাধম মদ্যপায়ী-স্থান।"
পুনঃ কাশি ছল কাশি, প্রকাশ্যে কহিলা ঋষি—
"কোথায় হইতে বলরাম?"—
থক্ থক্ থক্ পুনঃ— "ঋষি আমি, বনচর,
রাজ্যধন নাহি ত আমার,
যথায় তথায় যাই, যাগযজ্ঞ-ব্যবসায়ী,—
কোথা হ'তে আসিব আবার?"

বলরাম (স্বগত)

কি উৎপাত, ভগবান্, করিতেছিনু আরাম,
মধ্যাহ্নে বসিয়া মন-সুখে,
একি এক বিড়ম্বনা! থক্থকানি কি যন্ত্রণা!
নিশ্বাস কি নাহি ঠেকে বুকে?
পূতিগন্ধে যায় প্রাণ,—নাহি সুরাপাত্র কাছে,—
শ্মশানের গন্ধে ভরপুর।
যে গন্ধ লেগেছে নাকে, ছয় মাসে নাহি যাবে,
কেমনে এ পাপ করি দূর!
(প্রকাশ্যে) পীড়িত কি ভগবান্?

দুর্বাসা (স্বগত)

ভগবান মুণ্ড খান,
তোমার বংশের শতবার।
তব বংশ-পিণ্ডদান না দেখি ভরিয়া প্রাণ,
ভগবান নহে মরিবার!
(প্রকাশ্যে)
ব্যাধির মন্দির দেহ— থক্ থক্ থকাথক—
কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম—

হইলাম বিস্মরণ,— কোথা হ'তে আগমন ?
সর্বত্র হইতে, কিন্তু রাম !
যথায় তথায় যাই, সর্বত্র শুনিতে পাই
অদ্ভুত তোমার কীর্তিগান।
রূপের তুলনা নাই, বলে তুমি অবতার,
ভুজবলে সর্বশক্তিমান।
তব নামে সুরনর কাঁপে, রাম, নিরন্তর ;
তব বীর্য জলন্ত-পাবক।
সর্বত্র এরূপ শুনি, অপরূপ কীর্তি তব,
কেবল কেবল—থক্ থক্ !
আশুতোষ বলরাম, তোষামোদে তুষ্টপ্রাণ,
কাদম্বরী-কৃপায় তরল ;
বিস্ফারি অরুণ আঁখি, জিজ্ঞাসিলা সবিস্ময়ে,—
"কেবল—কি ? মহর্ষি—কেবল ?"

দুর্বাসা

কেবল, কেবল, রাম ! ইন্দ্রপ্রস্থে শুনিলাম
যেই নিন্দা হয় কণ্ঠরোধ,—

বলরাম

কি বলিলে, তপোধন ? ইন্দ্রপ্রস্থে নিন্দা মম ?
ইন্দ্রপ্রস্থে ?—পাণ্ডব নির্বোধ !

দুর্বাসা

কথায় কথায় আমি কহিলাম ধরাতলে
ভুজবলে অদ্বিতীয় রাম।
হাসি কহে বৃকোদর— 'পঙ্গু তুমি, তব কাছে
সঙ্কর্ষণ মহা বলবান।
কোথা ছিল সেই বল জরাসন্ধ-ভয়ে যবে
পশ্চিম সমুদ্রে দিল ঝাঁপ ?"
ক্রোধে অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল মম,
দিতেছিনু ঘোর অভিশাপ,
যুধিষ্ঠির পায়ে ধরি, বলিল বিনয় করি,—
"বালকের ক্ষম অপরাধ !"

বলরাম

অন্ধ ভীম দুরাচার ! তার এই অহঙ্কার।
ইন্দ্রপ্রস্থে মম নিন্দাবাদ !
শিমূলের স্তূপে অগ্নি হইল বিক্ষিপ্ত যেন,
বলদেব দীপ্ত হুতাশন !
ক্ষিপ্ত গ্রহ মত কক্ষে ছুটিতে লাগিলা ক্রোধে,
দন্তে দন্ত করিয়া ঘর্ষণ,—
"এই দণ্ডে ইন্দ্রপ্রস্থ, গ্রাসিব রাহুর মত,
উপাড়িয়া যমুনার জলে
ফেলিব লাঙ্গল-বলে বল্মীকের স্তূপ যেন,
দেখিব কে রাখে ধরাতলে।"

দুর্বাসা

অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায়, চলিলাম হস্তিনায় ;
রাজচক্রবর্তী দুর্যোধন,
কত মতে ভক্তিভরে, জিজ্ঞাসিল বারবার,—
"গুরুদেব আছেন কেমন ?"
জাহ্নবী-স্রোতের মত, তব স্তুতিগান কত
গাহিলেন গান্ধারী-তনয় ;
অবশেষে হলায়ুধ ! করিল এ নিবেদন,
বহুমতে করিয়া বিনয়,—
"কর যদি ঋষিবর ! রৈবতকে পদার্পণ,
বলদেবে চরণে প্রণাম
বলিও দাসের, প্রভু ! চিরদিন এই দাস
সেই পদে পায় যেন স্থান।
পবিত্র করিতে কুল দুর্যোধন অকিঞ্চন
চাহে পদে এক ভিক্ষা আর,—
হয় যদি অভিমত, মাগিবে সে পদাম্বুজে,
সুভদ্রার পাণি-উপহার।"
এখন শুনিলে সব ;— থক্ থক্ থক্ থক্—
করি দুই সন্দেশ বহন,

হস্তিনায় বাক্‌-দান, ইন্দ্রপ্রস্থ-অপমান,
রৈবতকে মম আগমন।

বলরাম

জানি আমি দুর্যোধন, মম ভক্তিপরায়ণ,
কৃপা করি, মহর্ষি! সত্বরে
আন দুর্যোধনে, আগে সুভদ্রা করিব দান,
ইন্দ্রপ্রস্থে দিব দণ্ড পরে।
প্রহরি! প্রহরি!—
রাম ডাকিলেন গরজিয়া;
আসিল প্রহরী এক জন।
প্রকম্পিত কলেবরে— "কৃষ্ণ"—এই কথামাত্র
বলদেব করিলা গর্জন।
কৃষ্ণ মুহূর্ত্তেক পরে প্রবেশিলে কক্ষে ধীরে,
কহিলেন, ক্রোধরুদ্ধ স্বর,—
"এই দণ্ডে আয়োজন,— মম শিষ্য দুর্যোধনে
সমর্পিব সুভদ্রার কর।"

দুর্ব্বাসা (স্বগত)

কি পাপ! দেখিবামাত্র, কাঁপিতেছে মম গাত্র;
নাহি জানি কি যে ইন্দ্রজাল
জানে এই দুরাচার, দেখিয়া আমারো মনে
উপজিছে ভক্তি, কি জঞ্জাল!

কৃষ্ণ

আজ্ঞা শিরোধার্য মম, কিন্তু, দেব! এ কেমন?
ব্যস্ততার কর্ম্ম এ তো নয়।
রয়েছেন গুরুজন, তাঁহাদের অভিমত
জানা কি উচিত, দাদা! নয়?

বলরাম

গুরুজন! গুরুজন! চিরকাল গুরুজন!
চিরকাল! এই তর্কজাল!
না শুনিব কারো কথা, বিলম্ব কাহারো তরে
করিব না তিলার্দ্ধেক কাল,

কৃষ্ণ

যদি বীর ধনঞ্জয় ভদ্রা-পাণি-প্রার্থী হয়,
অতিথির হবে অপমান।

বলরাম

নাহি দিব কদাচন; করি নাহি হেন পণ
অতিথিরে ভগ্নী দিব দান।

কৃষ্ণ

রোষিবে পাণ্ডবগণ, দোষিবে যাদবকুল,—

বলরাম

উভয়ে পাঠাব রসাতল।
কেবল পাণ্ডবগণ নিরন্তর তব মুখে!
অতি তুচ্ছ পাণ্ডব সকল।
সবে মাত্র পঞ্চজন, শত ভাই দুর্যোধন,—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ দাস।
পাণ্ডবের এক গ্রাম, ব্যাপী এই ধরাধাম
কৌরবের সাম্রাজ্য প্রকাশ!
পাণ্ডব বনের পশু, আজীবন ভ্রমি বনে
পশুত্বই শিখেছে কেবল।
আজীবন চক্রবর্ত্তী দুর্যোধন মহামতি,
মম শিষ্য খ্যাত ধরাতল।
তুলনা কাঞ্চনে কাচে, পুনঃ যদি মম কাছে,
করিস্‌ এরূপে অনুচিত,
এই মুষ্ট্যাঘাতে ক্রূর! করিব মস্তক তোর
রৈবতক সহিত চূর্ণিত।
(ক্ষেপিয়া নিকটে গিয়া, ভীম মুষ্টি দেখাইয়া
পদ দুই হইয়া অন্তর,)—
কৃপা করি ঋষিশ্রেষ্ঠ! কহিবেন দুর্যোধনে
রৈবতকে আসিতে সত্বর।

ঋষিশ্রেষ্ঠ এতক্ষণ বসিয়া নীরবে সায়
দিতেছিলা,—কৌতুক দর্শন!
দাঁড়াইলা যষ্টি করে,—ধনুতে চড়িল গুণ,—
মুষ্টির আকারে ভীত মন।

কৃষ্ণ

কিন্তু ভদ্রা বরে যদি ধনঞ্জয় বীর-নিধি
কি সঙ্কট হইবে তখন!

বলরাম

আর বার ধনঞ্জয় ? একটি বালিকা ক্ষুদ্র
বিফলিবে বলভদ্র পণ ?
(তুলি ভীম উপাধান শিরোপরে শক্তিমান,
মহা ক্রোধে করিয়া গর্জন,)
টলে যদি প্রভাকর, টলে যদি শশধর,
টলিবে না বলভদ্র-পণ।

নিক্ষেপিয়া উপাধান, করিলা প্রস্থান রাম,
কক্ষে যেন হলো বজ্রাঘাত ;
ধমকেতে তপোধন, হইলা সকুব্জ যষ্টি,
একেবারে ভূতলে পপাত।

হাসিয়া ঈষৎ কৃষ্ণ, তুলিলা কৌতুকমূর্তি,
অস্থির পঞ্জর ধনুখান ;
"রাম! রাম! রাম"—বলি, সকাশি সকুব্জ যষ্টি
ধীরে ধীরে করিলা প্রস্থান।
"কি বিপদ!"—হাসি কৃষ্ণ, কহিলা স্বগত কণ্ঠে,—
"দাদার ত এই কার্য নয়,
শিরে যেই মহাদেবী রয়েছেন বিরাজিতা,
তাঁর কীর্তি এই সমুদয়!
যা হ'ক এ মন্দ নয়, পাব ভাল পরিচয়,
অর্জুনের কত ভুজবল,
নিজে তুমি! ভগবান! যোগাইছে উপাদান,
তব কার্য সকলি মঙ্গল!"

চতুর্দ্দশ সর্গ

ঊর্ণনাভ

জরৎকার-নামধারী মহর্ষি দুর্বাসা
বসি নাগপুর-কক্ষে। কুঞ্চিত অধরে
কুঞ্চিত কুটিল হাসি আছে লুকাইয়া,
অর্দ্ধসুপ্ত ফণী যেন। সম্মুখে বাসুকি
অধোমুখে চিন্তামগ্ন বসিয়া নীরবে।
বন্য-পশু শির, শৃঙ্গ, শোভিছে ভীষণ
প্রাচীরের স্থানে স্থানে; শোভে স্থানে স্থানে
মৃগয়ার সাংঘাতিক অস্ত্র নানাবিধ
মিশি সমরাস্ত্র সহ; খেলে ছায়া কক্ষে
প্রেতযোনি-ক্রীড়া যেন ক্ষীণ দীপালোকে।

জরৎকারু

নিরুত্তর মৌনভাবে রহিয়াছ তুমি
বাসুকি! নাগেন্দ্র তুমি এই দীপালোকে
দেখিছ এ কক্ষ যথা, পারি দেখিবারে
যোগালোকে আমি এই বিশ্ব চরাচর।
বিশ্বের ঘটনাস্রোত পারি দেখিবারে
কোন্ মতে, কোন্ পথে, বহিছে কোথায়।
কোন্ মতে, কোন্ পথে, গ্রহ তারাগণ
ছুটিতেছে মহাশূন্যে, বহিতেছে বারি
সরিৎ সাগরগর্ভে, পারি মানবের
দেখিতে নিভৃততম কক্ষ হৃদয়ের।

বাসুকি

আমি সেই দস্যুপতি!

জরৎকারু

পাপের স্বীকার,
অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত তার! গুরুতর পাপ
ব্রতচারী অনূঢ়ার প্রতি অত্যাচার।

বাসুকি

পাপ যত অনার্য্যের,—শুনি হাসি পায়!
যথা তথা ভুজবলে কুমারী হরণ,
স্বজনশোণিতে লিখি প্রণয়কাহিনী,—
আর্য্যের বীরত্ব, পুণ্য!—পাপ অনার্য্যের!

জরৎকারু

আর্য্যের ধর্ম্ম তাহা, আছে শাস্ত্রবিধি।
স্বধর্ম্মপালনে নাহি পাপ, নাগপতি!

বাসুকি

হা ধর্ম্ম! তুমিও তবে দুই মূর্ত্তি ধর?
এক মূর্ত্তি অনার্য্যের, দ্বিতীয় আর্য্যের?

জরৎকারু

জাতিভেদে ধর্ম্মভেদ ঘটিবে নিশ্চয়,—
নহে বিস্ময়ের কথা। পক্ষীর যে ধর্ম্ম
নহে পশুদের তাহা; ধর্ম্ম উদ্ভিদের,
খাটিবে না কোন মতে খনিজে কখন।
স্থলচরে জলচরে কত ধর্ম্মান্তর।

বাসুকি

তর্কজালে বিজড়িত হেন শাস্ত্র, ঋষি,
কর গিয়া ওই সিন্ধুনদে বিসর্জন।
সকল অনার্য জাতি আমরা সকল,
সকল মানবে ঋষি নিরখি সমান।
কেবল একই ভেদ,—রাজায় প্রজায়।

জরৎকারু

থাক অনার্য্যের ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসি বাসুকি,
প্রতিজ্ঞাপালন কিহে তব ধর্ম্ম নহে?
অনার্য্যের প্রতিজ্ঞা কি সলিল-লিখন?

বাসুকি

অনার্য্যের প্রতিশ্রুতি লিপি প্রস্তরের,—
ওই বিন্ধ্যাচল সম সতত অটল;
অনিবার্য গতি যেন সিন্ধুর প্রবাহ।

জরৎকারু

বহে কি উজান সিন্ধু প্রবাহের মত?

বাসুকি

ব্রাহ্মণ!

জরৎকারু

—মহর্ষি। ক্রোধ নিবার, বাসুকি
কি ছিল প্রতিজ্ঞা তব? হরিতে অনূঢ়া
আছিলে কি প্রতিশ্রুত? হরিলে সুভদ্রা
যাবে কি ক্ষত্রিয়কুল ভারত ছাড়িয়া?
হইবে কি অনার্যের সাম্রাজ্য-উদ্ধার
নারী-চৌর্যব্রতে? ছি! ছি! হা ধিক বাসুকি!
আমি ভাবিতেছি তুমি যুথরাজ মত
ভ্রমিতেছ বনে বনে; বনে বনে তুমি
অনার্যের যুথদল করিয়া দীক্ষিত
মহামন্ত্রে, জ্বালাইছ ভীম দাবানল
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়-রাজ্য। হা ধিক্ বাসুকি!
তুমি কোথা মদকল মাতঙ্গের মত
ঝাঁপ দিয়া নীচ চৌর্য-পঙ্কিল-সলিলে
হরিতেছ,—নহে রাজ্য,—সতীত্ব-মৃণাল
নারীর পাশব বলে। ছি! ছি! নাগরাজ
এ ছিল প্রতিজ্ঞা তব?

বাসুকি

কর-ধৃত যষ্টি
নহি আমি ঋষি! তব; ঘুরিব ফিরিব,
ঘুরাইবে, ফিরাইবে, তুমি যেইরূপে।
নহে তব শুষ্ক যষ্টি মানব-হৃদয়।
তাহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত পিপাসা।
নহে মৃত্তিকার সৃষ্টি, যথা ইচ্ছা তুমি
গড়িবে ভাঙ্গিবে। নাহি ইচ্ছার শকতি
রোধিতে তাহার গতি সর্বত্র সমান।
সাম্রাজ্যও নাহি পারে করিতে পূরণ
সকল পিপাসা তার; প্রণয়-পিপাসা,
ঋষি! পারে না কখন। উভয়ে আমরা
বনবাসী, কিন্তু বন-শুষ্ক কাষ্ঠ তুমি,
আমি মহা মহীরুহ। তুমি ত নিষ্ফল,
পুষ্প-ফল-আশা-মত্ত যৌবন আমার।
মানি রাজ্য-আশা মম হৃদয়ে প্রবল
কিন্তু যে প্রবলতর সুভদ্রার আশা!
পার যদি যোগবলে দেও হে বলিয়া,—
পড়িব চরণে তব,—কোন মতে যদি
পারি দুই রাজ্য ঋষি করিতে উদ্ধার।
না পার, সাম্রাজ্য-আশা পারি ছাড়িবারে;
সুভদ্রার আশা নহে জীয়ন্তে কখন।

জরৎকারু

নহে যে অদমনীয় মানব-হৃদয়,
জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমি সম্মুখে তোমার,
নাগেন্দ্র, বালকগণ যেই মৃত্তিকায়
ক্রীড়ার পুতুল গড়ে, সেই মৃত্তিকায়
দেব-দেবী মূর্তি করি আমরা নির্মাণ।
একই কানন, দেখ করি পুণ্যাশ্রম
আমরা, তোমরা কর হিংস্র-জন্তু-বাস।
একই হৃদয়, শূন্য ইন্দ্রিয়-লালসা
আমাদের; পরিপূর্ণ বাসনা-অনলে
তোমাদের! জরৎকারু-পরিণয় মম
ব্রত উদ্ধারের তরে। ভদ্রার প্রণয়,
তব ব্রত নাগপতি! ধ্বংসের কারণ!

বাসুকি

শরীরের কোন্ অংশ মানব-হৃদয়,
কহ ঋষি! কাটি তাহা কৃপাণে এখনি
নিক্ষেপি সম্মুখে তব জ্বলন্ত অনলে।
নহে চক্ষে, ঋষিবর! মুদিলে নয়ন
নিরখি ভদ্রার রূপ। নহে বক্ষে, অস্ত্রে
বিদীর্ণ যখন বক্ষ দেখেছি সেরূপ
অস্ত্রক্ষতে করিতেছে জ্যোছনা-বর্ষণ
নিরমল, সুশীতল। নহে কোনো অঙ্গে,
অবশ যখন দেহ মূর্ছায়, নিদ্রায়,
অতুলিত সেইরূপ দেখিছি স্বপন।
ক্ষুদ্র মানবের দেহে কোথা এ হৃদয়,—
অনিবার্য বেগে যার যেতেছি ভাসিয়া
অরণ্য-কেশরী আমি তৃণের মতন?

ঋষিবর! ঋষিবর! চাহিয়াছি আমি
পোড়াইতে ক্রোধানলে, করিতে পেষণ
অভিমানে সে হৃদয়, করিতে ছেদন
অপমান অসিধারে;—হয়েছি নিষ্ফল।

জরৎকারু

সাবধান নাগরাজ! করেছে বিস্তার
উর্ণনাভ যেই জাল অপূর্ব কৌশলে
দিও না তাহাতে ঝাঁপ। ভদ্রা-প্রলোভনে
এক দিকে অসতর্ক ফেলিয়া তোমারে
খেলিতেছে ইচ্ছামত। করেছে নির্বিষ
এই মন্ত্রে নাগেশ্বরে। দেখ অন্য দিকে
সেই প্রলোভনে মোহি মধ্যম পাণ্ডবে,
দুইটি বিপুল কুল যাদব পাণ্ডব
বাঁধিতেছে অনশ্বর প্রণয়-বন্ধনে।
ক্ষত্রিয়ের দুই ভুজ মিলি এইরূপে
তুলিবে যে ভীম অসি, মিলিবে যখন
পঞ্চ-ভুজ সিন্ধুনদে দুর্বার-বিক্রমে
শতভুজা শক্তীশ্বরা বিপুলা জাহ্নবী,—
মিশ্রিত, বর্ধিত সেই ক্ষত্রিয়-প্রবাহ,
কে বল রোধিবে, নাগ?

বাসুকি

কি দারুণ চক্র!
সরল কানন-চর বুঝিব কেমনে
এমন কুটিল-তত্ত্ব। হা কৃষ্ণ! শুনেছি
বিষ্ণু-অবতার তুমি। এই সর্বগ্রাসী
সর্বধ্বংসী ক্রূরনীতি সত্য কি তোমার?
দেখিতেছি দিব্য-চক্ষে, মহাকাল যেন
সর্ব-সংহারক গ্রাস করিয়া বিস্তার
আসিছে গ্রাসিতে যত অনার্য দুর্বল!
কে রক্ষিবে ইহাদের?

জরৎকারু

বলেছি, বাসুকি!
চিন নাই তুমি সেই চক্রী দুরাচার,—
পাপ অবতার! কিন্তু চক্র বিফলিব,
কণ্টকে কণ্টক আমি করিব উদ্ধার।
নিবাইব প্রজ্বলিত তব ঈর্ষ্যানল।
বরিষিয়া প্রতিহিংসা বারি সুশীতল!

বাসুকি

বিফলিবে!—অসম্ভব। মম ঈর্ষ্যানল
নিবাইবে ব্রতচারী ঋষির কঙ্কাল।
নিশ্চয় প্রলাপ সব,—বৃথা বিড়ম্বনা!

জরৎকারু

'অসম্ভব' কথা নাহি মম অভিধানে।
ঋষিরা প্রলাপী নহে। আমার কৌশলে
প্রতিশ্রুত বলরাম করিতে প্রদান
দুর্যোধন-করে তব প্রেমের প্রতিমা।
না হইতে অস্তমিত পূর্ণিমা রজনী
পূর্ণ-শশধর সহ, রাহু দুর্যোধন
গ্রাসিবেক পূর্ণচন্দ্র ভদ্রার বদন।

বাসুকি

নৃশংস! নারকি! চক্রি! লভিবি কি ফল
নির্দোষী নারীরে আহা। বধি এইরূপে?
পারি বসাইতে অসি কৃষ্ণের হৃদয়ে,
দ্বিগুণ আহ্লাদভরে বক্ষে অর্জুনের,—
প্রতিযোগী, কিন্তু ঋষি কেশাগ্র ভদ্রার
পরশিবে যেই জন,—শত্রু বাসুকির
সেই জন, ধরাতলে নাহি তার স্থান।
বনের বর্বর আমি, তথাপি না পারি
দেখিতে একটি অশ্রু রমণী-নয়নে,
ভদ্রার বিষাদ মূর্তি সহিব কেমনে?
বনের বর্বর আমি, অযোগ্য তাহার
জানি আমি, তথাপিও দক্ষিণে তাহার
দেখি যদি রুদ্রদেবে ফাটিবে হৃদয়,
নরাধম দুর্যোধনে দেখিব কেমনে?
মরি সে কিশোরী মূর্তি! কৌমুদী-নির্মাণ,—
সুখের স্বপন-সৃষ্টি! কি শান্তি মাধুরী
ভাসে বিস্ফারিত নেত্রে, করে বরিষণ
সরলতা, কোমলতা, কিবা পবিত্রতা,—

প্রতি পদসঞ্চালনে। আত্মহারা আমি
বসিয়া, মহর্ষি! সেই শান্তিচন্দ্রিকায়
দেখিয়াছি কত স্বপ্ন। কত স্বর্গ! কত—
না, না, ঋষি, পারিব না দেখিতে নয়নে,—
আমার শশাঙ্ক অঙ্কে ধরিবে যে জন
নিবাইব আমি তপ্ত শোণিতে তাহার
প্রণয়-পিপাসা মম, মরুময় প্রাণ।

জরৎকারু

স্থির হও নাগপতি। নাহি চাহি আমি
সমর্পিতে সুভদ্রায় শার্দুলের করে,—
দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে। একই বাসনা
ক্ষত্রিয়বিনাশ মম। ভেবেছ কি মনে,
যেই দিন দুর্য্যোধন দিবে দরশন
দ্বারকার দ্বারদেশে, ভেবেছ কি মনে
সিন্ধুতীরে কি অনল উঠিবে জ্বলিয়া?
অপমানে গরজিয়া উঠিবে ফাল্গুনী
দলিত ভুজঙ্গ মত, মন্ত্রবদ্ধ ফণী
বাসুদেব, নিরখিয়া আশা-কাননের
এরূপে অঙ্কুরে নাশ, কি বিষ-নিশ্বাস
করিবে নির্গত ক্রোধে! কৌরবে পাণ্ডবে
বাজিবে তুমুল রণ। গৃহ-ভেদ-খড়্গে
যদুকুল কলেবর হইয়া ছেদিত,
দেবে যোগ দুই দিকে, হইবে লোহিত
ক্ষত্রিয়ের তপ্তরক্তে কৃষ্ণ পারাবার;
পড়িবেক ঊর্ণনাভ আপনার জালে!
ভারতের রাজলক্ষ্মী সুভদ্রার সহ
আসিবেন অঙ্কে তব, হইবে সফল
মম গুরু দুর্ব্বাসার ঘোর অভিশাপ।

বাসুকি

ব্রাহ্মণ, আশার মন্ত্রে মুগ্ধ এত দূর
হইও না, করিও না আকাশে নির্ম্মাণ
হেন মহা-দুর্গ। নহে বালকের ক্রীড়া
কৃষ্ণের মন্ত্রণা।

জরৎকারু

নাহি হয়, ক্ষতি কিবা?
না পায় সুভদ্রা যদি ঘোর অপমানে,
প্রত্যাখ্যানে, যেই মহা শত্রুতা-অনল
জ্বলন্ত নরক-নিভ দুর্য্যোধন-বুকে
জ্বলিবেক, অনির্ব্বাণ সেই বৈশ্বানর।
এক দিন, দুই দিন, তিন দিন পরে,
কিম্বা যুগযুগান্তরে,—অতি ক্ষুদ্র কাল
আমাদের মহাব্রত করিতে সাধন,—
জ্বালাইয়া সেই অগ্নি সমর-অনল
ভস্মিবে ক্ষত্রিয়-রাজ্য তৃণস্তূপ মত।
সমগ্র অনার্য জাতি এই অবসরে
বাঁধি দৃঢ় সন্ধিসূত্রে, তুলিব যে ঝড়
বসুন্ধরা-বক্ষ হ'তে সেই ভস্মরাশি,
নাগেন্দ্র, ফুৎকারে মাত্র দিব উড়াইয়া।
চলিলাম হস্তিনায় প্রেম-দৌত্য-ব্রতে,—
আনিতে ভদ্রার বর, তুমি কর হেথা
উচিত বাসর-সজ্জা উৎসবে মাতিয়া।

পঞ্চদশ সর্গ

গঙ্গা-যমুনা

দীর্ঘ দিবা অবসান ; রৈবতক পুরোন্তানে
শোভিতেছে সায়াহ্ন কিরণে,
সুবর্ণমণ্ডিত যেন,— কারুকার্য ছায়াগণ,—
মণি মুক্তা কুসুম রতনে।
চূড়ান্ত ফুটিয়া ফুল, ঝর ঝর ঝর কেহ,
পড়িয়াছে কেহ বা ঝরিয়া।
ফুল-বনে দুই ফুল, রুক্মিণী ও সত্যভামা
রহিয়াছে অঝর ফুটিয়া।
একাসনে দুই জন রুক্মিণী সুবর্ণময়ী,
অস্তগামী ভানুর কিরণ ;
তপ্ত স্বর্ণ সত্যভামা, অস্তগামী রবিকরে
সুরঞ্জিত জলদ বরণ।

রুক্মিণী

কি ঘোর সঙ্কট, দিদি, হলো এবে সংঘটন
কিছুই যে ভাবিয়া না পাই।
দেখি সুভদ্রার মুখ মরমে যে পাই ব্যথা
সুভদ্রা সুভদ্রা আর নাই।
যদিও প্রসন্ন মুখ রাখে ভদ্রা পূর্বমত,
সেইরূপে শান্তির প্রতিমা,
তথাপি হৃদয় তার, কি যে করিতেছে, আহা!
সে দুঃখের নাহি বুঝি সীমা।

সত্যভামা

তোর যে হৃদয় জল সর্বদাই টল্ টল্
যথা তথা পড়ে গড়াইয়া।
আকাশে মলিন মেঘ দেখিলে, অভাগী তুই
মরমেতে মরিস্ কাঁদিয়া।
নাহি শক্তি দাঁড়াবার, নাহি শক্তি রোধিবার
তুই যেন মোমের পুতুল!
অবিরত পরদুঃখ, অবিরত অশ্রুজল,
নিরন্তর কাঁদিয়া আকুল।

কেন ? কি হয়েছে বল ? সুভদ্রার কোন্ দুঃখ ?
রাজচক্রবর্তী দুর্যোধন,
মিলিয়াছে বর তার,— বল কোথা পতি আর
মিলিবেক দাদার মতন ?

রুক্মিণী

তুমি কি ভদ্রার মন পার নাহি বুঝিবারে ?
ভদ্রা ধনঞ্জয়-গত প্রাণ।

সত্যভামা

ভগ্নীও ভ্রাতার মত, কথায় কথায় কেন
করে হেন পরে প্রাণ-দান ?

রুক্মিণী

তাহা বড় মিথ্যা নয়, ভগিনী ভ্রাতার মত,
কি পবিত্র উভয় হৃদয়।
উভয় অমৃতে ভরা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
কি মহিমা, কি দেবত্বময়!
সুভদ্রা রমণী-কৃষ্ণ, রমণীর পূর্ণ-সৃষ্টি,
সব্যসাচী যোগ্য পতি তার।
পূর্ণ নরনারী রূপ মিলেছিল অপরূপ,
কেন এই বাদ বিধাতার।

সত্যভামা

বিধাতা চুলোয় যাক্। এমন যোটক যদি,—
পূর্ণ-নর লইয়া মাথায়,
কেন সে রমণী-কৃষ্ণ নাহি যায় পলাইয়া,
বিধাতা ত পথে না দাঁড়ায় ?
ভগ্নী ত ভ্রাতার যোগ্যা ; ভ্রাতার সে চুরি বিদ্যা,
নাহি করে কেন অনুসার ?
ভ্রাতা করে নারী-চুরি ; ভগ্নী হাতে দিয়ে তুরী,
করুক পুরুষ সুখে পার।
"চুরি! ছি ছি"!—জিভ কাটি কহেন ভীষ্মক-সুতা,
লজ্জায় অরুণ মুখখানি—

"সত্ত্ব যে পাগল তুই, এমন বলিতে নেই,
পত্নীর পরম দেব স্বামী।
কৈশোর হইতে আমি শুনি, দিদি, কৃষ্ণনাম,
রেখেছিনু লিখিয়া হৃদয়ে ;
যৌবন হইতে ধ্যান করিয়াছি সেই নাম,
চাহিয়াছি চরণে আশ্রয়।
পদ্মিনী সবিতা সেবি, জোনাকির করে প্রাণ
সমর্পণ করে কি কখন ?
রুক্মিণীর হৃদয়েতে সমুদিত যেই রবি
শত সূর্য না হয় তুলন।
বিক্রীত চরণে প্রাণ, তাহাতে মাগিনু স্থান,
করিলাম আত্ম-সমর্পণ ;
করুণার সিন্ধু নাথ, হৃদে উপজিল দয়া,
এ দাসীরে করিলা হরণ।

সত্যভামা

তুই দিদি বড় হাবি, এমন সুলভ দরে
বেচিতে কি আছে নারী-প্রাণ ?
আমি হলে দেখাতাম কেমন সে বাঁকা শ্যাম,—
কি করিব, পিতা দিলা দান।

রুক্মিণী

সুলভ সে পদছায়া!— কি বলিস্ সত্যভামা ?
ভাগ্যবতী আমরা দু'জন।
জগতে পূজিত সেই পতিতপাবন পদ
পারি হৃদে করিতে ধারণ।
নহে শত সত্যভামা, রুক্মিণী সহস্র শত,
তার এক ধূলির সমান।
একটি চরণ-রেণু পড়ে যথা, সেই স্থান
জগতের মহাতীর্থধাম।

সত্যভামা

থাক সেই গুণগান, 'হরণই' মানিলাম,
পার্থ কেন করে না হরণ
সেইরূপে সুভদ্রায় ? তবে ত মিটিয়া যায়
এই প্রেম সঙ্কট বিষম।

রুক্মিণী

কেশবের প্রিয়তমা ভগ্নী, শিষ্যা অনুপমা,
নখাগ্রও পরশিবে তার,—
করে চক্র সুদর্শন যেই সুধা সংরক্ষণ,
হরিবে এমন সাধ্য কার ?
তবে যদি অনুকূল হন প্রভু দয়াময়,—
তাতেও ফলিবে কিবা ফল ?

সত্যভামা

ওই সিন্ধু তীর মত, আছে কৌরবের কত,
মহারথী সমরে অটল।
হেন বীর্য-পারাবার আছে কোথা বল দিদি,
সেই বেলা করিবে লঙ্ঘন ?

রুক্মিণী

আছে এই রৈবতকে ; দেখ নাহি তুমি কি হে
নারায়ণী সেনার বিক্রম ?

সত্যভামা

দেখিয়াছি ; কিন্তু রাম- প্রতিকূলে অস্ত্র, দিদি
তাহারা কি করিবে ধারণ ?

রুক্মিণী

যাক নারায়ণী সেনা, কি ভয় অভয় যদি
দেন পার্থে নিজে নারায়ণ।
অগণন মৃগগণে বল কিবা প্রয়োজন,
সহায় কেশরী নিজে যার ?
নিজে প্রভাকর যদি করে প্রভা-বিকীরণ
প্রতিবিম্ব কেবা চাহে তার ?

সত্যভামা

তোমার সে নারায়ণ! তিনি কি কখন পণ
করিবেন বিফল ভ্রাতার ?

রুক্মিণী

সত্য কথা, মূর্খা আমি, ভাবি নাহি এতখানি,
সে যে বড় বিষম ব্যাপার !
পৌর নরনারী যত সাধিয়াছে কত মত,—
ক্রোধে অগ্নিমূর্তি বলরাম।

যত সাধে বাড়ে ক্রোধ, কহেন গর্জিয়া তত—
"কথা মম না হইবে আন।"
তবে, বোন, সুভদ্রার নাহি কি নিস্তার আর,
(মহিষীর ভিজিল নয়ন)
একে প্রেম, অন্যে প্রাণ, এরূপে করিতে দান
রমণী কি পারে লো কখন ?
রাজ-দণ্ড, রণ-অসি, জ্ঞান-তত্ত্ব সুধারাশি,
প্রাণ-অবলম্বন অশেষ
রহিয়াছে পুরুষের ; আমাদের ক্ষীণ যষ্টি
এক প্রেমে, নারী নির্বিশেষ।
তোমারো রমণী প্রাণ, রমণীর মণি তুমি,
বুঝ না কি দুঃখ সুভদ্রার ?
রমণী মাথার মণি করুণায় নাথ যদি
বুঝিতেন এ দুঃখ তাহার !

সত্যভামা

তবে কেন তুমি দিদি, দেখ না বলিয়া যদি
পার তাঁর হৃদয় দ্রবিতে ?

রুক্মিণী

বলিব, বলিব, দিদি, ভাবিয়াছি কতবার,
বলি বলি পারি না বলিতে।
কেমন দুর্বল প্রাণ, প্রাণনাথে যেই ক্ষণ
দেখি, দিদি, সম্মুখে আমার,
কি স্বর্গ ভাসে নয়নে, কি অমৃত বহে প্রাণে,
কি যে মোহ হয় লো সঞ্চার !
নর-নারায়ণ রূপ নিরখি নয়নে যাই
আপনার ক্ষুদ্রত্বে মরিয়া।
ইচ্ছা হয় মনে মনে,— চিরজীবনের তরে
পদপ্রান্তে পড়ি ঘুমাইয়া !
তুমি কেন একবার বলিয়া দেখ না, বোন,
এই কর্ম নহে লো আমার,—

সত্যভামা

বলিয়াছি ; গুণধাম হেসে হন আটখান,
ব্যঙ্গে অঙ্গ পুড়ে হয় ক্ষার।
বলেন—"মঙ্গলময় নারায়ণ, ইচ্ছা তাঁর
অবশ্যই হইবে পূরণ।
নাহি সাধ্য মানবের সে মঙ্গল নিয়তির
এক রেখা করিবে লঙ্ঘন।"
এইরূপে বেঁধে বেড়ে দেন যদি নারায়ণ,
—বোকারে বুঝাব কিবা বল ?—
রুক্মিণী অমৃতরাশি পড়িত কি পাতে তাঁর ?
সত্যভামা তপ্ত হলাহল ?

রুক্মিণী

হইয়া অমৃতরাশি সেবিব প্রাণেশে, বোন,
হেন ভাগ্য হবে কি আমার ?
বারিবিন্দু হ'য়ে যদি পারি পদ প্রক্ষালিতে
নারীজন্ম হইবে উদ্ধার।
পতি জ্ঞান-পারাবার— আমরা শফরী ক্ষুদ্র,
কি বুঝিব সে লীলা বিশাল !
ক্ষুদ্র শফরীর মত থাকি তাহে লুকাইয়া
আমাদের নীরবতা ভাল।

সত্যভামা

জ্ঞানের চূড়ান্ত ফল,— গলায় সতিনী দুটি !
জ্ঞানের মহিমা বলিহারি !
এমন লক্ষ্মীর পায়ে আমি সতিনীর কাঁটা
ফুটাল যে, তার জ্ঞান ভারি !

রুক্মিণী

দিদি রে ! দুর্বল প্রাণে কত ব্যথা দিবি আর,
তোর ত হৃদয় দয়াময় ;
এমন প্রতিভাময়ী সপত্নী পতির যোগ্যা,
জন্মজন্মান্তরে যেন হয় !
কি যে অভাগিনী আমি, পতিসেবা নাহি জানি,
আপনি মরমে মরে রই।
পতির প্রসন্ন মুখ দেখি যবে পাই সুখ,
তোর কাছে কত ঋণী হই।
আমরা কে, সত্যভামা ? জগতের পতি যিনি,
দুই ক্ষুদ্র নারী পত্নী তাঁর ?

পত্নী তাঁর নারীজাতি, পত্নী তাঁর বসুমতী,
পত্নী তাঁর অসংখ্য অপার !
অনন্ত প্রকৃতি সতী, অনন্ত রূপেতে সাজি,
সেবে নিত্য চরণ যাঁহার,
তাঁর প্রেমে ক্ষুদ্র কীট পায় যাহা, ততোধিক
আমাদের নাহি অধিকার।
যিনি বিষ্ণু অবতার, প্রকৃতি রাধিকা যাঁর,
সত্যভামা রুক্মিণী কি ছার।
আমাদের প্রাণনাথ, দিদি, তিনি জগন্নাথ !
আমাদের সপত্নী সংসার !

সত্যভামা

(স্বগত) এ কভু মানবী নয়, কি হৃদয় প্রেমময় !—
জগতের পুণ্য-প্রস্রবণ !
সপত্নী ইহার আমি ? নহে যোগ্যা এ দেবীর
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ ;
কি যে পাপ অভিমান, হৃদয়েতে মূর্তিমান
কিছুতেই ধ্বংস নাহি হয় ;
পরশি প্রাণেশ-অঙ্গ বহে যদি সমীরণ,
ঈর্ষ্যানলে দহে এ হৃদয়।
জগৎ কি নাহি জানি, তুমি আমারই স্বামী,
তুমি সত্যভামার সংসার।
জগৎ যে হয় হোক্, তুমি যে সত্যভামার,
সত্যভামা তেমতি তোমার !
ধীরে ধীরে বাসুদেব, অধরে ঈষৎ হাসি,
উপবনে দিলা দরশন।
হাসিলা কুসুমবন, হাসি দুই নারী প্রাণে
অমৃত বহিল সমীরণ !

কৃষ্ণ

কিবা দুই চিত্র !
এক দিকে শান্তি, দ্বিতীয়ে সমর !
এক দিকে বারি, অন্যে বৈশ্বানর।
এক দিকে কুলু কুলু নির্ঝরিণী
অন্য দিকে বিধুনিত তরঙ্গিণী !
এক দিকে মন্দ মলয় পবন।
অন্য দিকে চক্র-বাত্যা বিভীষণ !
এক বিনয়ের কুসুম-হার !
অন্য অভিমান হিমাদ্রি-ভার !
এক দিকে প্রীতি-কৌমুদী-ছবি !
অন্য দিকে ক্রোধ-মধ্যাহ্ন-রবি !
এক দিকে বহে যমুনা নির্মলা !
অন্য দিকে গঙ্গা ধবলা পঙ্কিলা !

সত্যভামা

সমর কে ?

কৃষ্ণ

সত্যভামা।

সত্যভামা

বৈশ্বানর ?

কৃষ্ণ

সত্যভামা।

সত্যভামা

বিধুনিত তরঙ্গিণী আর ?

কৃষ্ণ

সত্যভামা।

সত্যভামা

চক্রবাত্যা বিভীষণ ?

কৃষ্ণ

সত্যভামা।

সত্যভামা

অভিমান হিমাদ্রির ভার ?

কৃষ্ণ

গরবিণী সত্যভামা।

সত্যভামা

ক্রোধে মধ্যাহ্নের রবি ?

কৃষ্ণ

সত্যভামা ভাস্কর বিভব !

সত্যভামা

পঙ্কিলা জাহ্নবী-ধারা, সেও তবে সত্যভামা ?

কৃষ্ণ

সত্যভামা—সত্যভামা সব।

সত্যভামা

দেখিলি, দেখিলি, দিদি! কেমন যমুনা গঙ্গা
এক কণ্ঠে বহালেন স্বামী?
কেমন নির্জ্জলা নিন্দা! কেবল আমার দোষ,—
তোর মত হাবি নহি আমি।
তাই লো যমুনা তুই, ব্রজলীলা-রঙ্গভূমি,
আমি সে পঙ্কিলা ভাগীরথী—
(বাজাতে বাজাতে শাঁক্ আসি কহে সুলোচনা)—
"মাঝখানে আমি সরস্বতী।"

কৃষ্ণ

কি গো সুলোচনে! এত শঙ্খধ্বনি কেন আজ?

সুলোচনা

কালি শুভ বিবাহ আমার!

কৃষ্ণ

এমন যৌবনডালা কারে দিবি উপহার?

সুলোচনা

ঢালিব মাথায় সুভদ্রার।

কৃষ্ণ

অপরাধ সুভদ্রার?

সুলোচনা

কি দোষ সত্যভামার?
তাহার মিলেছে যেই স্বামী,
পুরুষত্বে শত বার সুলোচনা শ্রেষ্ঠ তার,
তার চেয়ে যোগ্যপতি আমি।

কৃষ্ণ

গালি দিস, বিষমুখি, টানি বজ্র জিহ্বা তোর
সাজাইব তোরে মহাকালী,—

সুলোচনা

বোকা পুরুষের বুকে নাচি তবে মন-সুখে
রণরঙ্গে দিয়া করতালি।
ব্রহ্মাস্ত্র জিহ্বায় ধরি, বরুণাস্ত্র নেত্র-কোণে,
করে বজ্র ধরি ভীমা ঝাঁটা,—
এরূপে দুর্য্যোধনের দেখি পৃষ্ঠ-পরিসর,
ইচ্ছা করে দেখি বুকপাটা।
শিখাই পুরুষে আর কেমনে পত্নীর পণ,
ভগিনীর প্রেম রক্ষা হয়;
এই বীরকার্য যদি নাহি পারে সুলোচনা,
সত্যভামা পারিবে নিশ্চয়।

সত্যভামা

দূর হও, কালামুখি!

সুলোচনা

যাহা আজ্ঞা, সোনামুখি!
দেখিব সোনার কত ধার,—
কৃষ্ণ নহে দুর্য্যোধন, অভিমান চাপে আর
পৃষ্ঠভঙ্গ হবে না তাহার।

সত্যভামা

দুর্ম্মুখি! আবার! ফের!—জিজ্ঞাসে প্রভুরে দাসী
ভগ্নিপতি হবে কয় জন?
জিজ্ঞাসে চরণে আর, এরূপে সত্যভামার
পতি কিহে রাখিবেন পণ?

কৃষ্ণ

সতী রমণীর পণ, জানি নাহি কদাচন
নারায়ণ করেন লঙ্ঘন,—
শুনি, বড় মহিষীর এ বিবাহে কিবা মত,
শুনি তাঁর বাসনা কেমন!
রুক্মিণী প্রশান্তমুখে চাহি প্রাণেশের পানে
কহিলা—"দাসীর কিবা মত!
তুমিই করিবে নাথ অর্জ্জুনের সুভদ্রার
এ সঙ্কটে পূর্ণ মনোরথ।"
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ— "জানিলাম ধনঞ্জয়
যাদুকর হইবে নিশ্চয়।
সকলি গ্রাহক তার, হই পাছে স্থানচ্যুত,
মনে হইতেছে বড় ভয়।
সরলে! উপায় তার হইয়াছে, দুর্য্যোধন
করিয়াছে সন্দেশ প্রেরণ,

পার যদি সত্যভামা, ফিরিবে সে হস্তিনায়,
এ সঙ্কট হইবে মোচন।
করিয়াছি অঙ্গীকার, দিব তারে সত্যভামা,
কি করিব চারা নাহি আর।
আরো বলিয়াছি, প্রিয়ে, সঙ্গে দিব সুলোচনা,
সম্মার্জনী সহিত তাহার।

সুলোচনা

কেমন গো, ঠাকুরাণি! সন্দেশটি সোনামুখে
কেমন লাগিল দেখি বল?

সত্যভামা

বেশ লাগিয়াছে, বোন, সত্যভামা সুভদ্রার
স্থান বিনিময় হবে চল।
তবু ভাল ভার্য্যাদান দিয়া ভগিনীর মান
রাখিলেন পতিচূড়ামণি!
দেখাইব পত্নী আমি, কেমনে মাথার মণি
রক্ষা করে দলিত ফণিনী।
রাখিব সতীর পণ,— এই দণ্ডে সুভদ্রার
পাণি পাইবেক ধনঞ্জয়।

সুলোচনা

আমি বাজাইব শাঁক দেখি হস্তিনার পতি
কত দীর্ঘকর্ণ,—তাহা সয়।

চলে গেল ক্রোধে রাণী সখীর গলায় ধরি
শঙ্খশব্দে কাণ ফেটে যায়,
হাসিয়া স্বগত কৃষ্ণ কহেন—"কি পুণ্য মম!
দুই চিত্র অতুল ধরায়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা, নিষ্কাম সকাম প্রেম
প্রবাহিণী যুগল ধরায়,—
পবিত্র যমুনা গঙ্গা— বহে এক সিন্ধু মুখে,
আমি সেই পুণ্য-পারাবার!
সরল সকাম বেদ ভক্তিময়ী সত্যভামা;
জ্ঞান উপনিষদ রুক্মিণী;
নির্জীব নিষ্কাম ভাব আছে তাহে লুক্কায়িত,
অন্তঃশীলা প্রীতি-প্রবাহিণী।
উভয় মিলন স্থান, সুভদ্রা তাহার নাম,
কি নিষ্কাম ধর্ম মূর্তিমতী!
ভারতের ভাবী ধর্ম, বেদ উপনিষদের
পূর্ণ তত্ত্ব, পূর্ণ পরিণতি!"
কাতরে রুক্মিণী কহে— "সতু যে মানিনী, নাথ
ফিরাইয়া ভাঙ্গ মান তার।"
কহেন কেশব হাসি— "সমরের নাহি সাধ
শান্তি আজি বাসনা আমার।"

ষোড়শ সর্গ

রাখি-বন্ধন

সেই অপরাহ্নশেষে ধীরে ধনঞ্জয়
কানন অপর প্রান্তে চিন্তাকুল মন
ভ্রমিছেন অধোমুখে। ভাবিছেন মনে—
"ইন্দ্রপ্রস্থ হতে দূত আসিয়াছে ফিরি।
ভ্রাতাদের এই মত—ভেবেছিনু যাহা—
গোবিন্দের ইচ্ছা যদি সুভদ্রার কর
অর্পিতে আমার করে, তবে পাণ্ডবের
নাহি ততোধিক আর গৌরব, মঙ্গল।
রামের প্রতিজ্ঞা-বার্তা গেছে হস্তিনায়;
সাজিতেছে দুর্যোধন; ছুঁয়েছে আকাশ
অভিমান-শিখা তার। ভীত ধর্মরাজ
কৌরব যাদবকুল হইলে মিলিত
ভাসিবে পাণ্ডবগণ অকূল সাগরে
শুষ্ক তৃণরাশি মত; ভীত ধর্মরাজ
ততোধিক—রাম, কৃষ্ণ অভিন্ন-অন্তর!—
যৌবনসুলভ কোনো চাপল্যে আমার
কৃষ্ণের বিরাগ হয় পাণ্ডবের প্রতি।
হরি! হরি! কি সঙ্কট! পারি ভুজবলে
করিতে এ ব্যূহভেদ। পুরনারীগণ
কালি যবে দ্বারকায় করিবে গমন
করিতে বিবাহসজ্জা, পারি সুভদ্রায়—
আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—করিতে হরণ,
ভুজবলে যদুকুল করি পরাজিত,
যাদব-বিক্রম-সিন্ধু মথি ভুজবলে
পারি উদ্ধারিতে এই অমৃত শীতল,—
সুভদ্রা জীবন্ত সুধা! কিন্তু হলাহল
উঠে যদি সে মন্থনে—কৃষ্ণের বিরাগ?
অম্লানবদনে পারি ত্যজিতে জীবন,
ত্যজিতে জীবনাধিক পারি সুভদ্রায়,
জীবন-সুভদ্রাধিক ভ্রাতা চারি জন,—
পীতাম্বর-পদছায়া তথাপি কখন
না পারি ছাড়িতে,—হরি। কি ঘোর সঙ্কট!"
একটি অশোকমূলে বসি ধনঞ্জয়,
অধোমুখ, ন্যস্ত শির যুগ্ম করাধারে,
চিন্তিলেন বহুক্ষণ। "ঘোরতর পাপ?"
ভ্রমিতে লাগিলা পুনঃ—"ঘোরতর পাপ!
একে ত অতিথি আমি; তাহাতে আবার
কি যে অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতিপারাবার,
ঢালিছে আবালবৃদ্ধ কিবা নারী নর
এ পবিত্র যদুপুরে! সর্বোপরি তার,—
সেই বাসুদেবপ্রীতি! এই কয় দিনে
কি ত্রিদিব খুলিয়াছে নয়নে আমার!
ঘটিয়াছে জীবনের কিবা রূপান্তর!
কি ছিলাম? বন্য-পশু, গর্ব ভুজবল;
ধরা ভাবিতাম সরা আত্ম-গরিমায়।
এই নর-হিমাচল বিশাল ছায়ায়
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপী,—দাঁড়াইয়া এবে
দেখিতেছি কি যে ক্ষুদ্র বালুকণা আমি।
অথচ কি আত্মজ্ঞান, মহত্ত্ব অসীম,
সে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বতে হয়েছে সঞ্চার!
রাম-পদ-পরশনে অহল্যা-উদ্ধার,—
কবির কল্পনা নহে। পাষাণ হৃদয়,—
নৃশংস বীরত্বে দৃঢ়,—হইল উদ্ধার
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে। পতিতপাবন,
বিষ্ণু সনাতন তুমি! নর-নারায়ণ!
দ্বাপরের অবতার! ধর্ম মূর্তিমান!
আমি ক্ষুদ্র নর, আমি সখা ভ্রাতা তব!
না না, দেব! আমি শিষ্য সেবক তোমার,—
তব পদানত দাস।" আকাশের পানে
রহিলা চাহিয়া পার্থ। ভিজিল নয়ন

ভক্তিরসে।
ভক্তিছবি রয়েছে চাহিয়া
সেই আকাশের পানে, সুভদ্রা বসিয়া
অদূরে অশোক-মূলে। হইল মিলন
চারি চক্ষু প্রীতিময়, কি যেন তরঙ্গ
হৃদয়ে অমৃতময় ছুটিল নাচিয়া।
ভদ্রা ভাবিলেন মনে,—"কিবা রূপান্তর
ঘটিয়াছে প্রাণেশের এই কয় দিনে!
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন-রবি বীরত্বে কেবল
নহে সেই মুখ আর। জ্ঞানেতে মধুর,
উন্মেষে ভক্তি আর্দ্র, বালার্কের শোভা
ধরিয়াছে সেই মুখ! ছায়া গাঢ়তর
ঢালিয়া জলদচিন্তা, গাম্ভীর্যে তাহার
করিয়াছে অতুলন মহিমা সঞ্চার।
ভ্রাতার দেবত্ব-আভা ভাসিতেছে তাহে,
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে। কিন্তু হৃদয়েতে
নাহি যেন শান্তি তাঁর। কারণ তাহার
এ দাসী কি প্রাণনাথ? আমি, হা অদৃষ্ট!
ক্ষুদ্র পতঙ্গের দুঃখ সহিতে না পারি,
আমি তব এ গভীর দুঃখের কারণ!"
দেখিলেন ধনঞ্জয় ভদ্রার বদন
শান্তির চিত্রিত ছবি; রেখাটিও তার
হয় নাই রূপান্তর। কৃষ্ণের মতন
সতত প্রসন্ন, শান্ত, স্থির, চিন্তাশীল,
প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, প্রীতিতে শীতল।
চমকিলা সব্যসাচী। ভাবিলেন,—"এ কি!
বিলোড়িত এ হৃদয় যেই ঝটিকায়,
একটি হিল্লোল ওই কোমল হৃদয়ে
তোলে নাহি? তবে অনুরাগিণী আমার
নহে কি সুভদ্রা?"
সম্ভ্রমে অর্জুন
গেলেন অশোকতলে। সম্ভ্রমে সুভদ্রা
উঠিলা, বসিলা পুনঃ বেদীতে দু'জন,—
শীতল নির্মল শ্বেত মর্মর-নির্মিত।
ঈষৎ হাসিয়া পার্থ কহিলা মধুরে—
"জানিতাম আমি এই অশোকের বনে
বনদেবী সুভদ্রার পাব দরশন।"
নহে সুলোচনে! তব কামিনীকুসুম
ভদ্রা আর, ক্রমে ক্রমে রজনীগন্ধায়
হইয়াছে পরিণত সুভদ্রা এখন,—
সহে দরশন, বুঝি সহে পরশন।
ঈষৎ হাসিয়া ভদ্রা, হাসিল ঈষৎ
সায়াহ্ন-গগন-আভা, করিলা উত্তর—
"বড় ভালবাসি আমি অশোক-কানন।
ত্রেতার তরল-তত্ত্ব, করুণার গীত,
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত ইহার
দেখি আমি; পত্রে পত্রে দেখি পবিত্রিত
লোক-মাতা জানকীর পদচিহ্ন আর।
দেখি দূর্বাদলে সেই অশ্রু-পরকাশ,
শুনি সমীরণে সেই শোকের নিশ্বাস।
পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, আত্ম-বিসর্জন
পতিপদে, দেয় শিক্ষা অশোক-কানন।
অশোক করিতে শোকে রমণীহৃদয়
নাহি হেন শান্তি-স্থান জগতে নিশ্চয়।"
বুঝিলেন পার্থ, এই কয়টি কথায়
কি গভীর প্রেম-কাব্য রয়েছে নিহিত,
কিবা অপার্থিব চিত্র নারীহৃদয়ের।
কহিলেন উচ্ছ্বসিত গদ গদ স্বরে—
"পড়িয়াছি রামায়ণ; আমিও মোহিত,
সুভদ্রে, সীতার সেই চরিত্রে অতুল।
কিন্তু কি যে স্বর্গ তাহে আছে অধিষ্ঠিত,
কি স্বর্গ, কবিত্ব এই অশোক-কাননে
বুঝি নাই এত দিন। অশোক-কানন
আজি হ'তে মহাতীর্থ হইবে আমার—
পাইলাম এই বনে আজি সুভদ্রার,—
দ্বাপরের সীতা সহ,—শেষ দরশন।"
হলো ক্রমে কণ্ঠরোধ, ফাল্গুনী নীরব
রহিলেন কিছুক্ষণ—সুভদ্রা নীরব।

"রজনী প্রভাতে"—পার্থ অর্ধরুদ্ধস্বরে
বলিতে লাগিলা পুনঃ—"রজনী প্রভাতে
যাবে তুমি দ্বারকায়, রজনী প্রভাতে
ভাঙ্গিবে আমার দেবি! আশার স্বপন;
সুখের শর্ব্বরী মম হইবে প্রভাত।
লুকাব হৃদয় আর নাহি সে সময়,
নাহি সেই শক্তি মম। হৃদয়মন্দিরে
যেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রণয়বেদীতে
করিয়াছি প্রতিষ্ঠিত, যার উপাসনা
করেছি জীবনব্রত, সেই দেবী মম
লইবে কাড়িয়া পরে, কাপুরুষ মত
সহিব কেমনে বল ক্ষত্রিয়শোণিতে?"

সুভদ্রা

বীরবর! এ কি কথা? তব হৃদয়ের
হবে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রমণী এমন
আছে কি জগতে, প্রভু? সুভদ্রা তোমার
একটি চরণরেণু নহে সমতুল।
বিশ্ব-মস্তকের মণি ওই সুধাকর,
ওই চেয়ে দেখ, প্রভু, উর্দ্ধে সমাসীন।
মানবের শিরোমণি, বীরেন্দ্র! তেমতি
মানবের বহু উর্দ্ধে আসন তোমার।
ভার্য্যা তব জীব-জাতি, তারার মতন
অনন্ত, অসংখ্য; প্রেমকৌমুদী তোমার
আলোকিত, পবিত্রিত, করিবে সংসার।
যার যথা শক্তি তারে ব্রতে অনুরূপ
করি ব্রতী সমুচিত করেন সৃজন
নারায়ণ; প্রভাকর প্রভার আকর,
বাঁচাইতে, বাড়াইতে, বিশ্বচরাচর।
তোমার অনন্ত শৌর্য, উন্নত হৃদয়;
জগৎমঙ্গল কাব্যে তব অভিনয়
অমর, অমৃতপূর্ণ। তুচ্ছ নারী তরে
কেন, বীরচূড়ামণি! পাও মনস্তাপ?

অর্জুন

জ্বলিবে যে মহামরু জীবনের তরে
নিরাশার তীব্রানল হৃদয়ে আমার
রজনীপ্রভাতে ভদ্রে, আশঙ্কাও তার,
এ বিশাল ভুজ মম, বীরের হৃদয়,
করিয়াছে শক্তিহীন বালকের মত।
আগ্নেয় ভূধর মত, অর্জুন তোমার
আপনি হইবে ভস্ম, ভস্মিবে জগৎ,—
শান্তির সলিল, তুমি শান্তিনির্ঝরিণী,
নাহি ঢাল যদি, ভদ্রে! হৃদয়ে তাহার।
ভদ্রা-নারায়ণ-সেবা,—জীবনের ব্রত
লইয়াছে ধনঞ্জয়; করিও না তারে
ব্রতহীন, ধর্ম্মহীন। হব তব স্বামী
নাহি সে যোগ্যতা মম, দেও অনুমতি,
হৃদয়ে রাখিয়া দেবি! পূজিব তোমারে
পবিত্র প্রণয়পুষ্পে। দেও অনুমতি,
হরিব সুভদ্রা-সুধা নমি সুদর্শন;
বুকে, সুধাকররূপে ধরি সেই সুধা
সাধিতে নিয়তি তব অর্পিব জীবন।

সুভদ্রা

জানি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু, বীরমণি!
নর-রক্তে রৈবতক করিয়া রঞ্জিত,
—যাদবের রক্তে প্রভু রক্ত সুভদ্রার,
নর-প্রাণ মম প্রাণ, নারায়ণ প্রাণ,—
কি ধর্ম্ম সাধিবে বল? নরমুণ্ডমালা
পরাবে গলায় প্রভু! তব সুভদ্রার?
নারায়ণ এই ছিল অদৃষ্টে তাহার!

অর্জুন

সুভদ্রে! করুণাময়ি এই রণক্ষেত্রে
যাদববিক্রম সহ কৌরববিক্রম
হয় যদি সম্মিলিত; হয় অগ্রসর
সমগ্র ক্ষত্রিয়-জাতি সিন্ধুপরাক্রমে
প্লাবিতে আমারে, দেবি! প্রতিজ্ঞা আমার,—
নিবারিব অস্ত্র, নাহি করিব প্রহার।
একটি কণ্টকে যদি হয় বিদ্ধ কেহ,
একটি শোণিতবিন্দু করে কলঙ্কিত

ফাল্গুনীর কর যদি, সেই কর আর
অর্পিব না তব করে, কাটি সেই কর
নিক্ষেপিব সিন্ধুগর্ভে সহ ধনুঃশর।
একমাত্র ভয় মম,—বাসুদেব যদি
হন অগ্রসর রণে! পড়িবে খসিয়া
শরাসন। বক্ষ মম পারিবে সহিতে
অস্ত্র তাঁর; অপ্রীতিতে পড়িবে ভাঙ্গিয়া।
ভদ্রা বীর-বালা, বীরা রমণী আপনি,—
বীরা রমণীর মণি,—প্রদীপ্ত বীরত্বে
অবিচল আত্ম-ধৈর্য নিল ভাসাইয়া,
তুষারের রাশি যেন। আকাশের পানে
নিরখিয়া বিস্ফারিত নীলাঞ্জনয়নে,
রমণী-হৃদয় ঢালি কহিতে লাগিল!—
"নারায়ণ! ভ্রাতঃ!"—পার্থ দেখিলা সে কণ্ঠ
তরলিত, উচ্ছ্বসিত—"করিলে অঙ্কিত
এত যত্নে যেই চিত্র মহিমামণ্ডিত
দাসীর হৃদয়পটে, দয়াময় তুমি
মুছিবে কি সেই চিত্র, ভাঙ্গিবে সে পট?
কতবার তুমি স্নেহ-উচ্ছ্বসিত-প্রাণে
চুম্বিয়া বদন, বুকে লইয়া তোমার
সুভদ্রায়, বলিয়াছ জননীর কাছে—
'সুভদ্রা আমার, মাতঃ! করিবে পবিত্র
দুইটি বিশাল কুল! এই পুষ্পহারে
অর্জুনের বীরকণ্ঠ করিয়া ভূষিত
শিক্ষা, দীক্ষা আশা, মম করিব সফল—
ভূতলে দ্বিতীয় যোগ্য পতি নাহি তার।'
সে অর্জুন সুভদ্রার, ভদ্রা অর্জুনের,—
ভদ্রার কি ভাগ্য আজি! তাহাতে অপ্রীত
হইবে কি প্রীতিময় প্রেম পারাবার?
তুমি নরনারায়ণ। জানি আমি তব
জগৎমঙ্গলনীতি। সুভদ্রারো তরে
সূত্রমাত্র রূপান্তর হইবে না তার।
সে মঙ্গলনীতিপথে হয়ে থাকে যদি
কণ্টক সুভদ্রা তব, নাহি দুঃখ তার,
তোমার মঙ্গল-নীতি হউক পূরণ!
তব দেব-করে তুমি করিলে রোপণ
যেই লতা, সে লতায় পারে কি ফলিতে
বিষফল? না না"—ভদ্রা উন্মাদিনী মত
উঠিয়া, উচ্ছ্বাসে কহে,—গলদশ্রু বামা,—
"অর্জুন! ফাল্গুনী! পার্থ! আর্য ধনঞ্জয়
নীলমণিময় ওই আকাশের পটে,
নীলমণিময় বপু দেখ নারায়ণ—
শত সুধাকর কান্তি, শঙ্খ-চক্র-কর,
আনন্দাশ্রু দু'নয়নে, অধরে সুহাসি।
ওই দেখ ভ্রাতা মম বিষ্ণু-অবতার!
ধনঞ্জয়! বীরবর, যুগল হৃদয়
আইস করিয়া ঐ চরণে বিলীন,
—জগতের মোক্ষধাম!—লভিব নির্বাণ;
নরায়ণ! কর পূর্ণ তব মনস্কাম!"
নীলমণিময় সেই আকাশের পটে,
নীলমণিময় বপু দেখিলা অর্জুন,—
নহে ভ্রান্তি। ভদ্রা পার্শ্বে বসিলা ভূতলে
জানু পাতি, দর দর বহিতে লাগিল
চারি প্রীতিধারা, চারি অচল নয়নে।
পার্থের হৃদয়ে উগ্র কামনা অনলে
কি যেন শান্তির সুধা হইল বর্ষণ,—
বারিধারা দাবানলে! করিল হৃদয়
নিষ্কাম; কহিলা পার্থ উচ্ছ্বসিত স্বরে—
"ভগবন! কর পূর্ণ তব মনস্কাম!"
হইলেন দুই জনে প্রণত ভূতলে।
বহিল কি যেন সুধা সান্ধ্য সমীরণ!
কি যেন সৌরভে পূর্ণ হইল কানন!
জিনিয়া জীমূতমন্দ্র ঘোর শঙ্খধ্বনি
ঘোষিল প্লাবিয়া বিশ্ব, জগতে জগতে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি প্রীতির সঙ্গীত—
"ভগবন্! কর পূর্ণ তব মনস্কাম!"
সে সমীর, সে সৌরভ, সেই শঙ্খধ্বনি,
গেলে মিশাইয়া ধীরে, উঠিয়া দু'জনে

দেখিল সে নীলাকাশে গেছে মিশাইয়া
সেই নীলমণি-রূপ। চিত্রিতের মত
রহিলা চাহিয়া সেই আকাশের পানে।
আবার কি শঙ্খধ্বনি! চমকি ফিরিয়া
দেখিলেন সত্যভামা, অগ্রে সুলোচনা,
শঙ্খ নিনাদিনী বামা হেলিয়া দুলিয়া,
চাপা হাসি মুখে যেন উঠিবে ফুটিয়া।

সত্যভামা

বীরমণি! বল তুমি চাহ কি ভদ্রায়?

অর্জুন

না,—দেখেছি সুন্দরতর রূপ কোহিনুর।

সত্যভামা

কে সে, পার্থ?

অর্জুন

সত্যভামা।

সত্যভামা

সুভদ্রা অভাগি!
কি দশা হইবে তোর?

সুলোচনা

সেও শ্রেষ্ঠতর
দেখিয়াছি বীরবর!

সত্যভামা

কে সে?

সুলোচনা

সুলোচনা!
তার তরে শাঁক জানি বাজিবে না কভু,
বাজাবে না কেহ যদি, আয় তবে ভাই!
হৃদয়ে লইয়া তোরে হৃদয় ভরিয়া,
হৃদয় ঢালিয়া, শাঁক বাজাইব আজি।
না না, ভাই। পারিব না সহিতে এ প্রাণে
পরের হইবি তুই, হবে তোর পর
সুলোচনা। দুই লতা গেছে জড়াইয়া
আশৈশব, প্রাণে প্রাণে, বিচ্ছিন্ন এখন
কেমনে হইব বল?

হাসিতে হাসিতে
কাঁদিতে লাগিল বামা গলা জড়াইয়া
সুভদ্রার, সেই সঙ্গে উঠিল কাঁদিয়া
চারিটি পরাণ; বেগে পড়িল খসিয়া
হৃদয়ের আবরণ, চারিটি হৃদয়,
নিরখিল পরস্পরে, দর্পণে দর্পণ।
অতল গভীর সিন্ধু রাণীর হৃদয়
বহিল ঝটিকা তাহে। লইল ভদ্রায়
তরঙ্গিত সেই বুকে। তরঙ্গিত বুক
সুভদ্রার; মধ্য শুভ্র কুসুম-প্রাচীর
ভাঙ্গি, দুই মত্ত সিন্ধু গেল মিশাইয়া।
উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বুক
যাইছে ভিজিয়া, রাণী সুভদ্রার কর
অর্পি অর্জুনের করে কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"ধনঞ্জয়! করিলাম আজি সমর্পণ
তব করে সুভদ্রায়,—সাক্ষী নারায়ণ।
সুভদ্রা আমার দেব! জগৎগৌরব,
স্নেহে কন্যা, জ্ঞানে গুরু, দেবত্বে কেশব।
যাদবের কুলদেবী সুধায় সৃজিত,
পাণ্ডবের কুলে আজি হইল স্থাপিত
শিশুদের চিরানন্দ, আরাধ্যা যুবার,
স্থবিরের শান্তি-ছায়া, প্রেমপারাবার
জগতের, জগতের প্রাণ যার প্রাণ,
সেই সুভদ্রায় পার্থ! করিলাম দান।
যথা নরদেব ভ্রাতা, ভগ্নী নারী-দেবী।
যথা পূর্ণ-ব্রহ্ম-পতি পাদপদ্ম সেবি
ভাগ্যবতী সত্যভামা, তথা ভাগ্যবতী,
সুভদ্রা ননদ মম, তুমি তার পতি।
পবিত্রতা, মহত্বতা, সৌন্দর্য ধরার,
আজি হতে, সব্যসাচী, হইল তোমার!'
ধনঞ্জয় আত্ম-হারা, স্তম্ভিত, বিস্মিত,
চাহি ছল ছল নেত্রে আকাশের পানে।
কহিলা—"মঙ্গলময়! নিয়তি-নিদান,
এইরূপে কর পূর্ণ তব মনস্কাম!

বুঝিলাম বলদেব বল-অবতার,
কি সাধ্য নিয়তি বল খণ্ডিবে তোমার।"
আপন প্রকোষ্ঠ হ'তে পুষ্পের বলয়
খুলি সত্রাজিৎ-সুতা দিলা পরাইয়া
পার্থের প্রকোষ্ঠে; গর্বে কহিলা তখন,—
"হও সুভদ্রার পতি, করিনু বরণ,
শুভক্ষণে এই রাখি করিয়া বন্ধন!
সমগ্র জগৎ যদি হয় সম্মুখীন
লঙ্ঘিতে প্রতিজ্ঞা মম, ধরিয়া মস্তকে
নারায়ণ-পদ-চিহ্ন, প্রবেশিও রণ,—
রাখিও 'রাখির' মান, এ দাসীর পণ!
ধনঞ্জয়! যোগ্য পতি হও সুভদ্রার,—
ততোধিক আশীর্বাদ নাহি জানি আর।"
সেই মুখে সেই বুকে দেখিলা ফাল্গুনী
কি মহিমা, কি মহত্ত্ব। উত্তরিলা ধীরে—
"এরূপ না হ'লে, দেবি! পতি নারায়ণ
হইবেন কেন তব? জলধরবক্ষে
কে পারে দামিনী বিনা করিতে বিহার?
কৌমুদী বিহনে নভে? কার সাধ্য আর
আলোকিবে, উচ্ছ্বাসিবে মহা-পারাবার?
আকুল এ প্রাণ, দেবি, সুভদ্রার তরে;
কিন্তু বুঝিয়াছি আজি লভিতে সে স্বর্গ
কতই অযোগ্য আমি! অযোগ্য কেমন
তোমাদের পদপ্রান্তে পাইতে এ স্থান!
এক মুখে অস্ত্র ধরি আসুক জগৎ,
নাহি ডরে ধনঞ্জয়। আসুন কেশব,
উঠিবে না অস্ত্র করে, অর্পেছি এ প্রাণ
যেই পদে, সেই পদে লভিবে নির্বাণ।
যতক্ষণ দেবি! দেহে থাকিবে এ প্রাণ,
পবিত্র 'রাখি'র তব রাখিব সম্মান।
তোমার পবিত্র কর, যে পবিত্র কর
অপবিত্র করে মম করেছে অর্পণ,—
অসির নাহিক শক্তি ঘুচাবে মিলন।
কিন্তু পশু-বলে বলী আমি দুরাচার,
নাহি সাধ্য হ'ব যোগ্য পতি সুভদ্রার।
হৃদয়ে তাহারে মাত্র করিয়া স্থাপন
পূজিব, সেবিব নিত্য তোমার চরণ।
কৃষ্ণের সেবক আমি, ততোধিক আর
স্বর্গধাম ফাল্গুনীর নাহি আকাঙ্ক্ষার।"
"আজি মম কি সুখের, কি দুঃখের দিন!
আয় ভদ্রা! আয় বুকে!"—সুখাশ্রু নয়নে,
কহিতে লাগিলা রাণী আনন্দে অধীর,—
"আয় ভদ্রা! আয় বুকে! অভাগিনী আমি
পাপ অভিমানবিষে, ক্রোধের অনলে,
পুড়িব যখন, বুকে মেয়ের মতন
কে বল রাখিয়া মুখ কাঁদি অবিরল
ঢালিয়া তরঙ্গ স্নেহ ল'বে ভাসাইয়া
সেই বিষ, সেই বহ্নি?" চুম্বিতে চুম্বিতে
সুভদ্রার অশ্রুসিক্ত বদনকমল
কহিতে লাগিলা রাণী বাষ্পাকুল স্বরে—
"এই মুখ, এই চোখ, এ দেবী-মূরতি,—
পুণ্যের স্বপন-সৃষ্টি, দেখিব না আর
নিত্য নিত্য; নিত্য নাহি শুনিবে শ্রবণ
শীতল প্রীতির ধারা কণ্ঠবরিষণ।"
"হা কৃষ্ণ! তোমার"—হাসি-কান্না-ভরা মুখে
কহে সুলোচনা ধীরে,—"হা কৃষ্ণ! তোমার
নিষ্কাম ধর্মের চেলা ইহারা সকল?
এই দেখ কত সুখ গলায় গলায়
লভিতেছে দুই জন, বিন্দুমাত্র তার
না দেয় এ অভাগীরে। নাহি অভিমান,
নাহি ক্রোধবহ্নি-বিষ, তাই পোড়ামুখী
সুলোচনা নহে কেহ। আয় বোন! আয়!
বারেক গলায় আয়! আসি জড়াইয়া
দুই লতা এত দূর, দুই বোন আজি
শুভক্ষণে সহকার করিয়া আশ্রয়
ছুটিলি আকাশ মুখে; কিন্তু পদমূলে
উভয়ের আমি বোন! পাই যেন স্থান,
তোর ফুলে, তোর ফলে, জুড়াইতে প্রাণ!"

সুখসমুজ্জল চারি ধারা নিরমল,
বহে সুলোচনা সত্যভামার নয়নে ;
সুভদ্রার মুখ স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর,
নাহি সুখ-দুঃখ-রেখা ; বহিছে নয়নে
দুই স্রোতে প্রীতিধারা ; ভাসিছে নয়নে
কোমলতা, কাতরতা, স্নেহের উচ্ছ্বাস।
"দিদি! তোমাদের আমি",—কহিলা কাতরে—
"দিদি! তোমাদের আমি ; আমরা সকল
নারায়ণপদাশ্রিতা! অনন্ত জগৎ
যে চরণ সমাশ্রিত, আমরা বল্লরী,—
জগতের প্রাণ সহ আমাদের প্রাণ
গাঁথা সেই পদমূলে। দিদি! আমাদের
অবিচ্ছেদ সে মিলন, অনন্ত সে প্রেম।"
হাসি হাসি সুলোচনা কহে,—"প্রাণ ভরি,
মহিষি! বাজাই তবে শাঁক একবার।"
কত ফুঁ, তথাপি শাঁক বাজিল না ভাল,
কি যেন রোধিল চারু কণ্ঠ বাদিত্রীর।

সপ্তদশ সর্গ

মহাভারত

১

সুপ্ত রৈবতক-অঙ্কে সচন্দ্র শর্ব্বরী
নিদ্রা যায়, পরকাশি
মৃদু সুখ-স্বপ্ন হাসি
নিরমল জ্যোৎস্নায়, চুম্বি মনোহর
পুরোদ্যানে ফুটোন্মুখ পুষ্প থরে থর।
এখনো সে উপবনে
ফাল্গুনী নিরজনে,—
নাহি নিশীথিনী জ্ঞান রৈবতক মত
শান্তির জ্যোৎস্নাময় হৃদয় তাঁহার
শান্ত, স্থির, সমুজ্জ্বল;
মেঘছায়া সুকোমল
ঈষৎ মিশায়ে চিন্তা, করিছে বিকাশ
সুখের তরঙ্গে মৃদু বিষাদ উচ্ছ্বাস।

২

প্রমত্ত তটিনী-তটে তরু ভগ্ন মূল
ছিলা পার্থ দাঁড়াইয়া;
পর্ব্বত-প্রবাহ ছিল রুদ্ধ ক্ষুদ্র শৈলে।
ভেবেছিলা মনে
বসি সুভদ্রার পার্শ্বে প্রণত ভূতলে,—
নারায়ণ-পদে করি আত্ম-সমর্পণ,
রহিবেন স্থির-ব্রত,
এই রৈবতক মত!
একটি তরঙ্গে
সত্যভামা সেই তরু ফেলিলা উপাড়ি,
ভাসাইলা শিলা, করি মুক্ত রুদ্ধ বারি।

৩

নিশ্চয় এখন তরু যাইবে ভাসিয়া,
নাহি সাধ্য দাঁড়াইবে।
নিশ্চয় প্রবাহ এবে যাইবে ছুটিয়া,
কার সাধ্য ফিরাইবে?
হরিতে হইবে ভদ্রা;—পরিণাম তার?
এইখানে জ্যোৎস্নায় ছায়ার সঞ্চার!
অপ্রীত কি নারায়ণ
হইবেন? তাঁর মন
জানেন কি সত্যভামা? অসম্ভব নয়!
তাহার ইঙ্গিত আছে নাহিক সংশয়!
অথবা রমণী-প্রাণ,
চঞ্চলতা মূর্তিমান;
তাহাতে যে বেগবান হৃদয় রাণীর!—
হ'লো জ্যোৎস্নায় ছায়া দ্বিগুণ গভীর।
এইরূপে—
শারদ-আকাশ মত ফাল্গুনি-হৃদয়ে
কখনো ভাসিছে মেঘ; কখনো জ্যোৎস্না
হাসিতেছে মেঘান্তরে।
কভু ছায়া গাঢ়তর; কভু সুখ-হাসি
ফুল্ল প্রেম চন্দ্রালোক,—সুখ স্বপ্নরাশি।

৪

বাজিল কালের কণ্ঠ; শ্যেনপক্ষিচয়
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বৃক্ষচূড়ে সুপ্ত চরাচর
প্লাবিয়া ঘোষিল,—নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
চমকিয়া ধনঞ্জয় চলিলা আবাসে
অন্য মনে; অন্য-মনে কর-পরশনে
খুলিল নীরবে এক কক্ষের দুয়ার।
এ কি কক্ষ? এতো নহে আবাস তাঁহার!
এ কি কক্ষ? নহে ইহা দৃষ্ট-পূর্ব তাঁর!
দেখিলা বিস্ময়ে পার্থ, শোভিছে প্রাচীরে
নানারূপ মানচিত্র, চিত্র নানারূপ।

শোভে কক্ষে স্থানে স্থানে গ্রন্থ রাশি রাশি
সুবাসিত দীপালোকে ; স্তবকে স্তবকে
শোভিতেছে স্থানে স্থানে পুষ্প সুবাসিত।
দীপগন্ধ, ধূপগন্ধ, কুসুমসৌরভ,
বহি মুক্তদ্বার-পথে মোহিল পাণ্ডব।
এ কি কক্ষ ? সব্যসাচী ভাবিলেন মনে
কি যেন মহান্ তত্ত্ব তাঁর জ্ঞানাতীত,
সেই সব মানচিত্রে আছে প্রকটিত।
কি যেন গভীর কথা, সেই চিত্রাবলী
কহিতেছে জ্ঞানাতীত, নীরবে সকলি।
গ্রন্থে গ্রন্থে অতীতের মনস্বী সকল
মূর্তিমান কক্ষে, যেন সবিতৃমণ্ডল।
এ কি কক্ষ ? অতীতের অনন্ত আলয় !
দেখিলা ফাল্গুনী, যেন নিবিড় তিমিরে
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে নক্ষত্রের মত
অমর মানবগণ। মধ্যস্থলে তার
ও কি মূর্তি ! ও কি জ্যোতিঃ ! কিরণ-প্রবাহ !
অতীতের গ্রহগণ করি বিমলিন,
প্লাবি বর্তমান, কিবা জ্যোতিঃ নিরমল
আলোকিছে ভবিষ্যৎ, অনন্ত, অসীম।
কক্ষকেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণ বসি যোগাসনে
সমাধিস্থ, সংজ্ঞাশূন্য দেব-অবয়ব
শোভিতেছে যেন সিন্ধু নিষ্কম্প নীরব।
সমাধিস্থ চরাচর। বাতায়নপথে
কেবল বহিছে ধীরে নিশীথসমীর
নীরবে ভকতিভরে, কেবল আলোক
নীরবে ভকতিভরে কাঁপিছে ঈষৎ।
সকলি নীরব স্থির, পার্থের হৃদয়
হইল ভক্তিতে পূর্ণ পবিত্রতাময়।
ভীত ধনঞ্জয়, যেন কার্য তস্করের
করেছেন আসি এই পবিত্র মন্দিরে ;
করেছেন কলুষিত এ পবিত্র ধাম
পদপরশনে তাঁর, নিশ্বাসসমীরে।
ভাবিলেন মনে মনে যাইবেন চলি
কৃষ্ণের অজ্ঞাতে,—সেও কার্য তস্করের !
রহিবেন দাঁড়াইয়া অজ্ঞাতে যোগীর,—
সেও তস্করের কার্য ! দেখিতে দেখিতে
যোগীর শরীরে যেন জীবনসঞ্চার
হইতেছে ধীরে ধীরে, কাঁপিতেছে ধীরে
সেই প্রসারিত বক্ষ, শান্ত সরোবরে
বহিছে হিল্লোল যেন অতি ধীরে ধীরে।
গোবিন্দ মেলিলা আঁখি ; কি যেন কি আভা
ভাসি সেই চক্ষে পুনঃ গেল মিশাইয়া।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ, বড় প্রীতি-মাখা
সেই হাসি, ডাকিলেন—"সখে ধনঞ্জয় !"
সভয়ে সম্ভ্রমে পার্থ হ'য়ে অগ্রসর
হইলা প্রণত পদে ; সাদরে কেশব
বসাইয়া পার্শ্বে কাছে অজিন আসনে,
বলিতে লাগিলা প্রীত সস্মিতবদনে,—
"অতীত নিশার্ধ, সখে ! কেন এতক্ষণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত ? সুপ্ত চরাচর
নিদ্রার কোমল অঙ্কে।"

অর্জুন

বসিয়া উদ্যানে
দেখিতেছিলাম, দেব, রৈবতক-শোভা
মনোহর চন্দ্রালোকে। অজ্ঞাতে কেমনে
বহিল শর্বরী-স্রোত ; ফিরিতে আলয়ে
ভ্রমে প্রবেশিয়া এই পবিত্র নিবাস,
তীর্থধাম, করিয়াছে কলুষিত দাস।

কৃষ্ণ

এই আত্মগ্লানি, সখে। মহত্ত্ব তোমার।
অপূর্ব বীরত্বে, দেবচরিত্রে যাঁহার,
পুণ্যবান ধরাধাম,– একি গ্লানি তব ?
থাকুক কৃষ্ণের কক্ষ, বক্ষও তাহার
হয় পবিত্রিত দেহপরশে তোমার।
নহে ভ্রম, নারায়ণ আনিলা হেথায়
তোমায় ফাল্গুনী। তব রৈবতকবাস
হইতেছে শেষ, তবে আইস ভুজ'নে

মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়,
পবিত্র সলিল মত, করি প্রক্ষালন
নারায়ণ পাদপদ্ম, নিরখি তাহাতে
আমাদের কি নিয়তি রয়েছে অঙ্কিত।
পারিয়াছ সেই লেখা পড়িতে কি তুমি?

অর্জুন

না দেব! অধম আমি পাইব কোথায়
সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-নেত্র, দয়া করি দাসে
নাহি দেও যদি তুমি, সহস্রকিরণ
নাহি দেন দীপ্তি যদি, পাইবে কোথায়
আলোক স্ফটিক-খণ্ড? নিয়তি তাহার
এই মাত্র জানে দাস—যথা ক্ষুদ্র স্রোতঃ
অবিরামবেগে ক্ষুদ্র জীবন তাহার
অনন্ত সিন্ধুর পদে ঢালে, নরোত্তম,
তেমতি এ দাস ক্ষুদ্র জীবন তাহার
ঢালিবে অশ্রান্ত ওই পদ-পারাবারে,—
জগৎ-জীবন-সিন্ধু,—ততোধিক আর
নাহি জানে ধনঞ্জয় নিয়তি তাহার।

কৃষ্ণ

সংসার সমুদ্র পার্থ—আমরা মানব
অনন্ত সমুদ্র-যাত্রী; জ্ঞান ধ্রুব তারা;
গম্য স্থান সুখধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম;
অনন্ত তাহার পথ। জ্ঞান ধ্রুবালোকে
আপন নিয়তিপথ,
আপনার কর্মব্রত,
যে পায় দেখিতে, সখে, সেই পুণ্যবান,
সে পায় বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণু-পদে নিরবাণ।
বিশ্বরাজ্য কর দৃষ্টি,
সর্বত্র সার্থক সৃষ্টি,
কিবা কীট, কি পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সলিল,
আকাশ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অনল, অনিল।
সেই অর্থ মূলধর্ম,
তাহার সাধন কর্ম,
যার যত উচ্চ শক্তি, তত গুরুতর
কর্ম তার, দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর।
এ বীরত্ব দুরলভ,
অতুল মহত্ত্ব তব,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে, জননী ভারত,—
রয়েছে মহত্ত্বপূর্ণ তব কর্মব্রত।
দেখ ফিরাইয়া মুখ, দক্ষিণ প্রাচীরে
কি দেখিছ ধনঞ্জয়?

অর্জুন

ক্ষুদ্র দেশ-চিত্রচয়।

কৃষ্ণ

মগধ, মিথিলা, চেদী, অযোধ্যা, হস্তিনা,
বিদর্ভ, বিরাট, সিন্ধু, মথুরা, গান্ধার,
অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল।
চেয়ে দেখ, মহাবল!
পূরব প্রাচীরে?—

অর্জুন

সিন্ধু ভূধর-মালায়
সুরক্ষিত মহাদেশে—অনন্ত বিস্তার!
যেন সসাগরা ধরা,
সরিৎভূধরাম্বরা,—
প্রকৃতির মহারাজ্য!

কৃষ্ণ

দেখ, মহারথ,
পুণ্যভূমি আমাদের জননী ভারত!
এক দিকে কর দৃষ্টি
স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি,
অতুল সাম্রাজ্য! অন্য দিকে, ধনঞ্জয়!
ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয়!
পশ্চিমে চাহিয়া দেখ—

অর্জুন

কি ভীষণ চিত্র এক!
অসংখ্য গৃধিনী, কিবা বিকটদর্শন!—

কেবা সে দেবী, গোবিন্দ,
—কিবা মুখ-অরবিন্দ !—
খণ্ড খণ্ড করি যারে শকুন নির্মম,
কেহ হস্ত, কেহ পদ, করিছে ভক্ষণ ?
বিঁধিতেছে পরস্পরে,
কি হিংসা কটাক্ষশরে !
একে অন্য গ্রাস যেন লইবে কাড়িয়া,
একে অন্যে আক্রমণ
করিতেছে ঘন ঘন,
কিবা পাকসাট ! কিবা চীৎকার ভীষণ !
পশিতেছে কর্ণে যেন আকুলিয়া মন !
ছিন্ন নারী-অঙ্গ হায়
তবু কিবা মহিমায়
বিমণ্ডিত বর বপু ! সহস্র ধারায়,
ছুটিতেছে অঙ্গে অঙ্গে কি শোণিত হায় !
কি করুণা মুখে তাঁর !
দেখিতে না পারি আর,—
পেতেছি হৃদয়ে, দেব ! দারুণ আঘাত।
এ কি চিত্র,—কে সে নারী,—কহ, নরনাথ ?

কৃষ্ণ

চিত্র ভারতের, পার্থ ! আর্যলক্ষ্মী দেবী
খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ ;
দেখ গৃধ্রনির্বিশেষ
ভারত নৃপতিগ্রাম দেখ দুর্বিষহ
বর্তমান ভারতের চিত্র শোকাবহ !
হায় মা—(তিতিল নেত্র,
প্রীতির পবিত্র ক্ষেত্র)
হায় মা ! ধরিয়া কিবা মূর্তি ভয়ঙ্করী,
করে খড়্গ, দানবের সদ্যঃ-ছিন্ন শির,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী,
মুণ্ডমালাবিশোভিনী,
দানবের মহাকাল দলি পদতলে,
মহাকালী—ক্রোধে মহা মেঘস্বরূপিণী,
বিজলী শোণিতধারা,
ঘোরারাবা, ধ্বংসাকারা,—
দলিয়া দানববল নৃশংস দুর্জয়,
সত্যযুগে পুত্রগণে দিলা বরাভয় !
সিন্ধুগর্ভে বিতাড়িত
করি পুনঃ শিরোত্থিত
ত্রেতায় অনার্যশক্তি, প্রতিহিংসাপর,
ভারত দক্ষিণাপথে বাড়াইলে কর,
আবার মা ! রণরঙ্গে
ডুবালে সিন্ধুতরঙ্গে,
অনার্যের অধর্মের শেষ অভ্যুত্থান,
নাচিলে আনন্দে তারা তারিয়ে সন্তান।
অনার্যের ধর্ম শব
পড়িয়া চরণে তব,
শিরে অর্ধচন্দ্র মালা, করে কুবলয় !—
সত্যযুগে রণমূর্তি, ত্রেতায় বিজয় !
দ্বাপরে বল তারিণী
এরূপে আত্ম-ঘাতিনী
হইবে কি ? মা ! আমরা যত কুলাঙ্গার,
বিফলিব দু' যুগের শ্রম কি তোমার ?
না না, দেখ বীরবর !
উত্তর প্রাচীরোপর
রাজরাজেশ্বরী মাতা, সম্রাজ্ঞী-রূপিণী !
শিরে ধর্ম-সুধাকর,
শোভে পঞ্চভূতোপর
জননীর রাজাসন ; দূর রণশ্রম,—
হইয়াছে জননীর অরুণবরণ।
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
দেখ কিবা মনোহর
সম্রাজ্ঞীর সমরাস্ত্র,—রাজ-প্রহরণ !
চারি দিক্ চারি ভুজে শোভিছে কেমন !
ত্রিকাল ত্রিনেত্রে ভাসি,
অধরে প্রীতির হাসি,

পার্থ! জগন্মাতা-রূপ দেখ নেত্র ভরি,—
মহাভারতের চিত্র রাজরাজেশ্বরী।
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ,
দেখিলেন দুই জন,
সে চিত্র মহিমাময়; চারিটি নয়ন
ভক্তিভরে অচঞ্চল করিল দর্শন।

অর্জুন

এ মহা রহস্য জ্ঞান
হয় নাই, ভগবান।
এ মূঢ় দাসের তব; কহ দয়া করি,
কহ কি অভীষ্ট তব,—
এই খণ্ড রাজ্য সব
ধ্বংসিয়া, সাম্রাজ্য এক করিবে স্থাপিত,
আবার ভারত রক্তে করিয়া প্লাবিত?

কৃষ্ণ

সমর সর্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়!
রক্ষিতে দশের ধর্ম,
নহে পার্থ! পাপ কর্ম
একের বিনাশ। পার্থ! নিষ্কাম-সমর,—
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর।
দেখ, সখে! সৃষ্টি রাজ্য,
স্বয়ং স্রষ্টার কার্য,—
দেখ তাহে ধ্বংসনীতি অলঙ্ঘ্য কেমন!
সাধিতে সৃষ্টির তত্ত্ব
প্রতিকূল, কি অশক্ত,
যেই জন, ধ্বংস তার ঘটিছে তখন;—
কি রহস্য! মৃত্যু এই জগত-জীবন!
কি ছার নৃপতি শত!
স্রষ্টার মঙ্গলব্রত
বিফলি, কোটীর সুখে হইবে কণ্টক,—
পবিত্র ভারত-ভূমি করিবে নরক।

অর্জুন

ধ্বংসনীতি প্রকৃতির
যদি দেব! সত্য স্থির,
প্রকৃতি রক্ষিবে তবে নীতি আপনার,
আমাদের তাহাতে কি আছে অধিকার?

কৃষ্ণ

ফুটিলে কণ্টক দেহে,
নির্গত করিতে কি হে
সে কণ্টক, আমাদের নাহি অধিকার?
ধর্ম যাহা মানবের,
ধর্ম তাহা সমাজের;
যেই বারিবিন্দু, সখে! সেই পারাবার;
সমাজ-কণ্টক তথা করিবে উদ্ধার।
অন্যথা কণ্টক-বিষ,
যেন তীব্র আশীবিষ,
করিবেক জর্জরিত সমাজ-শরীর;—
অচিরে পড়িবে গ্রাসে সে ধ্বংস-নীতির।

অর্জুন

সমাজ-কণ্টক কিসে পাব পরিচয়?

কৃষ্ণ

শরীর-কণ্টক যাতে জান, ধনঞ্জয়!
মানব-শরীরে ব্যথা;
সমাজ-শরীরে তথা
অশান্তি ও অবনতি;—জ্বলন্ত যেমন
দেখিছ সর্বত্র পার্থ! ভারতে এখন।

অর্জুন

কিন্তু হেন নরমেধ যজ্ঞ বিভীষণ,
দয়াময়! হেন রণ
করিবে কি সংঘটন?

কৃষ্ণ

বরং নিবাব সেই ভীষণ বিগ্রহ,
হইতেছে প্রধূমিত যাহা অহরহ।
গৃহ-ভেদ, জাতি-ভেদ,
রাজ্য-ভেদ, ধর্ম-ভেদ,
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি, করিবে নিশ্চয়

ভগ্ন এই আর্যজাতি।
চাহি আমি বক্ষ পাতি
নিবারিতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চির-শান্তি; নহে সখে! সমর দুর্বার।
যেই রাজ্য অসিধারে
সৃজিত, সে পারাবারে
বালির বন্ধন ক্ষুদ্র। মানব-হৃদয়
কার সাধ্য অসিধারে করিবে বিজয়?
যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম,
শাসন নিষ্কাম কর্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি ধর্ম, ধনঞ্জয়! নহে পশুবল।

অর্জুন

ভীষণ শার্দুলগণে,
নাহি বিনাশিলে রণে,
শান্তিতে সাম্রাজ্য দেব! হবে কি স্থাপিত?

কৃষ্ণ

উপায় মায়ের চিত্রে রয়েছে লিখিত!
বাঁধি ধর্ম-নীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব-মর্ম,—
এক জাতি, এক ধর্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!
পাশাঙ্কুশে যদি পার্থ!
সাধিতে এ পরমার্থ
নাহি পারি, জননীর আছে ধনুঃশর,
প্রবেশিব ধর্মরণে নিষ্কাম-অন্তর।
যুদ্ধ পাপ ঘোরতর,
যতক্ষণ বীরবর
থাকে অন্য পথ ধর্ম করিতে পালন;
নিরুপায়ে বীরব্রত পুণ্যপ্রস্রবণ!

অর্জুন

ধর্ম তবে বলি কারে?
নরহত্যা—ধর্ম? ধর্ম-কর্ম বা কেমন,
দাসে দয়া করি কহ কংসনিসূদন!

কৃষ্ণ

যাহাতে ধারণ যার
সেই পার্থ! ধর্ম তার;
সেই নীতিচক্র করে জগৎ ধারণ,
সেই জগতের ধর্ম-চক্র সুদর্শন।
তাঁর সূক্ষ্ম অঙ্গমাত্র,
মানবের ধর্মশাস্ত্র।
ওই নীতিচক্র কার্য অশ্রান্ত জগতে,
তিলেক নাহিক সাধ্য তিষ্ঠি কোন মতে।
উন্নতি কি অবনতি,—
জগতে এ নিয়তি;
ধর্ম-কর্ম,—নীতিশিক্ষা, নীতির সাধন,
কর্মফল নিয়ন্তায় করি সমর্পণ।
আর্য-সমাজের গতি
আজি ঘোর অবনতি
নীতির লঙ্ঘন পাপে; আইস দু'জন,
ধরার এ পাপভার করিব মোচন।

অর্জুন

জ্ঞানাতীত নারায়ণ,—
কর্মফল সমর্পণ
কেমনে করিব দেব! চরণে তাঁহার?

কৃষ্ণ

জননীর ওই চিত্র দেখ আরবার।
বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা
পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিতা,
—পঞ্চভূতময়ী সৃষ্টি,—সর্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু অধিষ্ঠান!
পার্থ! সর্বভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম,—ধর্ম; পুণ্যফল তার

হয় সর্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার।

অর্জুন

কি উদ্দেশ্য এ ধর্মের?

কৃষ্ণ

সখে, মোক্ষসুখ!
বিষ্ণু সর্বভূতময়,
জন্ম মৃত্যু কিছু নয়,
জলবিন্দু জলে জন্মে, জলে হয় লয়;
'সোঽহং' সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়
জগতের সুখ যাহা,
আমাদের সুখ তাহা,—
সকলে জগৎসুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ-অধিষ্ঠান!
অন্যথা সকলে, পার্থ!
সাধে যদি নিজ স্বার্থ,
কি পশুত্বে পরিণত হইবে মানব;—
আজি এ ভারত তার দৃষ্টান্ত, পাণ্ডব!

অর্জুন

তবে যাগ-যজ্ঞ সব
নহে ধর্ম, হে কেশব!

কৃষ্ণ

নহে পূর্ণধর্ম, যদি না হয় নিষ্কাম;
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম-জ্ঞানের সোপান।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
অপূর্ণ মানব-মন,
অপূর্ণে পূর্ণের জ্ঞান, অন্তে অনন্তের,—
দুরূহ তপস্যা সাধ্য।
অনন্ত সে বিশ্বারাধ্য;—
পূজিয়া অনন্ত মূর্তি অনন্ত শক্তির,
লভিবে বিভক্তি হ'তে জ্ঞান সমষ্টির।
দেখ ওই নীলাকাশ,
অনন্তের কি আভাস!
নাহি সাধ্য পূর্ণমূর্তি করি দরশন।
যার সাধ্য যতটুকু
দেখি সে অনন্ত মুখ,
লভি যথা ধনঞ্জয়! আকাশের জ্ঞান;
যাগ যজ্ঞ তথা পার্থ! পূর্ণব্রহ্ম ধ্যান।

অর্জুন

এ মহা নিষ্কামধর্ম জগতে প্রচার
যদি মহাব্রত তব,
কি কায, মহানুভব!
ভারত-সাম্রাজ্যে তবে? যে রাজ্য তোমার,
ক্ষুদ্র নররাজ্য তার কাছে কোন্ ছার!

কৃষ্ণ

যত দিন খণ্ডরাজ্য
রহিবে ভারতে, আর্য
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয়;
রহিবে এ রাজ্যভেদে ধর্ম ভেদময়।
ফল ফুল ভিন্ন যথা,
তরু ভিন্ন হবে তথা,
প্রকৃতির এই নীতি; ক্ষুদ্র ভিন্নতায়
করে ধর্ম-বিভিন্নতা যথায় তথায়।
এক ধর্ম, এক জাতি,
একমাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য, নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
তত দিন হিংসানল,
হায়! এই হলাহল,
নিভিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত;
আর্যজাতি, আর্যনাম, হবে স্বপ্নবৎ।
ধর্মভিত্তি নাহি যার,
বালিতে নির্মাণ তার,
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ, নিজ পাপভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙ্গি কাল-পারাবারে।
তেমতি, হে মহাবল!
সমাজ-সাম্রাজ্য-বল

নাহি যে ধর্মের, তাহা হবে না প্রচার,
নহে সত্ত্ব-গুণমাত্রে সৃজিত সংসার।
পবিত্র নিষ্কাম-ধর্ম,
তুমি কি তাহার মর্ম
বুঝিয়াছ, করিয়াছ সে ধর্ম গ্রহণ?

অর্জুন

করিয়াছি,—লইয়াছি চরণে শরণ।

কৃষ্ণ

দেখ তবে, মহারথ!
তোমার কর্তব্যপথ,
জননীর ওই চিত্রে অঙ্কিত সুন্দর,
ততোধিক নর-ব্রত নাহি মহত্তর!
এস, মিলি দুই জন
করি আত্ম-সমর্পণ
এই কর্তব্যের স্রোতে, যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া।
একধর্ম একজাতি
একরাজ্য, একনীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম-কর্ম,
লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম-রাজ্য মহাভারত স্থাপিত।

ধনঞ্জয় ভক্তিভরে,
কৃষ্ণের চরণ করে
পরশিয়া কহিলেন, প্রণত ভূতলে—
"কি সাধ্য, পুরুষোত্তম!
আমি ক্ষুদ্র কীটোপম,
একটি ত্রিদিব আমি করিব সৃজন!
নাহি জানি কিবা ধর্ম,
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম,
জানি এই মাত্র,—তুমি নর-নারায়ণ;
জানি ধর্ম,—তব পদে আত্ম-সমর্পণ।"

ভাসি প্রীতি-অশ্রু-নীরে,
নারায়ণ ফাল্গুনীরে
কহিলেন প্রীতিভরে শান্তি অবিচল,—
"এত দিনে মনে হয়,
বুঝিলাম নিঃসংশয়
মহর্ষি গর্গের সেই ভবিষ্যদ্বাণী।
দুটি নদী অর্ধপথে,
মিলি মা গো! এই মতে,
অদৃষ্টের পারাবারে চলিল বহিয়া,
তব অই মূর্তি-ধ্যানে হৃদয় ভরিয়া!"
কিছুক্ষণ দুই জন
করিলেন দরশন,
জননীর সেই মূর্তি, সজল নয়ন
কহিলেন গদ গদ স্বরে জনার্দন—
"সব্যসাচি! সন্ধ্যাকালে
উদ্যানের অন্তরালে
বসি সুভদ্রার সহ, করিলে জ্ঞাপন
যেই হৃদয়ের ভাষা,
যেই হৃদয়ের আশা,
জানিয়াছি যোগবলে আমি, শক্তিমান!
আশীর্বাদ করি হও পূর্ণমনস্কাম!
প্রভাতে অরুণোদয়
হবে যবে, ধনঞ্জয়!
দারুক যোগাবে রথ,-যাবে মৃগয়ায়।"
(লুকাইল মৃদু হাসি অধর-কোণায়।)
"রজনী বহিয়া যায়,
চিন্তা-অবসন্ন কায়,
করগে বিশ্রাম; সখে! কালি জগন্নাথ
করিবেন আমাদের জীবন প্রভাত।"
সে মৃগয়া, সেই মৃদু হাসি মনোহর,
বুঝিলেন ধনঞ্জয়।
বন্দি পদকুবলয়,
চলিলেন নিজ কক্ষে; নীলাকাশে আর
নাহি মেঘ; কিবা হাসি ফুল্ল-চন্দ্রিকার!

অষ্টাদশ সর্গ

তপস্বিনী

"তুই রে পোড়ার মুখ!"—নিশীথসময়ে
জরৎকারু বসি নিজ কক্ষ-বাতায়নে—
মৃগচর্ম-শয্যা-অঙ্কে। সস্মিত-হৃদয়ে
ভাসিছে সরস হাসি অধরে নয়নে।
ভাসিছে শারদশশী শারদ-আকাশে;
শারদ জলদমালা ঐরাবত মত
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে মন্থর-বিলাসে,—
আবেশে অবশ অঙ্গ। বিলাসীর মত
আবেশে শারদানিল অতি ধীরে ধীরে
কিবা যেন প্রেমকথা যাইছে কহিয়া।
অধর টিপিয়া যেন হাসিতেছে ধীরে
সম্মুখে সরসী-নীর; অধর টিপিয়া
হাসিতেছে জরৎকারু তপস্বিনী-বেশ।
পরিধান রক্তবাস; রুদ্রাক্ষের মালা
শোভে অঙ্গে অঙ্গে; ধূলাধূসরিত কেশ;—
ভস্মে ঢাকা যৌবনের অপরূপ ডালা।
কহিছে অধর টিপি—
"তুই পোড়ামুখ!
তুই শশী নিত্য আসি কেন রে আমায়
জ্বালাস্ এরূপে বল্? ফাটে এই বুক,—
বারেক বাহিরে যদি এক পদ যাই,
যেই প্রেমভরে তুই দিস আলিঙ্গন
অধীর করিয়া প্রাণ; এলে বাতায়নে
মুখ বাড়াইয়া তুই করিস্ চুম্বন।
গেলে কক্ষে, উঁকি মেরে কটাক্ষ নয়নে
করিস্ রে জ্বালাতন! নিদ্রা যাই যদি
তুই বাতায়ন-পথে চুরি করি আসি
থাকিস্ রে ঘুমাইয়া বক্ষে নিরবধি,
সতী-নারী আমি, মম সতীত্ব বিনাশি।
ওরে গুরুপত্নী-চোর! একবার তোর
ঋষিপত্নী-চুরি করি পুড়িয়াছে মুখ
আমি জরৎকারু-পত্নী, মম মন-চোর
হইবি বাসনা পুনঃ এত বড় বুক?
আসিয়াছে ঋষি আজি নাবির মম,
তোর ব্যভিচার-কথা দিব রে কহিয়া;
এক দীর্ঘ অভিশাপে দেখিস্ কেমন
মুহূর্তে চন্দ্রত্ব তোর দিবে ঘুচাইয়া।
তবু হাসে পোড়ামুখ! সাম্রাজ্য-প্রয়াসী
জানিস্ না ভ্রাতা মম করেছে আমার
সমর্পণ এ যৌবন, এই রূপরাশি;
প্রজ্জ্বলিত হোমানলে,—হাসি কি আবার?
এক অভিশাপে তোর বংশধরগণ—
যাদব কৌরব সব—যজ্ঞ-কাষ্ঠ মত
হবে ভস্মে পরিণত; সাম্রাজ্য-স্বপন
ফলিবে ভ্রাতার, হবে পূর্ণমনোরথ।
হাসি বড় নহে, এ যে মুনি জরৎকারু!
এমন যোটক আর মিলিবে কোথায়?
দু নামই জরৎকারু!—সোহাগা সোণায়!
কুসুমের মালা পোড়া কাঠের গলায়!
তবু হাসে কালা-মুখ! তোর ও রগড়
আমি পতি-পরায়ণা দেখিব না আর।"
ক্রোধে জরৎকারু বেগে প্রসারিত কর,
রোধিল বজ্রের শব্দে গবাক্ষের দ্বার।
মুহূর্তেক রূপবতী মুদিয়া নয়ন
রহিলা শায়িতা; ত্রস্তে উঠিয়া আবার
পড়ি ভূমিতলে—"পোড়া নিদ্রাও এমন,
কিছুতেই চক্ষে নাহি হইবে সঞ্চার।
জাগি কি নিদ্রা যাই কিছুই বা না জানি;

এক পিপাসায় প্রাণ সতত আকুল ;
অনিবার হৃদয়েতে কিবা আত্মগ্লানি !—
বিঁধে কি কণ্টক শুষ্ক আশার মুকুল !
রাজ্য-স্বপ্নে প্রেম-স্বপ্ন পার ভুলিবারে,
তুমি সহোদর ! হায় ! আমি অবলার
নাহি সে সান্ত্বনা, কিবা বিধি বিধাতার—
একই সাম্রাজ্য প্রেম, সর্বস্ব আমার !
হয়েছি সর্বস্বহারা ; বিদরে হৃদয়
কৃষ্ণ-প্রেমরাজ্যের যে ছিল আকাঙ্ক্ষিণী,
—নিদারুণ অদৃষ্ট কি এতই নির্দয় !—
আজি জরৎকারুর সে শয্যার সঙ্গিনী !
ফুলফুলেশ্বরী সেই গর্বিতা পদ্মিনী
সদা ভানু-প্রয়াসিনী, যে বিধি তাহারে
নিক্ষেপিল পঙ্কে ;—সেই মানিনী নলিনী
নিক্ষেপিল যজ্ঞ-ভস্মে সেই কি আমারে ?
ফুলরাণী কমলিনী যথা পঙ্কজিনী,
জরৎকারু তপস্বিনী হইল তেমন ;
মথি প্রেম-পয়োনিধি, সুধা-প্রয়াসিনী,
হা অদৃষ্টে ! হলাহল পাইল এমন ?”

শয্যাপার্শ্বে ছিল পড়ি অযতনে
বিচিত্র দর্পণ,
লইয়া রূপসী গেল সুবাসিত
দীপের সদন ;—
“তপস্বিনী-বেশ,— তথাপি কেমন
পড়িছে ঝরিয়া
রূপের মাধুরী, যৌবন-তরঙ্গ,
যাইছে ছুটিয়া।
শরতের মেঘ শোভিছে কেমন
ধূসরিত কেশ !
উদাসীন সব, হইয়াছে যেন
সুখ-নিশি শেষ।
ফুটন্ত নলিনী দেখি ত তোমার
ভুলিল না মন ;
হয় ত ভুলিতে মুদিতা নলিনী
দেখি, প্রাণধন।
ফুটন্ত শোভায় কে বল না ভুলে,
ভুলে বালকের প্রাণ ;
মুদিতের শোভা যে বুঝিতে পারে,
সেই সে হৃদয়বান্।
জানি আমি, নাথ ! তোমার হৃদয়
কোমল উচ্ছ্বাসময়
এই উদাসীন, ঘুমন্ত ঘুমন্ত
মেঘে ঢাকা চন্দ্রোদয়,
হয় ত ভুলিতে বারেক দেখিলে,—
না, না, প্রাণে নাহি সয়।
তুই মিথ্যাবাদী, তুই রে দর্পণ !
নিত্য প্রতারণা তোর
না পারি সহিতে, বুঝিয়াছি আমি
তোর এ চাতুরী ঘোর।
সত্য যদি হ'ত রূপের গগনে
এমন যৌবন-লীলা !
প্রেম-বিনিময়ে পাইতাম আমি
তবে কি এমন শিলা ?
তুই প্রবঞ্চক, তুই ত প্রথম
এই প্রতিবিম্ব ধরি
করিলি গর্বিতা, যে গর্বে ডুবিয়া
এইরূপে আমি মরি।
আজি তপস্বিনী সাজিয়াছি আমি,
তবু প্রবঞ্চনা তোর ?
দেখাইয়া ছবি মিছা অভিমানে
পোড়াস্ পরাণ মোর।
আর তোরে কাছে রাখিব না আমি,
দূর হও চাটুকার !”
বাতায়ন-পথে ছুটিল দর্পণ,—
আঘাতে কাঁপিল দ্বার।
“জরৎকারু ! কুঞ্জ- দ্বারে নটবর,
শবগন্ধে সুবাসিত,

এসেছে রে ওই মনচোরা তোর,
পৃষ্ঠে কুব্জ দোলায়িত।"
দুর্বাসা অধীর ক্রোধে; ভীম যষ্টি দিয়া,
করিতেছে কপাটেতে আঘাত ভীষণ।
"কি বালাই! পুরবাসী উঠিবে জাগিয়া।"
বলি জরৎকারু দ্বার করিল মোচন।
"রে নাগিনি! পিশাচিনি! ব্যঙ্গ মম সনে!
আমি ঋষি জরৎকার দাঁড়াইয়া দ্বারে
এতক্ষণ। কিছু তোর শঙ্কা নাহি মনে?
এখনি পাঠাব তোরে শমন-আগারে।"
উঠিল ভীষণ যষ্টি, ছাদেতে ঠেলিয়া
হ'লো কুব্জ কেন্দ্রচ্যুত; দুর্বাসা ভূতলে
পড়িতেছে, জরৎকারু, বাহু প্রসারিয়া
ধরিল,—পড়িল ঘৃত জলন্ত অনলে!
"পাপীয়সি! দুশ্চারিণি! ধরিলি আমারে,
ছুঁইলি পবিত্র অঙ্গ,—গরব এমন!"
করিলা শ্রীপদাঘাত; ফুল্ল-পুষ্প-হারে
বিঁধিল কঠিন শুষ্ক কণ্টক যেমন!
"ভ্রাতার সাম্রাজ্য যাক্ চুলায় এখন!
চূর্ণ করি এই দণ্ডে অস্থির পঞ্জর,
ইচ্ছা বাতায়ন-পথে করিতে প্রেরণ
যম-রাজ্যে; একি পাপ! কেমন বর্বর!"—
স্বগত ভাবিয়া কারু, কহিল কাতরে—
"ভূতলে পড়িলে, প্রভু! লাগিত বিষম,
ধরেছিল তাই দাসী।"

দুর্বাসা

পড়িবে ভূতলে!
জরৎকার ধরাতলে হইবে পতন!
জরৎকার মহাঋষি! ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে!

জরৎকারু

জ্বলিতে কি আছে বাকি? কপাল আমার!

দুর্বাসা

আমার পতন চক্ষে দেখিবে বসুধা!—

জরৎকারু (স্বগত)

তিন পদাঘাত! ভাল অদৃষ্ট, এবার,
পাইলেন বসুন্ধরা পদাম্বুজ-সুধা!

দুর্বাসা

নিজে বসুমতী উঠি ধরিত আমারে,
তুই দুশ্চারিণী কেন ছুঁইলি আমায়?

জরৎকারু

(স্বগত) চিরদিন তাঁর গর্ভে ধরুন তোমারে
মাতা বসুন্ধরা, কারু এই ভিক্ষা চায়!

দুর্বাসা

কি বলিলি ভুজঙ্গিনি?

জরৎকারু

কিছুই না প্রভু!

দুর্বাসা

কিছুই না প্রভু! দ্বারে আমি জরৎকার
দাঁড়াইয়া এতক্ষণ—কিছুই না প্রভু!—
মনের আনন্দে তুই করিস্ বিহার!
তখন পশিল কর রমণী-চাঁচরে,
কান্তে যেন নব তৃণরাশির ভিতরে!
দুর্বাসার দুই পদ ধরি দুই করে,
—দুইটি পঙ্কজ যেন পড়িয়া প্রস্তরে!—
বিস্ফারিত দুই নেত্রে চাহি করি ছল,
কহে জরৎকারু, কণ্ঠ কোমল তরল!—
"নহে দুশ্চারিণী দাসী। হ'তে যেই দিন
পাইয়াছে স্থান দাসী পবিত্র চরণে,—
আশা সরসিজ তার,—হ'তে সেই দিন
সাজিয়াছে জরৎকারু যোগিনী যৌবনে।
একই তপস্যা তার হ'তে সেই দিন,—
প্রভুর চরণাম্বুজ। দাসী উদাসীন
সংসার বিলাস-সুখে হ'তে সেই দিন;
পাইয়াছে জরৎকারু জীবন নবীন।"
কেশ-মুষ্টি দুর্বাসার হইল শিথিল।
বলিতে লাগিল বামা,—"দেখিনু যখন

প্রবেশিতে নাগপুরী পদ পুণ্যশীল,
আনন্দে অধীর প্রাণ হইল তখন।
ভাবিতেছিলাম শুয়ে অজিনশয্যায়
কতক্ষণে এ হৃদয়ে করিব ধারণ
সে পবিত্র পাদপদ্ম ; সঁপেছি যথায়
পাণি মম, প্রাণ তথা করিব অর্পণ।
না জানি কেমনে নিদ্রা শত্রুবেশে মম
আচ্ছন্ন করিল পাপ নয়ন আমার।
স্বপনে স্বামীর পদ করি দরশন
ছিনু সুখে অভিভূত ; কপাটে প্রহার”—

দুর্বাসা

শুনিলি না ভুজঙ্গিনি ! জানি ছয় মাস
নিদ্রা যায় ভুজঙ্গিনী। কিন্তু ইচ্ছামত
নাহি মরে জরৎকার তোর অভিলাষ
করি পূর্ণ ; নাহি হয় স্বপ্নে পরিণত।

জরৎকারু

(স্বগত) দূর হক্ ইচ্ছামত,—যদি একবার
বুঝিতেন যমরাজ ভুল আপনার !
(প্রকাশ্যে) জন্মায়স্তি এ দাসীর। সমান তাহার
ধরাতলে ভাগ্যবতী কেবা আছে আর ?

দুর্বাসা

ঋষি-পত্নী ভাগ্যবতী ! রহস্য নূতন।
বিলাসিনী জরৎকারু রাজার নন্দিনী
বেড়াইবে বনে বনে ! বল্কল বসন,
আহার বনের ফল, অজিন-শায়িনী !

জরৎকারু

আপনি তপস্বী তুমি, ক্ষমিবে কি, প্রভু !
প্রগল্‌ভতা এ দাসীর ?—রমণী-হৃদয়
কি যে রমণীয়,– তাই বুঝ নাহি কভু,
রমণীর প্রাণ কিবা সহিষ্ণুতাময়।
রমণী জগৎপত্নী, জগৎ-জননী,
জগৎ-দুহিতা নারী। হৃদয় তাহার
না হইলে রূপান্তর, সলিল যেমনি,
যখন যেরূপ হয় ছায়ার সঞ্চার ;
সলিলের মত যদি রমণীর প্রাণ
না হইত সমভাবে সর্বত্র বিলীন ;
হইত জগৎ কিবা ভীষণ শ্মশান—
পত্নীহীন, মাতৃহীন, দুহিতৃ-বিহীন।
সলিলের মত নারী যাহাতে যখন
যায় মিশাইয়া, প্রভু ! করে অধিকার
তার ধর্ম ; মিশাইয়া জীবনে জীবন
অবিচ্ছিন্ন, হয় সহধর্মিণী তাহার !
শিখিয়াছি গুরুমুখে এ আত্ম-নির্বাণ
রমণীর মহা-সুখ, মহত্ত্ব মহান্ ;
বিলাস প্রাসাদ, কিবা ভীষণ শ্মশান,
রমণীর মহাব্রত সর্বত্র সমান্।
ছাড় প্রভু ! অপবিত্র এই কেশভার—
পাপ বিলাসের সাক্ষী,—কাটিয়া এখন
দিব পায়ে ; স্থান তথা দেও অবলার ;
দেখাইব বিলাসিনী যোগিনী কেমন !

খসিল কেশের মুষ্টি, ভ্রমি কিছুক্ষণ
কহিলা দুর্বাসা—“কিবা তত্ত্ব সুগভীর !
গুরু তব বিচক্ষণ !”

জরৎকারু (স্বগত)

না হ'লে কি কভু
বিকাতেম প্রাণ মন এই অভাগীর ?

দুর্বাসা

সত্যই কি ইচ্ছা তব হতে তপস্বিনী ?
পারিবে সহিতে তুমি সে দুঃখ বিষম ?

জরৎকারু

নীরজা নলিনী প্রভু ! ভানু-আকাঙ্ক্ষিণী,
আতপের তাপে সে কি ডরায় কখন ?
সুখ দুঃখ শুনিয়াছি সেই গুরুমুখে,
রূপান্তরে পরিণামমাত্র বাসনার।
সকল বাসনা সুখে, নিষ্ফল যে দুঃখে
হয় পরিণত মাত্র ; মানব আবার

এত অবস্থায় দাস, তাহার বাসনা
শতে এক নাহি ফলে ; মানবজীবন
তাহে এত দুঃখময়, এত বিড়ম্বনা।
যাহার আকাঙ্ক্ষা যত দুঃখও তেমন।
নিষ্কাম জীবন সুখ ; পতির চরণে
সকল কামনা তার করি সমর্পণ,
প্রবেশিবে এই দাসী শান্তির আশ্রমে,
হইবে তপস্যা তার পতির চরণ।

দুর্বাসা (স্বগত)

বিলাসিনী, ঘোর অভিমানিনী, ইহায়
ভাবি মনে করিলাম এত অপমান
করিবারে গর্ব চূর্ণ। সত্যই কি হায়!
তপস্বীর নাহি নারী-হৃদয়ের জ্ঞান?
বৃথা ভস্ম ঘেঁটে মরি, মহর্ষি আমরা!
পুণ্য-খনি গৃহাশ্রম! কতই রতন
ফলে এইরূপে তথা ; প্রকৃত অমরা
রমণী-হৃদয়, চির-শান্তি-নিকেতন।
কিন্তু এ "নিষ্কাম" কথা শেলসম কাণে
বাজিয়াছে, এই কথা শিখিল কেমনে?
শুনিয়াছি সেই পাপ ছিল এইখানে ;
সে কি গুরু? সন্দেহ যে হইতেছে মনে।
(প্রকাশ্যে)
সরলে! "নিষ্কাম" কথা আনিও না আর
তব মুখে ; নাস্তিকতা মূলে আছে তার।
সকাম মানব-ধর্ম, তাহার সাধন
যাগ-যজ্ঞ ; মূল বেদ ; সাধক ব্রাহ্মণ।
পবিত্র বৈদিক-ধর্ম শিখাব তোমারে
অবসরে জরৎকারু! করিতে উদ্ধার
রাহুগ্রস্ত সত্য-ধর্ম ; কারু! স্থাপিবারে
অনার্য-সাম্রাজ্য এই ভারতে আবার ;—
সাধিতে এ মহাযজ্ঞ, বনবাসী আমি
পরিয়াছি পরিণয়-সংসার বন্ধন।
হবে তপস্বিনী তুমি? আমি তব স্বামী,
এ মহা তপস্যা আজি করাব গ্রহণ,—
ত্যজিয়া বিলাস, তুমি শক্তি-স্বরূপিণী,
স্বামী সহোদর সহ হইয়া মিলিত,
প্রবাহিয়া ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিণী,
ভারতে অনার্য-রাজ্য কর অধিষ্ঠিত!
হবে তুমি নাগমাতা অধিষ্ঠাত্রী তার,
রুদ্রাণীর মত পূজা হবে মনসার।

জরৎকারু

জরৎকারু-পত্নী আমি ; ভগ্নী বাসুকির ;
নাগরাজকুলে জন্ম। প্রতিজ্ঞা আমার
পরশি পতির পদ,—অসাধ্য নারীর
সাধিব, অনার্য-রাজ্য করিব উদ্ধার।

দুর্বাসা

ধন্য ধন্য জরৎকারু! সিংহের কুমারী,
সিংহিনী যোগ্যা এই প্রতিজ্ঞা তোমার!
অনুকূল দেবগণ,—হইয়া কাণ্ডারী
করাইব নাগরাজে এই সিন্ধু পার।
অনুকূল দেবগণ,—কুরুকুল-পতি
আসিতেছে ক্ষিপ্ত মত্ত মাতঙ্গের মত
রৈবতকে যে কৌশলে, নিজে রতিপতি
নিশ্চয় মানিবে হারি। মুক্ত আশা-পথ,—
ধনঞ্জয় দুর্যোধন আকুল উভয়
রূপসী সুভদ্রা তরে। ক্রুদ্ধ বলরাম
এক দিকে ; অন্য দিকে কৃষ্ণ পাপাশয় ;—
আশু শুভ-পরিণয় হবে সমাধান!
আশু রৈবতকমূলে হইবে নির্মূল
বিপুল ক্ষত্রিয়কুল,—যাদব কৌরব।
ফুটিয়াছে সুভদ্রার বিবাহের ফুল,
বাসুকি হইবে কারু! সুভদ্রাবল্লভ।
তৃতীয় প্রহর নিশি, করিব বিশ্রাম
ক্লান্ত দেহ পথশ্রমে।

মুদিয়া নয়ন

কুশোপরে মহা-মূর্তি হইল শয়ান ;
হাসি নিবারিয়া কারু সেবিছে চরণ।

সরি দাঁড়াইলা বামা অন্ত বাতায়নে।
শারদ-নিশির শেষ বহিছে সমীর
মৃদু মৃদু ; ডাকিতেছে দয়েল কাননে ;
জলিছে হীরকরাজি আকাশ খনির।
বহুক্ষণ জরৎকারু চাহিয়া চাহিয়া
কহিল—"কঠোর কিবা পুরুষের প্রাণ !
কেমন হৃদয় স্বার্থ পাষাণে বাঁধিয়া
আমরা অবলাগণে দেয় বলিদান !

কি দশা ভদ্রার আজি ! কি দশা আমার
দেখ আজি প্রাণনাথ ! আদরে তোমার
এক দিন ছিল পূর্ণ হৃদয় যাহার,—
আজি পদাঘাত নাথ ! অদৃষ্টে তাহার !
অনার্য্যা স্বার্থের পথে না হ'লে কণ্টক
ঠেলিতে কি পারে তারে ? কিন্তু আর প্রাণ
না পারে বহিতে এই নিরাশা-নরক,
জলিতেছে বুকে সদা কি যেন শ্মশান।
পাপিষ্ঠের ঘূর্ণচক্রে ঝাঁপ দিয়া পড়ি
দেখিব নিবে কি জালা। দেখিব কি করি
প্রতিদান দিতে আর পারি, প্রাণনাথ !
সেই প্রত্যাখ্যান,—আর এই পদাঘাত।"
ফিরি কক্ষে অভাগিনী করিল শয়ন
দুর্ব্বাসার পদপ্রান্তে ; ক্লান্ত কলেবর
নিদ্রার মাদকে মুগ্ধ হইল তখন।
পোহাল শর্ব্বরী ; ঋষি জাগিলা সত্বর।

দুর্ব্বাসা (স্বগত)

এ ত নহে নারীরূপ, জলন্ত অনল !
বেড়াইব বনে বনে লইয়া ইহায় ;
বর্ব্বর অনার্য্যজাতি পতঙ্গের দল
ঝাঁপ দিবে এ বহ্নিতে যথায় তথায়।
এইবার আশামত না ফলিলে ফল,
যে বিষ অঙ্কুর তরু হইবে রোপিত,
কালে প্রধুমিত হ'য়ে বৈরিতা-অনল,
ক্ষত্রিয়ের দুই বাহু হইবে ভস্মিত।
তখন এ রূপানলে জ্বালি দাবানল,
বাহুশূন্য কলেবর করিব দাহন।
দেখিবি, দেখিবি, কৃষ্ণ ! দেখিবি তখন।
দুর্ব্বাসার অভিশাপ অব্যর্থ কেমন।

ঊনবিংশ সর্গ

অদৃষ্টফল

এইরূপে ভারতের অদৃষ্ট-আকাশে
দুই দিকে প্রতিঘাতী দুই মহা মেঘ
করিয়া সঞ্চার, অস্ত গেল নিশানাথ।
ভারতের ইতিহাসে, মানবজীবনে,
ঈষৎ জলদাচ্ছন্ন শান্ত সুগভীর
এক মহাদিন ধীরে হইল প্রভাত।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য; বৈতালিকগণ
গাহিছে মঙ্গলগীত; পুরদেবীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী,—কুসুম-উদ্যান
মন্থর-তরঙ্গে যেন চলেছে ভাসিয়া।
তুরঙ্গের তীব্র-কণ্ঠ, মাতঙ্গগর্জন,
বাদ্যের নিনাদ; উচ্চ-বৈতালিক গীত।
রমণীর হুলুধ্বনি রহিয়া রহিয়া,
মিলাইয়া একতানে মঙ্গলসঙ্গীত
শত-কণ্ঠে রৈবতক গাহিছে গম্ভীরে।
ভাঙ্গিল পার্থের নিদ্রা। নবীন উৎসাহে
উঠিলা ফাল্গুনী যবে, দেখিলা বিস্ময়ে
সুসজ্জিত রণসজ্জা সম্মুখে শয্যার।
কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শৈল
অনিমিষ দু' নয়নে রহেছে চাহিয়া
অর্জ্জুনের মুখপানে,—বড়ই কোমল
দৃষ্টি, শান্ত, সুশীতল। ঈষৎ হাসিয়া
কহিলা প্রসন্নমুখে পার্থ স্নেহস্বরে,—
"কেমনে জানিলে শৈল! প্রয়োজন মম
রণসজ্জা?" নিরুত্তর রহিল বালক
অন্যমনে, সেই দৃষ্টি দ্বিগুণ কোমল।
বিস্মিত হইলা পার্থ। জানিতা বালক
থাকে নিরন্তর চাহি মুখপানে তাঁর।
বালকের কুতূহল, প্রভুভক্তি কিবা,—
ভাবিতেন মনে পার্থ। কিন্তু আজি যেন
পার্থের সেরূপ নাহি হইল বিশ্বাস।
সেই রণবেশ শূর উৎসাহে যখন
পরিতে লাগিলা, ধীরে হ'য়ে অগ্রসর
পরাতে লাগিল শৈল। যেখানে যখন
পরশিছে অঙ্গ কর, হইতেছে জ্ঞান
পরশিছে অঙ্গ যেন, পুষ্প সুকোমল;—
পুষ্প যেন সেইখান রহিবে লাগিয়া।
হইলেন অন্যমন, পার্থ কিছুক্ষণ।
কহিলেন—"শৈল! মম রৈবতকবাস
হইয়াছে শেষ, তুমি ছাড়িয়া আমায়
যাইবে কি গৃহে তব?" দর দর দর
বহিল শৈলের অশ্রু। কহিল কাতরে—
"নাহি গৃহ এ দাসীর।" সে কি? "এ দাসীর!"—
পার্থ ভাবিলেন ভ্রম। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলেন,—"শৈল! তবে চল হস্তিনায়,
পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্রনির্বিশেষে
পালিবে তোমায় পার্থ। তব স্বার্থহীন
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা হইবে তাহার
জীবনের মহাসুখ। হৃদয় তোমার
জগতে দুর্লভ, বৎস!" ছুটিল কাঁদিয়া
নিরুত্তরে ক্ষুদ্র শৈল কক্ষে আপনার।
প্রাচীরে একটি চিত্র চাহিয়া চাহিয়া
কি যেন ভাবিলা পার্থ; কি যেন সন্দেহ
ভাসিল হৃদয়ে—চিত্র ও কি অন্যতর!
চাহিলেন পার্থ, চক্ষু ফিরিল না আর,—
মরি! মরি! কিবা শোভা স্বর্গ নীলিমার
অপূর্ব যোগিনীমূর্তি, মাধুরী-মণ্ডিত;
অপরাজিতার সৃষ্টি, সদ্য সুবাসিত।
কোথায় স্তবকে পুষ্প, কোথা পুষ্পহার,
অঙ্গে অঙ্গে কি তরঙ্গ সলজ্জে সঞ্চার!

কৃষ্ণার নীলিমা,—সে যে প্রভাতগগন
বালার্ককিরণে দীপ্ত, নীল হুতাশন।
জরৎকারু নীলিমার উপমা কেবল,
বারি বিদ্যুতেতে ভরা জলদমণ্ডল।
নীলিমা এ রমণীয়,—শারদ আকাশ
অস্ফুট চন্দ্রাভ, শান্তি-করুণা-নিবাস।
শীতল মাধুর্যে, অঙ্গ, মধুর রেখায়,
শান্তি ও করুণা যেন ঝরিছে ধরায়।
সে স্থির সুন্দর নেত্র ঈষৎ সজল,—
শান্তি করুণার স্বর্গ দর্পণযুগল!
ঈষৎ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর-কোণায়,
শান্তি করুণার স্বপ্ন,—সমাধি,—তথায়।
নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতনু শরীর,
শান্তি করুণার যেন পবিত্র মন্দির।
দেখ মুখ,—দেখিবে সে হৃদয় তাহার,
কি শান্তি-করুণামাখা প্রেম-পারাবার!
নীরব,—কি যেন এক করুণা-উচ্ছ্বাস
অন্তরে অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিশ্বাস
যোগিনীর পরিধান আরক্ত-বসন,
একটি কুসুমহার অঙ্গের ভূষণ।
সেই মুখখানি,—ওকি মুখ বালিকার?
কিবা সরলতা-মাখা কিবা সুকুমার।
কিন্তু সেই শান্তি শোভা স্থিরা সরসীর,
নহে বালিকার,—চিন্তা-রেখা সুগভীর।

"শৈল! শৈল"—কহি পার্থ বিস্ময়ে বিহ্বল,
বসিলা পর্যঙ্কোপরি,—"দেবী কি মায়াবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"

অতি ধীরে জানু পাতি বসি পদতলে,
দুই করে দুই পদ করিয়া গ্রহণ,—
কাতরে কহিলা বামা—"ছলনা দাসীর
ক্ষমা কর বীরমণি; ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে
সতত ব্যথিত প্রাণ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে। কহিব দাসীর—
আত্মপরিচয়, কিন্তু সেই শোকগীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।"—

আত্মবিস্মৃতের মত রহিলা চাহিয়া
ফাল্গুনী সে মুখ পানে—করুণার ছবি!
কহিতে লাগিল বামা—"নাগবালা আমি।"
নাগকুলে জন্ম মম। নিবিড় কানন
যে খাণ্ডবপ্রস্থ আজি, শুনেছি তথায়
পিতৃরাজ্য যুগব্যাপী অলকা সমান
ছিল বিরাজিত প্রভু! পিতৃগণ মম
শাসিতেন সেই রাজ্য প্রবল প্রতাপে।
যেই রাজছত্র তথা আছিল স্থাপিত
ছায়ায় ভারতভূমি ছিল আচ্ছাদিত।
শুনিয়াছি, যবে আর্য-বিপ্লব ঝটিকা
নিল উড়াইয়া এই ছত্র সুবিশাল,
খাণ্ডব করিয়া মহা বনে পরিণত,
ধ্বংস শেষ নাগজাতি লইল আশ্রয়
পাতালে পশ্চিমারণ্যে; পশ্চিম-সাগরে
অস্ত গেলা নাগ রবি চিরদিন তরে।
আমার পিতৃব্যসুত, নাগপুরে যিনি
বাসুকি এখন, ক্রোধী দাম্ভিক যেমন,
বনের শার্দূল নহে ভীষণ তেমন।
নাগরাজ কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণভক্ত পিতা,—
মতভেদে মনোভেদ; ত্যজিয়া পাতাল
কিশোর বয়সে পিতা সংসার সাগরে
দিলা ঝাঁপ অসিমাত্র করিয়া সহায়।
যুদ্ধক্ষেত্রে নাগরাজ্যে ছিল না দোসর
জনকের; কিন্তু সেই প্রেমপারাবার
হৃদয়েতে, হ'ল অসি ভিক্ষা-যষ্টি সার।
বেড়াইলা বনে বনে, অচলে অচলে,
ভারতের নানা স্থানে। শুনিয়াছি, প্রভু!

শিখিলেন ছদ্মবেশে ঋষিদের কাছে
আর্যবিদ্যা, আর্যধর্ম। নির্মাইয়া শেষে,
এই বিন্ধ্যাচলশিরে, "সুনীরার" তীরে,
সুন্দর কুটীর ক্ষুদ্র—"পুলিনকুটীর",—
হইলা আশ্রমবাসী। সেই কুটীরেতে,
সেই শৈলে জন্ম, নাম 'শৈলজা' আমার!

"দেখেছ কি বীরমণি শোভা সুনীরার?
কি সুন্দর সরোবর! সলিলসীমায়
শোভিতেছে চারি দিকে তাল নারিকেল
নানা জাতি, শোভিতেছে স্তবকে স্তবকে
বেষ্টি চারি দিকে তীরে মেখলার মত
ফল পুষ্প লতা গুল্ম বৃক্ষ মনোহর,
সৃজিয়া নয়নানন্দ কানন সুন্দর।
শিলায় বিচ্ছেদে তীরে ক্ষুদ্র পুষ্পবন
শোভিতেছে স্থানে স্থানে ; জলজ কুসুম
শোভে তীরপার্শ্বে জলে, বাপী-মধ্যস্থল
সুনীল আকাশ সম পবিত্র নির্মল!
জলে জলচর, স্থলে পশুপক্ষিগণ,
আনন্দকণ্ঠেতে পূর্ণ করিয়া কানন।
বাপীর পশ্চিম তীরে 'পুলীনকুটীর',—
তরুলতাসমাচ্ছন্ন ; পশ্চিমে তাহার
দূরে নীলাকাশে মিশি মহাপারাবার।
শুনিয়াছি, ঋষি কেহ তপস্যার বলে
সৃজিলা সে সরোবর। সলিল তাহার
সুতরল পুণ্যরাশি ; স্নিগ্ধ-সমীরণ
পুণ্য-শ্বাস, পুণ্য-ভাষা বিহঙ্গকূজন।
"এই কুটীরেতে গেল শৈশব আমার,
জনকজননী-অঙ্কে, প্রকৃতির কোলে।
আমার জনক, প্রভু! আমার জননী,—
দেব-দেবী দুই মূর্তি। সে প্রসন্ন মুখ,
সেই প্রেমপূর্ণ বুক, সুনীরা যুগল",—
কাঁদিতে লাগিল বামা,—"করুণার সিন্ধু,
অভাগিনী ইহজন্মে দেখিবে না আর।
অষ্টম বৎসর যবে, পড়ে মনে, প্রভু!
স্থলে স্থলচর সহ করিতাম ক্রীড়া,
জলে জলচর সহ দিতাম সাঁতার,
সুনীরার তরঙ্গেতে ডুবিয়া ভাসিয়া।
কভু ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র পর্বতশিখরে,
করিতাম কৃষি সুখে জনকের সহ ;
কভু থাকি জননীর ছায়ায় ছায়ায়
করিতাম গৃহকার্য। জনক জননী
কি আদরে হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ।
কি আদরে নাচিত এ অভাগীর বুক!
কার্য-অবসরে পিতা কতই আদরে
শিখাতেন আর্য-ভাষা, অস্ত্রসঞ্চালন,—
লক্ষ্য ফুল ফল পত্র। কহিতেন,—পাপ
অকারণ জীবহত্যা, জীবমনস্তাপ।
"অষ্টম বৎসর যবে,—অষ্টম বৎসরে
ভাঙ্গিল কপাল দেব এই অভাগীর!
অষ্টম বৎসর যবে, খাণ্ডবদর্শনে
গেলা সহৃদয় পিতা। যাইতেন সদা
দেখিতে সে অনার্যের গৌরব-শ্মশান ;
মানিতেন তাহা যেন পুণ্যতীর্থস্থান।
শুনিয়াছি কত দিন সে গৌরবগাথা
গাহিতে আকুল প্রাণে। জননীর কাছে
কহিয়া পূরব সেই গৌরব-কাহিনী
দেখেছি কাঁদিতে, মাতা কাঁদিতা বিষাদে,
শুনিতাম অঙ্কে আমি বসি অবসাদে।
হইনু পীড়িতা আমি ; দুগ্ধ-অন্বেষণে
গেলা পিতা ইন্দ্রপ্রস্থে, ফিরিলা না আর,
তব অস্ত্রে"—

রমণীর শোক-নির্ঝরিণী
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে। উঠিলা ফাল্গুনী—
"শৈলজে! শৈলজে! তুমি সে অনাথা বালা!
চন্দ্রচূড়-কন্যা তুমি!" উন্মত্তের মত
শোকের প্রতিমাখানি লইয়া হৃদয়ে,
চুম্বিলেন বার বার নীলাব্জ বদন

অশ্রুসিক্ত। কহিলেন—"শৈলজে! শৈলজে!
আমি তব পিতৃহন্তা জানিয়া কেমনে
দেবতার মত তুমি সেবিলে আমায়
এতদিন? নাহি স্বর্গ, কে বলে ধরায়?
এ যে স্বর্গ বক্ষে মম পূর্ণিত সুধায়!
করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল আমি। আমি পাপী, ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ"—মুখে হাত দিয়া নাগবালা
নিবারিল কথা,—পার্থ বিস্ময়ে বিহ্বল;
বসিল শৈলজা ধরি চরণযুগল।
জিজ্ঞাসিলা পার্থ—"তব জননী কোথায়?"—
"যথায় জনক মম; বৈকুণ্ঠ যথায়!"—
কহিতে লাগিল বামা—"শোকসমাচার
শুনিলা জননী, চাহি মুহূর্ত আকাশ
পড়িলা ভূতলে, ছিন্ন এ জীবনপাশ।
বিধির অপূর্ব বীণা,—দেবতা বিভব,—
মধ্য-গীতে ছিন্ন তার, হইল নীরব।
এইরূপে চন্দ্র সূর্য যুগল আমার,
ডুবিল বালিকা-প্রাণ করিয়া আঁধার!
মুখে মুখ বুকে বুক দিয়া জননীর
কত ডাকিলাম আমি কত কাঁদিলাম!
কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতা জননীর বুকে—
পড়িলাম ঘুমাইয়া",—না ফুটিল মুখে
রমণীর কথা আর। অশ্রু অবিরল
বহিয়া তিতিল পার্থ-চরণ-যুগল।
মনোবেদনায় পার্থ হইয়া অধীর
ভ্রমিতে লাগিল কক্ষে। চাহি ঊর্ধ্বপানে
কহিলেন,—"নারায়ণ! এ ঘোর পাপের
আছে কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কহ এ দাসেরে।
কি পুণ্য-কুটীর শূন্য করিয়াছি আমি!
নিবায়েছি কিবা দুই পবিত্র প্রদীপ।
কি দুঃখীর সুখ-স্বপ্ন নির্দয় অর্জুন
করিয়াছে ভঙ্গ আহা। কপোত-কপোতী
পাপ মর্ত্যে কি ত্রিদিব করিয়া নির্মাণ।
ছিল সুখে। সেই স্বর্গ মম ধনুর্বাণ
করিয়াছে ধ্বংস। আজ শাবক তাহার
পড়ি পদতলে মম করে হাহাকার।
হা কৃষ্ণ! নারকী হেন সখা কি তোমার?
ধরিব না ধনুর্বাণ; দেও অনুমতি,
বীরবেশ পরিহরি যোগিবেশ ধরি
দেশে দেশে গাব এই শোকসমাচার;—
এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি বুঝি আর!"
কাতরে শৈলজা কহে পড়িয়া চরণে—
"ক্ষম এই অনাথায়! কি মনোবেদনা
দিতেছে তোমায় দাসী! বৃথা মনস্তাপ
কেন পাও বীরমণি? পিতৃমুখে আমি
শুনিয়াছি, সুখ-দুঃখ পূর্বকর্ম-ফল।
তুমি যদি পাপী, তবে পুণ্যস্থান, হায়!
আছে কোথা ধরাতলে কহ অবলায়।"
অর্জুন লইয়া বুকে পুনঃ অনাথায়
বসিলা পর্যঙ্কে, অঙ্কে লইয়া তাহার।
কহিলা কাতরে,—"শৈল! পাষাণে অন্তর
বাঁধিয়াছি, কহ শুনি এ দশ বৎসর
কাটাইলে কত দুঃখে? নিকটে আমার
আসিলে কি এ পতিতে করিতে উদ্ধার?"
মুহূর্তেক নাগবালা রহিল বসিয়া,—
সেই মুহূর্ত স্বর্গ তার! মুহূর্তেক মুখ
রাখি সেই বীর-বক্ষে শুনিল নীরবে
বাজিতেছে কি সঙ্গীত; বুঝিল নিশ্চয়
দুইটি হৃদয়যন্ত্র একতান নয়।
কহিতে লাগিল পুনঃ বসি পদমূলে—
"পবিত্র খাণ্ডবে নাহি দিলা পিতৃগণ
অঙ্কে স্থান অভাগীরে। মূর্ছান্তে আমার
দেখিনু পাতালপুরে বাসুকি-আলয়ে
রয়েছি শায়িতা আমি। দুঃখী নাহি মরে;
মরিল না এ দাসী। আশ্রয়ে তাহার
বহিয়াছি এত দিন এ জীবনভার।
রৈবতকে যবে তব হলো আগমন,

কহিলেন নাগরাজ,—পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে ; সম্মুখসমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে।
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্বগ্রহণ,
কালভুজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।
আমায় সংযোগ দেখি দিবি সমাচার,
হরির সুভদ্রা,—চির বাসনা আমার।
সন্দেহ আমার,—সেই চক্রী নারায়ণ
পার্থে সুভদ্রার পাণি করিয়া অর্পণ,
যাদব কৌরব শক্তি করিবে মিলিত,
তা হলে অনার্য ধ্বংস হইবে নিশ্চিত।'
আসিলাম রৈবতকে ; কি ঘটিল পরে
জান তুমি বীরমণি !"

অর্জুন

শৈলজা কি তবে
বাসুকি সে দস্যুপতি ?

শৈলজা

বাসুকি আপনি।

অর্জুন

কি যে অভিসন্ধি তব ; ক্ষুদ্র হৃদয়েতে
প্রেমময়, কি রহস্য রয়েছে নিহিত
বুঝিতে না পারি আমি। নারায়ণ তব
রহস্য অপার ! ক্ষুদ্র শক্তির হৃদয়ে
ফলে মুক্তা ; কি সৌরভ ক্ষুদ্র যূথিকায়।

শৈলজা

দেখিলাম দেবরূপ রৈবতক-বনে ;
আসিলাম দেবপুরে ; শুনিলাম কাণে
শোকপূর্ণ অনুতাপ জনকের তরে,
অনাথার অন্বেষণ দেশদেশান্তরে ,—
ভরিল হৃদয় ক্ষুদ্র ! করিনু অর্পণ
পিতৃহন্তৃ-পদে এই অনাথা-জীবন।
দেখিলাম কত স্বপ্ন ! পড়িল ভাঙ্গিয়া
অচিরে সে স্বপ্নসৃষ্টি আশার মন্দির,
যেন বালিকার ক্রীড়া-কুসুম-কুটীর।
প্রতিজ্ঞা বাসুকি মনে করিল ঈর্ষ্যায়
দৃঢ়তর ; আত্মহারা দিনু সমাচার
কুমারী-ব্রতের। নাথ ! উঠিল ভাসিয়া
ঈর্ষ্যায় তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার
পূর্ণশশধর সম মুখ সুভদ্রার,—
সেই চন্দ্রালোক-ভরা হৃদয় তোমার।
শৈলজা অপরাজিতা পাইবে কি স্থান
সেই সমুজ্জ্বল স্বর্গে ? অনাথার নাথে
মাটিতে পাতিয়া বুক ডাকিনু কাতরে।
শুনিলেন দয়াময় ভিক্ষা এ দাসীর,
পাইনু অপূর্ব শান্তি। কি ঘটিল পরে
জান তুমি, প্রাণনাথ !

"শৈলজে ! শৈলজে !"—
সাপটি ধরিয়া ক্ষুদ্র কর বালিকার
কহিলা কাতরে পার্থ,—"করেছি, প্রতিজ্ঞা,
জনক-শ্মশানে তব, দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি। অনুতাপ মম,—
তব পিতৃ-হত্যা পাপ,—জুড়াইব শৈল !
দেখি সুখহাসি তব সুধাংশুবদনে।
চল ইন্দ্রপ্রস্থে শৈল ! অথবা খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে, করিব উদ্ধার
হিংস্র-বন্য-পশু-বাস ; স্থাপিব আবার
পিতৃ-রাজ্য তব ; তব পিতৃসিংহাসন
শৈলজে ! তোমায় বক্ষে করিয়া ধারণ,
শোভিবে চন্দ্রিকা-বক্ষ শারদ গগন।
কে আছে ভারতে, নারীরত্ন ! তব কর,
হৃদয় অমরাবতী পবিত্র সুন্দর,
পাইতে আগ্রহে নাহি হবে অগ্রসর ;
জীবনের মরীচিকা করি অনুসার
হইব সন্তপ্ত যবে, হৃদয় তোমার
হবে মম শান্তিরাজ্য ; এই ক্ষুদ্র মুখ
লইয়া হৃদয়ে আমি জুড়াইব বুক।"

শৈলজা
দাসীরো বাসনা তাহা। দাসীর হৃদয়ে
যেই শান্তিরাজ্য নাথ! হয়েছে স্থাপিত,
তুমি সে রাজ্যের রাজা। মাতা প্রকৃতির
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্বচরাচর
হবে মম পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর, নির্ঝর সলিল,
হইবে অর্জুন মম; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক, অনন্ত, ঈশ্বর।
যেই রক্তবাসে যোগী সাজি, প্রাণনাথ!
খুঁজিলে এ অভাগীরে; পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জুন তাহার।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য; পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী; যাও প্রাণনাথ;
শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত!
লও এই ফুলমালা! রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা হার,—ত্রিদিবভূষণ,—
শুকায়ে পড়িবে মালা; মাল্যদাত্রী, হায়!
হয়তো বাসুকি-অঙ্কে শুকাবে ধরায়!"

চাহি ঊর্ধ্বপানে অশ্রু দর দর মুখে
কহিলা কাতরে পার্থ,—"ব্যাসদেব! আজি
তব ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলিল দুর্বার,—
পিতৃহন্তা হলো আজি হন্তা অনাথার!"
মুছি অশ্রু ধনঞ্জয় দেখিলা বিস্ময়ে,—
নাহি সেই অনাথিনী। "শৈলজে শৈলজে!"—
ডাকিতে ডাকিতে পার্থ গেলা গৃহদ্বারে,
ছুটিয়া নক্ষত্রবেগে। দেখিলা সম্মুখে
সরথ দারুক, রথী যেন স্বপ্নবৎ
এক লম্ফে ধনঞ্জয় আরোহিলা রথ।

বিংশ সর্গ

অঙ্কুর

অমল মর্ম্মরে চারু সুনির্ম্মিত মনোহর
বিখ্যাত "সুধর্ম্মা" নাম যার,
রৈবতক সভাগৃহ, যেন মর্ম্মরের স্বপ্ন
বালার্ক-কিরণে মহিমার।
অষ্টকোণসমন্বিত কিবা কক্ষ সুবিশাল,
কোণে কোণে স্তম্ভ মনোহর।
বিরাজিত স্তম্ভোপর বৈদিক দেবতাগণ,
সহ দেবী-প্রতিমা সুন্দর।
নীলাভ-আকাশনিভ, বিশাল গুম্বজ বক্ষ
রতন-নীলাভে ব্যাপ্ত কায়;
শতদল দলে দলে, শোভে গ্রহ উপগ্রহ,
পত্নীগণ সহ প্রতিমায়!
সেই সরসিজবক্ষে বিরাজিত নারায়ণ,
রত্নমূর্ত্তি শঙ্খচক্রধর।
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি! কিবা মহিমার রাশি
নীলমণি বপু মনোহর!
রত্ন ফুল, রত্ন পাতা, রত্ন ফল, রত্ন লতা,
রত্ন পুষ্প-কানন প্রাচীর;
অঙ্কিত প্রাচীরপটে রামায়ণ-চিত্রাবলী
জগৎপূজিত বাল্মীকির।
প্রশস্ত অলিন্দে শোভে স্তম্ভরূপী নারীনর,
শিরে ছাদ করিয়া বহন;
শোভে স্তম্ভ-অবসরে, খচিত মর্ম্মর পাত্রে
পুষ্পবৃক্ষলতা অগণন।
উড়িতেছে হর্ম্ম্যশিরে যাদবের বৈজয়ন্তী
বালার্ক আতপে সুকেতন।
কক্ষকেন্দ্রে কি নির্ঝর! সপুষ্প সুবাস-বারি
কি রঙ্গে করিছে উৎক্ষেপণ!
চারি দিকে রত্নবেদী, পৃষ্ঠে বীর-রত্নগণ
পদ্মে যেন ভানুর কিরণ।
সুবাসিত তৃণময়, শিখিপুচ্ছ সুশোভিত,
খেলিতেছে সহস্র ব্যজন,—
যেমতি শিখণ্ডী শত উড়িতেছে অবিরত,
বেষ্টি শত শিখণ্ডিবাহন।
দ্বারে দ্বারে দ্বারপাল, প্রতিভাতি রবিকর
বস্ত্র অস্ত্র করে ঝল ঝল;
সবার প্রফুল্ল মুখ; ঈষৎ চিন্তার ছায়া
গোবিন্দের বদনে কেবল।

বলরাম

যেমতি অনন্ত-কোলে, অনন্তের গ্রহদলে,
ভগবান সহস্রকিরণ,
যেমতি ভারত-রাজ্যে, ভারত নৃপতি মাঝে,
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন।
কিবা শৌর্য্যে, কি ঐশ্বর্য্যে, ধন মান কুলে যশে,
দুর্য্যোধন মহা-পারাবার;
মম-শিষ্য প্রিয়তম, গদা-যুদ্ধে অনুপম,
অর্জ্জুন গোষ্পদ, কিবা ছার!

ব্যাসদেব

সব সত্য মানিলাম, কিন্তু বৎস বলরাম!
অনুরাগ-নীতি জ্ঞানাতীত।
দেখিয়াছ সরোজিনী সবিতার প্রয়াসিনী,
কুমুদিনী শশাঙ্কে মোহিত।
কমলিনী শশধরে, কুমুদিনী প্রভাকরে,
অনুরক্ত হইবে কি বলে?
কর বল,—শুকাইবে; সুদর্শন নীতিচক্র
মানবের নাহি সাধ্য ছলে।

বলরাম

কে বলিল ধনঞ্জয়ে সুভদ্রা যে অনুরক্তা?
উদাসিনী সুভদ্রা আমার।

লঙ্ঘিবারে কথা মম, এ কল্পনা পরিজন
করিয়াছে কৌশলে বিস্তার।

ব্যাসদেব

একবাক্যে পরিজন, চাহে যাহা সঙ্কর্ষণ!
তাহে বিঘ্ন করা সহৃদয়!
হয় কি উচিত তব? ব্যথিত করিয়া সবে
হবে তব কিবা সুখোদয়?
না জান ভদ্রার মন, কর তবে স্বয়ম্বর,—

বলরাম

পাদপদ্মে ক্ষমা চাহে দাসে,
অন্যথা করিতে কথা—
ও কি শব্দ! শতভেরী
গরজিল একই নিশ্বাসে!
বাজে ভেরী ঘন ঘন, করি রণে আবাহন
রৈবতক পূর্ণ কোলাহলে।
চমকিল সভাস্থল, এ চাহে উহার পানে,
"কি হলো? কি হলো?"—সবে বলে।
উর্দ্ধশ্বাসে এক আসিয়া সৈনিক
কহে কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"ঘটিয়াছে যাহা, কহিতে দাসের,
মুখে নাহি কথা ফুটে।
পূজি রৈবতক, পুরদেবীগণ
চলেছিলা দ্বারবতী,
সসৈন্য-বাদিত্র, পুষ্পময় রথে,
মৃদুল মন্থর গতি।
নক্ষত্রের বেগে কেশবের রথ
গেল সৈন্য ভাগ করি,
বারি বিদারিয়া ছুটিল মকর
যেন ভীম মূর্তি ধরি।
দাঁড়াইলে রথ,— বিক্রমে ফাল্গুনী
উত্তরিলা ধরাতলে;
নমিলা বীরেন্দ্র, দেবীগণ-ফুল্ল
চরণ-কমলদলে।
সত্রাজিৎ-সুতা সুভদ্রার সহ
যেই রথে বিরাজিতা,
গেলা ধীরে তথা হাসিয়া হাসিয়া,
সত্যভামা শুচিস্মিতা।
বন্দিলা চরণ, হাসিয়া দু' জন,
কি যেন কহিয়া কথা।
কহিয়া কি কথা, হাসিল জলদ,
হাসিল বিদ্যুৎলতা।
এক পদ রথে, এক কর কক্ষে
দেখিলাম সুভদ্রার;
দেখিলাম ভদ্রা, ফাল্গুনীর বক্ষে
নীলাকাশে তারা-হার।
ধরি সুলোচনা করে টানাটানি,
কহে ডাকি—"চোর! চোর!"
অন্য করে তারে ধরিয়া অর্জুন
তুলিলেন, রথোপর।
ভীম কোলাহলে পুরিল আকাশ,
বাজিল শতেক ভেরী;
ছুটিল সামন্ত, বাজিল সমর,
আসিনু নয়নে হেরি।"

শুনি বলরাম, কাঁপে থর থর,
ক্রোধে দন্তে দন্ত কাটি;
লোহিত-লোচনে ছুটে বহ্নি যেন
আগ্নেয়-ভূধর ফাটি।
"শুনিলেন ভগবান!"—দুন্দুভিনির্ঘোষে
কহিলেন হলায়ুধ—"শুনিলা অচ্যুত!
কেমনে নীরবে বল রহেছ বসিয়া
রৈবতকশৃঙ্গ মত? এই অপমান
সহিবে কি পাতি বক্ষ কাপুরুষ মত?
পালিয়াছে পার্থ ভাল ধর্ম অতিথির
কুলাঙ্গার, যেই পাত্রে করিল ভোজন
ভাঙ্গিয়া সে পাত্র; দিল যে কর, হৃদয়,

প্রেমভরে আলিঙ্গন, কাটিয়া সে কর,
করি পদাঘাত সেই পবিত্র হৃদয়।
সুভদ্রা শুক্তির মুক্তা ভাবিয়াছে মনে।
মত্তগজমুক্তা ভদ্রা ভুজঙ্গের মণি,—
নাহি জানে দুরাচার, দেখাইব তারে
মহাকাল বিষদন্ত; দিব বুঝাইয়া
ভদ্রা নহে, সন্ত মৃত্যু করেছে হরণ!
রে অন্ধক-ভোজ-বৃষ্ণি-বংশ-কুলাঙ্গার!
এখনো বসিয়া তোরা? হইলি কাতর
একটি তস্করভয়ে? কেশরীর পাল
একটি শৃগাল ভয়ে কাতর, হা ধিক্!
বসিয়া তোদের রথে,—তোদের সারথি,—
হরিল তোদের মান, তোদের ভগিনী,—
যদুরাজ্যে নরনারী হাসিবেক লাজে!
যাও সভাপাল! আন সাজাইয়া রথ!
না লঙ্ঘিলে হলায়ুধ মৃত কলেবর,
না পাইবে ধনঞ্জয় সুভদ্রার কর।

পুনঃ কোলাহলে পূর্ণ হলো সভাস্থল।
ছুটিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ সগর্বে তখন,
আহত মৃগেন্দ্র যথা। রথের ঘর্ঘর
তুরঙ্গের হ্রেষারব, মত্ত মাতঙ্গের,
সিংহনাদ, অস্ত্রধ্বনি, রণবাদ্য সহ
মিশিয়া সমরভূমে ছুটিল বিক্রমে,—
বহিল ঝটিকা যেন মহা-পারাবারে।

বহুক্ষণ অধোমুখে রহিয়া কেশব,
কহিলা বিনীত-কণ্ঠে,—"জান তুমি, দেব,
সর্বশাস্ত্র। তব পদে ধর্মকথা আর
নিবেদিবে কিবা দাস? কহিবে যথায়
বিরাজিত শাস্ত্র-সিন্ধু স্বয়ং ভগবান?
ভুজবলে হরি কন্যা করিতে বরণ
আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। জানে ধনঞ্জয়
সুভদ্রার স্বয়ম্বর নহে তব মত।
জানে যদুকুলে কন্যা না হয় বিক্রয়;
পশুবলে দুহিতায় নাহি করে দান।
আছে কি ক্ষত্রিয় তবে হেন কুলাঙ্গার
মাগিবে যে দারভিক্ষা। বীরকুলর্ষভ
ধনঞ্জয়! বীরকুলে হেন নরাধম
আছে কি অর্পিবে কন্যা ভিক্ষুকের করে?
সুভদ্রা বীরের বালা; বীরবালা মত
বরিয়াছে ধনঞ্জয়ে, করি সম্মানিত
যদুকুল, দুই কুল করি সমুজ্জ্বল।
ভরতবংশের রবি, পাণ্ডব-তনয়,
পিতৃস্বসা কুন্তীসুত, মধ্যম পাণ্ডব।
অতুল চরিত্রে, বীর্যে, কীর্তির কিরণ,
উজ্জ্বল ভারতভূমি আসিন্ধু অচল।
এ কি ভ্রান্তি, পূজ্যতম—কোন্ মহাকুল
আছে এই ধরাতলে, করে ফাল্গুনীর
না হবে গৌরবান্বিত, পবিত্র শরীর।

ব্যাসদেব

সুধাংশু হইতে দুই অমৃতের ধারা
অবতীর্ণ নরলোকে, এই পুণ্যভূমি
হইতেছে পবিত্রিত প্রবাহে যাহার,
মিলিবেক আজি সেই পুণ্য-ধারাদ্বয়,—
আজি মানবের রাম! বড় শুভ দিন!
সে সুধাংশু বিষ্ণু-পদ; স্রোত সম্মিলিত
মানব-অদৃষ্ট বৎস! করিবে গ্রথিত।
সেই সুধাকর সহ, জাহ্নবীর মত;
মোক্ষধাম পথে শেষে হবে পরিণত।
যেই কীর্তিরত্নরাশি ফলিবে হৃদয়ে,
কালের তিমির-গর্ভ করি আলোকিত
দেখাইবে ধর্মপথ; সেই সুধাসার
বহিবে অনন্তকাল, করিয়া বিধান
পাপে মুক্তি, দুঃখে শান্তি, পতিতে উদ্ধার,
করিবে ও ধরাতলে স্বর্গের সঞ্চার।

"কি বিচিত্র রণ, আসিনু দেখিয়া!"—
কহিল সৈনিক আর,

আসি উর্দ্ধশ্বাসে শ্বাস-রুদ্ধ স্বরে—,
“নাহি সাধ্য বর্ণিবার।
রাখি সুভদ্রায় রথের উপর—
শৈবালেতে শৈবলিনী,
সৈন্য-রঙ্গভূমে চালাইতে রথ
আজ্ঞা দিলা বীরমণি।
কৃতাঞ্জলি কহে দারুক,—‘হরিলে
প্রভুর ভগিনী মম ;
চালাইবে রথ কেমনে এ দাস ?
তার অপরাধ ক্ষম !’
কহিলা অর্জুন,—‘দারুক ! পালিলে
তব ধর্ম, নাহি রোষ।
বীরধর্ম মম পালিব এখন,
ক্ষমিও আমার দোষ।’
বাঁধিলা দারুকে উত্তরীয়বাসে
রথদণ্ডে ধনঞ্জয়।
কহে সুলোচনা—‘আমি বুঝি আর
যাদবের কেহ নয় ?’
হাসি ধনঞ্জয় তারো দুই কর
বাঁধিয়া বসনাঞ্চলে,
অঞ্চলাগ্র পার্থ অর্পিল ভদ্রার
কোমল কর-কমলে
কহে সহচরী,—‘এইরূপে ভদ্রা !
দিলি প্রতিফল মোর !
থাক্ ! থাক্ ! থাক্ ! জিহ্বা ত আমার
বাঁধিতে না পারে চোর।’
ধরিয়া চরণে অশ্বরশ্মিজাল,
—কি শিক্ষা বিস্ময়কর।
বাজাইয়া শঙ্খ, চালাইয়া রথ
পলকেতে বীরবর।
সৈন্য রঙ্গভূমে দাঁড়াইল রথ,
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
বাজাইয়া শঙ্খ গেল যোদ্ধগণ,
বাজিল তুমুল রণ।

নিলা রশ্মি করে সুভদ্রা শোভিল
মৃণালেতে মৃণালিনী ;
সিংহ সহ রণে মিলিল সিংহিনী,
সূর্যে উষা তেজস্বিনী।
নারায়ণী সেনা ছুটিল তখন
বন্যার লহরী মত ;
অক্রূর, সারণ, বভ্রু, বিদূরথ,
বর্ষে শর শত শত।
অর্ধপথে শর কাটিছে হেলায়,
কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রকর !
ফল্গু খেলা যেন খেলিছে ফাল্গুনী,
হাসি হাসি বীরবর।
ধনু আকর্ষণ, শর বিক্ষেপণ,
কিছু নাহি দেখা যায়।
আকর্ষিত ধনু দেখি স্থির, অস্ত্রে
অস্ত্রাঘাত শুনা যায়।
কি কৌশলে রথ ঘুরিছে ফিরিছে,
কি বিজলী খেলা ছলে !
যদি রথ কাছে গেল অস্ত্র, পড়ে
লক্ষ্যহীন ভূমিতলে।
মুক্তকেশরাশি, বিজয়-পতাকা,
উড়িছে ভদ্রার কিবা !
পতাকার গায়ে কি বিজুলি লেখা,
লেখার মহিমা কিবা !
পার্শ্বে ধনঞ্জয় নীলমণিময়
কিবা মূর্তি মহিমার !
শোভিছে সুভদ্রা নভঃপ্রান্তে যেন
সুচন্দ্রমা পূর্ণিমার !
রূপ-বীরত্বের অপূর্ব মিলন
সকলে চাহিয়া রয় ;
নাট্য রঙ্গভূমি হ'লো রণস্থল,
যুদ্ধ নাট্য-অভিনয়।
হাসে ধনঞ্জয়, অস্ত্রে অস্ত্র কাটে,
নাহি করে অস্ত্রাঘাত ;

রণস্থলে প্রভু! হয় নাই এক
বিন্দুমাত্র রক্তপাত।
কাটি শরাসন, উড়াইয়া তূণ,
হাসে পার্থ প্রীতি-হাসি।
সাত্যকি, সারণ, মহারথিগণ
যেতেছে, দেখিনু আসি।
নারায়ণী-সেনা দেখিয়াছে, প্রভু!
কত রণ বিভীষণ,—
শোণিতপ্রবাহ! দেখে নাহি কভু
এমন অরক্ত রণ!

কৃষ্ণ

শুনিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ?
কি অপূর্ব বীরগাথা!
কিবা রণনৈপুণ্য অসীম!
এ অদ্ভুত খেলা যার,
সে যদি করে সমর,
কার সাধ্য হবে সম্মুখীন!
আমার সে রথ, অশ্ব,
—অজেয় সুগ্রীব, শৈব্য,—
সারথ্যে সুভদ্রা শিষ্যা মম।
অজয় যাহার নাম,
যোদ্ধা সেই ধনঞ্জয়,
সুভদ্রার কর যুদ্ধপণ।
যদি পার্থ করে রণ
সহস্র কিরণ মত
একা সব ফেলিবে মুছিয়া
যাদব নক্ষত্র যত;
হরিবে সুভদ্রা বলে
যদুনামে কলঙ্ক ঢালিয়া।
তাও ভাল; যদি পার্থ
নাহি করি অস্ত্রাহত,
অস্ত্রহীনে করি সমুদায়,
সুভদ্রা হরিয়া যায়,—
এমন কলঙ্ক, দেব!
কেমনে সহিবে বল, হায়!
শুন ভেরী-গরজন!
আবার বাজিল রণ!
সিংহনাদে কাঁপে সভাতল!—

চমকি উঠিয়া সবে,
ছুটিলা ব্যাকুলচিত্তে,
যেই দিকে সেই রণস্থল।
শৃঙ্গ-প্রান্তে তরুমূলে
দাঁড়াইলা,—ও কি দৃশ্য।
এক পদ সরিল না আর।
সাত্যকির অস্ত্রাঘাতে
অর্জুন মূর্ছিত রথে,
ক্ষতদেহ পুষ্পিত মন্দার।
সুভদ্রার করে ধনু,
চরণে রথের রশ্মি,
পৃষ্ঠে মুক্তকেশ ঘনবর,
পার্থের মূর্ছিত দেহ
করিতেছে সংরক্ষণ,
ব্যর্থ করি সাত্যকির শর।
রণরঙ্গে গৌর অঙ্গ
আরক্তিম কিবা শোভা
কেশাধারে করিছে বিকাশ!
নিবিড় আকাশ-কোলে
দীপিতেছে উষা কি রে!
শর করে ছাইয়া আকাশ!
কিবা রথ-সঞ্চালন,
কিবা অস্ত্র-বরিষণ,—
সেই আলুলায়িতকুন্তলা!
"জয়! সুভদ্রার জয়!"—
গর্জিতেছে বীরগণ,
বামাগণ বিস্ময়ে বিহ্বলা।
"জয়! সুভদ্রার জয়!"—

গর্জ্জে দুই বাহু তুলি
বলরাম বীরত্বে বিহ্বল,—
'ধন্যা রে সুভদ্রা তুই !
ধন্য আজি যদুকুল !"
আশুতোষ নেত্র ছল ছল ।

সেই জয়নাদে ঘন,
ভাঙ্গিল পার্থের মূর্ছা,
মস্তক তুলিলা বীরবর ।

প্রেমাশ্রু-নয়নে চাহি
রণরঙ্গিণীর পানে,
লইলেন করে ধনুঃশর ।

আঁখি নাহি পালটিতে
কাটি সাত্যকির ধনু,
বর্ম চর্ম কাটিলা সকল ।

লয় ধনু যতবার,
কাটে পার্থ ততবার,
কি অদ্ভুত শিক্ষার কৌশল !

কহেন মহর্ষি—"রাম !
দেখ ফাল্গুনীর, দেখ,
কি মহত্ত্ব ! কিবা ক্ষিপ্র-হাত !

সর্ব অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে
ফুটিয়াছে রক্তজবা
তবু নাহি করে প্রতিঘাত !"

কহেন মাধব খেদে,—
"এ তো নহে রণ, প্রভু !
হত্যাকাণ্ড অতি নিরমম ।

এতেও যাদবগণ,
হইতেছে কি লাঞ্ছিত,—
সিংহ-করে মূষিক যেমন !"

নিরস্ত্র সাত্যকি লাজে,
অপমানে, গেল সরি ;
সারণ হইল অগ্রসর ।

না ধরিতে শরাসন,
কাটিলেন ধনঞ্জয় ;
না লইতে চাপ অন্যতর,

অস্ত্রে উড়াইয়া তূণ,
কাটিলা অশ্বের রশ্মি,
ছুটিলেক তুরঙ্গযুগল ।

অস্ত্রহীন, রথহীন,
সারণ কাঁপিছে ক্রোধে,
বামাগণ হাসে খল খল ।

বীরত্বে বীরের প্রাণ
মোহিল আনন্দে রাম
শান্তি-আজ্ঞা করিলা প্রচার ।

কেতন-রজত-প্রভা
দুর্গশিরে দিলা দেখা,
উথলিল আনন্দ অপার ।

"জয় ! ভদ্রার্জুন জয় !"
ঘন ঘন সিংহনাদে
পরিপূর্ণ হলো রণস্থল ।

"জয় ! ভদ্রার্জুন জয় !"
শৃঙ্গবাহী প্রতিধ্বনি
গাইল পূরিয়া দিঙ্মণ্ডল ।

"জয় ! ভদ্রার্জুন জয় !"
গায় পুরদেবীগণ,
পুষ্পে পুষ্প করি বরিষণ

"জয় ! ভদ্রার্জুন জয় !"
গাহিতেছে ঘন ঘন,
উনমত্ত রেবতী-রমণ ।

"জয় ! কৃষ্ণ বলরাম !
জয় ! যদুবীরগণ !"—
ঘোষিলা গম্ভীরে ধনঞ্জয় ।

"জয় ! কৃষ্ণ বলরাম !"—
গায় নারায়ণী-সেনা,
সিংহনাদে করিয়া দিগ্‌ময় ।

ছিন্ন যেই পুষ্পহার
কুন্তলে ছিল ভদ্রার,
সেই ফুল করিয়া গ্রহণ,
শরে দুই দুই ফুল
প্রেরিয়া, পূজিলা পার্থ
কৃষ্ণ, বলরাম, দ্বৈপায়ন।

তুলিয়া লইলা ফুল
আশীষিলা তিন জন
দুই বাহু করি উত্তোলন।

অশ্ব-বল্গা লয়ে করে
দারুক ফিরাল রথ,
উঠিল আনন্দ-প্রভঞ্জন।

বাজিল মঙ্গলবাদ্য,
রমণীর হুলুধ্বনি
উঠিতেছে রহিয়া রহিয়া;
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে
আনন্দ-তরঙ্গ তুলি,
জনস্রোত আসিছে বহিয়া।

বন্ধন হইল মুক্ত,
আগেভাগে সুলোচনা
দুই গাল ভদ্রার টিপিয়া;
কাড়িয়া লইয়া শঙ্খ
অর্জ্জুনের কর হ'তে,
বাজাইছে মুখ ফুলাইয়া।

দম্পতীরে আবাহন
দিতে বেগে সঙ্কর্ষণ
ছুটিলেন আনন্দে বিহ্বল।

সর্বত্র আনন্দধ্বনি,
সর্বত্র হাসির রাশি,
সর্বত্র আনন্দ ঢল ঢল!

কেবল চারিটি মুখ,
গম্ভীর অবাতক্ষুব্ধ
মহিমামণ্ডিত পারাবার।

রথে,—ভদ্রা, ধনঞ্জয়;
শৃঙ্গে,—কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন;
ঝড় গর্ভ মহা-মেঘাকার।

চাহি অনন্তের পানে
ব্যাস-বাসুদেব-নেত্র;
চাহি সেই বদনমণ্ডল,—
অনন্তপ্রতিম মুখ,
রহিয়াছে ভদ্রার্জ্জুন,
অপলক আঁখি ছল ছল।

যথা শুকপক্ষী-স্রোত
আকাশ বহিয়া যায়,
করি কল-লাঘিত গগন,
চলি গেল জনস্রোত
তথা গিরি-অন্তরালে,
মিশাইল আনন্দনিক্কণ।

নির্জন শিখরপ্রান্তে,
নীরব আকাশতলে
ভারতের দুই ধ্রুবতারা;
শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতকেশ,
মহর্ষির কাঁপে ধীরে
স্থিরমূর্তি যেন জ্ঞানহারা।

নীরবে গোবিন্দ ধীরে
জানু পাতি শিলাতলে
বসিলেন, পাতিয়া অঞ্জলি।

অঞ্জলিতে পুষ্পদ্বয়,
ভদ্রার্জ্জুন উপহার,
পুষ্পে পুষ্প শোভিছে উজ্জ্বলি'।

বহিতেছে দুই ধারা
ধীরে ধীরে দু' নয়নে,
পতিতপাবনী নিরমল।

মধ্যাহ্নে পাদপ-ছায়া
বিকাশিছে শান্তমুখে
মহিমার ত্রিদিবমণ্ডল।

"ভূতলে অতুল এই
যুগল কুসুম, নাথ !"—
কহিলেন নরনারায়ণ,—
"গাঁথি তব প্রেমসূত্রে,
করিলাম সমর্পণ
তব পদে, করহ গ্রহণ !
তুমি সর্বশক্তিমান,
পার ক্ষুদ্র তৃণে তুমি
সৃষ্টিকার্য সাধিতে তোমার।
দেও শক্তি এই তৃণে,
তব প্রেমময়-রাজ্য
ধরাতলে করিব প্রচার।
আজি শুভক্ষণে, নাথ !
তোমার করুণাবলে
যে অঙ্কুর হইল রোপিত,
দেও শক্তি সে অঙ্কুরে,
করিব শান্তির ছায়া
নাথ ! 'মহাভারত' স্থাপিত।"



কুরুক্ষেত্র

(প্রথম প্রকাশ—১৮৯৩)

আমার

সরলা স্নেহময়ী শোকসন্তপ্তা

স্বর্গীয়া জননী

রাজরাজেশ্বরী দেবীর

পবিত্র চরণাম্বুজে

সদ্য-শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে

এই শোক-কাব্য

উৎসর্গ করিলাম।

রাণাঘাট

৩০শে বৈশাখ

১৩০০ সাল

নবীন

আমার পুত্রপ্রতিম

ভাগিনেয়

৺কামিনীকুমুদ সেন

প্রাণাধিক,

তোমার বড় আদরের কুরুক্ষেত্র,—নানা কারুকার্যে খচিত করিয়া মুদ্রিত করিবে বলিয়া তুমি যে 'কুরুক্ষেত্রে'র মুদ্রাঙ্কন দুই বৎসর যাবৎ স্থগিত রাখিয়াছিলে,—তুমি রোগ-শয্যায় শায়িত হইলে যে 'কুরুক্ষেত্রে'র আভারণহীন মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া তুমি এত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলে,—আজ সে কুরুক্ষেত্রের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইল, আর তুমি কি আজই একটি পবিত্র সুখস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইলে? তুমি যে একবার মুদ্রিত 'কুরুক্ষেত্র' দেখিয়াও গেলে না আমার এ দুঃখ কোথায় রাখিব? আমি একটি শিশু-শোক-স্মৃতির সহিত 'কুরুক্ষেত্র' আরম্ভ করিয়াছিলাম, জানিতাম না তোমার শোকস্মৃতি ইহার শেষের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে। ভগবানের যে শোক আমি কল্পনায় অনুভব করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে, সেই শোক 'কুরুক্ষেত্রে'র মুদ্রাঙ্কনের শেষের সহিত মূর্তিমন্ত হইয়া আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে। জানিতাম না যে, যে মহাচিতা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য জ্বলিবে। তথাপি আমার দুঃখ নাই। তোমার জীবনে বুঝি জন্মান্তরের কিঞ্চিৎ কর্মছায়া ছিল; ২৩ বৎসর কাল ধরাধামে থাকিয়া তাহা অপসারিত করিয়া, তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য, মাধুর্য, ও দেবত্ব কোনরূপে কলুষিত হইবার পূর্বেই তুমি আজ পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রকৃতির শান্তিময়ী মূর্তি দেখিতে দেখিতে "নীরবে শান্তভাবে" দেবলোকে চলিয়া গেলে। যাও বৎস! আমিও পুণ্যবতী শৈলজার মত দেখিতেছি—

"ওই সর্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ।"

আমিও শৈলজার মত সেই—

"শান্তির ত্রিদিব-বুকে
পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাব সুখে কৃষ্ণনাম জুড়াব জীবন।"

রাণাঘাট
৩০শে বৈশাখ
১৩০০ সাল

তোমার শোকসন্তপ্ত
নবীন

নিবেদন

'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান ভাগ 'রৈবতকে'র সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্রে'র সম্যক কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না। 'রৈবতকে'র ভিত্তিভূমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, 'কুরুক্ষেত্রে'র ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।

প্রথম সর্গ

ধর্মক্ষেত্র

"নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল নির্মল আকাশে,
শরতের শেষ মেঘে ঊর্ধ্বে তরঙ্গিত,—
নীরব, নিস্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্বচরাচরে।
দুই প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,
তরঙ্গিত বেলা যেন রণ-পয়োধির।"—
কহিলেন দ্বৈপায়ন শিষ্যে আপনার—
দাঁড়াইয়া দূরে বট বিটপি-ছায়ায়,
কহিলেন—"দেখ বৎস! পৃথিবী আবার
হইতেছে সিক্ত জীব শোণিত-ধারায়!
কতরূপ মৃত্যুজিহ্ব অস্ত্র ভয়ঙ্কর
উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন,—
অসংখ্য বিদ্যুৎগতি তীব্র বিষধর
খেলিতেছে শমনের কি ক্রীড়া ভীষণ!
অস্ত্রের নিঃস্বন ঊর্ধ্বে ঘাত-প্রতিঘাত,
কালানল উদ্গীরণ; নিম্নে হাহাকার
মিশি' সিংহনাদ সহ, অশনি-সম্পাত
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর, শ্রবণে আমার
লাগিতেছে যেন দূর সমুদ্র-হুঙ্কার
বাতক্ষুব্ধ, সহ ঘন অশনিঝঙ্কার।"
কহিল বিনীত শিষ্য ভয়ে ব্যাকুলিত—
"কি ভীষণ দৃশ্য! প্রাণ কাঁপে থরথর,
নরকের দৃশ্য যেন সম্মুখে বিস্তৃত!
বীরেরা মানব নহে, শমনকিঙ্কর!
এই পাপ দৃশ্য প্রভু! দেখিলেও হায়!
হয় চিত্ত কলুষিত। নিষ্ঠুর মানব
এইরূপে নিরমম হিংস্রজন্তুপ্রায়
নাশে কি হে পরস্পরে—একি অসম্ভব!
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিণত, হায়!
পাপক্ষেত্রে, এ নরক দেখা নাহি যায়।"
মহর্ষি ঈষৎ হাসি' উত্তরিলা ধীরে—
"পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম, জগতের নীতি,
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। সেই রত্নচয়
অনন্ত তিমিরগর্ভে। হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।
নির্মম নিষ্ঠুর এই পাপ অভিনয়ে
শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুরহৃদয়,
দয়ায় সাগর তিনি, পুণ্য-পারাবার!
নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের রথে
সাধি'ছেন স্থির চিত্তে ক্ষত্রিয়-বিনাশ,
নাশি'ছেন প্রিয়জন দেখ কত মতে,
হাহাকারে পূর্ণ করি' আপন আবাস।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম, সেইখানে জয়,—
সতী গান্ধারীর কথা সত্য নিঃসংশয়।"
বিস্ময়ে কহিল শিষ্য,—"হায়! যদি প্রভু
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম, অধর্ম কি আর?
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম! হৃদয়েতে কভু
নাহি পায় স্থান,—এই হিংসা পারাবার!
না পারি বুঝিতে কিছু। নর-নারায়ণ
কেশব করুণাসিন্ধু বিষ্ণু-অবতার,—
জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্মসংরক্ষণ,
যাঁর মহা ধর্মনীতি,—এই কার্য তাঁর?
যেই সুধাকর সুধা করিবে বর্ষণ,
সে কি এই হলাহল বর্ষিছে ভীষণ!"

ব্যাস

সংহার স্রষ্টার নীতি, সৃষ্টির কারণ,
জড়ে ও অজড়ে বৎস! সর্বত্র সমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখ চক্রের মতন
ঘুরিতেছে বিশ্বে, নাহি তিলার্ধ বিশ্রাম,
ধ্বংস বিনা সৃষ্টিস্থিতি, বৎস! অসম্ভব।
ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে ওই তৃণগণ,—
নাহি সাধ্য তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব;—
না পারিবে স্থিতি লাভ করিতে কখন।
রুদ্ধ কর মৃত্যুদ্বার, হইয়া বর্ধিত
জীবসংখ্যা আত্মঘাতী হইবে নিশ্চিত।

শিষ্য

মানিলাম ধ্বংসনীতি। সৃজন পালন
যাঁর মায়া, মানিলাম ধ্বংসও তাঁহার।
না পারি একটি বালি করিতে সৃজন,
আমার তাহাতে কিবা আছে অধিকার?
আমি কে?

ব্যাস

তাঁহার অস্ত্র। সৃষ্টিস্থিতিলয়
যেই নীতিচক্রে নিত্য হ'তেছে সাধিত,
তুমি পরমাণু তার; সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত;—
স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি। এই নীতিবলে
শার্দুল নাশিয়া, বৎস! ক্ষুদ্র প্রাণী যত,
পড়িছে শার্দুলাধিক কালের কবলে;
নাশিছে এ বৃক্ষ দেখ তৃণ ছায়াগত।
আংশিক এ ধ্বংসনীতি করিতে সাধিত
জীবদের হিংসাবৃত্তি দত্ত বিধাতার।
এই নীতি অনুসরি' যদি নিয়োজিত
কর তাহা, কেন পাপ হইবে তোমার?
পোড়ায় অনল যদি, ডুবায় সলিল,
বল কি তাদের পাপ হয় এক তিল?

শিষ্য

নিগূঢ় সংসার-তত্ত্ব। হায়! ক্ষুদ্র নর
কেমনে বুঝিবে তাহা, কে বুঝবে তারে?

ব্যাস

মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-রত্নাকর!
ভাসি' এই অনন্তের মহাপারাবারে,
মহাধ্যানে লভিতেছে মহাজনগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র-জ্ঞান,
ধর্মশাস্ত্র নাম তার। শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
যোগবল, মানবের শিক্ষার সোপান।
বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি' অবতার
করেন জগতে ধর্ম-যুগের সঞ্চার।

শিষ্য

শুনিয়াছি দ্বাপরেতে কৃষ্ণ-অবতার।
এই ধ্বংস-যজ্ঞ প্রভু! ধর্মশিক্ষা তাঁর?
জীবে দয়া,—জীবহিংসা? সর্বজীবহিত,—
সর্বজীবের বিনাশ? এই মহারণ,—
কুরুক্ষেত্র—ধর্মক্ষেত্র? প্রভু! উৎপাটিত
করিলে কি, এই তরু হবে সংরক্ষিত?

ব্যাস

এই ধ্বংস-যজ্ঞ, ধর্ম। কর দরশন
সর্বত্র ধর্মের গ্লানি, অধর্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ-হলাহল।
অধর্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার,
করিতে মোচন বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত,—কৃষ্ণ অবতার।
অপূর্ব জীবনলীলা! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্বাসন
নিবারিতে রক্তস্রোত সমুদ্রের পার।
সেই জরাসন্ধ-বধ, অদ্ভুত কৌশল,—
কারামুক্তি, রাজমেধ-যজ্ঞ-নিবারণ!
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনা যুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপন!
সর্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্বত্র নিষ্কাম,
সর্বত্রই দয়াধর্ম আদর্শ মহান্।
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির; ধর্মরাজ্য তাঁর
জান যে অধর্মে তাহা হলো অপহৃত!
জান সভামধ্যে সেই ঘোর অত্যাচার
সতী দ্রৌপদীর প্রতি, নরক অতীত!
বাল-নির্যাতন; জতুগৃহের দাহন;
ত্রয়োদশ বৎসরের ঘোর বনবাস;
সন্ধি তরে স্বয়ং কৃষ্ণ সহি' নির্যাতন
পঞ্চগ্রামে ভিক্ষা করি' হইলা নিরাশ।
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—
শুনিয়াছ লোভীর সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদমন,
সাধিবারে অনিবার্য হ'ল ধর্মরণ।

শিষ্য

মানিলাম দুর্যোধন পাপী দুর্বিনীত;
কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, নৃপতিমণ্ডল?—

ব্যাস

পাপের প্রশ্রয়-দাতা,—অধর্মে পতিত,—
জ্বালাইল সবে এই সমর-অনল।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পঙ্গপাল মত
অসংখ্য বীরেন্দ্র-বৃন্দ না হ'লে সহায়,
হইত কি দুর্যোধন এই পাপে রত?
নদীস্রোতে রক্তস্রোত বহিত কি, হায়?

কি অধর্ম-অভ্যুত্থান ক্ষত্রিয়-জগতে
ঘটিয়াছে, বৎস! এই ভীষণ সমর
না হইতে নির্বাপিত, হায়! কত মতে
দেখিবে তাহার আরো চিত্র ভয়ঙ্কর।
অধর্ম-অনলে, বৎস! পঙ্গপাল মত,
হইবে ক্ষত্রিয়জাতি ভস্মে পরিণত।

শিষ্য

কিন্তু পাণ্ডবের পক্ষ বীরেন্দ্রমণ্ডল
মরিতেছে কোন্ পাপে?

ব্যাস

মৃত্যু অনিবার,
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম,—ত্রিদিব তাহার
বীরব্রতে ধর্মরণে জীবন-অর্পণ।
মানব-সমাজ রক্ষা হয় নিরন্তর
এইরূপে; জান বৎস! নির্লিপ্ত ঈশ্বর।

শিষ্য

ঘোরতর কর্মলিপ্ত অবতার তাঁর
দেখিতেছি ভগবন্! বুঝিব কেমনে
ঈশ্বর নির্লিপ্ত তবে!

ব্যাস

কি ভ্রান্তি তোমার!
কর্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।
ভগবান্ কর্মরত। বিপুল সংসার
কর্মক্ষেত্র; নাহি কারো তিলার্ধ বিশ্রাম।
জগতের সুখ মাত্র সুখ আপনার,
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
যার কর্ম-মূলে, কর্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার, নির্লিপ্ত সে জন।
নিষ্কাম বা নির্লিপ্তের আদর্শ উজ্জ্বল
মহিমা-মণ্ডিত ওই সম্মুখে তোমার,—
কৃষ্ণের জীবনচিত্র পবিত্র নির্মল!
আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার?
নারায়ণ, নারায়ণী সেনা আপনার,
দেখ প্রতিকূল পক্ষে! সমগ্র ক্ষত্রিয়
সমবেত যেই ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র কীট ছার
যশোলাভে মত্ত যথা,—বীর অদ্বিতীয়
ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি!
সারথির ব্রতে ব্রতী! শৃগালের ব্রতে
ব্রতী সিংহ; খদ্যোৎব্রতে ব্রতী দিনমণি!
জগৎ তাঁহার রথ; অনন্ত তাঁহার
কুরুক্ষেত্র; শক্তি অস্ত্র; অনন্ত সমর,—
সৃজন পালন লয়; অনন্তে সাঁতার
দিতেছে সে মহারথ কল্প কল্পান্তর!
কাতর অর্জুনে সেই যোগেশ্বর হরি
যেই ধর্ম-গীতামৃত করাইয়া পান
করিলা স্বধর্মে রত, যোগধ্যান ধরি'
করিয়াছি সঙ্কলন,—পরিতৃপ্ত প্রাণ।—
সেই গীতা উত্তরীয়-অঞ্চলে তোমার।
যাও, বৎস! পুণ্যতোয়া হিরণ্বতী-তীরে
এখনি সায়ংসন্ধ্যা করি' সমাপন
যাব আমি! গিয়া তুমি পাণ্ডব-শিবিরে
সুভদ্রার করে গ্রন্থ কর সমর্পণ,
মম আশীর্বাদ সহ। শান্তনুতনয়
এই গীতামৃত তরে আকুলহৃদয়।
কহিও ভদ্রারে—"যেই ধর্ম মূর্তিমান্
"সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্মে দীক্ষিত
"তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
"এই গ্রন্থে সেই ধর্ম ভাষায় চিত্রিত।
"বিরাজিত যেই চন্দ্র, সুধার আধার,
"তব বক্ষে, এই গীতা জ্যোৎস্না তাহার।"
যাও বৎস! যাও চলি। যথা-অবসর
করিব যতেক শিষ্যে এ অমৃত দান।
মিলিয়াছে মোক্ষসুধা, যুগ যুগান্তর
যার তরে যোগিগণ করিতেছে ধ্যান!
মানবের কর্মাকাশে ধর্ম-ধ্রুবতারা
জানিলাম এত দিনে হ'ল সমুদিত;
অনন্ত কালের তরে অন্ধ দিক্‌হারা
দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত।
গীতার এ রঙ্গভূমি, মহাতীর্থ মত,
কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে হবে পরিণত।

দ্বিতীয় সর্গ

জীবন-সঙ্গীত

ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মত্ত বিঘূর্ণিত
পারাবার-গর্ভে মরকতপুর
শোভে বরুণের, শান্তির আধার,—
বরুণ বারুণী কি চিত্র মধুর!
রণ-ঝটিকায় মত্ত বিক্ষোভিত
কুরুক্ষেত্র-গর্ভে শোভার আধার
শোভিছে শিবির শান্তির ত্রিদিব
প্রীতিপূর্ণ—অভিমন্যু উত্তরার।
প্রীতির স্বপন প্রতিমা-যুগল,
সুখশান্তি হাসি জ্যোৎস্না মুখে।
প্রীতির স্বপন নয়নে তরল,
সুখশান্তি ভরা জ্যোৎস্না বুকে।
ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া
সৃজিলেন বিধি মূর্তি উত্তরার,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ-তরঙ্গ তুলিয়া।
আনন্দনির্ঝর উছলে হৃদয়ে,
আনন্দনির্ঝর নয়নতারা,
আনন্দনির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর
ঢালে অবিরল আনন্দধারা।
সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা,
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে;
অভিমানভরে থাকে যদি বালা
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চহাসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁশরীঝঙ্কার।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চভাষা—
কিশোরীর? না না, স্বর্গীয় বীণার।
হাসিতে, ভাসিতে, কিবা মূর্ছনায়
আনন্দ-সঙ্গীত বহে অবিরল;
চঞ্চলার মত যাইতে ছুটিয়া,
না ছোঁয় ধরণী চরণ চঞ্চল!
এই হাসিরাশি-কুসুম কাননে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ!
কহিছে যৌবন—"উত্তরা যুবতী।"
কৈশোর কহে—"না, কিশোরী এখন।"
বসি' অভিমন্যু বিচিত্র আসনে
সুবর্ণে নির্মিত, রতনে খচিত,
আঁকিছেন চিত্র;—বীর অবয়ব
সুবর্ণে নির্মিত, রতনে ভূষিত;
আকর্ণবিশ্রান্ত যুগল নয়ন,
আকর্ণনিবিড় যুগল ভুরু;
বিশাল ললাট, বিশাল উরস্,
ক্ষীণ কটি, কিবা বিশাল উরু!
গবাক্ষের তলে হিরণ্বতীজলে,
জ্বলে ধক্ ধক্ পশ্চিম রবি;
গবাক্ষ-সম্মুখে প্রশস্ত ললাটে
জ্বলে ধক্ ধক্ প্রতিভাছবি!
এই বীরত্বের মহারঙ্গভূমে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ!
কহিছে কৈশোর—"এখনো কিশোর।"
"মিথ্যা কথা"—গর্বে কহিছে যৌবন।
চিত্রিছেন অভিমন্যু একমনে
'ভীষ্ম-শর-শয্যা' আনত মুখে;
আসি, চুপে চুপে আসন পশ্চাতে
কহিলা বিরাট-বালা কৌতুকে,—
"কিহে বীরবর! আজি যে সকালে
রণ-ক্ষেত্র হ'তে দিলে পিট্টান?
জীবহত্যা-রঙ্গে হ'ল কি অপ্রীতি?
কত শত আজি দিলে বলিদান?"
আঁকিতে আঁকিতে কহে অভিমন্যু—
"যথার্থ উত্তরে! দিয়েছি পিট্টান।
যুঝিতে যুঝিতে কি মনে পড়িল,
কার হাসিটুকু, কার মুখখান।"
"দেখি দেখি"—কহি', সুকোমল করে,
আদরে উত্তরা তুলিলা মুখ।
হাসি' অভিমন্যু কহিলা আদরে—
"এই মুখ বটে, এ হাসিটুক।"
অধরে অধরে হইল মিলিত;
অধরে অধর রহিল গাঁথা।

অধরে অধর কি সুধা ঢালিল,—
নিমীলিত চারি নয়ন-পাতা।

উত্তরা

নরহত্যা করি' মিটেনি কি সাধ ?
নারী-হত্যা কেন এরূপে আবার ?

অভিমন্যু

মুহূর্তে মুহূর্তে করে নর-হত্যা
যে জন, এ কথা সাজে কি তার ?
তবে নর-হত্যা মানি শ্রেষ্ঠ তব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার।
ইচ্ছা, থাকি প্রেম অনন্ত স্বপনে
ওই বুকে মরি, জাগি না আর !

উত্তরা

থাক্ মেনে থাক্, তব ভালবাসা !
সে ছাই বীরত্বে কাটি' সারাদিন
ফিরিলে শিবিরে, চিত্রে নিমগন ;
নহে কবিতায় থাক উদাসীন।
গাইয়ে বাজিয়ে কাটাইব দিন
ভাবি মনে মনে, তাও সাধ্য কার ?
ওই দেখ ওই শিবিরকোণায়
আদরের যন্ত্র সব স্তূপাকার।
বাঁধিতেছি বীণা, কর্ণে এক কর,
অন্য কর তারে,—ছাড়িল হুঙ্কার
সেই পোড়া অস্ত্র—কি নাম তাহার ?
চমকিল কর, ছিঁড়ে গেল তার !
আর সাজ করি বাজাতেছি যদি,
সেই হুম্‌হাম—কি নাম তাহার ?
বীর-সিংহনাদ ! তাহার উপর !
ট্যাঙ্গ ট্যাঙ্গ সেই কোদণ্ড-টঙ্কার !

অভিমন্যু

উত্তর গোগৃহে যে বীরত্ব ভাই
দেখাইল, ইহা পরিশিষ্ট তার !

উত্তরা

ছাই শত্তুরের মুখে রাশি রাশি।
মন্দ বুঝি সেই বীরত্ব দাদার ?
কেমন অক্ষত-শরীরে ফিরিয়া
আসিল, আনিল কতই ভূষণ।
কতই পুতুল করিনু নির্মাণ
সে বীর-বসনে মনের মতন।
কেহ না মরিল, কেহ না কাঁদিল,
পতিহীনা নাহি হ'ল কারো দারা,
কারো শিশু নাহি হ'ল পিতৃহীন,
না হইল কোন মাতা পুত্রহারা !

"অদ্ভুত বীরত্ব"—পিতার বীরত্বে
পুত্রের হৃদয় উঠিল ভরি'—
কহি' অভিমন্যু, রহিলা নীরব,
চিত্রবৎ শূন্য দরশন করি।
চুপে চুপে চুপে তুলিটি লইয়া
চুপে চুপে গেল উত্তরা সরিয়া।
"চোর ! চোর !"—বলি' হাসিতে হাসিতে
গেলা অভিমন্যু পশ্চাতে ছুটিয়া।
ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গিণী মত
ঘুরিছে ফিরিছে বিরাটবালা ;
হাসিয়া হাসিয়া ছুটিছে বালিকা,
হাসির ঝলকে শিবির আলা।
ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গের মত
পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়,—
মুখভরা হাসি, প্রেমভরা আঁখি,
দুইটি বিদ্যুৎ খেলিয়া যায় !

এবার যুবক ধরিল সাপটি',
"হি-হি" উচ্চ হাসি হাসিছে বালা—
কর হ'তে তুলি লইল, কাড়িয়া
চাপিয়া হৃদয়ে কুসুমমালা।
চুম্বিলা সে হাসি আবার আবার,
হাসিতে সুন্দর মিশিল হাসি।
নিপীড়িত যুগ্ম কুসুম-স্তবক
ঢালিল হৃদয়ে অমৃতরাশি !
যুবকের বাম প্রকোষ্ঠে বামার
শোভিছে বদন মুক্তকেশাবৃত,
শ্রমে পদ্মপর্ণ-কপোলযুগলে
ভাসিছে গোলাপ সদ্য-বিকশিত।
শোভিছে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যুবার
ক্ষীণ কটি ; চারু কুসুম-দাম,
জ্যোৎস্নার লতা, উত্তরীয় মত
শোভিতেছে বক্ষে,—মোহিত প্রাণ !
চুম্বিছে যুবক আবার আবার
ফুলে ফুলে সেই পুষ্পিতা লতা।
আবার আবার হাসির তরঙ্গ,
কি ভাষা হাসির ! মরি কি কথা !

সাঙ্গ হ'ল রণ ; আবার আসনে

বসিল যুবক আঁকিতে ছবি।
কহিল—"পাগলি! দেখ লো চাহিয়া
জগতে অতুল বীরত্বরবি!
দেখ ভীষ্মদেব প্রসন্নবদনে
শুইয়া কেমন শরের শয্যায়!
বীরের পিপাসা নিবারিতে বীর
সৃজেছেন উৎস কি সুন্দর হায়!
বামপার্শ্ববিদ্ধ শায়কে শায়িত;
ঘন অস্ত্রাঘাতে উরস-অম্বর
আচ্ছন্ন কিংশুকে বীরত্ব-আধার;—
নাহি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র একটি আঁচড়।
বিস্মিত পাণ্ডব, বিস্মিত কৌরব,
বিস্মিত ধরার বীরেন্দ্রমণ্ডল,
দাঁড়ায়ে নীরবে শ্লথধনু করে
দেখিছে এ দৃশ্য আঁখি ছল্ ছল্।
ধান্যক্ষেত্রে ছিন্ন তৃণরাশি মত
চারিদিকে অস্ত্র পড়ি' স্তরে স্তরে;
চারি দিকে হত চতুরঙ্গদল,
দীপ-মালা যেন শোণিত-সাগরে!"
মুহূর্তে বালিকা দেখিল সে চিত্র
দক্ষ তুলিকার উচ্ছ্বাসে চিত্রিত।
চাহিয়া চাহিয়া অধর টিপিয়া
উত্তরিল, চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত,—
"কি নিষ্ঠুর দৃশ্য। দেখা নাহি যায়
বীরত্বের হায়! এই পরিণাম।
শুইত যে নিত্য কুসুম-শয্যায়,
অসংখ্য শরাগ্রে আজি সে শয়ান!
হরি! হরি! হরি! মানুষে মানুষ
কেমনে এমন করয়ে প্রহার?
হায়! সকলের একই পরাণ,
প্রাণে প্রাণ-ব্যথা বুঝে না আর?"
আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া
কহে অভিমন্যু গম্ভীরমুখে—
"বড়ই কঠোর বীরধর্ম এই!
কি পাষাণ চাপা বীরের বুকে!—
সত্য লো উত্তরে! ভাবি যবে মনে,
ইচ্ছা নাহি হয় ধরিতে শর;
করি রণ যেন কলের পুতুল,
শিবিরে ফিরিয়া আসি সত্বর।
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর,
দেখি সব ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
নাহি দেখি কেহ অস্ত্রযোগ্য মম,
কাঁদে প্রাণ দেখি' ক্ষুদ্র সৈন্য হত।
বজ্র অস্ত্র যার, হয় কি, উত্তরে!
পিপীলিকা-বধে প্রবৃত্তি তার?
উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল-পয়োধি
ডুবাতে কি চাহে পতঙ্গ ছার?
হায়! বিধাতার সুখের সংসার
সৌন্দর্য-ভাণ্ডার হৃদয়ভরা।
হায়! কেন নর হিংসি' পরস্পরে
এমন নরক করে এ ধরা!
কি যে বীরধর্ম নাহি বুঝি, প্রিয়ে!
নর নারায়ণ জনক মাতুল
যেই পথগামী, ধর্মপথ তাহা
এই বালকের পবিত্র, অতুল!
বীরধর্ম পুণ্য নিয়তি আমার।
মাগ প্রিয়তমে! এ বর কেবল,—
হেন শরশয্যা লভি' রণক্ষেত্রে
কৃষ্ণার্জুন-মুখ করি সমুজ্জ্বল।"
"ওই ছাই কথা শুনিব না আমি"—
কহি' সব তুলি ফেলিল ছুড়িয়া।
কুড়াইতে গেলে বিরক্ত যুবক,
ছবিটি লইয়া ছুটিল হাসিয়া।
"এখনি উননে করি' সমর্পণ
এ সাধের ছবি করিব ছাই।
ফেলি' সেই ছাই হিরণ্বতীজলে,
দিব করতালি তাই, তাই, তাই!"—
কুসুমকোমল কক্ষ-গালিচায়
কুসুমিত লতা ঢালিয়া পড়ি'
কাম-স্বপ্ন-শয্যা পুষ্পিত উরসে
হাসিছে ছবিটি চাপিয়া ধরি'।
আপাদচুম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরি' সুতনু সুবর্ণলতা,
আবরি' গালিচা—শোভিছে সুতন্বী
কানন-আঁধারে জ্যোৎস্না যথা।
মুগ্ধপ্রাণ যুবা চাহিয়া চাহিয়া,
ঈষদ্ ঈষদ্ করে পরশন
সুবঙ্কিম গ্রীবা সুগোল সুন্দর,
পার্শ্ব ব্রীড়ালয় মার্জিত কাঞ্চন।
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতেছে বালা,

লহরে লহরে ছুটিয়ে হাসি,
বিকাশিছে মরি! উন্মেষ যৌবন,
লহরে লহরে কি রূপরাশি!
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতে হাসিতে
চিত্র হ'তে চিত্র পড়িল সরিয়া,
এক চিত্র করে, অন্য চিত্র বক্ষে,
হাসিয়া যুবক লইল তুলিয়া।
প্রাণেশের করে ক্ষীণ কটিখানি,
যেন ফুলধনু দুলিয়া পড়ি!
আলুথালু-কেশে, আরক্ত বদনে,
আয়ত নয়নে, কি ক্রীড়া মরি!
অশ্রান্ত হাসিয়া আবেশ নয়নে
পতিমুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
বাড়াইছে কর ধরিতে সে ছবি,—
খেলে দুই পদ্ম কি লীলা করিয়া!
কি লীলা করিয়া দোলে কর্ণদুল!
কি লীলা করিয়া খেলিছে বলয়!
দোলে মুক্তাহার কি লীলা করিয়া!
শিঞ্জিনী-শিঞ্জন কিবা লীলাময়!

আবার আবার সহস্র চুম্বন,
চুম্বন সহস্র আবার আবার;
হাসির লহরে সহস্র সহস্র
কুসুমবর্ষণ কিবা অনিবার!
বসিলা যুবক আঁকিতে সে ছবি;
কক্ষতলে বালা বসিল মানে,
বারিভরা-মেঘ বিস্তৃত নয়ন,
ছল ছল চাহি' গালিচা পানে।
কহে অভিমন্যু—"দেখ্ এসে দেখ্
কেমন সুন্দর ফলেছে রঙ্গ।"
মাথা নাড়া দিয়া কহে ক্রোধে বালা—
"নাহি চাহি ভালবাসার ঢঙ্গ্।
বড়ই আমার লেগেছে বিষম।"
হাসি' কহে যুবা—"লেগেছে কোথায়—
শরীরে, মনে, কি নাকের আগায়?
দিতেছি ঔষধ আয় কাছে আয়।"
"আয় কাছে আয়"—মাথা হেলাইয়া
হাসিকান্না-মুখে কহিল উঠি'।
উঠিলা যুবক; ছুটিল যুবতী—
উড়ে কেশভার চরণে লুটি'।
আঁকিতে লাগিলা যুবা পুনঃ ছবি;
চুপে চুপে বালা ফিরিয়া আসি',
ধীরে ধীরে ধীরে বীণাটি লইয়া
ঢালিতে লাগিল অমৃতরাশি।
সেই বীণাতানে প্রাণেশের প্রাণে
বহিতে লাগিল কি সুধাধারা!
আঁকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর
কি আঁকে না জানে,—আপনাহারা।
মিশিল বীণায় কণ্ঠ উত্তরার,
বীণার জীবন্ত বীণার লয়!
ভরিয়া শিবির সঙ্গীত-তরঙ্গ
হ'ল অপরাহ্ণ গগনময়।
"ওই যা! আঁকিলাম কি আঁকিতে কি!
উত্তরে! উত্তরে! পায়ে পড়ি তোর"—
কহে অভিমন্যু—"অল্প আছে বাকি,
এই করি শেষ, মাথা খাস্ মোর।"
"এ রাগিণী ভাল নাহি লাগে যদি
বাজাতেছি অন্য"—উত্তরিলা বালা,
ছড়ের আছাড়ে, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
কার সাধ্য বসে, কান ঝালাপালা।
এক করে টিপি কপোলযুগল,
অন্য করে বীণা লইয়া কাড়ি',
কহে অভিমন্যু—"এই দেখ তবে
সাধের এ বীণা ভাঙ্গি আছাড়ি'।"
হি-হি-হি-হি হাসি—"দাইমা! দাইমা"
উঠিল চীৎকার উপরে চীৎকার;
গর্জি' বেগে সুলোচনা ঠাকুরাণী,
নামিয়া আসরে দিলেন বার।
অন্তরাল হ'তে ধাত্রী সুলোচনা
দেখি' অভিনয়-মোহিত মনে,
এবে ছল-রোষে রাঙ্গাইয়া আঁখি
কহিলা গর্জিয়া ভ্রুকুটী সনে

সুলোচনা

"কি হয়েছে বল?"

উত্তরা

মেরেছে আমায়।

সুলোচনা

কে মেরেছে? অভি?

অভিমন্যু

দাইমা অভাগী
মিছে কথা কহে।

সুলোচনা

চোরের বেটা চোর,
চোরের ভাগিনা ? কি—কি বলিলি কি ?
দাইমা অভাগী ? ভদ্রা কৃষ্ণার্জুন
ধ্যান করে যার মহিমা অপার ?

অভিমন্যু

না দাইমা। আমি আঁকিতেছি ছবি,
শুধু জ্বালাতন করে বার বার।

সুলোচনা

বটে দুষ্ট মেয়ে।

উত্তরা

জানি লো, জানি লো,
তুই ওর দিকে টানিস্ সতত।
হইবে বাবার সমক্ষে বিচার,
মার কাছে হবে উচিত মত।

সুলোচনা

কে—বাবা ? কি বলিলি তুই ?
দিলি রে আমার বিচার দোষ ?
আমার উপরে কে সে বিচারক।
চল দেখি যাই।
করি' মহারোষ,
ছুটে বালিকায় অঙ্কেতে লইয়া,—
হাসে পুষ্পরাশি সে পুষ্পদোলায়।
চুম্বিয়া চুম্বিয়া সেই হাসিরাশি
হাসিতে হাসিতে সুলোচনা যায়।
ভাবে অভিমন্যু—"দাই মা এ কায
করিল কি ভাল ? হৃদয়ে আমার
রাখি' মেঘ, গেল বিজলি চলিয়া,
আজি ছবি আঁকা হ'বে না আর।"

তৃতীয় সর্গ

নারী-ধর্ম

"অভাগি ! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার ?"
কহে সুলোচনা খেদে,—সুভদ্রা শিবিরে ফিরি'
ম্লানদেহ ক্লান্তির আধার
রাখিয়া শয্যায় যবে হইলা অর্ধশায়িতা,
অবসন্না মূর্তি করুণার !
শ্লথ গ্রন্থি গেল খসি', ধূসরিত কেশরাশি
ধূলামাখা পড়িয়া শয্যায় ।
পাশে বসি' সুলোচনা চারু সুকোমল করে
ধীরে ধীরে বিনাইছে তায় ।

সুলোচনা

অভাগি ! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার ?
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি' অঙ্গে আহত সবার !
শিবিরে শিবিরে ঘুরি' আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার !
বসিয়া গিয়াছে চোক, মলিন বিবর্ণ মুখ,
ধূলার ধূসর কেশভার ।
আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ,
দেখি নাই তব হাসি মুখ ।
এইরূপে রাত্রি দিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ !

সুভদ্রা

ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ !
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনাছায়া
দিদি ! এই ধরাতলে রমণীর বুক !
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ !
যেমতি অনল জল, সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি সেইরূপ দিদি ! রোগ, শোক, দুখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক ।
আছে আর কিবা সুখ, হায় ! এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী-জীবনগঙ্গা বহিয়া না যায় !

ওই দেখ নিত্য নিত্য কতই পুরুষরত্ন
পালিয়া স্বধর্ম কিবা ত্যজিছে জীবন !
পালিতেছি আমরা কি স্বধর্ম তেমনি ?

সুলোচনা

মানিলাম নারী-ধর্ম, আর্ত আহতের সেবা ;
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন ?
তাহাদের মড়া নিয়া তাহারা মরুক গিয়া,
তোর কেন মাথাব্যথা হেন ?

সুভদ্রা

শত্রু !—শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত ?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার ?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার ।
তাও এক ধাতুময় অস্ত্রে একরূপে হয়
সর্ব দেহ ক্ষত ও বিক্ষত ;
সহে একরূপ ব্যথা, একরূপ মৃত্যুমুখে
শত্রু মিত্র হয় নিপতিত ।
শত্রু !—এক ভগবান্ সর্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্বময় এক অদ্বিতীয় ।
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা ?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?

সুলোচনা

শত্রুকেও তাহা বলি করিব কি মিত্র জ্ঞান ?
মিত্র ওই কর্ণ দুর্যোধন ?
দুর্জনের(ও) দুঃখে দুঃখী হইব কি ? সমভাবে
বিষামৃত করিব গ্রহণ ?

সুভদ্রা

যেই-জন পুণ্যবান্, কে না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম-অবতার ।
সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখ অঙ্কে মাতা বসুধার !
সমুজ্জ্বল রত্ন সহ অনন্ত বালুকারাশি
বহিতেছে গর্ভে পারাবার ।

জগতের সাম্যনীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান!
সর্বত্র সমান প্রেম, সর্বত্র সমান দয়া,
সর্বত্র কি একত্ব মহান্!
না, দিদি!—আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু-মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননীপ্রেম
সর্বত্র ঢালিয়া চল যাই!
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার!
শত্রু-মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার!
জনক জননীমুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
শিশু কিছু নাহি জানে আর।
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর-কিশোরী দেখে
ভ্রাতা-ভগ্নী পূর্ণ এ সংসার!
পতি-পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্ত মুখ,—
পুণ্যতীর্থ সাগর-সঙ্গম!
প্রেমধর্ম এই, দিদি! কালি কৃষ্ণার্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহ-পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার!
পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি পুত্র, মহাবিশ্বে,
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি' কি যে লো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়।
সরিল না কথা আর; নিশ্চল প্রতিমা মত
দুই জন রহিলা চাহিয়া,
সেই অনন্তের পানে, সেই অনন্তের ধ্যানে,
প্রেমানন্দে হৃদয় ভরিয়া।
"আমিও তেমতি বোন্। এক সত্যভামাময়"—
চাপি' হাসি কহে সুলোচনা—
"দেখি জীবগণ যত; ইচ্ছা সকলের সঙ্গে
ঝগড়া করি পুরিয়া বাসনা।
দ্বারকা ছাড়িয়া যেন আসিয়াছি কত যুগ।
মরি জিহ্বাকণ্ডুয়নে হায়!
তোর কাছে আসি যদি বিজি বিজি কি বকিস,
শুনি' মম হাড় জ্ব'লে যায়।
যাই উত্তরার কাছে, তার সেই হিহি হাসি,
একেবারে কাণ ঝালাপালা!
পোড়া শাশুড়ীর মুখে চিরদিন চাপা হাসি,
বউটি ফুটন্ত হাসিডালা!
গালি পাড়,—তাও হাসি, মার,—অনর্গল হাসি,
হাসির কিছুতে নাহি শেষ।
যুড়িয়া ঝগড়া করি, হাসিতে ঝগড়ার ঝোঁক
ভেসে যায়, এ ত জ্বালা বেশ।
দুর্লভ রমণীজন্ম লভিয়া, ঝগড়া যদি
না করিল, জীবন বিফল।
তাই লো বিরলে বসি', সত্যভামা উদ্দেশেতে
ছাড়ি শব্দভেদী শরদল।"

সুভদ্রা

সত্য লো উত্তরা, দিদি! ফুটন্ত হাসির ডালা,
জ্যোৎস্না-প্লাবিত পুষ্পবন।
হৃদয়ের জ্যোৎস্নায় নাহি সংসারের ছায়া,
নির্মল আনন্দ-প্রস্রবণ।
সেই হাসি, সেই ভাষা, সে আনন্দ ভালবাসা,
কিবা স্বর্গ, সরলতাময়।
সরলতা আনন্দময়ী আমার উত্তরা, দিদি!
এই জগতের যেন নয়।
কৃষ্ণার্জুন শিষ্য-শিষ্যা উভয়ের সংমিলন—
মিলন সৌন্দর্য প্রতিভার!
ঘুমন্ত প্রতিভা-অঙ্কে ফুটন্ত সৌন্দর্য স্বপ্ন;
কি সংযোগ শশাঙ্ক সুধার!

সুলোচনা

হউক তা, কিন্তু মেনে, না জানে ঝগড়া ছুঁড়ি,—
কমল কণ্টকে মনোহর।

সুভদ্রা

কেন, দু'জনে ত দিদি! করে ঝগড়া অহরহ;
সে কোন্দল কতই সুন্দর।

সুলোচনা

মূর্খ দুই শিক্ষকের শিক্ষার অভাবটুকু
চাহিতেছি করিতে পূরণ!
কিন্তু সে হাসির স্রোতে সকল ভাসিয়া যায়,
হইতেছে পণ্ড মম শ্রম।

সুভদ্রা

দিবসান্তে কৃষ্ণার্জুন আসিলে শিবিরে ফিরি'
ঝগড়া ত বাদ তব নাই।

তাতে কি উদর তোর নাহি ভরে, পোড়ামুখি!
শিশু দুটি ল'য়ে মর তাই!

সুলোচনা

হরি! হরি! এ কি কথা! মিটিল না সাধ যার
সত্যভামা-কোন্দলসাগরে,
কিসে সে গণ্ডুষ-জলে বাঁচিবেক,—এত দিনে
সুলোচনা পড়িল ফাঁপরে।

সুভদ্রা

কোন্দল-রোগের তোর করিতেছি প্রতিকার,—
সঙ্গে মম থাকি' নিরন্তর
করিবি আহত-সেবা, পালিবি রমণী-ধর্ম,
আয়, দিদি! এই সত্য কর।

সুলোচনা

তোর নারী-ধর্ম ল'য়ে মর্ গিয়া মরা ঘাঁটি,
আমার তাহাতে কাজ নাই।
আহত আমার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণার্জুন, অন্য
আহত সেবিতে আমি যাই!
উত্তরা ও অভিমন্যু,—দুই পুত্র কন্যা মম—
থাকিব লইয়া আমি বুকে!
এই মম নারী-ধর্ম; থাকে যদি ধর্ম আর,
মারি শত ঝাঁটা তার মুখে।
এই ব্যঙ্গ আবরণে কি হৃদয়-স্নেহোচ্ছ্বাস।
পরশিল মরম ভদ্রার।
দুই আঁখি ছল ছল চাহি শূন্যে, কহিলেন,—
স্নেহময়ী মূর্তি করুণার—
"আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ত্ব তাহার?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,
যে হয়, সে পুণ্য-পারাবার!"
"জয়! সুভদ্রার জয়! অর্জুনমহিষী জয়!"—
কে গাইল বাঁশরীর স্বরে?

সুলোচনা

আ ম'লো! কে কালামুখী! "জয় সুলোচনা জয়"
তোর বুঝি কণ্ঠে নাহি সরে?
"জয় পাণ্ডবের জয়! জয় কৌরবের জয়!"—
শু'নে শু'নে হাড় জ্বালাতন।
"জয়! সুভদ্রার জয়!"—তাহার উপরে যেন
কাটা ঘায়ে চুণ বরিষণ।
"মহর্ষি শিবির-দ্বারে ব্যাস-শিষ্য এক জন"—
সখী অন্যতরা কহে আসি'।

ব্যস্তে ভদ্রা কহে—"আন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁকে।"
সুলোচনা ক্রোধে অগ্নিরাশি!

সুলোচনা

জানি সেই বুড়া বিনা এমন বেহদ্দ আর
তালকাণা কেহ কি লো হয়?
খেটে খুটে সারাদিন লভিতেছি এ আরাম,
এলো কি না—"সুভদ্রার জয়!"
এখনই সে অদ্ভুত ঘট, পট, সর্বভূত,
খোলা যাবে কত শাস্ত্র-হাঁড়ি।
যাই উত্তরার কাছে, হাসির তরঙ্গে তার
যদি ভূত নামাইতে পারি।

শিবির-দুয়ারে আহা! ও কি মূর্তি মনোহর!
সখীর না চলিল চরণ।
নীলোৎপল প্রতিমায় জাগিতেছে যৌবনের
কি মধুর প্রথম স্বপন!
সুন্দর গৈরিকে ঢাকা অপরাজিতার রাশি
সুকুমার দেহ মনোহর।
ললাটে চূড়ার মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি
অমার্জিত ধূলায় ধূসর।
সুগোল কোমল মুখে যুগল নয়ন ভাসে,
আকর্ণবিস্তৃত ছল্ ছল্।
ভাসিছে যুগল তারা, নীলিম প্রভাতাকাশে
দুই সুখতারা সমুজ্জ্বল।
কি তারায়, কি নয়নে, শান্ত স্থির সে বদনে,
ক্ষুদ্র সেই অধর-কোণায়,
কি ত্রিদিব-কোমলতা, কি ত্রিদিব-স্নেহকথা
হৃদয়ের, ভাসিতেছে হায়।
প্রণমিতে পার্থ-প্রিয়া উঠিলে, নিবারি' যুবা
কহিল,—কি কণ্ঠ সুকুমার!—
"যে ধর্মে দীক্ষিত আমি, তুমি প্রতিমূর্তি তার,
দেবি! তুমি নমস্যা আমার।
যে ধর্মের আত্মা কৃষ্ণ, বাহুবল ধনঞ্জয়,
জ্ঞানবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
দেহ যার মূর্তিমতী আপনি সুভদ্রা তুমি,
পুণ্যময়ী প্রেম-প্রস্রবণ,
এ পবিত্র মহাগীতা তার সুধাময়ী ভাষা,
আশীর্বাদ সহ উপহার
বিশ্বারাধ্য গুরুদেব অর্পিলেন তব করে,
সুধাকরে সুধার ভাণ্ডার।

মানব-অদৃষ্টাকাশে বিরাজিয়া পুণ্যবতী,
গীতামৃত করি বিকিরণ,
সুশীতল জ্যোৎস্নায় জুড়াও, জগতারাধ্যে!
জগতের তাপিত জীবন!"
উদ্দেশেতে দ্বৈপায়নে প্রণমিয়া ভদ্রাদেবী,
শিরে গ্রন্থ করিয়া ধারণ,
পার্শ্বস্থিত পুষ্পাধারে রাখি শূন্যপানে চাহি,
রহিলা বসিয়া শূন্যমন।
সুলোচনা চিত্রবৎ তপস্বীর ক্ষুদ্র মুখ
স্থিরনেত্রে রয়েছে চাহিয়া!
সেই তীব্র দৃষ্টিতলে, চাহি' ধরণীর পানে
আছে যুবা সলজ্জ বসিয়া।
সেই কণ্ঠ, সেই ভাষা, ত্রিতন্ত্রীর সে মূর্চ্ছনা,
স্মৃতির কি সঙ্গীত অতীত!
যেন সুভদ্রার কাণে, যেন সুভদ্রার প্রাণে,
বাজিল মধুর স্বপ্ন-গীত!
বহুক্ষণ আত্মহারা বসি' ভদ্রা ধীরে ধীরে
কহিলা মধুরে—"তপোধন
আছিলেন প্রতিশ্রুত পবিত্রিতে কুরুক্ষেত্র
পুনর্বার করি' পদার্পণ।"
উত্তরিল শিষ্য ধীরে—"সান্ধ্যকৃত্য করি' শেষ
করিবেন শুভ আগমন।
গোধূলিরে পদধূলি দিয়া উদিবেন, দেবি!
ঋষিকুল নক্ষত্র প্রথম।"
উভয় নীরব পুনঃ, উভয়ের হৃদয়েতে।
ভাসিয়াছে কি যেন উচ্ছ্বাস।
দেখিল তপস্বী, নেত্র ছল ছল সুভদ্রার,
কি করুণা করিছে বিকাশ!
সরিল না কথা আর, বিদায় হইয়া যুবা
ধীরে ধীরে ত্যজিলে শিবির,
কহে সুলোচনা—"এর ঋষিপনা বল, ভদ্রা,
করি আমি এখনি বাহির।
এ যদি সে শৈল নহে, নহি আমি সুলোচনা,
জানে ছুঁড়ী ছদ্মবেশ কত!
অপরাজিতার আহা! মরি! মরি! কি পুতুল!"
সুভদ্রা নীরব চিত্রমত।

চতুর্থ সর্গ

মাতা-পুত্র

"মা! মা! ওমা মা আমার!"—উচ্ছ্বসিত প্রাণে
ডাকি' অভিমন্যু আসি' ধরিয়া গলায়
জননীর, চাহি' মার স্নেহমুখ-পানে,
রাখে মুখ মার বুকে ক্ষুদ্রশিশু-প্রায়-!—
উপাধানে অবসন্ন অঙ্গ আরোপিয়া
এখনো সুভদ্রা দেবী বসিয়া শিবিরে।
আনন্দে হৃদয়-নিধি হৃদয়ে লইয়া,
অসংখ্য চুম্বন স্নেহে বরষিলা শিরে।
আসি' গরজিয়া মত্তা মাতঙ্গিনী মত
সুলোচনা ক্রোধভরে লইল কাড়িয়া
মাতৃ-বুক হ'তে পুত্র, মাতঙ্গিনী মত
কহিল কৃত্রিম ক্রোধে ঘন গরজিয়া—
"হাঁরে রে! কৃতঘ্ন ছেলে! উহারে না বলিতে মা
কতবার করিয়াছি মানা।
বল আমাকেই মা,—"মা"! বল আরবার মা,—"মা!"
ডাক আরবার বলি, মা,—"মা!"
আঁটিয়া ধরিয়া বুকে চুম্বি' মুখ সুলোচনা
যত কহে হাসি' খল খল
তত ডাকে "মা" বলিয়া চাহি' তার মুখ পানে
চারি চক্ষু স্নেহে ছল ছল!
"বল, নহে সুভদ্রা মা" উত্তর—"সুভদ্রা মা!"
পড়িল অমনি গালে চড়।
"বল, নহে সুভদ্রা মা!" —"সুভদ্রা আমার মা!"
পুনঃ চড় স্নেহ-পুষ্পশর!

সুলোচনা

হাঁরে! কৃতঘ্নের ছেলে এই ধর্ম তোর!
আমি পালিলাম, তুই পুত্র হলি ওর!

অভিমন্যু

আমার যুগল মাতা স্নেহ নির্ঝরিণী,
তুই লো শূলীমা! আর সুভদ্রা জননী।

সুলোচনা

"শূলীমা! শূলীমা!"—আচ্ছা আসুক এখন
তোর সে যুগল পিতা নর-নারায়ণ!
কেমন শূলী রে আমি যাবে আজ জানা,
দেখি দু'জনের আছে কাণ কয়খানা।

অভিমন্যু

গালি দিস্, তোরে নাহি মা ডাকিব আর।
আচ্ছা, সত্য কথা তবে বলি এইবার।
আমার যুগল মাতা, করুণার ছবি,
সুভদ্রা ও সুলোচনা—দেবী ও মানবী।
সুভদ্রা মায়ের স্নেহ স্বর্গ নিরমল,
সুলোচনা মার স্নেহ ধরণী শীতল।

সুলোচনা

সারাদিন মরা ঘেঁটে মরে ওই পোড়ামুখী,
তোরে নাহি দেখে একবার,
'দেবী মা' হইল রে সে, 'মানবী' হইনু আমি,
সে স্বর্গ লো; আমি মাটি ছার?

অভিমন্যু

আমাকে দেখিতে, মা গো, আছে ত মা সুলোচনা,
হৃদয় স্নেহের পারাবার।
তাদের দেখিতে বল কে আছে মা! রণক্ষেত্রে?
তাদের মা জননী আমার।
সেদিন মা! রণক্ষেত্রে প্রখর রবির কর
জ্বলিতেছে মস্তক-উপর।
জ্বলি'ছে প্রখরতর চারি দিকে যুদ্ধানল,
পিপাসায় হইনু কাতর।
সারথি আনিল বারি, আগ্রহে মা পানপাত্র
লইয়াছি করিবারে পান,
দেখিনু অদূরে মা গো! পড়িয়া সৈনিক এক
অস্ত্রাহত, কণ্ঠাগত-প্রাণ।
মৃত্যু-মুখে পিপাসায় র'য়েছে চাহিয়া হায়!
মম পানপাত্র, নেত্রস্থির।
ছুটে গিয়া কাছে তার, কহিলাম—"পান কর,
আনিয়াছি সুশীতল নীর।"
কহিল সে ক্ষীণকণ্ঠে,— "কুমার! বালক তুমি,
আপনি কাতর পিপাসায়;
এখনি মরিব আমি, নিবিবে পিপাসা মম,
পান করি' কি হইবে হায়!"
কাঁদিয়া তাহার শির রাখিয়া অঙ্কে আমার,
কহিলাম—"পিপাসা আমার

কিছু আর নাহি ভাই। তুমি নাহি কর পান,
এই জল ছুঁইব না আর!"
বাম করে খুলি' মুখ দিলাম ঢালিয়া বারি,
পান করি' কহিল আবার,—
"এমন না হবে কেন, অভিমন্যু তুমি পুত্র
আমাদের মাতা সুভদ্রার।"
বহিল যুগলধারা দু'নয়নে, দুই তারা
ক্রমে ক্রমে অপলক স্থির;
মায়ের পবিত্র নাম থাকিতে অধরপ্রান্তে
বীর-স্বর্গে চলি' গেল বীর।
"সেই জগতের মাতা আমার সুভদ্রামাতা" –
ছাড়ি' গলা সুলোচনা মার,
গলায় মা সুভদ্রার পড়ি' কহে—"মা! মা! ওমা!
জগতজননী মা আমার!"
স্নেহভরা মুখখানি সুভদ্রা লইয়া বুকে
চুম্বিলেন আবার আবার,
কহিলেন,—"সত্য বৎস! তুচ্ছ ভদ্রা, সুলোচনা,
জগতজননী মা তোমার।
মাতৃ-প্রেম-পূর্ণ বুকে দেখিয়া তাঁহার মুখে
পরিপূর্ণ অখিল সংসার,
ঢালিও এ প্রেমধারা, তখন দেখিবে মাতা
দুই নহে অসংখ্য তোমার!
ছয় চক্ষু ছল ছল যেন পুষ্প-পত্রোৎপল!
কি সঙ্গীত জগৎ প্লাবিয়া
হৃদয়ের যন্ত্রে এবে বাজিতেছে এক তানে
তিনজন রহিল শুনিয়া!
"এ কি গ্রন্থ!"—কহে যুবা, ল'য়ে প্রসারিয়া কর,—
'ভগবদ্গীতা' কি মা! কবি কে?"

সুভদ্রা

মহর্ষিবর।
পড়িতে লাগিলা পুত্র হইয়া নিবিষ্টমন,
শুনিতে লাগিলা মাতা গীতামৃত-প্রস্রবণ।
প্রথম অধ্যায় শেষ করি উচ্ছ্বসিত মনে
কহিতে লাগিলা যুবা, ভ্রমিয়া অধোবদনে,—
"বুঝিলাম এতদিনে, না হয় প্রবৃত্তি মম
কেন এই মহাযুদ্ধে। যথায় ক্ষত্রিয়গণ
জগতের একক্ষেত্রে হইয়াছে সমবেত,
সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত!
কেন সিংহশিশু আমি শুনি' বীর-সিংহনাদ
না নাচে হৃদয় মম। পাছে হয় অপবাদ
কেন শুধু যন্ত্রমত করি যুদ্ধে যোগদান,
কেন শ্লথকরে আমি ছাড়ি লক্ষ্যহীন বাণ।
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত;
পড়ি'ছে গাণ্ডীব খসি' হ'তেছে দেহ দাহিত।
'কি কায রাজ্যে, গোবিন্দ! কি কায ভোগে,
জীবনে!

যাদের কারণ
'চাহি রাজ্য-ভোগ, সুখ, তাহা উপস্থিত যুদ্ধে
ত্যজিতে জীবন।
'হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি,
হে মধুসূদন!
তুচ্ছ মহী, ইহাদের না ইচ্ছি ত্রৈলোক্য তরে
বধিতে কখন।'—
কি গভীর কাতরতা, মা গো! পিতার আমার
হৃদয় কি প্রেম-স্বর্গ, কিবা দয়া-পারাবার!
কি দেবহৃদয়ে, অহো! কি বাড়ব প্রস্রবণ!
কি প্রেম-সলিলে ভাসে কিবা বীর্য-হুতাশন।
কি ধর্মভীরুতা সহ কিবা বীর-পৌরুষতা!
কি বীরত্ব-পারিজাতে কি স্নেহ-ত্রিদিবলতা!
পিতার এ ভাব যবে, মা গো! কি বিস্ময় তবে,
অযোগ্য পুত্রের তাঁর হৃদয়ে এ ভাব হবে?
হায় মা! তথাপি পিতা করুণাহৃদয় মম,
কেন করি'ছেন বল এই মহাপাপ রণ?
স্বয়ং নারায়ণ কেন, হইয়া সারথি তাঁর,
করিছেন এইরূপে সংহার মা! এ সংসার?

সুভদ্রা

ভক্তিভরে পড় বৎস! এই গ্রন্থ জ্ঞানাধার,
বুঝিবে রহস্য তুমি পাইবে উত্তর তার।
তখন বসিয়া যুবা লাগিলা অনন্যমনে
পড়িতে সে মহাগ্রন্থ, অতুলিত ত্রিভুবনে।
সুলোচনা কাছে বসি' হাই তুলি' কিছুক্ষণ,
চলি' গেল ব্যাসদেবে করি, মিষ্ট সম্ভাষণ।
সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্ত্বরাশি,—
নিত্য, সত্য, সনাতন,—ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি'
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে যুবা রাখিয়া গ্রন্থ কখন
ভ্রমিল আনত মুখে, বিহ্বল অনন্যমন।
ক্রমে একাদশ সর্গ—কিবা দৃশ্য! বিশ্বরূপ!
বিরাট ও বিশ্বময়, চিন্তাতীত, অপরূপ!

সর্বদেহ রোমাঞ্চিত, পড়িয়াছে গ্রন্থ খসি',
চাহে শূন্য পানে যুবা বিস্মিত স্তম্ভিত বসি'।

অভিমন্যু

এক কৃষ্ণরূপে ব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চরাচর,
অনাদি অনন্ত কিবা বিরাট্ পুরুষবর!
সংখ্যাতীত সৌর রাজ্য, চন্দ্র, তারা, প্রভাকর,
ঝলসি' সে মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর!
সংখ্যাতীত ধূমকেতু, সৌর অগ্নি অস্ত্রমত,
অনন্ত পূরিয়া স্বনে ছুটিয়াছে অবিরত!
ছুটিয়াছে মহামন্ত্রে মেঘবৃন্দ অগণন
বিক্ষেপিয়া তাড়িতাস্ত্র ঘন বজ্র বিভীষণ!
গ্রহে গ্রহে বিধূনিত সংখ্যাতীত পারাবার,
বহিতেছে সংখ্যাতীত নদ নদী অনিবার।
অসংখ্য ভূধরমালা, অগ্নি-গিরি অগণন,
সধূম্র গৈরিক-রাশি করিতেছে উদ্গীরণ।
মুহুর্মুহু কত গ্রহ, অগ্নি-উল্কা বিকীর্ণিত
করিয়া, বিরাট্ শব্দে হইতেছে বিচূর্ণিত!
স্থাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত
সৃষ্ট, স্থিত, লীন দেহে, জলে জলবিম্ব মত।
অনন্ত করাল-মূর্তি করি'ছে বিশ্ব সংহার,
উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার!
করুণানিধান কৃষ্ণ, মা গো! জগন্নাথ হরি,
কেন নাশিছেন বিশ্ব এ ভীষণ রূপ ধরি'?

সুভদ্রা

অদ্বিতীয়, সর্বময়, সর্বভূত-মূলাধার,
যদি বৎস! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তবে রূপ তাঁর।
জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার
বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস! সোপান দ্বিতীয় আর।
দেখিলে এ বিশ্বরাজ্য, অভিন্ন চেতনে জড়ে,
নির্মম সংহার নিত্য সর্বত্র নয়নে পড়ে।
নহে নির্দয়তা, বৎস! ধ্বংসনীতি দয়াধার।
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার!
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার; মুহূর্তেতে জীবগণ
অন্নাভাবে, স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ
দারুণ যন্ত্রণাভোগ! মাগিবে দয়া মৃত্যুর
কাতরে, সলিল যথা মরু দগ্ধ তৃষ্ণাতুর।
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার, অধর্মের অভ্যুত্থান
করিবে, ভারত মত, জগত মহাশ্মশান।
কৌরবের লোভ হ'তে করিতে বিশ্ব-উদ্ধার,
ধ্বংস বিনা বল, বৎস! আছে কি উপায় আর?
পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত,
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হ'বে নিশ্চিত।
না বিনাশ' বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল,
নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল।
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম, নিত্য, সত্য, সনাতন;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে নীতিচক্রে বিচরণ।
সংখ্যাতীত ধ্বংস যথা, সৃষ্টি তথা সংখ্যাতীত
হ'তেছে মুহূর্তে, স্থিতি এরূপে হয় সাধিত।
সর্বভূতহিত তরে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয়;
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময়।
ধ্বংসনীতি ধর্মনীতি, ধ্বংসরূপী নারায়ণ।
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, ধর্মযুদ্ধ এই রণ।
আবার আবার পুত্র পিতার সে মহাধ্যান
পড়িল বিহ্বলচিত্তে, আতঙ্কপূরিত প্রাণ।
করি' পাঠ সমাপন, শিবির-গবাক্ষপথে
চাহি' আকাশের পানে রহিল, জ্ঞানের রথে
স্তম্ভিত বিস্মিতমন হইয়া যেন উত্থিত
কি অনন্তে, কি আলোকে, গাম্ভীর্যে কল্পনাতীত
হইয়া বিলীন ক্রমে; ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে
মিশাইল বারিবিম্ব যেন মহাপারাবারে।
অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রমে; কক্ষে কক্ষে ধীরে ধীরে,
প্রবেশিল অভিমন্যু অপূর্ব মহামন্দিরে—
অতল, অম্বর-স্পর্শী; পশি কক্ষে ঊর্ধ্বতম
দেখিল কি মহাদৃশ্য—গঙ্গাসাগরসঙ্গম!
জাহ্নবী জড়প্রকৃতি চেতন পুরুষবক্ষে
মিলিয়াছে, মহাগীত উঠিতেছে কক্ষে কক্ষে,—
"আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয়।"
চাহি ঊর্ধ্বপানে স্থির শুনিতেছে এই গীত
জ্ঞান-স্বরূপিণী মাতা, কুমার প্রতিভাম্বিত।
কি আনন্দ-মন্দাকিনী বহে উভয়ের চক্ষে!
কি পূর্ণ আনন্দসিন্ধু উচ্ছ্বসি'ছে দুই বক্ষে!
প্রদোষ অস্ফুটালোক ধীরে ভক্তিভরে আসি',
এ আনন্দে, এ উচ্ছ্বাসে ঢালি'ছে গাম্ভীর্যরাশি।
কুমার অস্ফুটালোকে ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
গাম্ভীর্যপূর্ণ হৃদয়ে শিবিরে, আনতশিরে।
জননী প্রফুল্লমুখে কহিলা প্রফুল্লস্বরে,—
ভাসিল পূরবী সান্ধ্যসমীরে ভকতিভরে—
"বুঝিলে কি অভিমন্যু!—অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি' স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন।

কল্পক্ষয়ে সর্বভূত তাঁহার প্রকৃতি পায় ;
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি হয় পুনরায়।
এইরূপে চরাচর জন্মি' জন্মি' হয় লয় ;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বৎস! এরূপে সাধিত হয়
'যথা আকাশেতে নিত্য সর্বগামী মহাবায়ু
করে অবস্থান,
সেইরূপে সর্বভূত তাঁহাতেই অবস্থিত,—
তিনি ভগবান্।
নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্বব্যাপী সর্বগত
আকাশ যেমন,
সর্বদেহে অবস্থিত নির্বিকার পরমাত্মা
নির্লিপ্ত তেমন।
নরের কর্তৃত্ব, কর্ম, কর্ম-ফল কদাচিত
না সৃজেন বিভু, জীব স্বভাবেতে প্রবর্তিত!
কি জীব, কি উদ্ভিদ্, চেতন, অজড়, জড়,
সকলই নিজ নিজ স্বতন্ত্র প্রকৃতিপর।
স্বপ্রকৃতি-অনুসারে স্বয়ং যবে নারায়ণ
নির্লিপ্ত কর্মেতে রত,—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন—
স্বপ্রকৃতি-অনুসারে নির্লিপ্ত কর্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম সনাতন।
ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম নিষ্কাম যে কর্মে রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত।
সর্বভূতস্থিত ব্রহ্ম ; সাধ সর্বভূত-হিত,
হইবে তোমার কর্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত।
জলধির হিত যাহা, তাহা জলবিন্দুহিত,
জগতের হিত, বৎস! তোমার হিত নিশ্চিত।
অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি' সংযত,
জগতের হিতে করি' নিজ স্বার্থ পরিণত,
স্বপ্রকৃতি-অনুসারে স্বধর্ম কর পালন,
এইরূপে কর্মফল ব্রহ্মে করি' সমর্পণ।
ফলিয়া অনন্ত তরু, বরষিয়া মেঘদল,
সাধি'ছে কি স্বার্থ? বিশ্ব আদর্শ নিষ্কামস্থল!
আপন প্রকৃতি মতে ফলে তরু, বর্ষে ঘন,
জগতের হিতে সাধি' স্বধর্ম মোক্ষ পরম।
বীরত্ব প্রকৃতি তব, স্বধর্ম যুদ্ধ তোমার ;
ধর্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।
সুখে দুঃখে অনাসক্ত, লাভালাভে জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি, বৎস! যথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
বুঝিলে কি অভিমন্যু! গীতামৃত করি' পান,—
নিবারিতে ধর্ম-গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান ;
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন ;
স্থাপন করিতে বৎস! জগতে ধর্ম-সাম্রাজ্য,—
এই মহারণ?
"বুঝিলাম",—জননীর পদতলে পড়ি'
কহে গলদশ্রু যুবা—"বুঝিনু আমার
মাতা দেবী, পিতা দেব, মামা নারায়ণ,
আমি তোমাদের মা গো! পুত্র নরাধম!
বুঝিলাম ক্ষুদ্র শুক্তি জন্মে রত্নাকরে ;
কুফল অশ্বত্থে, বটে ; তৃণ মহীধরে।
দিলে আজি পুত্রে তব জন্ম শ্রেষ্ঠতর,
শিরে দিয়া দুই হাত আশীর্বাদ কর,—
স্বধর্ম-পালনে মা গো! করি প্রাণদান,
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।"
দেব পুত্রে দেবী মাতা লইয়া হৃদয়ে
অশ্রুমুখী, চুম্বি' সেই সিক্ত কুবলয়ে,
কহিলা উচ্ছ্বাস-কণ্ঠে ভকতিপূরিত,
মাতৃ-স্নেহে দুই ধারা করি' বিগলিত—
"লও আশীর্বাদ—করি' স্বধর্মপালন,
গীতা-সাম্রাজ্য কর জগতে স্থাপন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, অর্জুনতনয়,
তোর মাতা—হ'ক মম এই পরিচয়।"

পঞ্চম সর্গ

ভ্রাতা-ভগিনী

হেমন্তশৈশবসন্ধ্যা ধীরে বিষাদিনী
উত্তরিলা কুরুক্ষেত্রে ; উত্তরিলা ধীরে
অদূর দক্ষিণারণ্যে, বসিয়া যথায়
সন্ন্যাসিনী জরৎকারু সন্ধ্যাস্বরূপিণী।
অপরাহ্ণ হ'তে বামা বসি' একাকিনী
বনপ্রান্তে, দূর পথ চাহি' অবিরাম,
কহিল—"গিয়াছে আশা। এইরূপে হায়!
যাইবে জীবন কি লো? সূর্য অস্তমিত ;—
যেই সন্ধ্যা-ছায়া হায়! ভাসিতেছে এবে
জীবনে এ দুঃখিনীর নিবিড় নিশীথে
তাও অভাগিনীর কি হ'বে পরিণত?
রমণীর সুখসূর্য, রমণীর প্রেম,
ডুবিয়াছে বহুদিন। হয় ত উদয়
অস্তরবি, অস্তপ্রেম ফিরে না কি আর?
ভ্রাতার সাম্রাজ্য-আশা এক ক্ষীণালোক
সঞ্চারিয়া সেই ঘোর নিরাশ-আঁধারে,
করিয়াছে সন্ধ্যাময় জীবন আমার
এইরূপে, এইরূপে সেই ক্ষীণালোক,—
হা বিধাতঃ! এইরূপে যাবে কি নিবিয়া?"

হেমন্ত-শৈশব সন্ধ্যা ধীরে ছায়াময়ী
উত্তরিয়া কুরুক্ষেত্রে, ঢালিল শান্তির
শীতল বিষাদ-ছায়া সমর-অনলে।
দিবসের শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল ;
দিবসের শেষ মৃত চুম্বিল ভূতল ;
শেষ সিংহনাদ, শেষ কোদণ্ডটঙ্কার,
মিশাইল সন্ধ্যানিলে। শেষ শঙ্খনাদে
দিবসের রণ-শান্তি ঘোষিয়া গম্ভীরে,
যোদ্ধাগণ দুই স্রোতে চলিল শিবিরে,—
অনন্ত বলাকামালা দুই স্রোতে যেন
চলিল কাকলীকণ্ঠে প্লাবিয়া গগন ;
দুই প্রতিকূলানিলে চলিল ছুটিয়া
ফেনিল তরঙ্গমালা মহাপারাবারে।
নিবিল ঝটিকা,—ঘোর শঙ্খের নিনাদ,
সমর-নির্ঘোষ,—মত্ত জলধি-উচ্ছ্বাস,
সন্ধ্যালোক সহ ধীরে। মহর্ষি দুর্বাসা
বনান্তর হ'তে ধীরে হইলা বাহির,
বিবর হইতে যেন তীব্র বিষধর।
এখন(ও) যুবতী বসি' চাহি পথপানে
বিবশা, আপনা-হারা, না দেখে নয়নে
রণক্ষেত্র, বনক্ষেত্র না শুনে কাকলী।
কিছুক্ষণ ভ্রমি' ঋষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে
ডাকিলা—"মনসে!" বামা শুনিল না কাণে,
চিত্রিত প্রতিমা মত রহিল বসিয়া।
"পাপীয়সি!"—স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বামা
দেখিল ফিরিয়া ঋষি। "পাপী-পাপীয়সি!"
ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ কাঁপে থর থর,
—"নিয়ত আমায় তুচ্ছ! নিয়ত এখানে
থাকিস্ বসিয়া ; নিত্য একই ভাবনা!"
কাতরে কহিল কারু,—"সংসার-বন্ধন
একে একে হায়! প্রভো! ছিঁড়েছি সকল ;"
—মুখ ফিরাইয়া পুনঃ চাহি পথপানে—
"একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
উদাসিনী পত্নী তব। স্নেহ-পারাবার
ভ্রাতা সে বন্ধন তার। সেই এক বৃন্তে
শুষ্ক ফল সম এই হৃদয় আমার
ঝুলিছে সংসার-বৃক্ষে ; কাটিও না তারে,
শুষ্ক ফল হায়! প্রভু! পড়িবে ঝরিয়া।
জগতে এমন ভাই কোথা আছে আর?
শৈশবে এ অভাগীরে গেলেন ছাড়িয়া
জনক জননী। হায় পিতৃব্যভগিনী—
বিশ্বাসঘাতিনী শৈল! হারা'ল শৈশবে
জনক জননী তার। দুইটি বালিকা
বনবল্লরীর মত পালিলা আদরে
অঙ্গে অঙ্গ জড়াইয়া, অঙ্গ মিশাইয়া,
কল্পতরু নাগরাজ। প্রভু! আমাদের
নাগরাজ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সহচর।
শুনিয়াছি মহাবনে আছে তরুবর,
কঠিন কঠোর দেহ, হৃদয় তাহার
দুগ্ধে ভরা, সেই তরু মম সহোদর,—
শিলারোধে অবরুদ্ধ স্নেহের সাগর।

মুখে মুখে বুকে বুকে অনাথা দু'জনে
বিহঙ্গ-শাবক মত করিয়া পালন
কত দুঃখে, কত স্নেহে ; কতই আদরে
শিখা'লেন অস্ত্রবিদ্যা, শিল্প ও সঙ্গীত।
আমি উগ্র, শৈল শান্ত! স্নেহে সহোদর
কহিত তপতী আমি, শৈলজা নর্মদা।
বনে বনে পর্যটনে, আমরা দু'জন
থাকিতাম অঙ্গে লাগি ; গলায় গলায়
দুলিতাম, পড়িতাম অঙ্কে ঘুমাইয়া।
করে নাই আমাদেরে, করিনি আমরা
সহোদরে, মুহূর্তেক নয়ন-অন্তর।
হায়! অভাগিনী শৈল, বিশ্বাসঘাতিনী
পুড়ি' মনস্তাপানলে,—জগতে এমন
নাহি বুঝি দুঃখ আর!—ছাড়ি মর্ত্যলোক,
ওই বুঝি আকাশেতে র'য়েছে ফুটিয়া
সেই ক্ষুদ্র স্নেহফুল! এই দীর্ঘকাল
নাহি জানি ভাই কোথা।"

কাঁদিল রমণী,
দর দর দুই ধারা বহিল নয়নে।

দুর্বাসা

পতিচিন্তা একমাত্র সতী রমণীর
মহাধর্ম, অন্য চিন্তা মহাপাপ তার।
নারীর আবার কেবা পিতা, মাতা, ভ্রাতা?
তাহার সর্বস্ব স্বামী। বিবাহের সনে
ছাড়ি' পিতৃকুল, পতিকুলেতে স্থাপিত
হয় অরুন্ধতী মত। হ'লে বৃক্ষান্তর,
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক কুঠারে
পূর্ব তরু, আছে তাহে কি দুঃখ লতার?
"ভ্রাতার সাম্রাজ্য-সাধ যাক্ রসাতলে।
ইচ্ছা—এই দণ্ডে পোড়া যজ্ঞকাষ্ঠখানি
ভাঙ্গি' ঝড়রূপ ধরি' করি খণ্ড খণ্ড
কুঠারে অস্থিপঞ্জর"—কহিয়া স্বগত,
কহিল কাতর-কণ্ঠে শিহরি রমণী—
"শিব! শিব! একি কথা! ইহা যদি, প্রভু!
নারীধর্ম আর্যদের, অনার্যা এ দাসী
পারিবে না তাহা কভু করিতে পালন।
বিবাহের পরে থাকি অনার্যা আমরা
পিতৃবাসে, পিতৃকোলে, জননীর বুকে,
ভ্রাতা ভগ্নীগণ সঙ্গে গলায় গলায়।
ছাড়ি' সেই স্বর্গ, ছাড়ি' পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
ছিন্ন করি' সে অনন্ত স্নেহের বন্ধন
বাঁচিতে অনার্যা লতা পারে না কখন।
মানব-হৃদয় সিন্ধুনদ শতমুখ ;—
কত আশা, কত তৃষা, কত ভালবাসা!
অবরুদ্ধ সর্বস্রোত মম হৃদয়ের।
এক স্রোতে হায়! আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এ জীবন ; এ হৃদয় ; সহোদর-স্নেহ
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ। জীবন-প্রবাহ,—
অম্লানবদনে পারি রোধিতে তাহার ;
এ প্রবাহ, অভাগিনী পারিবে না, হায়!
দাসী বন-নিবাসিনী ; বন-বিহঙ্গিনী
কাটিবে পিঞ্জর, নহে ত্যজিবে জীবন,
অনাহারে অভাগিনী, তথাপি কখন
কাটিবে না স্নেহময়ী স্নেহের বন্ধন।
ওকি দেখা যায় ওই! আসিলা আমার
ওই বুঝি দাদা! ওই!- দাদা! দাদা! দাদা!
যেমতি পিঞ্জর-মুক্ত বন-বিহঙ্গিনী,
ছুটিয়া রমণী বেগে আনন্দে অধীরা,
পড়িল বাসুকি-বক্ষে। গলা জড়াইয়া
কহিল কাঁদিয়া—"দাদা! ছাড়িয়া আমারে
কেমনে রহিলে তুমি বল এত দিন?
তুমি বিনা এ জগতে কি আছে আমার?"
উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে চুম্বিয়া আদরে
কহিলা বাসুকি—নেত্র ছল ছল,—
"কারু! কারু! পাগলিনি! আসিতে আমার
হইল বিলম্ব কিছু ছিলাম ব্যাপৃত
নানা কার্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া,
কেবল দেখিতে তোরে, লইতে রে বুকে
কোমল মু'খানি তোর ; জুড়া'তে জীবন,—
দুরাকাঙ্ক্ষা মরীচিকা—তোর স্নেহাসারে।
না দেখি' আমারে তোর যত কাঁদে প্রাণ,
কাঁদে মম ততোধিক ; সংসার-মরুতে
একমাত্র তুই মম স্নেহ-মন্দাকিনী।"
আবার আবার স্নেহে চুম্বিয়া বদন,
স্নাত ফুল্ল নীলোৎপল জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
"কেমনে আছিলি, কহ।"

উত্তরিল হাসি'
ধীরে অধোমুখী বামা—"আছিলাম,—আছি
আশ্রিত পাদপ-চ্যুত লতিকার মত।
ঝটিকায় ভূপতিত দেহ লতিকার,

পদাঘাতে বিদলিত ; মরে না তথাপি,
স্নেহের বেষ্টনে বাঁধা লতিকার মূল
পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি।"
"নরাধম! দুরাচার!"—লৌহ দৃঢ়তম
আঘাতিল শিলা দৃঢ়! অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
ছুটিল বাসুকিচক্ষে। "পাপী! নরাধম!—
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, জ্ঞানী, সুসভ্য ইহারা!
আমরা অনার্য্যগণ অসভ্য বর্ব্বর!
ভ্রাতা ও ভগিনী",—চাহি' আকাশের পানে,
ভগিনীকে ল'য়ে বুকে কহিলা কাতরে,—
"হতভাগ্য দুই জন! না জানি এমন
আছে কি জগতে আর। নিরাশা-অনলে
হায় রে! জ্বলিতেছিল দুইটি হৃদয়।
ডুবিনু আপনি, আর ডুবাইনু তোরে,
অনার্য্যের রাজ্যোদ্ধার দুরাশা-সাগরে,
নিবাইতে সেই জ্বালা,—সে ভীষণ জ্বালা
রাজ্যলাভে পারে যদি, পারি নিবাইতে!—
হায়! যদি রণরঙ্গে শত্রুর শোণিতে,
প্রতিহিংসা-সুরামৃতে নিবে রে সে জ্বালা!
বুঝিলাম আশা-মত্ত আমরা দু'জন।
অন্যথা বাসুকি তোর তিল সুখ তরে
তুচ্ছ কথা ধরারাজ্য, সুররাজ্য পারে
ফেলিতে চরণে ঠেলি' অম্লানবদনে।
কিন্তু তোর অপমান, এ ঘোর নিগ্রহ!
হা বিধাতঃ! বাসুকির স্নেহের মৃণালে
একটি যে নীলোৎপল, অতুল জগতে
ফুটিল, তাহার ভাগ্যে লিখিলে এ লিপি?
ফেলিলে আনায়ে এই বনের শার্দ্দূল,
করিলে নির্ব্বীর্য হেন, র'য়েছে চাহিয়া
ভগিনীর অপমান!"—
বহিল নয়নে,
বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী মেঘে, সলিলের ধারা।
কাতরে কহিল কারু,—"এ কি কথা, দাদা!
বাসুকির ভগ্নী আমি, নাগেন্দ্রনন্দিনী,
কি সাধ্য একটি দীন ঋষি-দুরাচার
করে মম অপমান? একটি পতঙ্গ
কি সাধ্য নিগ্রহ, দাদা! করে সিংহিনীর?
একটি কমল ক্ষুদ্র তুলিতে কণ্টক
জান ত সহিতে হয়। সামান্য নিগ্রহ
সহিতে না পারি যদি, বীরেন্দ্র! কেমনে
একটি বিশাল রাজ্য করিব উদ্ধার?"
দাঁড়াইয়া ঋষিবর দেখিতেছিলেন
এই দৃশ্য, ভাবিতেছিলেন মনে মনে,—
"সংসারবন্ধন যদি মোহের বন্ধন,
মোহ তবে কি মধুর! কি স্বর্গ সুন্দর,—
ভ্রাতা ও ভগিনী ওই গলায় গলায়!
জরৎকারু—জরৎকারু! কিবা মূর্ত্তিখানি!
কিবা মুখ! কিবা রূপ! রূপের সাগরে
খেলে কি তরঙ্গ-ভঙ্গ সঞ্চারি' আবেগ
যজ্ঞকুণ্ডসম মম যোগীন্দ্রহৃদয়ে!
তবু সে অনার্য্যা ; অঙ্গ-বাতাসেও তার
হয় দেহ কলুষিত আমি দুর্ব্বাসার ;
ঘৃণায় শিহরে অঙ্গ। কিন্তু কি করিব ;
ব্রাহ্মণের আধিপত্য রক্ষিত বর্দ্ধিত
করিতে ল'য়েছি ব্রত। তার উদ্‌যাপন
না হইবে যত দিন, হইবে সহিতে
অনার্য্য-সংসর্গ-পাপ, এই বিড়ম্বনা।"
প্রণমিল নাগরাজ। আশীষিয়া ঋষি
জিজ্ঞাসিলা—"কহ, শুনি শুভ সমাচার।"
উত্তরিলা নাগরাজ ছাড়িয়া নিশ্বাস—
"অসংখ্য অনার্য জাতি হইবে গ্রথিত
একতার সূত্রে, ঋষি! অসম্ভব কথা।
দুই চারি জন যদি হয় অগ্রসর,
দুই চারি শত যায় পশ্চাৎ সরিয়া।
অসংখ্য নক্ষত্রাবলি ওই আকাশের
গাঁথিলে গাঁথিতে পার,—হায়! আমি এই
দুরাকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রের নাহি দেখি কূল।"
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি কুরুক্ষেত্র প্রতি,
ঈষৎ হাসিয়া—সেই হাসিতে কি বিষ!—
উত্তরিলা ঋষিবর,—"ওই দেখ কূল!"

বাসুকি

কূল!—কূল নহে ঋষি! ঘোর প্রতিকূল
ভীষ্ম অর্জ্জুনের যেই বীরত্বের গীত
জনরব শতমুখে করিছে প্রচার,
প্লাবিয়া ভারতভূমি পশিয়াছে বনে
সে অপূর্ব্ব বীর-গাথা। ক'রেছে সঞ্চার
কি যে ত্রাস হৃদয়েতে বনপুত্রদের
কহিতে না পারি আমি। জিজ্ঞাসে সকলে—
"কে ধরিবে অস্ত্র বল ইহাদের আগে?
আছি ভাল সুশীতল কানন-ছায়ায়।

মাতা-বনদেবী-অঙ্কে জ্বলি' দাবানল,
কি ফল লভিব বল পুড়িয়া মরিয়া ?"

দুর্বাসা

জরৎকারু ঋষিশ্রেষ্ঠ যথা যজ্ঞাগারে
কাষ্ঠের অগ্নিতে কাষ্ঠ করে ভস্মীভূত,
ক্ষত্রিয়-অগ্নিতে তথা সমগ্র ক্ষত্রিয়
পোড়াই'ছে এই দেখ ! আশু দাবানল,
নিভিবে ক্ষত্রিয়হীন করিয়া ভারত।
শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্ম, ওই দেখ, ওই,
মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে !
কিবা দৃশ্য হাস্যকর ! বীর্যে, অহঙ্কারে,
ধরা ভাবিতেন সরা ; বুঝেছেন এবে
সার্ধ তিন হস্ত ভূমে সেই পৃথিবীর
হ'য়েছে গর্বিত শৌর্যে বীর্য পরিমিত,—
ভীষ্ম ও ভীরুর শেষে এক পরিণাম !
ওই ষণ্ড, রাজসূয়যজ্ঞে মহাদর্পে
বাড়াইয়া গোপসুতে করিল প্রহার
ব্রাহ্মণের শিরে অসি। বিধর্মী পামর
প্রাণভয়ে অর্জুনের সাজিয়া সারথি
উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছে তাহার,—
ওই ভীষ্মদেব, পড়ি মণ্ডুকের মত !
বীরত্বের এ বিদ্রূপের অঙ্গ বাসুকির
উঠিল জ্বলিয়া ক্রোধে—"যজ্ঞব্যবসায়ী
কাপুরুষ তুমি ঋষি ; বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ ; এই বীরত্বের
কেমনে বুঝিবে তুমি অতুল মহিমা,—
মূষিকে বুঝিবে কিসে সিংহের গৌরব ?
ভীষ্মের পতন স্তব্ধ কৌরবের পতি
করে যদি সন্ধিভিক্ষা,—জান তুমি চাহে
পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা ভাই পঞ্চ জন ।
কিম্বা যেই পক্ষ জয়ী এই মহারণে
হইবে, তাহার কীর্তি ছুঁইবে আকাশ ;
অনার্য কি কেহ তার দাঁড়াবে সম্মুখে ?
অসম্ভব কথা ঋষি !"

দুর্বাসা

'অসম্ভব' কথা
জরৎকারু মহর্ষির নাহি অভিধানে।
না হইতে প্রভাকর উদয় আবার,
ক্ষত্রিয়-অদৃষ্ট-গ্রহ যোগবলে আমি
ফিরাইব যেই মতে হেলা'য়ে তর্জনী,
নিশ্চয় হইবে তাহে সন্ধি অসম্ভব,
ভস্মিবে উভয় পক্ষ শিমূলের মত।
জয়ী পক্ষ এই রণে, বাসুকি ! আমরা !
নীরবে চিন্তিয়া ঋষি কহে অধোমুখে—
"কর্ণের শিবিরে গিয়া কহিবে গোপনে
নাগেন্দ্র ! আসিতে হেথা গভীর নিশীথে।"

জরৎকারু

না, দাদা ! একে ত ক্লান্ত হইয়াছ তুমি
দীর্ঘ পথ পর্যটনে। অবসন্ন দেহ
কাতরে মাগি'ছে শ্রান্তি, পড়ি'ছে ভাঙ্গিয়া
মূলশূন্য তরু যেন। তাহাতে তোমায়
দেখে যদি কোন জন, চিনে যদি কেহ,
হইবে শত্রুর মনে সন্দেহ বিষম।
মহা অন্ধকারে নাহি পারে লুকাইতে
মহীরুহ, ক্ষুদ্র লতা অলক্ষিতা সদা।
নহে তুমি, যাব আমি।

ষষ্ঠ সর্গ

কুরুক্ষেত্রে পুতুল-খেলা

সুবর্ণ প্রদীপ, সুগন্ধ বিতরি'
সুমন্দ আলোক সহ,
আলোকিছে চারু পার্থের শিবির
বহে ধীরে গন্ধবহ।
দুই পর্যঙ্কেতে, শুয়ে দুই জন—
ধনঞ্জয়, জনার্দন।
সুভদ্রা কৃষ্ণের, উত্তরা পার্থের,
ঔষধ অঙ্গে লেপন
করি'ছে আদরে,— বিষাদিত মুখ
মেঘমাখা চন্দ্র যথা।
কহি'ছেন হর্ষে শ্রান্ত কৃষ্ণার্জুন
দিবসের রণ-কথা।
উত্তরা না শুনে সেই বীর-গাথা
তাতে তার নাহি প্রীতি।
নীরবে তাহার নয়নের ধারা
পড়ি'ছে কপোল তিতি'।—
"সর্ব অঙ্গ ক্ষত! কেমনে মানুষ
এমন নিষ্ঠুর হয়?
বীরের কি, বাবা! থাকে না হৃদয়?
তুমি ত করুণাময়।"
দেখিলা অর্জুন কাঁদিছে উত্তরা,—
অশ্রু নহে—স্নেহাসার;
চুম্বিয়া মু'খানি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে
কহিলা—"বাছা আমার!
বীর-ধর্ম যুদ্ধ, এ ত আর তোর্
নহে পুতুলের রণ।
বীর-বালা তুই, দেখি' অস্ত্র-লেখা
কাতরা কেন এমন?"
"না না বাবা! আমি না পারি বুঝিতে
পোড়া বীর-ধর্ম ছাই
সংসার ছাড়িয়া যা'ক যমপুরে
লইয়া সব বালাই।
একটি কণ্টক চরণে তোমার
ফুটিলে উত্তরা তব
না পারে সহিতে; নিত্য এত ক্ষত
কেমনে পরাণে স'ব?
কেন এই রণ? কেন দেব-অঙ্গ
এইরূপে কর ক্ষত?
কে আছে জগতে তোমাদের মত,
কে সুখী আমার মত?"
সুবর্ণ দর্পণ সে ক্ষুদ্র ললাটে
আদরে বুলা'য়ে কর,
কুঞ্চিত কুন্তল সরাইয়া ধীরে,
উত্তরিলা বীরবর—
"পিতৃরাজ্য বাছা! করিব উদ্ধার,
রাজা হবে অভি মম;
তুই হবি রাণী বসি' বামে তার,
ইন্দ্রপাশে শচী সম।"
অধোমুখী বামা, কণ্ঠ ছল ছল,
কহিল বীণার স্বরে
কণ্ঠমূর্ছনায় নারী-হৃদয়ের
অমৃত বর্ষণ ক'রে,—
"যেই তিন রাজ্য পাইয়াছি আমি,
রাজ্য কিবা আছে আর?
তোমার, মায়ের, নারায়ণ-পদ,—
স্বর্গরাজ্য উত্তরার!
আমার সমান ভাগ্যবতী, বল,
কে আছে জগতে আর?
তোমাদের স্নেহ, ক্ষুদ্র হাসিটুকু
স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার।
এ পোড়া ধরার রাজ্যে কিবা সুখ?
নিত্য এই কাটাকাটি;
কে কারে মারিয়া কে কারে খাইবে,—
এ সংসারে কান্নাহাটি।
করে পুত্রহীনা মাতা হাহাকার,
পতিহীনা কত নারী
কাঁদিছে অনাথ শিশু ল'য়ে বুকে,—
প্রাণে না সহিতে পারি!

এ রাজ্য ছাড়িয়া চল যাই বনে,
বাঁধিয়া কুটীর ঘর,
তোমাদের পদ সেবিবে উত্তরা,—
সে রাজ্য কি সুখকর।"
পার্থ, কেশবের, মাতা সুভদ্রার,
ছয় চক্ষু ছল ছল ;
অর্জুন আবার চুম্বিয়া উচ্ছ্বাসে
বিষণ্ণ ফুল্ল কমল।
ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া হৃদয়ে,
—নীলাকাশে যেন তারা,—
গদ গদ কণ্ঠে কহিলা অর্জুন
উচ্ছ্বাসে আপনহারা—
"আশীর্বাদ করি,— এ কৌরব-কুল
মহা হিমাচল সম,
শোভে শিরে যেন বীরত্ব কৈলাস
বাছা অভিমন্যু মম!
তুই মা আমার যাইবি বহিয়া
জননী জাহ্নবী জিনি,
সংসার মরুতে ঢালিয়া অমৃত,
করুণার মন্দাকিনী!
আমার মতন নির্মম পাষাণ,
হয় যেন মুক্ত স্নেহেতে তোর!
তোর স্নেহমুখ চাহিয়া চাহিয়া
জীবনের স্বপ্ন হয় মা! ভোর!"
সকলি নীরব ; কি যেন কি স্বর্গ,—
জোছনার স্বপ্ন প্রায়!
কেবল সে স্বর্গে অনন্ত করুণা
উছলি' উছলি' ধায়!
ভাবিলেন কৃষ্ণ— "ধর্ম-শাস্ত্ররাশি
কি ছাই ঘাঁটিয়া মরি!
সরলা বালার পবিত্র হৃদয়ে
কি স্বর্গ দর্শন করি!
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত রমণী-হৃদয়
যে স্বর্গে লইয়া যায়,
কত সাধনায় ধর্মশাস্ত্র তার
ছায়া মাত্র দেখে, হায়!"
জিজ্ঞাসিলা ভদ্রা— "দাদা জ্ঞানযোগ,
কর্মযোগ কিছু নয়
ভক্তি আছে যেন ; ভক্তই তোমার,
ভক্তের তুমি নিশ্চয়।"

"সকলের মূলে ভকতি, ভগিনী!
না থাকে ভকতি যদি,
পাইতে আমায় চা'বে কেন তুমি
জ্ঞানে কর্মে নিরবধি?
জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত
যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"—
অন্যমনে কৃষ্ণ করিয়া উত্তর
রহিলেন চিন্তাকুল।
ভাবিলেন মনে কংস-নিসূদন—
"হ'তেছে বড়ই ভুল।
একে ত কোমল পার্থের হৃদয়,—
বীরত্ব আর্দ্র দয়ায় ;
বালিকার এই করুণা উচ্ছ্বাসে
বুঝি গীতা ভেসে যায়।"
বুঝিলা উত্তরা পার্থের হৃদয়
হ'য়েছে কাতর অতি,
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া অশ্রুতে হাসিয়া
কহে প্রত্যুৎপন্নমতি—
"হে বাবা! তুমি ত বহু দিন ধরি'
পুতুলগুলি আমার
দেখ নাই, আজি আনি গিয়া সব ;
দেখিবে কি একবার?"
ছুটিল বালিকা বিজলীর মত,
আনিল ভরিয়া ডালা
কতই পুতুল হাসিতে হাসিতে—
পুতুল বিরাট-বালা!
এমন সময়ে শিবিরে বিরাট
হইলেন উপনীত,
ছুটিয়া উত্তরা তুলিল গলায়
যেন স্বর্ণ উপবীত।
হাসিয়া হাসিয়া কহিলা বিরাট—
"এ কৌতুক মন্দ নয়,
কুরুক্ষেত্র এই পুতুলের নাচ।"
"দার্শনিক মহাশয়!
না হ'লে বিরাট মূর্খ, হেন কথা
কে বলিতে পারে আর?
বানরে না বুঝে, রঙ্গরস বিনা
নাহি চলে এ সংসার।

বীর-নাচ, আর পুতুলের নাচ,
দেখি হাড় জ্বালাতন।
বানরের নাচ আজিকার মত
দেখিব ভরি নয়ন।"—
হাসিতে হাসিতে মন্থর গতিতে
সুলোচনা দিল বার,—

বিরাট

ও কে ও? কে? তুমি?

সুলোচনা

পদ-চতুষ্টয়ে
করে দাসী নমস্কার।

বিরাট

না দেখি' তোমায় ভেবেছিনু মনে
কাটা'ব সন্ধ্যাটি আজি
গল্প করি' সুখে, লাগিলে কি তুমি?
লাগ তবে।

সুলোচনা

একি পাজি!
যাই, কেন মরি শূকরে মুকুতা,
অরসিকে দিয়া প্রাণ?

বিরাট

পায়ে পড়ি তোর, দেখ্ মেয়ে কাছে
ছাড়্ রঙ্গ অভিমান।
ওই ঔষধির পাতাটি লইয়া
আয় দেখি; আয় কাছে।
দ্রোণ-অস্ত্রে আজি ক্ষত সর্ব অঙ্গ,
তিলার্ধ না স্থান আছে।
পাতাটি লইয়া হাসিটি চাপিয়া,—
"ফির"—সখী কহে ধীর।

বিরাট

ফিরিব কেন লা?

সুলোচনা

জানি আমি ভাল,
তুমি যে বিরাট-বীর,
বুক পাতি' রণ কারো সনে তুমি
করিবার পাত্র নয়।
অস্ত্র-লেখা কিছু থাকে অঙ্গে যদি
পিঠে তা আছে নিশ্চয়!

সুভদ্রা

ক্ষমা কর দিদি! পায়ে পড়ি তোর,
কাতর বিরাটেশ্বর
দিবসের রণে; ঔষধটি অঙ্গে
দিদি লো! লেপন কর!
নয়ন মুদিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া
বসিয়া বিরাটপতি,—
"আহা! উহু! মরি! আহা! কি আরাম!
ঔষধ সুস্নিগ্ধ অতি।
ততোধিক স্নিগ্ধ সুলোচনা তোর
সুকোমল হাতখানি,
জিহ্বাটিতে শুধু এত কেন ঝাল,
বুঝিতে না পারি আমি।—
বাবা গো! বাবা গো! গেছি রে! গেছি রে!
দুর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাড়!
বড়ই লেগেছে!"

সুলোচনা

কমলেতে কাঁটা
আছে, কি জান না আর?

কৃষ্ণ

কই লো মা তোর পুত্র কয় জন?

সুভদ্রা

বল মা! তাদের নাম।

উত্তরা

বল না দাই মা এইটি—

সুলোচনা

অর্জুন

উত্তরা

এটি?

সুলোচনা

বোকা ভগবান্!
গালে ক্ষুদ্র চড় পড়িল অমনি।
সখী বাড়াইয়া কর,
বানরের মূর্তি তুলিয়া কহিল—
"এইটি বিরাটেশ্বর!"

উত্তরা

দুর্ পোড়ামুখি! তা কেন না হবে?
এই ত বাবা সুন্দর!

ওইটির সঙ্গে দিব বিয়ে তোর,—

সুলোচনা

বিরাট পা'বে দোসর!

উত্তরা

এই তিন পুত্র।

সুভদ্রা

কন্যা মা! কজন?

উত্তরা

এই কন্যা পঞ্চজনা—
তুমি মা, দু'কন্যা দ্বারকায়,—

সুলোচনা

আর?—

উত্তরা

পোড়ামুখী সুলোচনা।

কৃষ্ণ

আমি মা! না হ'ব ছেলে তোর কভু;
দেখ্ বেশী অলঙ্কার
দিয়াছিস্ তুই শ্বশুরে মা! তোর;
বিমাতা তুই আমার!

উত্তরা

না বাবা! তোমায় দিব আমি কাল
অলঙ্কার রাশি রাশি।

অর্জুন

তা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে
ডাকিব—"উত্তরা মাসী।"

উত্তরা

"না বাবা! তোমায় সকলের বেশী
দিব আমি আভরণ।
শৈশব হইতে উত্তরা যে বাবা!
তোমায় স্নেহের ধন।"—
ধরিয়া বালিকা অর্জুনের গলা
কহিল এ ক'টি কথা।
পুনঃ অর্জুনের আঁখি ছল ছল
চুম্বিলা সে স্নেহলতা।
"আয় মা! আয় মা! আয় মা! আমার
আয় দেখি একবার"—
মু'খানি ধরিয়া কহিলা কেশব—
"ক' বাপ কহ তোমার?"

উত্তরা

এ বাপ, ও বাপ, ওই বাপ আর—

কৃষ্ণ

শুনিলে বিরাটরাজ!

বিরাট

মা ক'টি মা! তোর?

উত্তরা

মা আমার পাঁচ।

বিরাট

বেয়াই! কে জিতে আজ?

সুলোচনা

স্বামী পাঁচ জন তা তো হয় জানি,
মাও এবে শুনি পাঁচ।
সংখ্যা শুনিলাম, সংজ্ঞা এবে শুনি—
দেখি কার কিবা ছাঁচ।

উত্তরা

এক মা বিরাটে, ওই মাতা আর,
দুই মাতা দ্বারকায়।

সুলোচনা

দুই দুই চারি, তার পর শুনি?

উত্তরা

শূলীমা বাপের পায়।

বিরাট

বাবা গো বাবা গো! মরেছি এবার।
মেরেছে ঘায়ে কি খোঁচা!

সুলোচনা

শূলীমার শূল লাগিল কেমন
আমার গোধন ওঁচা?

উত্তরা

আমাকে মারিস্, মারিস্ বাবাকে,
ঝগড়া তোর দিন রাতি।
কালামুখি! সব এখনি বাবারে
দিব ক'য়ে পাতি পাতি।
দেখ বাবা! দেখ, শূলীমা আমায়
আজ মারিয়াছে বড়,
আরো তোমাদের কত দেয় গালি,
বাবা গো, বিচার কর।

অর্জুন

হাঁ রে সুলোচনা! আমাদের গায়ে
ঝাড়ি জিহ্বা দিন রাত

মিটে না কি সাধ? মেয়েটির শেষে
লাগিলি দেখা'তে হাত?

সুলোচনা

হরি! হরি! হরি! কি সাধু সকল!
ঝগ্‌ড়া কারো নাহি জানা।
আমি কালামুখী! পোড়ামুখী আমি!
আর মুখ চাঁদ-পানা।
ঐ যে সারা দিন শুনি রণ-ক্ষেত্রে
দু'দলেতে হাঁকাহাঁকি—
কুটুম্বিতা সব! লোকে কাটা কাণ
বলে চুল দিয়া ঢাকি!
কর সারা দিন মর্দানি গর্দানি
রণক্ষেত্রে ঘুরি' ঘুরি',
গৃহক্ষেত্রে কিছু না রাখ খবর,
কি করে যে এই ছুঁড়ী।
সারাদিন তার পুতুলের বিয়ে
হুলুধ্বনি, উচ্চহাসি,
দু'টিতে মিলিয়া করে কাড়াকাড়ি
ঝগড়া করে রাশি রাশি।
কথা যদি কহি, মাথা ধরে মোর,—
শত্তুরের মুখে চুন!
নিদ্রা যাই যদি, হাসি ও চীৎকার—
ভেঙ্গে যায় কাঁচা ঘুম!
সাধুর বেটী সাধু! আমি কালামুখী?
আচ্ছা যাইতেছি আমি,
দিব চুন তোর বাপের মুখেতে;
এই আমি সাক্ষী আনি!
ছুটিল যুবতী, ছুটিল উত্তরা,—
অর্জুন ধরিলা হাসি।
"ছেড়ে দাও বাবা!"— কহে হেঁট-মুখে—
"ছেড়ে দাও, যাই,—আসি।"
ছুটি' অভিমন্যু পশিল শিবিরে
প্রণমিয়া গুরুজন,
কৃষ্ণপদতলে বসে জানু পাতি'।
জিজ্ঞাসিল নারায়ণ—
"কহ বাবা! শুনি, কার কার সনে
করেছিলে আজি রণ?"
"না মামা! যুদ্ধেতে—" হাসিয়া কিশোর
"আজি না লাগিল মন।
কেবল মাতুল হার্দিক্যের সনে
করেছিনু কোলাকুলি,
পিসা জয়দ্রথ হ'য়ে অগ্রসর
দিয়া গেলা পদধূলি।
মাতামহ শল্য আসিয়া তখন
আরম্ভিলা মহারঙ্গ,
না হ'তে ঝগড় ছোট জেঠা আসি
করিলেন রস-ভঙ্গ।"
এ কৌতুকে ঢাকা বীরত্ব অতুল
বুঝিলা শক্রসূদন;
চুম্বিলা ললাট ল'য়ে গর্বে বুকে—
শৈলে শৈল সম্মিলন।
"থাক্ রঙ্গরস"— ধরি' এক কান
উঠাইল সুলোচনা—
"তিন কুল চোর, তোর লাগি' আমি
সহি যে এত গঞ্জনা।"
তোলে অন্য করে ধরি' এক কান
বিরাট-রাজকুমারী,
"বল দেখি অভি! তোর সঙ্গে আজ
কে করিল কাড়াকাড়ি?"
দুই গালে চড় পড়ে দুই দিকে,
আদরে যে দিকে চায়।
"দেখ তবে এই দেই আল্‌পনা
বিরাট বীরের গায়।"
ঔষধির পাতা ছুটি' তীরবেগে
পড়িল রাজার মুখে,
চুন কালি যেন মেশামিশি করি'
শোভিল মুখে ও বুকে।
হাসিলা অর্জুন, হাসিলা কেশব,
হাসিলা কিশোর কিশোরী যুগল।
চাপা হাসি আর না পারি' রাখিতে
হাসেন সুভদ্রা চাহি' ধরাতল।
কহে সুলোচনা— হাসি নাহি মুখে,
— বিরাট-নৃপতি ক্রোধে গড় গড়—
"আচ্ছা বল দেখি, হেন লক্ষ্য শুদ্ধ
চলে কি কখনো তোমার শর?
সখের সমর বিরাট রাজার,
বসনে কখনো লাগে না দাগ।
মুখ চেয়ে দাগ লেগেছে বসনে,
বিরাট রাজার এই ত রাগ?"

না থামিতে হাসি কৌরব শিবিরে
উঠে জয়ধ্বনি মেঘমন্দ্র জিনি'।
চমকিলা সব, পশিল উত্তরা
সুভদ্রার বুকে ভীত কুরঙ্গিণী।

বেগে রাজদূত পশিয়া শিবিরে
কহে,—"দ্রোণাচার্য করেছেন পণ,—
কালি মহারণে করিবেন হত
পাণ্ডবের মহারথী একজন।"

সপ্তম সর্গ

দাবাগ্নি

কুরুক্ষেত্র!—ক্রীড়াক্ষেত্র হায়, দুরাশার!
অতীত প্রহর নিশি! কৃষ্ণা অষ্টমীর,
নিবিড় তিমিরে এবে আচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ।
উপরে নক্ষত্ররাশি জ্বলিছে কেবল
ব্যাপি' ঘনকৃষ্ণ নভঃ; জ্বলিছে কেবল
অনন্ত আলোকরাশি শিবিরে শিবিরে
ঘনকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র; জ্বলি'ছে কেবল
দুরাশার ক্ষীণালোক হৃদয়ে হৃদয়ে
ঘনকৃষ্ণ বিষাদের ঘোর অন্ধকারে।
বিষাদের প্রতিমূর্তি, জ্বলিয়া হৃদয়ে
দুরাশার ক্ষীণালোক, চলিয়াছে কারু
পাণ্ডব-শিবিরমুখে ধীরে বিষাদিনী,
ছাড়ি' অলক্ষিতা অঙ্গপতির শিবির।
শবে, ভগ্ন রথ-কাষ্ঠে, স্খলিতচরণ
হইতেছে পদে পদে—নাহি জানে বামা।
ছুটিতেছে চারিদিকে নৈশ-পর্যটক
মাংসাহারী হিংস্র পশু,—না দেখে নয়নে।
বিকট চীৎকার স্থানে স্থানে পশুদের,
বীর-কণ্ঠ, উচ্চহাসি, উচ্ছৃঙ্খল গীত
সৈনিকের স্থানে স্থানে, উঠিছে ভাসিয়া
নৈশ নীরবতা বক্ষে রহিয়া রহিয়া,—
না শুনে শ্রবণে বামা। খর চিন্তাস্রোতে
ছিন্নলতা-সম কারু চলেছে ভাসিয়া।
নীরবে এসেছে বামা, যাই'ছে নীরবে—
চিন্তাকুলা, অন্যমনা; জ্বলি'ছে হৃদয়ে
দুরাশার ক্ষীণালোক নিরাশা আঁধারে,
নৈশ অন্ধকারে ক্ষীণ তারালোক যথা।
ভাবিতে লাগিল কারু—"বুঝেছিনু আগে
ছদ্ম নাম জরুৎকার, সেই প্রবঞ্চনা,
সেই রুদ্র দরশন,—করি'ছিল মনে
ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া অস্পষ্ট সঞ্চার।
কিন্তু সহোদর মম, সরল-হৃদয়;
ওই নিরমল নভঃ হৃদয় তাঁহার,
বিভাসিত পুণ্যালোক-নক্ষত্র-মালায়
পাপময় পৃথিবীর কুটিলতা-ছায়া
পড়ে না সে পুণ্যকাশে; পড়িলা অজ্ঞাতে
পতঙ্গের মত এই ঊর্ণনাভ-জালে।
এই প্রবঞ্চনা যদি বুঝে ঘৃণাক্ষরে,
সিংহ পরাক্রমে এই প্রবঞ্চনা-জাল
ফেলিবে ছিঁড়িয়া; কিন্তু লভিব কি ফল?
এই জীবনের মত গিয়াছে ত হায়!
প্রেম-আশা; রাজ্য-আশা ডুবিবে অতলে।"
নীরবে চলিল বামা নক্ষত্রখচিত
নব-সিত-নিরমল আকাশের পানে
চাহিয়া চাহিয়া, ধীরে ধীরে চিন্তাকুলা।
"গিয়াছে ত প্রেম-আশা; হা হত বিধাতঃ!
কিন্তু কি গিয়াছে প্রেম? যায় কি তা কভু?
যায় আশা,—আকাঙ্ক্ষা ত যায় না কখন!
ভ্রাতার বিরহ-চিন্তা কিছুদিন হ'তে
করে'ছিল আকুলিত রমণী-হৃদয়,
জাগাইয়া পূর্বস্মৃতি। ধীরে সরাইয়া
যৌবন জলদজাল, দেখাইতেছিল
জীবন কি সুন্দর প্রফুল্ল প্রভাত,
স্নেহালোকে, আশালোকে, শান্ত সমুজ্জ্বল।
বহুদিন রুদ্ধ এক কক্ষের অর্গল
সরাইয়া হৃদয়ের, দেখাইতেছিল
কি শোকের দৃশ্য! যেই স্বর্গীয় আলোকে
ছিল কক্ষ সমুজ্জ্বল, গিয়াছে নিভিয়া;
ছিল পুষ্পাকীর্ণ যেই স্বর্গীয় কুসুম,
গেছে শুকাইয়া; যেই স্বর্গীয় সৌরভে
ছিল সুবাসিত, তাহা গিয়াছে ভাসিয়া।
কিন্তু সেই গন্ধে, পুষ্পে, দীপে, যে মুরতি
হইত পূজিত,—সেই হৃদয়ের দেব,
কারুর হৃদয়নাথ,—রয়েছে স্থাপিত
কারুর প্রণয়-পদ্মে সেই মত হায়!
সেই রুদ্ধ কক্ষ-দ্বারে দ্বাদশ বৎসর
করেনি আঘাত কেহ; জগতে দ্বিতীয়
নাহি কেহ, পারিবে যে করিতে আঘাত
সেই দৃঢ় রুদ্ধদ্বারে, খোলেনি কখন
সেই রুদ্ধ দ্বার এই দ্বাদশ বৎসর।

স্মৃতি কুহকিনী হায়! অজ্ঞাতে কেমনে
খুলিয়া সে রুদ্ধ দ্বার, জ্বালাইয়া দীপ,
বাঁচাইয়া শুষ্ক ফুল, ঢালিয়া সুবাস,
আরম্ভিল প্রেমারতি; রমণী-হৃদয়
আবেশে, আবেগে হায়! হইল আকুল!
পর্বতনির্ঝরে শুষ্ক বহিল ছুটিয়া
ঘোর বরিষার বন্যা প্লাবিয়া দু'কূল,
ভাসি' সেই স্রোতোবেগে আকুলা রমণী
আসিলাম কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে, যথা
বিরাজি'ছে অভাগীর হৃদয়-ঈশ্বর।
অঙ্গের বাতাস তাঁর, অঙ্গের সুবাস,
সেই ফুল্ল কম্বু-কণ্ঠ,—বহুদিন শ্রুত
নিশীথ-নির্জনে দূর বাঁশরীর রব,—
ভেবেছিনু মনে, বহি' নৈশ সমীরণে
জুড়াইবে হায়! এই প্রাণের উচ্ছ্বাস।"
সম্মুখে পথিক এক; জিজ্ঞাসিল কারু
মৃদুলে—"কোথায় কহ কৃষ্ণের শিবির?"
কহিল পথিক—"ওই নীল সূর্য মত
জ্বলিছে আলোক যেই শিবিরের দ্বারে
কৃষ্ণের শিবির উহা।"
ওই নীলালোক!
সম্মুখে শিবির!—হায়! রমণীর আর
চলিল না পদ। বলে চাপিয়া উচ্ছ্বাস
উদ্বেলিত, অন্ধকারে পাদপের মূলে
হেলাইয়া বাম অঙ্গ, অবশ মস্তক,
আশ্রিতা লতিকা যেন, বসিল রমণী—
বিহ্বলা, বিবশা, দীনা; রহিল চাহিয়া
অনিমেষনেত্রে সেই আলোকের পানে।
সেই নীলালোকে যেন নিরখি'ছে কারু
শিবিরের অন্তঃস্থল; নিরখি'ছে যেন
সুবর্ণপর্যঙ্ক-অঙ্কে শায়িত শিবিরে
নীলমণিময় কিবা মূরতি সুন্দর!
দেখিল জলধি যেন পূর্ণ শশধর
উনমত্ত উচ্ছ্বসিত ছুটিল বহিয়া।
"মরি! মরি! কি সুন্দর!"—ভাবিতে লাগিল কারু
"কিবা রূপ নয়ন মোহিয়া,
প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে মম,
প্রাণে প্রাণে অমৃত ঢালিয়া!
কিবা অঙ্গভঙ্গিমায় মহিমা ভাসিয়া যায়!
কিবা বক্ষঃ মহিমা-পূরিত।
মহিমা নয়নে ভাসে, মহিমা অধরে হাসে,
বীর-কণ্ঠ মহিমা-সঙ্গীত!
পূর্ণচন্দ্র-বিভাসিত সুনীল আকাশ সম,
কি ললাট মহিমা-দর্পণ!
যৌবনের পূর্ণতায় উচ্ছ্বসিছে মহিমায়
রমণীর কি স্বর্গ-স্বপন!
দুরাকাঙ্ক্ষা কুহকিনী বলেছিল একদিন,
এই স্বর্গ হইবে আমার;
আমি দীনা কাঙ্গালিনী পাইব হীরকখনি,
চকোরী পাইবে সুধাধার!
যদি নাহি পাইলাম, কেন নাহি মরিলাম
হায় নাথ! চরণে তোমার?
জীবন-স্বপন সহ জীবন না পোহাইল,
জ্যোৎস্না হইল অন্ধকার?
রমণীর অভিমান হৃদয়েতে চাপিলাম;
বিচূর্ণিত হইল হৃদয়!
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি' স্মৃতির সলিল-রাশি
আজি বেলা ভাসাইয়া বয়!
উত্তাল এ সিন্ধু মাঝে ছিল মৈনাকের মত
অভিমান হৃদয়ে চাপিয়া;
স্মৃতির নিঃশ্বাসে ক্ষুদ্র, এত দীর্ঘকাল পরে,
হায়! তাহা গেল কি উড়িয়া?—
এ ভগ্ন হৃদয় হায়! অবারিত প্রেম-স্রোতে
এরূপে কি চলিল ভাসিয়া?
একি দেখি! একি দেখি! ছিল একমাত্র চিত্র
হৃদয়ের দর্পণে বিম্বিত।
বিচূর্ণিত দর্পণেতে আজি সেই প্রতিবিম্ব
দেখিতেছি শত সংখ্যাতীত।
ব্যাপিয়াছে বিশ্ব যেন এ ভগ্ন-হৃদয়,
সেই প্রতিবিম্ব আজি দেখি বিশ্বময়।
মরি মরি, কিবা রূপান্তর!
রূপান্তর কত মনোহর!
মোহিল যে অষ্টমীর শশী
এ কিশোরী চকোরীর মন,
সেই শশী পূর্ণচন্দ্র আজি,
এ চকোরী যুবতী এখন।
বনমালা কিশোরীর প্রেম
গিরিসুতা ক্ষুদ্রা নির্ঝরিণী;
হইয়াছে আজি প্রাণনাথ!
মহানদী ধরাবিপ্লাবিনী!

বনমালা কিশোরীর হায় !
সে আকাঙ্ক্ষা বাঁশের আগুন,
হইয়াছে অকরুণ। আজি
পিপাসায় দাবাগ্নি দারুণ।
ছিল যে পাতাল—স্বর্গ মম,
তব স্মৃতি-অমৃতে মণ্ডিত,
হইয়াছে আজি মরুভূমি,
তব স্মৃতি-দহনে দাহিত।
সাজিলাম যৌবনে যোগিনী,—
তব প্রেমে উদাসিনী আমি।
আরাধ্য দেবতা মম তুমি,
একমাত্র তুমি মম স্বামী।
দুর্বাসা আমার নহে পতি,
আমি পত্নী নহি দুর্বাসার ;
উভয় উভয়ে মাত্র দেখি—
উভয়ের সেতু আকাঙ্ক্ষার।
পারিবে না দুর্বাসা কখন
পরশিতে এ দেহ আমার।
দেব-পদে নিবেদিত যাহা,
চিরদিন রবে দেবতার।
বুঝিয়াছি তুমি নহে নর,
বুঝিয়াছি তুমি নারায়ণ।
কারুর হৃদয়নাথ তুমি,
তুমি জগন্নাথ, সনাতন।
যেই প্রেম-উৎস বৃন্দাবন,
ভাসাইছ যে প্রেমে ধরায় ;
সেই প্রেম কারুর হৃদয়ে
উথলিছে মত্ত সিন্ধু প্রায়।
না না, নাথ ! তুমি মম স্বামী,
আমি আমরণ তব দাসী,
চরণে ঢালিব আজি তব,
প্রস্ফুটিত এই পুষ্প-রাশি।
এ শিবির ত্রিদিব আমার,
তুমি মম আরাধ্য ঈশ্বর,
পড়িব চরণে আজি তব,
পিপাসায় পুড়েছে অন্তর।"
দাঁড়াইল উন্মাদিনী ; গেল ছুটি' পদদ্বয় ;
ছিন্ন লতা মত ঢলি' পড়িল ভূতলে।
মাটিতে রাখিয়া বুক, কাঁদিতে লাগিল বামা
স্নেহময়ী বসুন্ধরা তিতি' নেত্রজলে,

"অভিমান ! অভিমান ! ওরে !
একি কথা, একি কথা তোর ?—
'পাবি না রে পাবি না রে স্থান ;
মরীচিকা হইবে রে, ভোর।'
নাহি পাই, নাহি পাই যদি
তাঁহার চরণে আমি স্থান,
লইয়া হৃদয়ে পা দু'খানি
তেয়াগিব এ নিরাশ প্রাণ।
হায় নাথ ! যেই জলধর
ঢালে বিশ্বে অমৃত-আসার,
একটি তাপিতা লতা বুকে
সে কি বজ্র করিল প্রহার ?
যেই দিনমণি বিশ্বময়
খোলে নিত্য শোভার ভাণ্ডার,
সে কি এই কুমুদিনী-প্রাণে
করে এই মরু আবিষ্কার ?
যেই অগ্নি পতিত-পাবন,
জগতের আনন্দ-বর্ধন,
পতিতা এই পতঙ্গিনী তরে
সে কি হায় ! কেবল দাহন ?
শুনি তুমি দয়া-পারাবার,
শুনি তুমি প্রেম-অবতার ;
পতঙ্গেও পায় তব দয়া,
আমি মাত্র অযোগ্যা তাহার ?
হায় মাতঃ বসুন্ধরে ! হৃদয়ে তোমার
দেও স্থান দুঃখিনীরে ; দয়াময়ী তুমি,
বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি।
এ হৃদয়-মরুভূমি কর মা ! গ্রহণ,
জুড়াও দুঃখিনী তব কন্যার জীবন।"
স্মৃতিতে কাতর, প্রেম-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল
রমণীর হৃদয়েতে তীব্র অভিমান
দংশিল বৃশ্চিক সম ; ছট্‌ফট্ করি'
কাঁদিতে লাগিল বামা চাপিয়া হৃদয়
ধরাতলে, বাণবিদ্ধ বন-কপোতিনী।
অতীত প্রহর নিশি। নীরব প্রাঙ্গণ।
প্রান্তস্থিত শিবিরের অসংখ্য আলোক
আসিছে নিভিয়া ক্রমে। আসিছে নিভিয়া
ক্রমে দূর নর-কণ্ঠ ; উঠিছে ভাসিয়া
নীরব শর্বরী-বক্ষে নর-মাংসাহারী
কুকুর-শৃগাল-কণ্ঠ, কর্কশ কঠোর।

সুপ্ত-উত্থিতার মত উঠিয়া রমণী,
যন্ত্রের পুতুল যেন, চলিল সবেগে
কিছু দূর,—ওকি কণ্ঠ! ত্রিদিব-সঙ্গীতে
প্রাঙ্গণ হইল পূর্ণ; নৈশ সমীরণ
পারিজাত-পরিমলে হইল পূরিত;
কৌমুদী প্লাবিত ফুল্ল মন্দাকিনীতীরে
কি স্বর্গ খুলিয়া গেল, শান্ত সুশীতল!
কি অমৃতে ঢল ঢল হইল সংসার!
সে সঙ্গীত, সে সৌরভ, স্বর্গ নিরমল;—
মূর্চ্ছিতা হইয়া বামা পড়িল আবার!

অষ্টম সর্গ

সূর্যমুখী

নির্মলা নক্ষত্রময়ী কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি ;
স্বচ্ছ সলিলের মত স্বচ্ছ অন্ধকার।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি ফুটেছে নির্মলাকাশে,
ফুটিয়াছে হিরণ্ময়ি ! বক্ষেতে তোমার !
বসিয়া রমণী এক নীরব আনতমুখী।
দ্বিতীয়া শায়িত অঙ্কে, নীলাব্জের হার,
মূর্ছিতা, মুদ্রিত-নেত্রা ; পার্শ্বে এক বীরোত্তম
জানু পাতি' ভূমে ; মুখে কথা নাহি কার।
অঞ্জলি করিয়া বারি বর্ষিছেন বীরবর
নিমীলিত নেত্রে, চারু ললাটে বামার।
কুন্তল আলুলায়িত পড়িয়াছে ধরাতলে,
অষ্টমীর অন্ধকার করিয়া আঁধার।
নিমীলিত নীলোৎপল ধীরে ধীরে উন্মেষিল
একবার আত্মহারা চাহি' শূন্য পানে,
আবার মুদিল আঁখি কি সুখের স্বপ্নে যেন,
কি সুখ-মদিরা যেন পশিয়াছে প্রাণে।
আবার আবার বামা মুদিয়া মেলিয়া আঁখি,
নিরখিয়া শেষে সেই অবনত মুখ,
ভাবে মনে মনে কারু—"মরি, মরি ! একি মুখ !
দয়ার দর্পণে যেন চিত্র পরদুখ !"
অনন্ত নক্ষত্রময় আকাশ হইতে যেন
নামিয়া নক্ষত্র এক শীতল উজ্জ্বল,
রহিয়াছে স্থিরভাবে বামার বদন'পরে
প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে চাহি' ছল ছল।
জরৎকারু কিছুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে
চাহি' সেই মুখ—সেই করুণার ছবি,
জিজ্ঞাসে বিস্ময়ে বামা, ক্ষীণ অস্ফুটিত কণ্ঠে,—
"কে তুমি রমণী ? তুমি দেবী, কি মানবী ?"
"ভগিনী ! রমণী আমি, সুভদ্রা আমার নাম"—
উত্তরিলা ভদ্রা—"কথা কহিও না আর।"
জ্যোৎস্নাময়ীর কণ্ঠে বাসন্তী জ্যোৎস্না যেন
বরষি' অমৃত প্রাণে পশিল বামার।
সুভদ্রা !—চমকি' কারু, আবার রহিল চাহি'
সেই মুখ পানে, স্থির বিস্মিত অন্তরে।
নিরখিল সেই মুখ শোভিতেছে অন্ধকারে,
ফুল্ল অরবিন্দ যথা নীল সরোবরে।
আঁধারে অস্ফুটতায় শোভিছে দ্বিগুণতর,
সে মুখের মহিমা, কিবা মধুরিমা !
নিরমল জ্যোৎস্নায় নিরমিত মুখখানি
শান্তির ত্রিদিব কিবা নয়ন-নীলিমা।
যেই অঙ্ক-উপাধানে রয়েছে অবশ শির,
বুঝিল রমণী—নহে অঙ্ক রমণীর ;
ত্রিদিব-কুসুমরাশি স্তবকে স্তবকে যেন—
সুশীতল সুকোমল স্বর্গ অবনীর।
কোমল কোমল কর বুলাইতেছিলা দেবী
ললাটে, কপোলে, সিক্ত কেশে রমণীর,
কোমল—কোমলতর—স্বপনে কোমলতার,
বুঝিল সে কর কারু নহে মানবীর।
হায় রে ! বুঝিল কারু এত দিনে বাসুকির
সে দারুণ নিরাশার তীব্র দাবানল।
বুঝিল—এ রূপ নহে ; ভূতলে রূপের স্বপ্ন ;
বুঝিল, হইল দুই চক্ষু ছল ছল।
"ভ্রাতা যথা নরোত্তম"—ভাবিতে লাগিল কারু—
"হায় রে ! ভগিনী তথা রমণীর মণি।
ভ্রাতা দেব, ভগ্নী দেবী, কি অপূর্ব সম্মিলন !
ইঁহাদের পদস্পর্শে পবিত্রা ধরণী।
তেমনি আমরা হায় ! ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন,
হতভাগ্য এমন কি আছে ধরাতলে ?
কাননের তরুলতা নন্দনের পারিজাত
চাহিলাম, মরিলাম পুড়ি' বজ্রানলে।
হতভাগ্য বাসুকির গলায় শোভিত যদি,
হা হত বিধাতঃ ! এই পারিজাতমালা,
নিরখি' তাহার সুখ, নিরখি' এ দেবী-মুখ,
জুড়াতেম মরু-দগ্ধ জীবনের জ্বালা।
সেই মুখ, সেই বুক, সেই চক্ষু, সেই নাসা,
সে মহিমা, সে ভঙ্গিমা, শোভা নিরুপমা !
উভয়ের কিবা রূপ ! অনন্ত হৃদয়প্লাবী !
কিবা শোভা উভয়ের—আকাশ, জ্যোৎস্না !
ইহাকে লইয়া বুকে, ভাবি' এই কৃষ্ণ মম,
হইতাম কিবা সুখ সে ভ্রান্তিস্বপনে !

ইহার সুরভি শ্বাস, ইহার কোমল কণ্ঠ,
জাগাইত কি উচ্ছ্বাস মরমে মরমে!"
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি' চাপিয়া বিষাদ কারু
জিজ্ঞাসে—"কেমনে আমি আসিনু এখানে?"
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, কহিলা সুভদ্রা, যথা
কহে নৈশ সমীরণ কুসুমের কাণে;
"হত ও আহতদের করিয়া সৎকার সেবা,
ভীষ্মদেব-পাদপদ্ম করি' প্রদক্ষিণ,
শিবিরে যাইতেছিনু ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন,
দেখিলাম আঁধারে কি হইল পতন।
কাছে গিয়া দেখিলাম, নিরাশ্রিতা লতা মত
রয়েছ ভগিনি! তুমি পড়িয়া ধরায়—
মূর্ছিতা, ধূলি-লুণ্ঠিতা; দয়াময় ভ্রাতা মম
তোমারে লইয়া অঙ্কে আনিলা হেথায়।"
"ভ্রাতা কে?—" জিজ্ঞাসে কারু; কহে ভদ্রা—
"বাসুদেব।" মুখ ফিরাইয়া কারু করিল দর্শন।
সে মূর্তি মহিমাময়, দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে,
নীরবে চাহিয়া আছে তাহার বদন।
অষ্টমীর অন্ধকারে অস্ফুট অস্ফুট মাত্র
ভাসিয়াছে সেই দেবমূর্তি মনোহর।
তথাপি দেখিল কারু যেন অন্ধকার পটে
রেখেছে আঁকিয়া কোন দক্ষ চিত্রকর।
কত দিন, কত বর্ষ—কত বর্ষ, কত যুগ,
এই রূপ জরৎকারু দেখেনি নয়নে!
চেয়ে আছে অভাগিনী—নিদাঘ-বিদগ্ধ-ধরা
কাতরা পিপাসাতুরা চাহি' নব ঘনে।
কত দিন, কত বর্ষ—কত বর্ষ, কত যুগ,—
এক দিনে কত যুগ হইয়াছে গত
যে-রূপ করিয়া ধ্যান, আজি সেই রূপ ওই!—
কারুর হইল বোধ স্বপনের মত।
শুধু তাহা নহে, আজি কারুর জীবন-স্বপ্ন
কারুকে লইয়া অঙ্গে আনিলা হেথায়।
লাগিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ, লাগিয়াছে, হায় কারু!
হৃদয়ে হৃদয় বুঝি! শিহরিল কায়।
অঞ্জলি-বারিতে তাঁর ভিজিছে ললাট মুখ,
লাগিয়াছে অঞ্জলি কি কপোলে তাহার,—
নীলোৎপলে রক্তোৎপল! আর না, হইল বামা
সেই স্মৃতিসুখাবেশে মূর্ছিতা আবার!
হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্রা করে;
বাসুদেব দ্রুতকরে আনি' নদী-জল
বর্ষিলেন মুখে চক্ষে, এবার কাঁপিল কর,
হইল কৃষ্ণের দুই চক্ষু ছল ছল!
পুষ্পমুখী ভদ্রা ধীরে পুষ্পনিভ কম করে
মুছিছেন পুষ্পমুখ সুপ্তা রমণীর;
প্রভাতসমীরে খেলি' পুষ্পে পুষ্প আলিঙ্গিয়া,
সরাইছে যেন ধীরে নিশির শিশির।
দেখিছেন সুতন্বীর আঁধারেও যেই শোভা
ভদ্রা দেবী, সে কি শোভা!—রূপ পারাবার!
পুষ্পিতা বাসন্তী নিশি রূপের স্বপন খুলি'
শায়িতা নিদ্রিতা যেন অঙ্কেতে তাঁহার।
রমণী মেলিল আঁখি,—সরিয়া গেলেন কৃষ্ণ,—
সুভদ্রার মুখপানে রহিল চাহিয়া।
শ্বেত নীলাম্বুজ দুটি—যেন এক বৃন্তে ফুটি',
চেয়ে আছে পরস্পর মোহিত হইয়া।
ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমণীর স্মৃতি,
আসিল ফিরিয়া, বামা ভাবে মনে মনে—
"হায়! নিদারুণ নাথ! যেই অঙ্গ আলিঙ্গন
দিলে মূর্ছিতায়, তাহা পাব কি জীবনে?
মূর্ছায় পাইনু যাহা, মরিলেও পাই যদি,
লও, পদে সমর্পিব দুঃখিনীর প্রাণ।
সহিতে না পারি আর, এবে দয়া কর নাথ!"
ফিরাইল মুখ বামা; কৃষ্ণ অন্তর্ধান।
"চিনিতেও দুঃখিনীরে হা নাথ! পারিলে না কি?"
বহিতে লাগিল নারী-অশ্রু অবিরল।
কিশোরীর প্রত্যাখ্যান, যুবতীর এ যন্ত্রণা,
জ্বালাইল অভিমান প্রচণ্ড অনল।
তীরবৎ উঠি' বামা বসিল; সুভদ্রা করে
ধরিয়া কহিল—"এ কি! কি কর ভগিনি!
হতেছে কি কষ্ট তব শুইয়া অঙ্কেতে মম?"
"কষ্ট!"—কহে গদগদ নাগেন্দ্রনন্দিনী,
"এমন পবিত্র স্বর্গে অনার্য্যা বনবাসিনী
নাহি জানি কোন্ পুণ্যে করিনু শয়ন।
এই দয়া, এই সুখ, ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন-শয্যা
এই অঙ্ক, আমি নাহি ভুলিব কখন।
কি ভাগ্য আমার! আমি ভগিনী হইব তব,
হবে হীনা বনলতা ভগ্নী মাধবীর।
যদি জন্মজন্মান্তরে তোমার ভগিনী হই,
সার্থক হইবে সেই জন্ম, দুঃখিনীর।
তুমি ত মানবী নহ, অপরিচিতায় হায়!
এই দয়া, এই স্নেহ, মানবের নহে।

নহে রূপ মানবীর, মানবীর প্রাণে হায়!
কোথা এইরূপ দয়া-মন্দাকিনী বহে?"
"সে কি কথা?"—কহে ভদ্রা—"মূর্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া?
একটি হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া?"
"পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্যা; আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্যার!
পশু পক্ষী যেই দয়া পায় আর্যদের কাছে,
আমরা অনার্যা নাহি পাই বিন্দু তার।"
"হায়! নাথ! তুমি পিতা"—চাহি' আকাশের পানে
কাতরে, করুণ-কণ্ঠে, কহে নাগবালা—
"হায় নাথ! তুমি পিতা নহ কি অনার্যদের;
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা?
মানব তাহারা নহে যদি নাথ! তবে কেন
একরূপ রক্ত মাংস করিলা সৃজন?
কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন?"
দয়াময়ী সুভদ্রার দুই আঁখি ছল ছল,
অন্তরালে আঁখি ছল ছল নারায়ণী।
করুণার এ উচ্ছ্বাস পরশি' উভয় প্রাণ
কাঁদাইল একতান বীণার মতন।
"না বোন! অনার্য আর্য"—কহিতে লাগিল ভদ্রা—
"একই পিতার পুত্র-কন্যা সমুদয়।
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের
এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয়!
স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, কর্ম-ভেদে জন্মে জন্মে,
কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নির্মল।
সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোকে এই মলিনতা কর্মে
কর অপনীত, হবে যে জল সে জল।
মানুষ যে গুণবলে অন্য জীব হ'তে শ্রেষ্ঠ,
মানুষের মনুষ্যত্ব সেই পুণ্যচয়
করি'ছে ধারণ, ভগ্নি! উহাই মানব-ধর্ম,
সে গুণের মহাদর্শ সর্ব বিশ্বময়
বিরাজিত নারায়ণ অনন্ত, অপরিজ্ঞাত!
আমরা মানব ক্ষুদ্র নৌকাযাত্রিগণ,
ভাসি, এই পুণ্যস্রোতে, চলেছি অনন্ত পথে;
এই যাত্রা মানবের ধর্ম সনাতন।
যেই জন, যেই জাতি, যতদূর অগ্রসর
এই মহাধর্ম-পথে, তত নিরমল
আত্মা তার, তত শ্রেষ্ঠ তার ধর্ম,—মনুষ্যত্ব;
এই মনুষ্যত্বে নর বিভিন্ন কেবল।
এই ধর্মে, মনুষ্যত্বে, আর্য জাতি শ্রেষ্ঠতর;
অনার্য হইলে হীন এই হীনতায়!
তথাপি আর্যের ধর্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার
জ্বলন্ত প্রমাণ এই কুরুক্ষেত্র হায়!
নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণ, তীক্ষ্ণ অসি দুই ধার,
অপরের প্রতি তুমি কর সঞ্চালন,
পাবে তুমি প্রতিঘাত,—প্রতিঘাত কি ভীষণ!—
দেখ তার সাক্ষী এই কুরুক্ষেত্র রণ!
মানুষ মানুষে ঘৃণা করিলে, জানিও মনে
উভয়েই মনুষ্যত্বে হ'য়েছে পতিত।
প্রস্তরেও পরস্পরে আঘাতিলে, দেখিয়াছ
কেমন উভয়ে হয় চূর্ণিত, ধ্বংসিত।
ত্যজ ভগ্নি! পরিতাপ! ঘৃণিয়া অনার্যগণে,
আজি পরস্পরের ঘৃণ্য করিছে কেমনে
ওই দেখ আর্যজাতি! দেখ মহা আত্মহত্যা,
অধর্মের অভ্যুত্থান, ধর্মের পতন!
ঈশ্বর মঙ্গলময়! এই ঘোর অমঙ্গলে
কি মঙ্গল নীতি তাঁর আছে বিদ্যমান!
এই ঝটিকার শেষে কিবা শান্তি বিরাজিবে!
করিবে মানবজাতি কি অমৃত পান!
অবতীর্ণ নারায়ণ! ভস্মিয়া অধর্ম যবে
এ মহাশ্মশান হায়! হবে নির্বাপিত;
প্রেমময় পুণ্যময়, শান্তিময় সুধাময়,
কি মহান্ ধর্মরাজ্য হইবে স্থাপিত!
তখন অনার্য আর্য"—চাহি আকাশের পানে
বহে আনন্দাশ্রুধারা মাতা সুভদ্রার।
বহে আনন্দাশ্রুধারা গোবিন্দের দু'নয়নে;
চাহি' আকাশের পানে কারু চিত্রাকার!
"ত্যজ ভগ্নি! পরিতাপ! তখন অনার্য আর্য,
ভাই ভগ্নী, মিলি সব করিব প্রস্থান
সে অনন্ত সুখপথে, অনন্ত কালের তরে,
গাইয়া তারকব্রহ্ম-মন্ত্র কৃষ্ণনাম।
অগ্রবর্তী আর্যগণ, অনার্য পশ্চাদ্‌গামী
প্রীতির দক্ষিণ কর করি' প্রসারিত
আনন্দে লইয়া সঙ্গে, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ধ্যান
করি' মনুষ্যত্ব-পথে হইবে ধাবিত।
বুঝিবে মানবগণ,—সর্বজীবে নারায়ণ,
সর্বজীব-হিত মহাধর্ম নিরমল।

এই নব ধর্মে, ভগ্নি ! হবে ক্রমে পরিণত
 মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল।"
কারুর পড়িল মনে এরূপ পাতালে ব'সে
 গাইত কিশোর কেহ, বহু বর্ষ গত,
এইরূপ স্বর্গ-গীতি মোহি' কিশোরীর মন,—
 কারুর সে সুখ আজি স্বপ্নে পরিণত।
সেই কৃষ্ণ, সেই কারু,—কারুর হইল ভ্রম
 সেরূপ পাতালে যেন বসিয়া দু'জন।
জীবনের সে প্রভাতে, সে প্রভাতে সেই স্বর্গ,
 খুলিয়া মুহূর্তে যাহা হইল স্বপন,—
কারুর পড়িল মনে। সেই স্মৃতি সুখে দুঃখে,
 তরঙ্গে, প্রতি তরঙ্গে, হায়রে ! বামার
কি দারুণ বেদনায় হইল অধীর প্রাণ,
 ভাবিল দু'হাতে চাপি' হৃদয় তাহার,—
"গাইয়া সে কৃষ্ণনাম, করি' কৃষ্ণপদ ধ্যান,
 পাবে নর দুঃখে শান্তি, পাপে পরিত্রাণ,
সেই নামে, সেই পদে, সর্বস্ব অর্পণ করি'
 লভিল কি দাসী, নাথ ! এ মহাশ্মশান ?"
অধীরা রমণী কহে বিগলিত কণ্ঠে—"দেবি !
 বাড়িছে রজনী, চাহি চরণে বিদায়।
এ দয়ার প্রতিদান নাহি সাধ্য দিব আমি,
 পূজিবে এ দাসী নিত্য হৃদয়ে তোমায়।"
দুই করে দুই কর, কহিতে লাগিল ভদ্রা,
 চারি রক্তকমলে কিবা সম্মিলন—
"যাইবার আগে ভগ্নি ! দেও আত্ম-পরিচয়
 কে তুমি রমণীরত্ন ? হেথা কি কারণ ?"
নিশ্চয় কি কৃষ্ণ তবে কারুকে পারেন নাই
 চিনিতে ? কারুর বুক পড়িল ভাঙ্গিয়া !
মনেতে করিল স্থির নাহি দিবে পরিচয়,
 কহিতে লাগিল তবে অবনী চাহিয়া,—
"নাগকন্যা, ঋষিপত্নী, মনসা দাসীর নাম,
 দারুণ কপালগুণে যৌবনে যোগিনী।
বেড়ায় সে বনে বনে, শৈলে শৈলে নিরজনে,
 বনমাতা প্রকৃতির প্রেমে উন্মাদিনী।
যথায় ঝটিকা গর্জে করি' বন বিলোড়িত,
 করিয়া তরঙ্গভঙ্গে সিন্ধু বিধূনিত,
যথায় জলদযুদ্ধে দৃপ্ত বজ্র বিস্ফুরিত
 ঘন দীপ্ত দিগ্মণ্ডল, ধরা প্রকম্পিত,
তথায় বেড়াই আমি। প্রকৃতির মহাপটে
 হৃদয়ের প্রতিকৃতি নিরখি' আমার
পাই বড় শান্তি মনে,—আসিয়াছিলাম তাই
 দেখিতে এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-পারাবার।
দেখিতে দেখিতে, দেবি !—বীরপত্নী জান তুমি
 কি বিজলী নারী-প্রাণে করে সঞ্চালিত
বীরত্বে,—বীরত্বে মুগ্ধা যাইতেছিলাম চলি',
 পথশ্রমে অবসন্না হইনু মূর্ছিতা।"
আবার কারুর কর ধরি' দুই করে ভদ্রা
 জিজ্ঞাসিলা,—সেই কণ্ঠ সিক্ত করুণায়,—
"কি দারুণ মনস্তাপ বহিছে হৃদয়ে আহা !
 কহিবে কি ? ভগ্নী আমি, কহ না আমায় ?
জান, এক নদীস্রোত বহিলে দ্বিতীয় পথে,
 হয় পূর্ব স্রোতোবেগে মৃদু, মৃদুতর।
দুঃখের করিলে অংশী হয় দুঃখ প্রশমিত,
 শোকে সম-হৃদয়তা বড় শান্তিকর।
রমণীর প্রাণে, প্রাণ মিশাইব রমণীর,
 তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব বর্ষণ।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া যদি পারি মুছাইতে
 এক বিন্দু, হবে মম সার্থক জীবন।"
কারুর হৃদয় দৃঢ় শিলা-বাঁধা সরোবর
 পরশিল এই স্নেহ, তুলিল উচ্ছ্বাস ;
অন্ধকারে অশ্রুধারা বহে বেগে অবিরল,
 কহিতে লাগিল কারু ছাড়িয়া নিশ্বাস,—
"ভগিনি ! তোমার স্নেহ, তোমার পরশ-সুধা,
 যেন মরুভূমে হায় ! জল সুশীতল,
পশিছে হৃদয়ে মম ; কিন্তু এই মরুভূমে
 প্রবেশি' হইবে তুমি উত্তপ্ত কেবল।
ভগিনি ! আমার দুঃখ, রমণীর মর্মব্যথা,
 রমণীর প্রাণে নাহি সহিবে তোমার,
ভগিনি ! আমার দুঃখ রমণীর মহাদুঃখ,
 ততোধিক রমণীর দুঃখ নাহি আর।
সংসারের যত দুঃখ—রোগ, ভিক্ষা, উপবাস,
 পদাঘাত, অসিধার, রমণীর প্রাণ
সহিবে প্রফুল্লমুখে,—প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা,
 যতক্ষণ নাহি হয় দিবা অবসান,
সহে ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি ; সেই দিবা, সেই স্বর্গ,
 রমণীর প্রেম, আহা ! রমণীর প্রাণ।
সেই প্রেম, সেই প্রাণে, রমণীর প্রাণের প্রাণে,
 নিরাশার কীট হায় ! পাতিলে আসন,
হউক কুবেরপত্নী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, কিবা,
 জগতে দুঃখিনী নাহি তাহার মতন।

কৈশোর নিশির শেষে দেখিলাম সুখতারা
হৃদয়-আকাশে মম শান্ত সমুজ্জ্বল,
যৌবন-প্রভাতে মম হইল সে অস্তমিত ;
কি মরুতে আজি সেই আকাশমণ্ডল
হইয়াছে পরিণত, নিরাশা রবির করে!
প্রেমে মুকুলিত আহা কি নিকুঞ্জ বন
হইয়াছে বনভূমি! সেই বিষবৃক্ষ-বনে
আজি জ্বলিতেছে কিবা দাবাগ্নি ভীষণ!
অভিমান শিলাখণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন
চাপিয়াছিলাম এই দ্বাদশ বৎসর।
উড়াইয়া শিলাখণ্ড, হুঙ্কারিয়া হৃদয়েতে
আজি গর্জিতেছে কিবা আগ্নেয় ভূধর।"

"নাগবালা! ঋষিপত্নি!" কহিতে লাগিল ভদ্রা,
জরৎকারু উচ্চ হাসি কহিল হাসিয়া—
"ভগিনী বলিতে আর পারিলে না পাপিনীরে—"
গেল সুভদ্রার মুখ লজ্জায় ছাইয়া।
"না না, ভগ্নি। পাপিনী যে তাকে সমধিক ভাল-
বাসি আমি, তার তরে কাঁদে এ মরম।
অনন্ত মানবধর্ম, কে পায় তাহার অন্ত,
কে পারে করিতে পূর্ণ স্বধর্ম পালন?
হৃদয় হইতে এই করাল কামনা-ছায়া,
মু'ছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।
তুমি আমি, কে আমরা? যিনি করিলেন সৃষ্টি,
তিনি করিলেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি আকাশে ফুটিয়া ওই,
আপনারা কি কামনা করিছে সাধন?
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, মস্তক পাতিয়া ধরা,
মঙ্গলকামনা তাঁর করি'ছে পালন।
মু'ছে ফেল, মু'ছে ফেল, করাল কামনা-ছায়া!—
আশায় নিরাশা ফলে, দুঃখ কামনায় ;
রমণী-সৃজনে তাঁর আছে সে মঙ্গল নীতি,
জীবন অর্পণ কর তার সাধনায়।"

"মুছিব কি? মুছিবে কে? রমণী"—কহিল কারু—
"পারে কি প্রেমের ছবি মুছিতে কখন?
অনন্ত সিন্ধুর বক্ষে ভাসে সুধাকর-ছবি,
সিন্ধুও ত পারে না তা' মুছিতে কখন!
তুলিয়া তুমুল ঝড়, প্রসারিত তরঙ্গ-কর,
ডুবাইতে ছবি সিন্ধু চাহে যদি আর,
এক ছবি হয় শত, হয় শত সংখ্যাতীত,
শতগুণ উদ্বেলিত করে পারাবার।
যাঁহার সৃজন আমি, আমার কামনা, দেবি!
নহে কি সৃজন তবে সেই বিধাতার?
পতঙ্গ সৃজিলা যিনি, অনলেতে অনুরাগ
পতঙ্গের নহে কি লো সৃজন তাঁহার?
চাতকীর বিধাতায় অতৃপ্ত পিপাসা তার
নাহি কি মেঘের তরে করিলা সৃজন?
মানবের এত আশা হইবে নিরাশা যদি,
নিষ্ফল আশার সৃষ্টি কেন নিরমম?"
"কেন?"—কহিলেন ভদ্রা—"জগতের এই 'কেন?'
কি সাধ্য বুঝিব বল ক্ষুদ্র নরনারী।
কেন এ অনন্ত সৃষ্টি? রবি শশী গ্রহ তারা?
কেন ক্ষুদ্র বালুকণা?—কে বলিতে পারি!
আছে বিশ্ব নীতিরাজ্য, সে নীতি মঙ্গলময়,
সেই নীতি জগতের ধর্ম সনাতন।
মানবের আশা যত সেই নীতি-অনুগত,
মানব-নিরাশা সেই নীতির লঙ্ঘন।
তৃণটি পারিবে কেন সিন্ধুস্রোত-প্রতিকূলে
করিতে আপন ক্ষুদ্র বলে সন্তরণ?
সিন্ধুস্রোত-প্রতিকূলে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীধারা
বহিতে পারিবে কেন? পারে কি কখন?
জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের,
মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার।
সেই মহাসুখ-স্রোতে, যাই তুমি আমি ভাসি',
পাইব অনন্ত সিন্ধু, সুখপারাবার।
কেমনে জানিলে তুমি, এ কামনা-লতিকায়
ফুটিত ফলিত সুখ দুঃখ কি তোমার?
এ আশায়, নিরাশায়, কেমনে জানিলে নাহি
মানব-মঙ্গল কোন নীতি নিয়ন্তার?
এ তীব্র কামনা কেন হায়। মানবের তরে?
চাহ রূপ? সৌন্দর্যে কি বিমুখ অন্তর?
এ বিশ্ব সৌন্দর্যে ভরা যাঁহার অনন্ত রূপ,
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি সুন্দর?
চাহ গুণ? এই বিশ্ব যাঁর গুণ-লীলাভূমি,
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার?
চাহ প্রেম? এই বিশ্ব যাঁর প্রেম-পারাবার,
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার।
সেই প্রেম-পারাবারে ঝাঁপ দেও নাগবালা,
এ প্রেম-মরীচিকা কর নিমজ্জিত!

অনন্ত প্রেম-পিপাসা মানবের, মানবে কি
পুরাইতে, জুড়াইতে, পারে কদাচিত ?"

আকাশের পানে চাহি' দু'নয়নে প্রেমধারা
বহিতেছে সুভদ্রার পবিত্র শীতল !
"হায় ! এক বিন্দু বারি"—নাগেন্দ্রনন্দিনী কহে
চাহি' আকাশের পানে হৃদয় বিহ্বল,
"হায় ! এক বিন্দু বারি দেখিল না যেই জন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার ?
হায় রে ! যাহার প্রেম অঙ্কুরে পুড়িয়া গেল,
সে অনন্ত প্রেমে দিবে কেমনে সাঁতার ?"

চমকি' কহিলা ভদ্রা—"সে কি কথা সুচরিত্রে ?
ঋষিপত্নী তুমি, তব পতি শ্রেষ্ঠতম।
তার প্রেম-নিরঝরে ভাসাইয়া মরীচিকা,
যাও বহি' যথা প্রেমসাগর-সঙ্গম।"

জরৎকারু উচ্চ হাসি হাসিল, বিদারি' গিরি
নিরুদ্ধ গৈরিক যেন উঠিল গগনে ;
"আগুন ঋষির মুখে ! পতি মম সেই জন—
জীবনে মরণে মম জনমে জনমে।
তুচ্ছ ঋষি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণ (ও) পারিবে না
জীয়ন্তে কখন ছায়া ছুঁইতে আমার।
অভাগিনী সূর্যমুখী মরে চাহি' রবিপানে,
অন্য দিকে তবু নাহি দেখে এক বার।
হায় ! সূর্যমুখী মত চাহি' সেই রবিপানে,
এরূপে জীবন-বৃন্তে যাব শুকাইয়া
আর,—নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া !"
বুকে করি' করাঘাত, হাসি' পুনঃ উচ্চ হাসি,
উন্মাদিনী বনমধ্যে চলিল ছুটিয়া ;
ছুটিলা, ডাকিলা কৃষ্ণ বারেক অস্ফুটে,—"কারু !"
গেল বামা উল্কা যেন আঁধারে মিশিয়া !

নবম সর্গ

কৃষ্ণনাম

কি পবিত্র তীর্থ! মহীরুহ-সমাবৃত
হিমাদ্রি-চূড়ার মত পড়িলা যথায়
রণক্ষেত্রে ভীষ্মদেব, বীরেন্দ্রকেশরী,
শর-সমাবৃত অঙ্গে, শরের শয্যায়,
তথায় শিবির চারু হ'য়েছে স্থাপিত।
শিবিরে শান্তনু-সুত, বীরমূর্তি ক্ষত,
অসংখ্য জবায় যেন পুষ্পিত, পূজিত,
শোভিতেছে অস্তগামী দিনকর মত।
বীরত্বের কি পবিত্র তীর্থ সেই স্থান!
সে শিবির কাল-বক্ষে মৈনাক মহান্।
অতীত প্রহর নিশি,—ব্যাস, বাসুদেব
সে শিবিরে ধীরে ধীরে করিলা প্রবেশ।
জ্বলিতেছে দীপাবলী হেম-দীপাধারে;
দেখিলেন ভীষ্ম করি' নয়ন উন্মেষ।
কহিলেন—"বড় ভাগ্য, আসন্ন সময়ে
দেখিলাম মহর্ষির চরণপঙ্কজ।"
লইলেন পদধূলি বাড়াইয়া কর,
ধরিলেন শিরে সেই পুণ্য পদরজঃ।
ভক্তিভরে বাসুদেব নমিলে চরণে,
কহিলেন গদগদ কণ্ঠে কুরুপতি,—
"কে নমে কাহারে? হরি এ লীলা তোমার
কেমনে বুঝিব হায়! আমি অল্পমতি!
কে নমে কাহারে? হায়! আবির্ভাবে যাঁর—
তুচ্ছ যদুকুল, নরকুল পবিত্রিত;
যাঁর আবির্ভাবে, এই জগতের হায়!
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত,
যাঁর পদতরী ভর করি' যুগে যুগে
সংসার-অর্ণবযাত্রী যাবে মোক্ষধাম;
পাপের ঝটিকা দুঃখ-তরঙ্গ ভীষণ
উত্তরিবে করি' যাঁর নামামৃত পান;
নারায়ণ! একি লীলা-রহস্য তোমার,
সেই কৃষ্ণ প্রণমি'ছে চরণে আমার!"
ভক্তিবিগলিত দুই নয়নধারায়
বীরের ভিজিতেছিল অস্ত্র-উপাধান।

কহিলেন কৃষ্ণ "আর্য! একি কথা হায়
জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম?
পবিত্র জীবন যাঁর, বীরত্বের গাথা,
জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত;
দশ দিবসের যুদ্ধ, শর-শয্যা যাঁর
করিবে মানবজাতি বিস্ময়ে পূরিত;
পিতৃভক্তি যাঁর এই আত্ম-বিসর্জন,
প্রতিজ্ঞা, জিতেন্দ্রিয়া হইবে ঘোষিত
অনন্ত কালের কণ্ঠে প্রবাদের মত,
মানবের কর্মপথ করি' আলোকিত;
মানব-জগতে র'বে হিমাদ্রির মত
বিরাট্ গগনস্পর্শী মূরতি যাঁহার;
তাঁর পদ-তীর্থে নাহি প্রণমিয়া হায়!
নমিব মানব আমি চরণে কাহার?"

ভীষ্ম

মানব!—মানব তুমি!—তুমিও মানব!
দেবতার ঊর্ধ্বে তবে মানবের স্থান।
রবি শশী, বালুকণা! পারাবার কূপ!
বল্মীকের স্তূপ তবে গিরি হিমবান্!
ভীষ্ম কি এতই পাপী, হা কৃষ্ণ! এরূপে
আসন্ন কালেও তুমি বঞ্চিবে তাহায়?
সেই রাজসূয়যজ্ঞে, সর্বাগ্রে কেশব!
চিনিয়াও না চিনিল ভীষ্ম কি তোমায়?
এই মাত্র অভিমন্যু—আহা! বৎস মম,
কৌরব-খনির শিশু মণি, সর্বোত্তম!
এই বাল-শশী হবে পূর্ণিত যখন
তাহার আলোকে ধরা হবে স্বর্গোপম।
মাতা পুত্র দুই জন আজি দুই দিন
কি অমৃত ক্ষত দেহে বর্ষিছে আমায়!
হইয়াছে শর-শয্যা স্বর্গশয্যা মম
স্নেহ শুশ্রূষায় অভিমন্যু সুভদ্রায়!—
এই মাত্র অভিমন্যু গম্ভীর ঝঙ্কারে
শুনাইল কি স্বর্গীয় গীতা সুধাময়!

সর্গে সর্গে কিবা স্বর্গ জ্ঞানের নয়নে
খুলিল, হইল আত্মা কি অনন্তে লয়!
কৃষ্ণের গগনব্যাপী জ্ঞান উচ্চতম,
মহর্ষির সুললিত ভাষা নিরুপম,—
হিমাদ্রিশেখরস্থিত সুধা সুশীতল
পতিতপাবনী গঙ্গা করিয়া বহন
অবতীর্ণা ধরাতলে, ধর্মের পিপাসা
জুড়াইতে, মানবের পুরাইতে আশা।

ব্যাস

আমি মাত্র মালাকার। জ্ঞানের উদ্যানে
ফুটিয়াছে গোবিন্দের যে ফুলনিচয়
গাঁথিয়াছি গীতাহার তুলি' সেই ফুল,—
চিরসুবাসিত, পুণ্য-পরিমলময়।

কৃষ্ণ

ব্যাসদেব মালাকার! জ্ঞানের উদ্যান
গোবিন্দের! এ রহস্য বড় হাস্যকর।
কার সৃষ্টি গোবিন্দের কুসুমকানন?
কার সৃষ্টি সে কাননকুসুমনিকর?
কার পদতলে বসি' সংহিতা বেদের
পড়িলাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল?
কাহার অনন্ত জ্ঞান কৃষ্ণের নয়নে
উন্মেষিল এ বিশ্বের রহস্য অতল?
শিষ্যের উদ্যান, আর গুরু মালাকার,—
বড় অসঙ্গত কথা! এই পুষ্পবন
তোমারি সৃজিত প্রভু! রচনা তোমার,
তোমারি কুসুম তুমি করেছ চয়ন।
জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর।
আমি মাত্র তবালোকে দীপ্ত শশধর।

ব্যাস

সেই আলোকের বৎস! তুমি অবতার,
যে আলোক পূর্ণ প্রতিফলিত তোমায়,
আমি এক ক্ষীণ রশ্মি সেই আলোকের
অনন্ত, খদ্যোত ক্ষুদ্র তার তুলনায়।
হইয়া অতল সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত
তুলিব অবিদ্ধ রত্ন, কি সাধ্য আমার?
আমি ক্ষুদ্র মীন, ভাসি' উপর সলিলে,
কি সাধ্য বুঝিব সিন্ধু-রহস্য অপার?
করিয়াছি সত্য আমি বেদ সঙ্কলিত,
করিয়াছি বহু ক্ষুদ্র শাস্ত্র প্রণয়ন,
অনন্ত সমুদ্রবক্ষে পাতি' ক্ষুদ্র জাল,
তুলেছি শম্বুকরাশি ভাবিয়া রতন।
মানবের মোক্ষসুধা চন্দ্রনিকেতন,
কেমনে পাইবে হায়! দরিদ্র বামন?

ভীষ্ম

যথায় ব্যাসের এই ভাষা আত্মগ্লানি,
যে অনন্ত কাছে ব্যাস এত ক্ষুদ্র হায়!
পশুবলে বলীয়ান্ আমরা সকল
সেই অনন্তের জ্ঞান পাইব কোথায়?
তথাপি পতঙ্গ মত উড়ি দুই হাত
ভাবিতাম এ অনন্ত করায়ত্ত মম।
আজি এই মহাগীতা শুনিয়া বিস্ময়ে
বুঝেছি পতঙ্গ আমি কত ক্ষুদ্রতম।
বড় শুভদিনে আর্য! আজ মানবের।
মানবের অন্ধকার অদৃষ্ট-গগনে
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নরূপে সূর্য শশধর
এত দিনে সমুদিত পবিত্র কিরণে!
বড় শুভদিন আর্য আজি মানবের!
মানব ভাসিতেছিল সংসারসাগরে
দিকহীন, লক্ষ্যহীন, আশ্রয়বিহীন;
মানব ডুবিতেছিল মহাপাপভরে।
বড় শুভদিন আজি! অদৃষ্টে তাহার
মিলিয়াছে এত দিনে আলোকযুগল!—
মিলিয়াছে এত দিনে গীতার তরণী!
লক্ষ্য,—নারায়ণ; পথ,—প্রশস্ত, উজ্জ্বল।
উপজিল যথা সুধা সমুদ্রমন্থন,
উপজিল গীতামৃত কুরুক্ষেত্র রণ।
মহাযোগী যেইরূপে ধরি' মহাধ্যান,
জীবাত্মা পরমাত্মা করি নিমজ্জিত,
কহিয়া এ মহাধর্ম পার্থে পুণ্যবান্,
করিলা এ মহাধর্ম-যুদ্ধে নিয়োজিত।
মহর্ষির মহাবীণা গগনে উঠিয়া
এইরূপে এই গীতা না করিলে গান,
পারিত কি ভবিষ্যৎ যুগযুগান্তর,
এই নব ধর্মামৃত করিবারে পান?
কবির কি উচ্চাসন! যে কাল-তরঙ্গ
উর্ধ্বতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি' লহরী খেলিয়া
কবির চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম।
কোথা সত্য ত্রেতা যুগ! নাহি নিদর্শন
কোথায় কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া

এখনও গায় ঋক্ গায়ক সকল,
বাজে বীণা বাল্মীকির জগত মোহিয়া।
দ্বাপর হইবে স্বপ্ন ; এই রঙ্গভূমি
কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পরিণত ;
মানব অনন্ত কাল করিবেক পান
মহর্ষির গীতামৃত আনন্দে সতত।
কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক ;
শিক্ষা, সাক্ষী, বেদ সত্যযুগের সকল,
কে শুনিত রামসীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল ?
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, বীর্য জগত নশ্বর.—
কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।

ব্যাস

মহাকবি মহেশ্বর! বিশ্বচরাচর
মহাকাব্য! কবিত্বের মহাপারাবার
অনন্ত অতল! কিবা কবিত্ব সুন্দর
অক্ষরে অক্ষরে করে অজস্র প্রচার!
যে পারে পড়িতে এই কাব্য চিন্তাতীত,
অনন্ত সঙ্গীত পারে করিতে শ্রবণ ;
খেলে প্রতিবিম্ব যার হৃদয়দর্পণে
এ অনন্ত কবিত্বের, কবি সেই জন!
এই কবিত্বই ধর্ম ; ধর্মশাস্ত্র আর
এই কাব্য ; এক ক্ষুদ্র অক্ষর মানব!
মানব কে, নিয়তির কবিত্ব তাহার,—
যে পারে বুঝিতে, কবি সেই বীরর্ষভ!
মানুষের এই ধর্ম, কবিত্ব তাহার,
আসৃষ্টি মানবকবি বুঝিতে কাতর ;
জ্বালিয়া খদ্যোতালোক নিয়তি তিমিরে
খুঁজেছে মানব কত কাল নিরন্তর!
সফল ত্রিযুগ-শ্রম ; কৃষ্ণ অবতার
মহাকবি, গীতা সেই ধর্মের আধার।

কৃষ্ণ

ক্ষীণা স্রোতস্বতী, প্রভু! সিন্ধু অভিমুখে
যত হয় অগ্রসর, হইয়া মিলিত
ক্রমশঃ সলিল রাশি বেগ, পরিসর,
ক্রমে ক্রমে তটিনীর করিয়া বর্ধিত,
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত করে উপজিত ;—
বিবশা তটিনী তাহে হয় নিমজ্জিত।
এ জীবন-স্রোতস্বতী, অনন্তের মুখে
যত হয় অগ্রসর, বেগ ও বিস্তার
বাড়াইয়া ক্রমে তত ঘটনানিচয়
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত করে আবিষ্কার।
মানব সে ঘূর্ণাবর্তে হইয়া পতিত,
হয় এক চিন্তাতীত শক্তির অধীন,
অজ্ঞাতে আপনহারা ; মানব তখন
হয় পূর্ণরূপে সেই শক্তিতে বিলীন।
কুরুনাথ! বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাসিত সতত!
কি শক্তি শরীরে, মনে, করিত সঞ্চার!
চালা'ত শিশুকে ক্রীড়াপুতুলের মত!
সে আলোকে সে শক্তিতে হইয়া চালিত
নাচিতাম, হাসিতাম, করিতাম রণ ;
হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভক্তিতে বিহ্বল,
নাচিত, হাসিত গোপ, গোপাঙ্গনাগণ।
বৃন্দাবনে গোচারণে বসি নিরজনে
শুনিতাম, যেন দূর সমুদ্র গর্জন,
ভারতের কি বিরাট্ হাহাকার ধ্বনি
অশান্তির, অধর্মের, প্লাবিছে কানন!
বন-অন্তরালে বসি' দেখিতাম হায়!
অশান্তির, অধর্মের, শিখা প্রধূমিত
মিশি' ঘোর জীব-ঘাতী যজ্ঞ-ধূমসহ,
করিতেছে কি ভীষণ মেঘ সঞ্চারিত।
শুনিতাম গোপমুখে বসি' নিরজনে
মথুরার নিদারুণ শোক সমাচার।
পীড়িতের আর্তনাদ, দুঃখীর রোদন
কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর।
প্রধূমিত অগ্নিমাঝে,—করিলাম স্থির,—
দিব ঝাঁপ, ধর্মবারি করিব সিঞ্চন ;
সেই মহাশক্তি বলে ঝটিকা তুমুল
নিবারিব,—মহা রাষ্ট্র-বিপ্লব ভীষণ।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিব সাধন
স্থাপন করিব ধর্ম, এক মহা ধর্মরাজ্য
করিয়া সৃজন।
বধিলাম কংসরাজে, করিনু মথুরা
রাহুমুক্ত, শান্তি-শশী হাসিল আবার।
হইতেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়িনু সরিয়া
বিমুখি মগধ পতি সপ্তদশ বার।
পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন,
লইলাম মহর্ষির চরণে শরণ ;

দিয়া প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে,
পাণ্ডবের ভুজবল করিনু বরণ।
জ্ঞানবল, ভুজবল, করিয়া আশ্রয়
হইলাম কর্মক্ষেত্রে ধীরে অগ্রসর ;
বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থ করিয়া বিজয়,
করিনু পাণ্ডব শক্তি, শান্তি, দৃঢ়তর।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, জরাসন্ধ করিয়া নিধন
নিবারিনু রাজমেধ, ঘোর পাপাচার।
করিল নির্মুক্ত, বশী, নৃপতিমণ্ডল
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রচার।
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; বসি' বৃন্দাবনে
গোচারণে যেই ধর্ম-সাম্রাজ্য স্বপন
সতত দেখিত শিশু, হইল স্থাপিত ;—
এক বিন্দু রক্ত নাহি হইল পতন।
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; যে শক্তি অঙ্কুর
সুভদ্রার স্বয়ম্বরে হইল রোপিত,
রাজসূয়ে, মহাবৃক্ষে ছাইয়া অম্বর,
করিল ভারতবর্ষ ছায়াসমাবৃত !
অন্তর বিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত ভারত,
করাল কামনা-দগ্ধ. কাম্যকর্মে হায় !
উৎপীড়িত, প্রতারিত, সন্তঃপ্রধূমিত,
জাতীয় বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত কায় ;—
ইহার ছায়ায় শান্তি পাবে নিরমল,
লভিবে অনন্তকাল মোক্ষসুখফল ;
সাম্রাজ্যে, সমাজে ধর্মে করিয়া সঞ্চার
নিষ্কামত্ব দেখাইয়া সর্বভূতময়
নারায়ণ কি নিষ্কাম, করিব সংসার
প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্বসুখালয়।
আবার অশান্তি-শিখা পশ্চিম ভারতে
দেখা দিল ; করিতেছি যবে নির্বাপণ,
হায় ! মূষিকের মত পাপিষ্ঠ শকুনি
সেই মহীরুহমূল করিল ছেদন।
হইল নির্মলাকাশে অশনির মত
পাণ্ডবের বনবাস মস্তকে পতন ;
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত কম্পিত হৃদয়ে
অধর্মের অভ্যুত্থান দেখিনু ভীষণ।
বুঝিলাম যে অধর্মে আচ্ছন্ন ভারত,
যে অধর্ম নরমেধ যজ্ঞে পরিণত,
হৃদয়ে পড়িল ছায়া, বুঝি সে রাক্ষস
নরমেধ যজ্ঞ ভিন্ন হইবে না হত।
গেল পাণ্ডবেরা বনে ; রয়েছে তথাপি
রাজসূয়ে যে সাম্রাজ্য হইল স্থাপিত।
পালিছে নৃপতিগণ আনত মস্তকে
রাজসূয়ে যেই মন্ত্রে হইল দীক্ষিত।
ভারত লভিছে শান্তি ; নাহি জরাসন্ধ
ভারতের শান্তি বিঘ্ন, নাহি শিশুপাল !
থাক কর্ণ দুর্যোধন তরু নব মূলে,
আছে তথা ভীষ্ম, দ্রোণ, বহু মহীপাল।
এইরূপে এই ভিত্তি হবে দৃঢ়তর
ত্রয়োদশ বর্ষ ; শক্তি করিয়া সঞ্চয়,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে করিব নির্মাণ
ধর্মরাজ্য-অট্টালিকা, অমর অক্ষয়।
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত
আকাশ হইতে ভূমে হইনু পতিত।
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত,
বিরাট-বিজয়ে চক্ষে করিনু দর্শন
অধর্মও করিতেছে শক্তির সঞ্চয়,
ধর্মের সহিত হায় ! অনিবার্য রণ।
কি যত্ন না করিলাম। পঞ্চখানি গ্রাম
চাহিনু এ নরমেধ করিতে বারণ।
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—
শুনিলাম অধর্মের প্রতিজ্ঞা ভীষণ !
দ্রবিবে না শিলা, নাহি কর বিচূর্ণিত ;
বিষবৃক্ষমূলে কর অমৃত সিঞ্চন,
তথাপি সুফল নাহি ফলে কদাচিত ;—
অধর্মের শেষ ধ্বংস নিয়তি ভীষণ !
বাজিল সমর ভেরী যুড়িয়া ভারত।
শুনিলাম, দেখিলাম পঙ্গপালমত
ছুটিল নৃপতিবৃন্দ মরিতে পুড়িয়া,—
বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছা ধ্বংসব্রত।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বুক, কাঁদিল পরাণ,—
করিলাম দ্বারকায় শোকেতে প্রস্থান।
হইলে আহূত যুদ্ধে, ধর্ম ক্ষত্রিয়ের
পালিলাম, করিলাম যুদ্ধে যোগদান
নিরস্ত্র ও নিরপেক্ষ ; স্বধর্ম-পালন
করিতে অশক্ত নহে পাণ্ডবরুপাণ।
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত সমরে
দুই মহা অনীকিনী ; করিয়া দর্শন
স্বজন উভয় সৈন্যে, করুণ হৃদয়ে
কহিলেন পার্থ,—"আমি করিব না রণ !"

শিহরিনু, একি কথা!—করিব না রণ!
আশৈশব নির্যাতন, ঘোর পাপাচার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সে কপট দ্যূতক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সেই অপমান লোমহর্ষণ ভীষণ,
পুনঃ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হায়!
সর্ব শেষ, বিনিময়ে সেই সাম্রাজ্যের
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি মিলিল ভিক্ষায়!—
থাকে যদি অধর্মের এই অভ্যুত্থান
অক্ষুণ্ণ, হা ধর্ম! তব কে লইবে নাম।
পার্থ করিবে না রণ! করিবে গ্রহণ
কৌরব-অধর্ম তবে ধর্মের আসন;
অধর্ম-অশান্তি-শিখা জ্বলিবে এমন;
আমার সে ধর্মরাজ্য হইবে স্বপন।
এক দিকে বর্তমান ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
অন্যদিকে ভবিষ্যৎ অনন্ত বিস্তার;
এক দিকে কৌরবেরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
অন্য দিকে সংখ্যাতীত মানব অপার।
অধর্মের এ আদর্শে ক্ষুদ্র বর্তমান
করিবে অনন্ত ভবিষ্যত কলুষিত!
কৌরবের এ আদর্শে মানব দুর্বল
করিবে অনন্ত কাল পাপে প্রবর্তিত।
জগতের এ অশান্তি র'বে চিরদিন!
অন্তর-বিগ্রহানল জ্বলিবে এমন!
ধর্মের এ দুরবস্থা, দুঃখ মানবের,
নারায়ণ! পারিব না করিতে মোচন?
কর্ম,—যাগযজ্ঞ! জ্ঞান,—সংসারবর্জন!
বৈদিক ধর্মের এই ঘোর পরিণাম!
কত দিন আর্যজাতি রহিবে জীবিত
নিরন্তর করি' এই মহাবিষ পান?
যেই ধর্মামৃত পানে পাবে মোক্ষ নর,
না পাইল এক বিন্দু সেই শান্তি জল,
আমার জীবন-ব্রত চলিল ভাসিয়া;
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
হইল না; হইল না ধর্মের স্থাপন।
পড়িলাম ঘূর্ণাবর্তে; দেখিলাম হায়!
এক দিকে অধর্মের স্বচ্ছ অন্ধকার,
অন্য দিকে ধর্ম-রাজ্য-জ্যোতিঃ নিরমল,—
হইল জীবনে ব্রাহ্মমুহূর্ত সঞ্চার!

সে আশায়, নিরাশায়, আলোকে, আঁধারে,
করিল কি চিন্তাতীত শক্তির অধীন!
কহিনু অর্জুনে এই ধর্ম সনাতন
হইয়া সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ বিলীন।
গায়ক সে নারায়ণ; এই গীতা তাঁর;
আমি ও মহর্ষিমাত্র নিমিত্ত ইহার।

ভীষ্ম

মানব—মানব তুমি! মানবজীবন
এই লীলা! মানবের এ অনন্ত জ্ঞান!
আজি দুই দিন কৃষ্ণ! এ শরশয্যায়
অপূর্ব চরিত তব করিয়াছি ধ্যান।
সামান্য মানব তুমি নহ কদাচন
বুঝিলাম, বুঝি নাহি আকাশ-বিস্তার
বিশ্বব্যাপী এ ব্রত! আসন্ন শয্যায়
আজি কি খুলিল ক্ষুদ্র নয়ন আমার?
আজি তব বিশ্বরূপ দেখিয়াছি হায়!—
অনন্তের গর্ভে যেন,—হৃদয়ে তোমার—
ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব; বুঝিতেছি হায়!
তোমার জীবন-ব্রত জগত উদ্ধার!
তব কুরুক্ষেত্র বিশ্ব; জীবাত্মা অর্জুন;
ধর্মাধর্মে পাপ পুণ্যে বাজিয়াছে রণ।
হইয়া সারথি যুদ্ধে জীবাত্মার জয়
সাধিতেছ, নররূপী তুমি নারায়ণ!
এ ধর্মসাম্রাজ্য-পথে ভীষণ কণ্টক
হইল কি ভীষ্ম? হায়! ভীষ্ম দুরাচার
ধর্মভ্রমে অধর্মকে করিয়া আশ্রয়
করিল কি সংখ্যাতীত জীবের সংহার!
বাসুদেব! বনমালি! কৃষ্ণ! নারায়ণ!
ভীষ্মের কি গতি হবে কহ জনার্দন!

কৃষ্ণ

হে রাজর্ষি! বৃথা এই অনুতাপ তব।
মানুষ কালের ক্রীড়া। কাল-স্রোতঃ, হায়।
যখন যে পথে বহে, সে পথে ভাসিয়া
যায় নরগণ, তৃণসমষ্টির প্রায়।
অধর্মের কি প্লাবনে প্লাবিত ভারত!
অন্যের কি কথা, ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্যতম
ভাবেন অধর্মে ধর্ম, কুজ্ঝটিকা মত
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হায়! তাঁদেরও নয়ন।
অনিবার্য হ'লে যুদ্ধ, ছিল এক আশা—
ভীষ্ম দ্রোণ কদাচিৎ করিবে না রণ।

কৌরব পাণ্ডব—তুল্য তাঁদের নয়নে,
রহিবেন অস্ত্রহীন আমার মতন।
সে আশাও গেল ভাসি' অধর্মের স্রোতে।
কৌরবের আশৈশব ক্রুর ব্যবহার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সে কপট দ্যুতক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সভাস্থলে নিরমম সেই নির্যাতন,
"না দিব সূচ্যগ্র স্থান"—প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
ভুলিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, মোহের আবেশে।
"ধৃতরাষ্ট্র অন্নে প্রতিপালিত আমরা,
হইবে অধর্ম"—মনে করিলেন স্থির—
"কৌরবের পক্ষ নাহি করিলে গ্রহণ!"
অধর্মের অভ্যুত্থান হায়! কি গভীর!
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্তিত
হইতে হইবে তবু সহায় তাহার!—
ধর্ম কি অধর্ম হায়! বলিব ইহারে?
পাপের প্রশ্রয় দেব! নহে পাপাচার?
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্তিত,
নিবারিত যথাসাধ্য করি' প্রাণপণ;
না পারি, রহিব দূরে ব্যথিত অন্তরে;—
ইহা কৃতজ্ঞতা, ইহা ধর্ম সনাতন।
আর সেই অন্ন,—অর্ধ নহে কি তাহার
পাণ্ডবের? অর্ধ-রাজ্য পাণ্ডবের নয়?—
এই ভ্রান্তি ঘটাইল এই মহারণ,
করিল ভারত-ভাগ্য চির ছায়াময়!
ভীষ্ম, দ্রোণ অস্ত্র নাহি করিলে গ্রহণ,
হইত কি দুর্যোধন রণে অগ্রসর?
হইলে, এ কুরুক্ষেত্র হইত নিশ্চয়
উত্তর গোগৃহ;—সেই ক্রীড়া হাস্যকর।
কিন্তু অধর্মের ধ্বংস হইত কি হায়!
থাকিতে অধর্মী এই ক্ষত্রিয় নিচয়?
থাকিতে প্রাচীর, স্তম্ভ, আশ্রয় প্রবল,
নাহি পড়ে অট্টালিকা, নাহি হয় লয়!
এই মহারক্ত-স্রোতে যেতেছে কি ভাসি'
যুগের অধর্ম? তব মহিমা অপার
কি বুঝিব নারায়ণ! আমি ক্ষুদ্র নর!
এই বুঝি,—তুমি সর্ব মঙ্গল আকর।

ভীষ্ম

কি বুঝিব আমি তবে নর ক্ষুদ্রতম!
এই বুঝি,—তুমি কৃষ্ণ নর-নারায়ণ
নাশিয়া দুষ্কৃত, সাধু করিয়া উদ্ধার,
স্থাপন করিতে ধর্ম তব আগমন।
বিপুলা পৃথিবী; মহাকাল অন্তহীন;
অনন্ত মানবজাতি; মুষ্টিমেয় তার,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, মানব মঙ্গল
রোধিতেছে;—কুরুক্ষেত্রে করুণা অপার!
মানবের ভবিষ্যৎ কি আনন্দময়!
দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে করি' আত্মক্ষয়
অধর্মের ঘনঘটা, হিংসা বজ্রানল
নিবিল; উঠিল কিবা ধর্ম-সুধাকর!
পুণ্যজ্যোৎস্নায় স্নাত অনন্ত মানব
লভিতেছে কিবা সুখ যুগ যুগান্তর!
ভূতল আনন্দ রাজ্য! বিস্তৃত ত্রিপথ
হইয়াছে একা মহা বেদিমূলে লয়।
ত্রিপথে ত্রিবৈজয়ন্তী উড়িছে সুন্দর—
জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—কিবা স্বর্গ শোভাময়!
সৌর-সরসিজ বক্ষে উর্ধ্বে নারায়ণ
বসি' কৃষ্ণরূপী, মূর্তি পূর্ণ মহিমায়,
মধুর বাঁশরীস্বরে ডাকিছে—"মানব!
আইস যে পথে পার, পাইবে আমায়।"
দেখিতেছি ছুটিয়াছে ত্রিপথে মানব
চারু বৈজয়ন্তীত্রয় করিয়া আশ্রয়;
সুমধুর কৃষ্ণনাম, ভূতলে গগন
করিতেছে কি পবিত্র, কি আনন্দময়!
গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্তি হৃদয়ে হৃদয়ে!
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, যুগ যুগান্তর!
দেখিতেছি পাপতাপ-পূর্ণ ধরাতল
হইতেছে ক্রমে স্বর্গ, স্বর্গ উচ্চতর।
নারায়ণ! জনার্দন!"

চাহি বীরর্ষভ

কৃষ্ণপানে ভক্তিপূর্ণ সজলনয়নে—
"ভীষ্ম মহাপাপী নাহি পাইল কি স্থান
সে আনন্দরাজ্য-স্বর্গে, হায়! এ জীবনে?
জন্ম জন্মান্তরে তারে, ভকতবৎসল!
সেই স্বর্গে, পদাম্বুজ-প্রান্তে, দিও স্থান!
দয়াময়! ছিন্ন এবে সংসারবন্ধন;
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম।
আমি নহি ভীষ্ম; তুমি নহ বাসুদেব।
আমি ভক্ত; দেখিতেছি তুমি ভগবান্,
শঙ্খচক্র-ধর হরি; পতিতপাবন!

দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম !"
বহিতেছে প্রেমধারা বহিয়া কপোল,
আকুল হৃদয়ে ভীষ্ম বাড়াইয়া কর।
বিহ্বল হৃদয়ে কৃষ্ণ পড়িলা হৃদয়ে,—
বিরাজিলা বৈকুণ্ঠেতে-বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
ভক্তিতে বিহ্বল ব্যাস, আকুলিত প্রাণ,
গাহিতে লাগিলা প্রেমকণ্ঠে কৃষ্ণনাম।



দশম সর্গ

ব্যাধ

কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি, অতীত প্রহর।
অদূরে অরণ্যে পত্রপল্লবকুটীরে
বসিয়া দুর্বাসা, কর্ণ, চিন্তাকুল মন।
দূর প্রান্তরের শেষে চিতাগ্নির মত
জ্বলিতেছে কাষ্ঠধুনি জ্বলিয়া নিবিয়া।
জপিছেন ঋষিবর রুদ্রাক্ষের মালা
ধীরে ধীরে; বনরাজি নীরব, নির্জন।

কর্ণ

দশ দিন মহারথী করি' মহারণ,
বিনাশি' অসংখ্য সৈন্য, চতুরঙ্গদল,
লিখিয়া অক্ষয় কীর্তি কালের হৃদয়ে
অস্ত্রমুখে, রণক্ষেত্রে রুধিরপ্লাবিত,
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত,
ভীমকর্মা ভীষ্মদেব শরশয্যাগত!

দুর্বাসা

উত্তম! ক্ষত্রিয়-ক্ষয় হয়েছে সাধিত
সংখ্যাতীত এক দিকে, হত অন্য দিকে
ক্ষত্রিয়ের শীর্ষ ভীষ্ম কৃষ্ণ-উপাসক।
রাজসূয় যজ্ঞে এই বিধর্মী পামর
বেদ-দ্বেষী কৃষ্ণে অর্ঘ্য করিয়া প্রদান
ব্রাহ্মণধর্মের মূলে করিল প্রহার
প্রথম কুঠার তীক্ষ্ণ; নিবারিতে রণ
কত ধর্ম-তর্কজাল করিল বিস্তার!
উত্তম, সে বাহু, জিহ্বা, নড়িবে না আর!
তুমি?

কর্ণ

ধরে নাই অস্ত্র প্রভুর আদেশে
দাস এই দশ দিন, উপদেশ মত
সৃজিয়া কলহ-ছল ভীষ্মের সহিত।

দুর্বাসা

উত্তম! সন্ধ্যান্তে আজি কি আনন্দধ্বনি
হইল কৌরব সৈন্যে?

কর্ণ

প্রতিশ্রুত দ্রোণ—
বধিবেন কালি যুদ্ধে করি' ঘোর রণ
পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী এক জন।

দুর্বাসা

উত্তম! উত্তম! আর সংশপ্তকগণ?

কর্ণ

প্রভুর মন্ত্রণা দাস করেছে পালন।
তাহার কৌশলে প্রভু! সংশপ্তকগণ
করিয়াছে ধনঞ্জয়ে যুদ্ধে আবাহন,
হইতেছে সংশপ্তকে ধনঞ্জয়ে রণ
ঘোরতর!

হাসি' ঋষি—"অতীব উত্তম
মন্ত্রযুদ্ধে জয়ী বৎস! হইলে আমরা,
তব করে ঘৃতাহুতি করিয়া প্রদান
কৌরবের রাজ্যলোভে, করিলে বিফল
পঞ্চগ্রাম-ভিক্ষা চক্র গোপ পামরের,—
নিবারিতে এই যুদ্ধ, শান্তির কমল
ফুটাইয়া ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপন
আপনার বেদ-দ্বেষী, কতই কৌশল
করেছিল দুরাচার! অজস্র শিশির
বরষিয়া তব করে করিলে নির্মূল
অঙ্কুরে সে শতদল, গেল দ্বারিকায়।
রহি' নিরপেক্ষ চক্রী ভেবেছিল মনে
রক্ষিবেক এই মহাক্ষত্রিয় খাণ্ডবে
আপনার কুলত্রয়! দেখিলাম আমি
দিব্য চক্ষে, থাকে যদি পশ্চিম ভারতে
এ বিশাল কুলত্রয়,—ধর্ম ব্রাহ্মণের,
ব্রাহ্মণের আধিপত্য হবে না কখন
নিরঙ্কুশ; সেই হেতু আদেশি' তোমায়
পাঠাইনু দুর্যোধনে দ্বারকানগরে।
নিশ্চয় পাণ্ডব তবে যাবে দ্বারকায়—
দেখিলাম দিব্যচক্ষে; বুঝিলাম আর—
হইলে আহূত যুদ্ধে চক্রী নিরপেক্ষ
অনিচ্ছায় দুইপক্ষে করিবে গ্রহণ;—
পড়িয়াছে ঊর্ণনাভ আপনার জালে!

সারথ্য করিয়া আজি দেখ নারায়ণ
নাশিছেন নারায়ণী সেনা আপনার,—
কণ্টকে কণ্টক দিব্য হতেছে উদ্ধার!
কাপুরুষ বাঁচাইতে আপনার প্রাণ
করিয়াছে নীচকর্ম সারথ্য গ্রহণ।
দুর্বাসার যোগ-মন্ত্র কাল সেই প্রাণে
করিবেক বজ্রাঘাত অমোঘ সন্ধানে।
সব্যসাচী সংশপ্তকে হ'লে কাল রণ,
র'বে একমাত্র যোদ্ধা পাণ্ডব শিবিরে
দ্রোণ-কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী; রক্ষিতে পাণ্ডবে
হইবেক মহারথী যুদ্ধে অগ্রসর,
তাহাকে বধিতে কালি হইবে নিশ্চয়!"

কর্ণ

কে সে প্রভো!

কাণে কাণে কহিলা দুর্বাসা;
অঙ্গপতি বীর অঙ্গ উঠিল শিহরি'।

দুর্বাসা

পাণ্ডবের দুই ভুজ—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়।
ক্রোধে শোকে দুই ভুজ হইয়া অধীর,
উন্মত্ত,—কটাক্ষে করি' ধ্বংস কুরুকুল,
বিশ্বত্রাস বজ্রাগ্নিতে তৃণরাশি যথা,
হইবেক অবসন্ন। কাটিবে হেলায়
সপাণ্ডব এক ভুজ তুমি পরাক্রমে;
নিক্ষেপিব অন্য ভুজ পশ্চিম সাগরে।
অব্যর্থ তপস্যা মম;—দুই দিন আর!
বেদ-ব্রাহ্মণের শত্রু যাবে রসাতল;
কর্ণের সাম্রাজ্য—ধ্বজা উড়িবে উজ্জ্বল।
ও কি!

চমকিলা ঋষি—"কি যেন নড়িল!
আইস দেখিয়া।" কর্ণ কহিলা ফিরিয়া
"কিছুই না, আঁধারের পশ্চাতে আঁধার।"
বসিলেন পূর্বাসনে চিন্তাকুল মনে।

কর্ণ

এ দ্বাদশ দিন সে ত করে নাই রণ,
রণক্ষেত্র তার যেন ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ!
আসিলে সে রণক্ষেত্রে, মহারথী কেহ
যদি হয় সম্মুখীন, অপূর্ব কৌশলে
পরাভবি' যায় শিশু উপহাস করি'।
স্থির চিত্তে যদি রণে হয় অগ্রসর,
সহজে জিনিবে তারে দ্রোণ কি কর্ণের
নাহি সাধ্য, সিংহ-শিশু সিংহ-পরাক্রম!
হউক যতই ক্ষুদ্র ভীম বজ্রানল,
মহামহীরুহ নাহি সবে তার বল!

দুর্বাসা

একা কর্ণ, একা দ্রোণ নাহি পারে যদি,
দ্রোণ কর্ণে মিলি' তবে করিবে সমর।
নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি'
বধিবে তাহারে রণে, বধে যেই মতে
মৃগেন্দ্র ফেলিয়া জালে বনে ব্যাধগণ,
আনন্দের কোলাহলে পূরিয়া গগন।

কর্ণ

এই ব্যাধ-বৃত্তি প্রভু! বীরধর্ম নয়।
পারিবে না দ্রোণ কর্ণ।

দুর্বাসা

না পারুক দ্রোণ,
অবশ্য পারিবে কর্ণ।

কর্ণ

পারিবে না দাস।

দুর্বাসা

হেলায় গুরুর আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন!

কর্ণ

অনুমতি কর গুরো! ধনুর্বাণ করে
ন্যায় যুদ্ধে বিমুখিব বনের কেশরী,
ততোধিক পরাক্রমী পার্থে দিব রণ,—
আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী! আসুন আহবে
বজ্রপাণি, শূলপাণি, দেব-সেনাপতি;
—পালিব তোমার আজ্ঞা, করিব সমর।
হানিয়াছিলাম খড়্গ তোমার আজ্ঞায়
পুত্র বৃষকেতু শিরে; আজ্ঞা কর যদি—
হানিব আপন শিরে, কাটি' এই শির
গুরু-ভক্তি উপহার দিব পদাম্বুজে।
এক মাত্র চাহি ভিক্ষা—বীরত্বে কর্ণের
করিও না এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ।

দুর্বাসা

নিজ পুত্র হইতে কি তবে প্রিয়তর
শত্রুপুত্র? তার বধে পাপ সমধিক?

কর্ণ

প্রতিশ্রুত ছিল দাস পাদপদ্মে তব—
গুরু, বিপ্রে, যেই ভিক্ষা চাহিবে যখন
অম্লান বদনে তাহা করিবে প্রদান।

আপনি চাহিলে ভিক্ষা ; তুলিলাম অসি
পুত্রশিরে , ভাবিলাম রহিবে জগতে
দাতাকর্ণ নাম মম ; র'বে ভবে আর
পুত্রত্যাগী গুরুভক্তি আদর্শ অতুল।

দুর্বাসা

আজিও চাহি এ ভিক্ষা।

কর্ণ

দিবে ভিক্ষা দাস ;
কালি কর্ণ তার সনে করিবে সংগ্রাম
ঘোরতর। হা অদৃষ্ট! জয় পরাজয়,
কর্ণের কলঙ্ক মাত্র ঘটাবে উভয়।

দুর্বাসা

দ্রোণ, কর্ণ উভয়ের স্নেহ-শ্লথ কর
পারিবে না দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বহুরথী মিলি'
ন্যায় কি অন্যায় যুদ্ধে, বধিবে তাহারে—
দুর্বাসা চাহিছে ভিক্ষা।

কর্ণ

হা পুত্র আমার!
কুরুক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত হিংসা-মরু মাঝে
কি অমৃত বাছা মম করে বিকিরণ!
কি কৌরব, কি পাণ্ডব, উভয় শিবিরে
বেড়ায় মনের সুখে, কৈশোর উচ্ছ্বাসে
পরিপূর্ণ বুক তার, পরিপূর্ণ মুখ।
শত্রু মিত্র তার কাছে উভয় সমান,
উভয়ের সমান ভক্তি, প্রীতি সমতুল ;
আকাশের সুধাপূর্ণ সুধাকর সম
সর্বত্র বরষে সুধা অজস্র ধারায়।
শিশুরা সকলে ভাই ; পিতৃব্য আমরা
সকলেই ; পত্নীগণ সকলি জননী ;
সমস্ত জগত তার প্রেমের নির্ঝর।
বৃষকেতু পাশে যবে বসে গলা ধরি'
গলা জড়াইয়া মম "তাত! তাত!" বলি',
কহে যবে স্নেহকথা হাসি হাসি মুখ,
বাসি ভাল পুত্রাধিক। ইচ্ছা হয় মনে
চিরিয়া হৃদয় তারে রাখি সেইখানে,
সে নহে এ জগতের কর্কশ বন্ধুর।
ইচ্ছা হয় ত্যজি' এই ছদ্ম অভিনয়,
ধনুর্বাণ করে নাশি' কৌরব পাণ্ডব,
ভারত সাম্রাজ্য তারে করি অধিষ্ঠিত,
জুড়াক্ জগৎ, শান্তি লভুক মানব।
দেব পিতা, দেবী মাতা, দেবতা মাতুল ;
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্মূল!
এ অধর্মে নিপতিত করো না দাসেরে!
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পায়।
ক্ষুদ্র জতুগৃহ যেন উঠিল জ্বলিয়া
অকস্মাৎ! উঠি' বেগে ক্রোধান্ধ দুর্বাসা
কহিলা কর্ণের শিরে করি' পদাঘাত—
"নরাধম! কৃষ্ণস্তুতি সম্মুখে আমার!
জমদগ্নি-সুত কাছে সূত্রধর-সুত
ক্ষত্রিয় বলিয়া যবে দিল পরিচয়,
সে ছলনা সমর্থন করিল দুর্বাসা,
কোথা ছিল ধর্ম তোর, ওরে দুরাচার?"

কর্ণ

গুরুদেব! গুরুদেব! নাহি জানি কেন
শিখিবারে যুদ্ধ বিদ্যা আছিল পিপাসা
আশৈশব ; কৃপা করি' করিলে পূরণ
কিশোর জীবনে সেই হইল সঞ্চার
ক্ষুদ্র পাপ! সেই পাপ আনিয়াছে কোথা!
তোমার আদেশে প্রভু! ক্রীড়া রঙ্গভূমে
প্রবেশিনু কৌরবের বৈশ্বানররূপে,
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অন্তর নিগ্রহে।
সে অবধি হায়! তব অঙ্গুলি নির্দেশে,
তব করধৃত জড় পুত্তলিকা মত,
করি' ছদ্ম অভিনয় কৌরব সভায়,
জ্বালাইনু প্রভু! এই মহা দাবানল!
কোন্ পাপে আত্মা নাহি করিনু পতিত।
নির্বোধ অদূরদর্শী যেই দুর্যোধন
সূতপুত্রে দিল অঙ্গ-রাজ্য-সিংহাসন,
করিতেছি ভস্ম তারে স্বকুল সহিত।
পুড়িতেছি হায়! হীন পতঙ্গের মত
ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্রগ্রাম—জগতগৌরব ;
নররক্তে করিতেছি পৃথিবী প্লাবিত—
ভস্ম হইতেছে মহা মহীরুহ চয়।
শিশু তরুগণে কর দয়া! নররক্তে
লোহিত এ কর ; দয়া কর, ক্ষমা কর ;
শিশুরক্তে কলঙ্কিত করিও না আর!
দাতাকর্ণ নাম যায়, বিশ্বাসঘাতক—
নর-হন্তা আততায়ী সেই দুরাচার!
গুরুদেব! গুরুদেব! ক্ষমা কর এবে ;

ধরি তব পায়—

"পাপি! বিশ্বাসঘাতক।"—

গর্জিলা দুর্বাসা পুনঃ করি পদাঘাত।
আসি' এত দূর মূর্খ! এইরূপে তুই
দুর্বাসার মনোরথ করিবি বিফল!
করিবি বিশ্বাস ভঙ্গ গুরু-জনকের।

কর্ণ

জনকের!

দুর্বাসা

জনকের!

বিস্তৃত নয়নে
বিস্ময়ে চাহিল কর্ণ ঋষিমুখ পানে
বিকৃত বিবর্ণ ক্রোধে। পড়িল ভাঙ্গিয়া
পর্বতের চূড়া যেন মস্তকে নিমিষে।
নিমিষে হইল যেন ভীষণ নিনাদে
বিদারিত বিচূর্ণিত পৃথিবীমণ্ডল,
বীর বক্ষ দুরু দুরু উঠিল কাঁপিয়া।

দুর্বাসা

শুন্ তবে কুলাঙ্গার! শিষ্য কুন্তিভোজ
করেছিল কন্যা কুন্তী আদেশে আমার
নিয়োজিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সেবায়,—
পুত্রার্থী! একদা আমি হইনু অতিথি
ভোজগৃহে; পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়
শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার।
আকর্ষিল মন্ত্রবলে কুন্তী সবিতায়,
জনম হইল তোর। পাপীয়সী মাতা
নির্দয়া সলিলে তোরে করিল নিক্ষেপ;
শিষ্যা রাধা সযতনে করিল পালন।
ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে, সুশাণিত ক্ষত্রিয়কৃপাণ
দেখিলাম যোগবলে হবে প্রয়োজন।
পরশুরামের করে সেই হেতু তোরে
ক্ষত্রিয়-নন্দন বলে' করিনু অর্পণ
শিক্ষার্থে। দুর্বাসা কভু নহে মিথ্যাবাদী,
কুন্তীর নন্দন তুই, মন্ত্র-পুত্র মম।
সূতের নন্দনে নহে মহর্ষি দুর্বাসা
শিখায় কি ধনুর্বেদ? সূতের নন্দনে
ভারত-সাম্রাজ্য চাহে করিতে প্রদান
দুর্বাসা? বানরে চাহে দিতে ইন্দ্রপদ?
রে কৃতঘ্ন কুসন্তান! গুরুর, পিতার,
আজীবন ব্রত তুই করিবি বিফল?
যে চাহে সাম্রাজ্য তোরে করিতে প্রদান,
তার প্রতি তোর এই তীব্র তিরস্কার?
কি দারুণ কৃতঘ্নতা! করে যেই কর
তোর মুখে দুরাচার! আহার প্রদান,
দাহন করিবি তুই এই তীব্রানলে?
যা রে চলি কুলাঙ্গার! একটি অক্ষর
মম আদেশের যেন না হয় লঙ্ঘন।
স্তম্ভিত, বিস্মিত, ভীত কর্ণ রুদ্ধশ্বাসে
চলিলা মহর্ষি পদে করিয়া প্রণাম,
চিন্তাকুল আত্ম-হারা। চলে না চরণ,
বসিলা কানন প্রান্তে অবসন্ন মনে।
কৃষ্ণা নবমীর চন্দ্র উঠিতে লাগিল
হাসাইয়া বসুন্ধরা, ধীরে, ধীরে, ধীরে।
চাহিয়া উদয়মান সুধাকর পানে
কহিতে লাগিলা কর্ণ—"এইরূপে হায়!
আমার জীবন রাজ্যে ধীরে, ধীরে, ধীরে
হইতেছে সঞ্চারিত আলোক উজ্জ্বল।
বুঝিলাম এত দিনে সূত-নন্দনের
কেন এই ভুজে বল; কেন হৃদয়েতে
রাজ্য আশা; এ জিগীষা পিপাসা দারুণ;
এ দারুণ অভিমান; কোন্ আকর্ষণে
চলিয়াছে এত দিন যন্ত্রের মতন
দুর্বাসার ক্রুর করে। হায় আমি তবে
কুন্তীর কানীন পুত্র, পুত্র দুর্বাসার!
যার যন্ত্রণায় কুন্তী, কুন্তীপুত্রগণ
ভুঞ্জিছে দুর্গতি এত, কুন্তীর তনয়
সেই পাপী, সহোদর পঞ্চ পাণ্ডবের!
ক্ষত্রিয় সে! অসম্ভব। না না এত নীচ
নহে রক্ত ক্ষত্রিয়ের! কুন্তী পুণ্যবতী,
তাঁর গর্ভে এ পাপীর জন্ম অসম্ভব।
সুরভির গর্ভে নাহি জনমে শার্দূল
বিনাশিতে জননীকে সহ বৎসকুল;
সিংহিনীর গর্ভে নাহি জনমে শৃগাল।
ক্ষত্রিয় যে বীর, ব্যাধ নহে কদাচন!
বীরত্ব—ক্রুরত্ব নহে,—ধর্ম ক্ষত্রিয়ের।
ক্ষত্রিয়ের শর ছোটে সরল রেখায়
দিবালোকে, অন্ধকারে ব্যাধ পাতে জাল।
সূতের নন্দন আমি, পিতা অধিরথ,
মাতা রাধা। না, দুর্বাসা নহে মিথ্যাবাদী;

কুন্তীর তনয় আমি। কিন্তু যে জননী
নিক্ষেপিল জলে সদ্যঃ-প্রসূত সন্তান,
মাতা নহে, রাক্ষসী সে। তার পুত্রগণ
পিতৃ-শত্রু, শত্রু মম ; নহে সহোদর।
অবশ্য করিব রণ!
উঠিয়া সবেগে
আস্ফালিয়া দুই ভুজ কহিল গর্জিয়া—
"অবশ্য করিব রণ। আইস অর্জুন!
আয় অভিমন্যু!—কিন্তু অস্ত্র পড়ে না যে মনে।
গ্রাসিছেন রথ-চক্র মাতা বসুন্ধরা
এ পাপীর। ধনঞ্জয়! ছাড় তীক্ষ্ণশর
ক্ষিপ্র করে বজ্রনাদে! নাহি জান তুমি
তব সহোদর কর্ণ। হায়! পিত! তুমি
আজি হ'তে অস্ত্রহীন করিলে কর্ণেরে,
হরিলে বাহুর বল, রাজ্যের পিপাসা!
তথাপি তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
কাটিলেন অস্ত্র গুরু জননীর শির
পিতার আদেশ ; আমি পিতার আজ্ঞায়
কাটিব না কেন হেন রাক্ষসী মাতার
পুত্রদের শির তবে?—যে পিতা আমার
পালিল বর্জিত সদ্যঃ-প্রসূত কুমার,
দিল জ্ঞান, অস্ত্র শিক্ষা, যাঁহার কৃপায়
কর্ণ আজি কর্ণ, কর্ণ অঙ্গ-অধিপতি?
এই চলিলাম মাতঃ! নিক্ষেপিলে জলে
যেই পুত্রে, পুত্রহীন করিয়া তোমায়
ভাসাইবে অকূলে মা শোকের সাগরে।
মুদ আঁখি চন্দ্রদেব! তব বংশধর
চলিল নির্মূল বংশ করিতে তোমার।"
ছুটিলেন বৈকর্তন। হাসি উচ্চ হাসি,
বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে হইয়া বাহির
কহিতে লাগিল কারু—"সহোদর মম
সরল শিশুর মত, ক্লান্ত পথশ্রমে
নিদ্রা যাইতেছে সুখে আপন কুটীরে।
কিন্তু আমি পোড়ামুখী শুনিনু যখন
হইবে মন্ত্রণা গুপ্ত কর্ণের সহিত
মহর্ষির, পোড়া চক্ষে আসিল না ঘুম।
কিন্তু আমি জাগ্রত কি? জাগিয়া মানুষ
এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কি কখন?
আমি কে? কারু কি? ধর্ম-পত্নী দুর্বাসার?
না কি স্বপ্ন-রাজ্যে আমি কারুরূপী কেহ?
এ হাত? কারুর বটে। কদম্ব দাড়িম্ব?
কারুর! এ ক্ষীণ কটি? তাহাও কারুর।
শ্রোণিভারে আর এই অলস গমন?
কারু সুন্দরীর তাও। সর্বশেষ এই
মার্জিত শাণিত বুদ্ধি? মনসা বিহনে,
দুর্বাসার প্রাণেশ্বরী, সম্ভবে কাহার?
কর্ণ দুর্বাসার পুত্র, স্বপ্ন নহে তবে!
পুত্র নহে, মন্ত্র-পুত্র! ভোজ নৃপতির
নাহি ছিল মৃত্যু আর, কুমারী কন্যায়
করেছিল নিয়োজিত দুর্বাসা-সেবায়।
সেবায় হইয়া তুষ্ট মহর্ষি গোপনে
দিলা মন্ত্র ব্যভিচার, না না, অভিচার।
কুমারী টানিল সূর্য, নামিল ভাস্কর
ছাড়ি আকাশের কায, জন্মিল কুমার!
গিলে কি হে আর্যজাতি এই ভস্ম ছাই
অকপটে? হরি! হরি! এ কি ব্যভিচার?
কি করিবে কৃপাপাত্রী কুন্তী অভাগিনী?
শিষ্য পিতা ; দুর্বাসাও ঋষি ধুরন্ধর,
অভিশাপে ভরা পেট, ক্রোধে গড় গড়।
পাইতাম আমি যদি মন্ত্র অভিচার,
না টানি পিতায়, অগ্নি-পিণ্ড ভয়ঙ্কর
হস্ত-পদ-হীন, টানি তনয়ে তাহার
চাপিতাম মহর্ষির মস্তক উপরে।
তার পরে এত দূর নাহি গিয়া আর,
ওই কুরুক্ষেত্র হ'তে আনিতাম টানি
আমার হৃদয় চোরে, এই জ্যোৎস্নায়
হইত কি অভিসার—না না,—অভিচার!
কিবা ঘোর ষড়যন্ত্র! অসাধ্য ইহার
নাহি বুঝি কোন পাপ অবনীমণ্ডলে?
কিন্তু ব্যাধ পড়িয়াছে আপনার জালে।
ফুরাবে কর্ণের লীলা দুই দিনে আর!
নিদ্রা যাও নাগরাজ! সাম্রাজ্যে তোমার!

একাদশ সর্গ

মৃগ-শিশু

সুবঙ্কিম শশধর কৃষ্ণা নবমীর
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে দূর-বনরাজি-শিরে—
হীরকের অর্ধচন্দ্র, রঞ্জি ধরাতল
উজ্জ্বল রজতালোকে তরল শীতল।
চাহি' সে ফুটন্ত শশী, শিবির গবাক্ষে বসি
উত্তরা, ও অভিমন্যু; গাহিছে উত্তরা,
বাজে কুমারের করে বীণা সপ্তস্বরা।
র'হিয়া রহিয়া সুখে প্রেম-উচ্ছ্বসিত বুকে
গাহিতেছে অভিমন্যু, সুধা বরষিয়া
জ্যোছনায় তিন বীণা উঠিছে ভাসিয়া
সুস্বর-ত্রিবেণীধারা উদারা, মুদারা, তারা
খেলিয়া আকাশ-পথে উঠিছে কখন,
তারায় তারায় করি সুধা বিকিরণ।
কভু নামি ধরাতলে হিরণ্বতী নীলজলে
হিল্লোল কৌমুদী-মাখা করিছে চুম্বন,
কহি প্রকৃতির কাণে প্রীতির স্বপন।
প্রীতির স্বপন মত শুনিতেছে নিদ্রাগত
কুরুক্ষেত্র সে সঙ্গীত; নরকে হিংসার
প্রীতির ত্রিদিব যেন হতেছে সঞ্চার।
উঠিলেন শশধর; ধীরে সঙ্গীতের স্বর
জ্যোৎস্নার সহ যেন গেল মিশাইয়া,—
আত্ম-হারা দুইজন রহিলা চাহিয়া।

অভিমন্যু

দেখ লো উত্তরে! চাহি, বসুন্ধরা অবগাহি
জ্যোছনায় উঠিছেন দেব শশধর,
পাপীর হৃদয়ে যেন পবিত্র ঈশ্বর!
এ সৌন্দর্য মনোহর, এ কবিত্ব মুগ্ধকর,
পারে লো বর্ণিতে বর্ণে কোন্ চিত্রকরে?
পারে কোন্ কবি বল চিত্রিতে অক্ষরে?

উত্তরা

পারে জানি একজন!
"কে উত্তরে?"—অন্যমন
জিজ্ঞাসিলা অভিমন্যু। অধরে তখন
আদরে বিরাট-বালা করিল চুম্বন।

"আমি!" যুবা কহে হাসি, "তবে যে রে অগ্নিরাশি
করিস্ ব্যবস্থা মম চিত্র; কবিতার?"

উত্তরা

তাহা কেন প্রতিযোগী হইবে আমার?
নিয়ে চিত্র কবিতায় থাক সদা, উত্তরায়
দিয়ে থাক সে কালের কতটুকু ভাগ?
তাহাতে কি মানুষের নাহি হয় রাগ?

অভিমন্যু

না উত্তরে! তাহা নয়, মম চিত্র কাব্য চয়
তব অগ্নি-পরীক্ষার যোগ্যাই কেবল।
কুতৃণের প্রাণাধিকে! ধ্বংসই মঙ্গল।

উত্তরা

কেন? নিজে নারায়ণ প্রশংসা ত সর্বক্ষণ
করেন চিত্রের তব, তব কবিতার।

অভিমন্যু

তেমন করেন না কি চিত্রের তোমার?

উত্তরা

লুকাইয়া একখানি একেছিনু ছবি আমি,
দাইমা পোড়ারমুখী দেখি অকস্মাৎ
লইয়া ছুটিল, আমি ছুটিনু পশ্চাৎ।
বলে—"ভদ্রা, দেখ! দেখ! আনিয়াছি ছবি এক,
শাশুড়ীর চুরি বিদ্যা শিখিয়াছে বউ।
ওমা! এ ছুঁড়ির পেটে এত বিদ্যা! হুঁ?"
মা বাবা হাসিয়া কত প্রশংসা করিল শত;—
মায়ের অঞ্চলে আমি লুকায়ে লজ্জায়।
কহিলেন মাতা যেন গলিয়া মায়ায়,—
"কহিবি অভিরে, দিদি! আমার অঞ্চল-নিধি
রাখে যেন তারে পার্শ্বে আঁকি এই পটে?"
তখন সে পোড়ামুখী কহে হাসি,—"বটে!
আমি তবে দিব আঁকি, অভির এ অঙ্ক ঢাকি,
ক্ষুদ্রতম অভি, মম অঞ্চলের ধন;
ফুটাব চন্দ্রের কোলে নক্ষত্র রতন!"
কহে বাবা উচ্চ হাসি— "আমি তবে দিব আসি
একটি উত্তরা ক্ষুদ্র আঁকি পাশে তার।"

সুলী কহে—"বরকন্যা তোমার আমার ?"
মা কহিল হাসি—"তবে দ্বিতীয় গোগৃহ হবে
বুঝিতে তোমার পুনঃ, মনের মতন
যোগাইতে পুতুলের বসন ভূষণ।"
সুলীমার মুখে ছাই, হাসি কহে—"তাই, তাই,
সুলোচনা হবে তবে সৈরিন্ধ্রী আবার
বিরাট,—কীচক, ভীম,—ঝণ্টিকা আমার।"
চাহি ফুল্ল চন্দ্র পানে নীরব উভয় !
হইতেছে চন্দ্রে যেন সেই অভিনয় !
সেই জ্যোৎস্নার উৎসে জনক জননী,
পিতা নীলপ্রভ, মাতা জ্যোৎস্না বরণী—
দেখিছেন ছবি বসি আনন্দে অধীর,
দাঁড়াইয়া সুলোচনা বদন গম্ভীর।
চাহি সেই দৃশ্য পানে আঁখি ছল ছল,
লজ্জায় কুঞ্চিত নেত্র, ভক্তিতে সজল।

অভিমন্যু

ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী আমাদের মত
আছে কি জগতে আর ?
না জানি, উত্তরে ! আহা জন্ম জন্মান্তর
করিয়াছি কত পুণ্য, অক্ষয় অতুল,
ভদ্রার্জুন মাতা পিতা, গোবিন্দ মাতুল।

উত্তরা

এই পোড়া যুদ্ধ নাথ ! কত দিনে আর
ফুরাইবে, জুড়াইবে অখিল সংসার ?
ইচ্ছা করে রাজ্য আশা দিয়া জলাঞ্জলি,
যাই কোন মনোহর অরণ্যেতে চলি।
মানুষে মানুষে যথা হিংসা নাহি করে,
কাঁদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে।
নির্মাইয়া তথা পুষ্প-কুটীর সুন্দর
জনকজননীপদ সেবি নিরন্তর।
কানন কপোত বন কপোতিনী মত,
মুখে মুখে, বুকে বুকে, থাকি অবিরত।

অভিমন্যু

সুলীমা রবে না সঙ্গে ?

উত্তরা

নিব না তাহায় ;
পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায়।
না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া,
না পারে থাকিতে এক তিন না দেখিয়া !
মুহূর্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া,
বৎসহারা গাভী মত মরে গরজিয়া।
আমিও যে পারিব না, কি যে সর্বনাশী,
এত দেয় গালি তবু কত ভালবাসি।
সুলীমাও যাবে সঙ্গে ; তা হইলে আর,
রহিবে না কোন দুঃখ তব উত্তরার।
কিন্তু—

অভিমন্যু

কিন্তু কি লো ?

উত্তরা

কিন্তু, পুত্র ত আমার
হবে রাজা ?
উচ্চ হাসি হাসিলা কুমার।

উত্তরা

পুতুল লইয়া খেলা করিতাম যবে
পিত্রালয়ে, প্রাণনাথ ! নাহি বুঝি হবে
এমন সুখের দিন !
সখীদের পুত্রগণ মন্ত্রী কর্মচারী !
হইত আমার পুত্র রাজা ছত্রধারী !
সে উত্তর গোগৃহের ভূষণে নির্মিত
পুত্র পুত্রবধূ মম আছে সুরক্ষিত।
বাবা মা বড়ই ভালবাসেন দুটিরে ;
হাসিয়া কহেন হরি—"নাতি নাতিনীরে
—কৌরবের ভূষণেতে নির্মিত, ভূষিত,—
কৌরবের সিংহাসনে করিব স্থাপিত।"
অপূর্ব পুতুল দুটি কুরু সিংহাসনে
যার তার এই মহা কুরুক্ষেত্র রণ !—
উচ্চ-হাসি অভিমন্যু হাসিলা আবার।
উত্তরাও উচ্চহাসি হাসিল এবার !

অভিমন্যু

কি সুখের ছবি আহা ! আঁকিলি, উত্তরে !
সেই বনবাসে।
যায় তিন বর্ষ প্রায় এক দিন মৃগয়ায়
গিয়াছি মলয়াচলে কৈশোর উল্লাসে।
উল্লাসে উন্মত্ত প্রাণ ; কি বিদ্যুৎ খরশান
বহে মৃগয়ার প্রিয়ে শিরায় শিরায় ;
ছাড়াইয়া রক্ষিগণে, পশিনু নিবিড় বনে,
অনুসরি মহা ব্যাঘ্র ভীম চিত্রকায় !
করি ঘোর গরজন কাঁপাইয়া সর্ব বন,
কানন-আতঙ্ক ব্যাঘ্র ত্যজিল জীবন ;
দেখিনু মস্তকোপরি প্রচণ্ড তপন।

ক্লান্ত প্রাণ পিপাসায়, হারায়েছি পথ তায়,
দেখিনু তখন
কি অপূর্ব পুণ্যাশ্রম! কিবা শান্তি-নিকেতন!
মরুভূমে চারু-মৃগ-তৃষ্ণিকা সৃজন!
কি সুন্দর সরোবর! কিবা বন মনোহর!
চারি ধারে বনে কিবা কুটীর সুন্দর,—
লতা পুষ্পে সুসজ্জিত চিত্র মুগ্ধকর!
সে কুটীরে মুগ্ধকর মাতৃ-মূর্তি মনোহর
জোছনা-প্রদীপ্ত-নীল-আকাশ-নির্মিত,
কিবা স্নেহ, কিবা শান্তি, কিবা সুধা মণ্ডিত
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত, বেদি বক্ষে সুস্থাপিত
পিতার মৃন্ময় মূর্তি সুচারু-নির্মাণ,
মনোহর মৃগয়ার বেশে শোভমান।
পুলকে ভরিল বুক, গাহিতেছে সারীশুক
জনকের দশ নাম বিহঙ্গ নিচয়;
স্থানে স্থানে পিঞ্জরায়, বন বিহঙ্গেরা গায়
বৃক্ষে বৃক্ষে শুনি সেই নাম পুণ্যালয়;
নামের সঙ্গীতে বন প্রতিধ্বনিময়!
মুক্তকেশী উদাসিনী জননী-বনবাসিনী
সেই দশানন প্রিয়ে! গাহিলে আদরে,
শশক, ময়ুর, মৃগ, কুক্কুট সুস্বরে
প্লাবিত করিয়া বন, কলকণ্ঠে হংসগণ,
আসি পালে পালে সেই বন মাতা পাশে,
নাচিতে লাগিল কিবা কানন উল্লাসে!
আনন্দে ভরিল প্রাণ, ছুটিয়া করি প্রণাম
জননীর পদাম্বুজে, কহিনু—"যাহার
এ অপূর্ব পূজা, আমি কুমার তাঁহার!
কে তুমি মা? কহ, বড় কুতুহল মনে!
কেন পূজ জনকেরে এ নিবিড় বনে?"
কি মধুর স্নেহ-হাসি ফুটিল সে মুখে!
কি মধুর স্নেহ-স্রোত উছলিল বুকে!
কি মধুর স্নেহ-স্বরে কহিলা—"বাছা রে!
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে।
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের অবয়ব,
অর্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?
ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য ধরার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?
পার্থ উপাসিকা আমি। কেন পূজি তারে?—
কেন পূজে বৎস! নয় ওই সবিতারে?
ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বীর্য,—কে না পূজে বল?
করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতল।
জগতে দেবত্ব ধর্ম-ভক্তি প্রস্রবণ;
হিমাচলে সিন্ধু গঙ্গা লভেন জনম।
মম ভক্তি-হিমাচল জনক তোমার।
সেই ভক্তিবলে,
পাইনু তোমায় আজি এই বনস্থলে।
এস বৎস! এস বুকে! তপস্যা আমার
হইল সফল বুঝি,"—
সরিল না আর
কথা জননীর মুখে, লইয়া আমার বুকে,
চুম্বিলা মা কতই চুম্বন!
কতই আনন্দ-অশ্রু করিলা বর্ষণ!
কোন রুদ্ধ প্রস্রবণ হ'য়ে অবারিত,
আমায় করিল যেন স্নেহেতে প্লাবিত।
কি সুখে কাটিল দিন, সন্ধ্যা আগমনে
কাকলি কল্লোল কিবা উঠিল কাননে।
সেই কাকলির সনে কণ্ঠ মিলাইয়া
বনপুত্র পুত্রীগণ গাহিয়া গাহিয়া
আসিতে লাগিল; বন হইতে পূরিত
হাম্বারবে শঙ্খনিভ, বাঁশীর সহিত।
আসি দ্বারে জননীর গাভী 'পুণ্যবতী'
"মা মা" বলি ডাকি, চাহি জননীর প্রতি
সস্নেহ নয়নে স্থির সন্ধ্যার আঁধারে
শ্বেত কাদম্বিনী যেন শোভিল দুয়ারে।
"মা মা" বলি স্নেহে মাতা করিল দোহন,
করিল কি শ্বেতামৃত অজস্র বর্ষণ!
নেচে নেচে বনপুত্র, বনবালাগণ,
কত খাদ্য জননীকে করিল অর্পণ।
তাহাদের "মা মা" কণ্ঠ, স্নেহ সম্ভাষণ;
জননীর স্নেহভাষা, আদর, চুম্বন;
কেহ করে, কেহ কক্ষে, কেহ বা অঞ্চলে
ধরিয়া মায়ের, কেহ জড়াইয়া গলে,
কেহ জড়াইয়া বাহু, কেহ জানু আর,
কহিতেছে গোচারণ কত সমাচার!
বনপুষ্প সম বনপুত্র কন্যাগণ;
পুষ্পিতা বল্লরী মাতৃ শোভা নিরুপম
জননীর; সেই বন স্নেহের কানন—
কি স্বর্গ খুলিল শিশু-হৃদয়ে প্রথম!

কহিল জননী তবে—"দেখ বাছাগণ!
আসিয়াছে মম রাজ-পুত্র একজন।
থামিল সে কোলাহল, বিস্ময়ে সকল
চাহিল আমার পানে নেত্র অচঞ্চল।
চাহিয়া চাহিয়া মম বসন ভূষণ
কহিল সঙ্কোচে "মা গো! বনপুত্রসনে
খেলিবে কি রাজপুত্র, যাবে গোচারণে?"
মাতা মাতুলের সেই শিক্ষা প্রীতিময়
তখন আমার মনে হইল উদয়;—
"সকল পুরুষ পিতা, রমণী জননী,
সকলের পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ও ভগিনী।
দেখিব সকল জীব আপনার মত,
পরহিত প্রাণপণে সাধিব সতত।"
"খেলিব, যাইব"—আমি কহিনু উল্লাসে।
পূরিল প্রাঙ্গণ কিবা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে!
আকাশে উঠিল চন্দ্র, চারু জ্যোৎস্নায়
খেলিলাম কত খেলা আলোক ছায়ায়।
খাইলাম কত কিছু মিলি সবে সুখে,
পড়িলাম ঘুমাইয়া জননীর বুকে!
প্রভাতে বালকগণ খুঁজিয়া কানন,
আনিল সঙ্গীর তত্ত্ব। সজল নয়ন
বিদায় দিলেন মাতা। সজল নয়ন
গলা জড়াইয়া সেই ভ্রাতা ভগ্নীগণ
কহিল—"আবার ভাই আসিবে কি বনে?
আমরা তোমাকে ছাড়ি থাকিব কেমনে?
সাজাইয়া বনফুলে পল্লব-মালায়,
আমাদের রাজা ভাই! করিব তোমায়।"
কাঁদিয়া কহিলা মাতা—"বন-জননীরে
পড়িবে কি মনে বাছা! আসিবি কি ফিরে?"
বড় কাঁদিলাম স্নেহ-বুকে জননীর;
কাঁদিলাম গলা ধরি ভাই ভগিনীর।
পথে পথে কত ফল, তুলি কত ফুল,
দিল তারা! সে যে স্নেহ জগতে অতুল!
জিজ্ঞাসে বিরাট বালা সজল নয়না—
"বনবাসিনীর সেই চারু-উপাসনা
জানেন কি পিতা মাতা?" সজল নয়নে
উত্তরিলা অভিমন্যু—"নাহি লয় মনে।
বিদায়ের কালে কোলে লইয়া আমারে
স্নেহ শোকোচ্ছ্বাসে মাতা কহিল—'বাছা রে!
জনকজননী কাছে বন-বাসিনীর
কহিও না, কোন কথা; এই তাপসীর,
কহিলে, তপস্যাব্রত হইবে বিফল।
যথাকালে তাঁহাদের চরণকমল
দেখিয়া সে চরিতার্থ করিবে জীবন,
তদবধি এ তপস্যা রহিবে গোপন।
ক্ষুদ্র সূর্যমুখী কোথা পূজে সবিতারে,
কি কায জানিয়া তাঁর, জানাইয়া তাঁরে।'"

উত্তরা

গিয়াছিলে সেই বনে আর কি কখন?
কি পবিত্র, কি সুন্দর স্থান, সেই বন!

অভিমন্যু

অধ্যয়ন অবসরে, অবসন্ন মন,
কতবার সেই বনে করেছি গমন!
সেই ক্ষুদ্র স্নেহে-স্বর্গে বনমাতাবুকে,
কাটায়েছি কত দিন, কত নিশি, সুখে।
সঙ্গী সঙ্গিনীর সঙ্গে কত দিবানিশি রঙ্গে
কাটায়েছি সেই বনে ক্রীড়া মৃগয়ায়!
কত গীত, কত নৃত্য, কানন ছায়ায়!
কভু বন-সরোবরে, নীল সুধাময়,
দিতাম সাঁতার; কত নীল কুবলয়,
—বন-বালকের বন-বালিকা বদন,—
ভাসিত সে নীল জলে, হংস হংসীগণ
সাঁতারিত, উচ্চ হাসি ছিন্ন গীত তানে
মিশাইয়া কলকণ্ঠে উল্লসিত প্রাণে।
হংসিনীর মত ক্ষুদ্র তরণী সকল
সাজাইয়া পত্র পুষ্পে, পতাকা উজ্জ্বল
উড়াইয়া, পত্রে পুষ্পে সাজিয়া আমরা,
করিতাম জলক্রীড়া। তরী মনোহরা
সঙ্গীতের তালে নাচিত হিল্লোলে,
নাচিত সরলাগণ গাহিয়া কল্লোলে।
সাজাইত পত্রে পুষ্পে আমাকে কখন
বনরাজা; চারু বনবালা এক জন
সাজাইত বনরাণী; পরিষদ্ চয়
সাজি সব করাইত রাজা অভিনয়।
পুষ্প বেদিকায়, কিবা পুষ্পিত শাখায়,
সিংহাসনে দেখি রাজরাণী পুষ্পকায়,
কত হাসিতেন মাতা, চুম্বিতেন কত!
কহিতেন—"বউ ত হয়েছে মনোমত?"
সত্য, ভাবিতাম আমি সে আমার রাণী;
সত্য সে ভাবিত মনে আমি তার স্বামী।

লইয়া দুটিকে মাতা কতই কৌতুক
করিতেন, হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ।
"সতিনী! সতিনী!"—বলি উঠিল হাসিয়া
উত্তরা—"আমার সেই পুতুলের বিয়া!
থাক্ এই পোড়া যুদ্ধ, রাজ্যের পিপাসা!
প্রাণনাথ! উত্তরার পুরাও এ আশা,—
চল সেই বনে নাথ! চল একবার
সেইমত বনরাণী সাজিব তোমার!
বসি সে মায়ের কোলে আনন্দে বিহ্বল,
সেই সতিনীর সঙ্গে করিব কোন্দল।"

অভিমন্যু

আমারো এ সাধ প্রিয়ে! লইয়া তোমায়
রণান্তে যাইব সেই বনে দুজনায়।
কি আনন্দ-অশ্রু মাতা করিবে বর্ষণ!
কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে কানন!
বড় সাধ মনে প্রিয়ে! রণান্তে সে বনে
সুন্দর আশ্রম এক সৃজিব দুজনে।
দেখিয়াছি সিন্ধুতীরে শৈল মনোহর।
নির্মাইব সেই শৈলে আবাস সুন্দর।
অর্ধচন্দ্র, অষ্ট কোণ, চতুষ্কোণ আর,
শোভিবে অলিন্দ চারু চারিধারে তার!
শোভিবে অলিন্দে পুষ্প গুল্ম থরে থর,
চারুপত্র গুল্ম সহ মিশিয়া সুন্দর!
সুরঞ্জিত স্তম্ভ সারি বেষ্টি সুবিমল
শোভিবে পুষ্পিত চারু লতিকা সকল।
বিচিত্র বিহঙ্গগণ স্তম্ভ অবসরে
নাচিবে গাহিবে সুখে সুচিত্র পিঞ্জরে।
কুটীরের চারিদিকে চারি পুষ্পোদ্যান
চারি ভিন্ন অবয়বে হবে শোভমান।
শোভিবে উদ্যান-বক্ষ শ্যামল প্রাঙ্গণ,
কারুকার্য-অলঙ্কৃত গালিচা যেমন।
প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে চম্পক, বকুল,
সুবাসিত পুষ্প বৃক্ষ শোভিবে অতুল।
শোভিবে পর্বত পার্শ্বে, মূলে, মনোহর
ফলিত, পুষ্পিত, ক্ষুদ্র কানন সুন্দর।
বনে নির্ঝরিণী এক গাবে অবিরত
নিরজনে অন্তঃপুরে উত্তরার মত!
বেষ্টি গিরিমূল এক তড়াগে নির্মল
ঢালিবেক নির্ঝরিণী সুধা সুশীতল,
অভিমন্যু-হৃদয়েতে ঢালে সেই মত
উত্তরা শীতল প্রেম-অমৃত সতত।
নীলাম্বুতে ঢল ঢল সেই সরোবরে
সুবর্ণ রজত মীন সুখে রবিকরে
খেলিবেক শত শত; ভাসিবে সতত
মন্থরে মরাল-বধূ, উত্তরার মত,
স্বনাথ মরাল সহ। নানা জলচর
নানা বর্ণ জলক্রীড়া করিবে সুন্দর।
কুরঙ্গ শশক শিখী প্রসারি পেখম
বেড়াবে প্রাঙ্গণে, বনে; কুক্কুট কূজন
উঠিবে পঞ্চমে কিবা রহিয়া রহিয়া!
ক্রীড়াশীলা কুরঙ্গিণী যাইবে ছুটিয়া,
বিলোল কটাক্ষময়ী, বিদ্যুৎ আকার,
ছুটে যথা ক্রীড়াশীলা উত্তরা আমার।
বনে রাখালের বাঁশী, কণ্ঠ সুপঞ্চম,
করিবে সে নিরজনে কি সুধা বর্ষণ!
ডাকবেক গাভীগণ রহিয়া রহিয়া,
গভীর সে কম্বুকণ্ঠে কানন ভরিয়া!
কুটীরের কক্ষচয় রবে সুসজ্জিত,
মনোহর নানা উপকরণে খচিত।
শোভিবে শয়ন-কক্ষে গোলাপী প্রাচীরে
উত্তরার নানা চিত্র। কোথা মানিনীরে
সাধিতেছে অভিমন্যু কোথায় ছুটিয়া
যাইতেছে ক্রীড়াশীলা ঝলকে হাসিয়া,—
উড়িতেছে মুক্তকেশ তরঙ্গ খেলিয়া;
কোথায় বিখ্যাত সেই পুতুলের বিয়া।
কোথা বীণা করে বসি যেন বীণাপাণি,
কোথায় আমার বুকে রাখিয়া মু'খানি,—
চন্দ্রের হৃদয়ে সুধা,—চাহি পরস্পরে
অনিমেষ অবিশ্রান্ত অতৃপ্ত অন্তরে।
বসিবার কক্ষে নীলআকাশপ্রতিম
প্রাচীরে শোভিবে চিত্র,—ভারত প্রাচীন
ইতিহাস অঙ্কে অঙ্কে রহিবে চিত্রিত,
আর্যদের শৌর্যবীর্য মহিমামণ্ডিত।
কোথায় সরল সেই আর্য পিতৃগণ
রক্ষিছেন মেষপাল; করিয়াছেন রণ
অনার্যের সহ; কোথা বসি নদীতীরে
গাহিছেন সামগান প্রভাতে গম্ভীরে।
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে রহিবে অঙ্কিত,
ধনুর্ভঙ্গ, বনযাত্রা করুণার গীত।
বনবাস—পতি পত্নী প্রেম মনোহর;

সে জীবন্ত ভ্রাতৃভক্তি, চিত্রদ্রবকর ;
সীতার হরণ ; সেই করুণ রোদন
শ্রীরামের, চাপি বক্ষে সীতার ভূষণ ;
অশোক-কানন, শক্তিশেল শোককর ;
রথে রাম সীতা, নিম্নে ফেনিল সাগর ;
নির্বাসিতা সীতাদেবী ভাগীরথী-তীরে,
বাল্মীকির তপোবন ; সীতা জননীর
উপহার সেই বন্দী পবনকুমার ;
রামায়ণ গীত সেই শোক অযোধ্যার ;
শোকসিন্ধু জানকীর পাতালপ্রবেশ,
জগত কাঁদিবে যাহে কাল নির্বিশেষ।
দেবযানী, শকুন্তলা, আখ্যান সুন্দর ;
দময়ন্তী সাবিত্রীর চিত্র মনোহর।
অধ্যয়ন কক্ষে গ্রন্থ রবে চারি ধার,
ভারতের ত্রিকালের জ্ঞানের ভাণ্ডার।
হরিদ্রাভ প্রাচীরেতে রহিবে চিত্রিত,
আর্য ঋষিগণ ব্যাস বাল্মীকি সহিত।
অঙ্কে অঙ্কে কবিতার জন্ম উপাখ্যান
রহিবে অঙ্কিত ;—কোথা ব্যাধের সন্তান
সুপবিত্র রাম নামে হতেছে দীক্ষিত,
কোথায় লভিছে বীণা অমৃত পূরিত,
কোথা করি বিদ্ধ-ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন,
গাহিতেছে "মা নিষাদ" কবিতা প্রথম ;—
করিছে অপ্সরাগণ পুষ্প বরিষণ,
হাসিতেছে বসুন্ধরা, সার্থক জীবন।
রবে উপাসনা কক্ষে মর্মরে স্থাপিত
মাতা পিতা মাতুলের মূর্তি অতুলিত।
নরদেব পিতা মম, মামা নারায়ণ,
প্রেমস্বরূপিণী মাতা পবিত্র বন্ধন
উভয়ের ;—প্রেমে নর পায় নারায়ণ,
নারায়ণ নর-দেহ করেন ধারণ।
বেদীমূলে এক পার্শ্বে মাতা সুলোচনা ;
অন্য পার্শ্বে বনমাতা গৈরিক-বসনা।
অমল মাজিত শ্বেত প্রাচীরে চিত্রিত
রবে কৃষ্ণার্জুন লীলা,—নরের অতীত ;
সেই পুণ্য জন্মাষ্টমী; শিশু জ্যোতির্ময় ;
প্রহরী নিদ্রিত, দ্বার-মুক্ত কারালয় ;
যমুনা লঙ্ঘন সেই নিশীথ সময়ে ;
গোকুলে নন্দের গৃহে শিশু বিনিময় ;
বৃন্দাবনে গোচারণে, বীরত্ব অদ্ভুত ;
রাস দোল গোপবালা সহ গোপসুত ;
সভামধ্যে দুরাচার কংসের নিধন ;
উগ্রসেনে মথুরার রাজত্বে বরণ ;
সিন্ধুতীরে দ্বারাবতী ; মাতা সত্যভামা ;
মাতা রুক্মিণীর সেই কৃষ্ণ আরাধনা,
বানপ্রস্থে পিতামহ পবিত্র দর্শন ;
পিতামহী মাদ্রীর সে চিতা-আরোহণ ;
হস্তিনায় সেই অস্ত্র-পরীক্ষা সুন্দর ;
মাতা দ্রৌপদীর সেই চারু স্বয়ম্বর ;
এক রথে যদুকুল সহ সেই রণ,—
জননীর সে বীরতা, অশ্ব-সঞ্চালন ;
খাণ্ডব দহন, জরাসন্ধের নিধন ;
করুণার দৃশ্য সেই কারা-বিমোচন ;
রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের দলন ;
দ্যূতে পাণ্ডবের ধর্ম-পরীক্ষা ভীষণ,
সেই বনযাত্রা ; শিক্ষাগৃহ উত্তরার ;
উত্তর গোগৃহে রণ, সেই উপহার ;
সর্বশেষ এই মহাকুরুক্ষেত্র রণ,—
কিবা শোভা এক রথে নর নারায়ণ !
চাহি অন্তরের পানে মহিমা মণ্ডিত,
দাঁড়াইয়া দুই বাহু করি প্রসারিত,
জগতের মহাধর্ম-গীতার প্রচার।
সেই বিশ্বরূপ—মহাকাল অবতার !
পবিত্র ত্রিমূর্তি,—মাতা, পিতা, নারায়ণ,—
পূজিব, করিব পদে আত্ম-সমর্পণ
তাঁহাদের পদমূলে, ভক্তিপূর্ণ মন,
করিব দুজনে নিত্য গীতা অধ্যয়ন।
তাঁহাদের সুপবিত্র নাম সুধাময়
গাহিবেক অবিরাম বিহঙ্গ নিচয়
কুটীর করিয়া পূর্ণ ; নর-লীলা গীত
গাহিব আমরা ভক্তিকণ্ঠে পুলকিত।
সেই রাম-মন্ত্রে বন করিব দীক্ষিত,
গাবে বনবসী, বনপশু সুললিত
শুনিবে সে নাম, তীর্থ হইবে কানন,
নর জন্ম, পশু জন্ম হইবে মোচন।
কখন সাজিয়া যোগী, সাজিয়া যোগিনী,
বেড়াইব দেশে দেশে করি নাম ধ্বনি,
গাহিয়া সে লীলা গীত ; করিয়া প্রচার
দ্বাপরের ধর্ম,—গীতা, কৃষ্ণ,—অবতার।
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত দমন

সাধিব, করিব ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপন।
করিব ভূতলে স্বর্গ, নর দেবোপম,—
নারায়ণ! এ স্বপ্ন কি হইবে পূরণ?

উত্তরা

আর সেই যোগী পিতা, যোগিনী মাতার
নিকটে আসিবে পুত্র নৃপতি ধরার,
চতুরঙ্গ দলে বলে, বউটি লইয়া
হবে অভিনীত বনে পুতুলের বিয়া!

জড়ায়ে পতির গলা হাসে উচ্চ হাসি
বিরাট-নন্দিনী; চুম্বি সেই হাসি রাশি
অভিমন্যু উচ্চহাসি উঠিল হাসিয়া;
জ্যোৎস্নায় দুই হাসি গেল মিশাইয়া।

অভিমন্যু

রবিকরে জ্যোৎস্নায় চাহি সিন্ধু শোভা,
চাহি বন-প্রকৃতির শোভা মনোলোভা,
গাঁথিব কবিতা-হার; গাঁথিবে উত্তরা
কাছে বসি ফুলমালা; বীণা সপ্তস্বরা
বাজাইবে, বীণাকণ্ঠে গাহিবে কখন
পুরিয়া সুধায় সেই নির্জন কানন।
সঙ্গীত তরঙ্গে মুগ্ধ কল্পনা আমার
স্বর্গে, মর্ত্যে, অঙ্কে অঙ্কে করিবে বিহার।
বাসন্ত, শারদ, ফুল্ল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত
নীল বন-সরোবরে, তরী মনোহরা
ভাসাইয়া, নিরখিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত
নীলাকাশ—গাব আমি, গাহিবে উত্তরা।

উত্তরা

কি সুখের ছবি আহা! চল নাথ! চল,
এই কল্পনার স্বপ্ন করিগে পূরণ।

অভিমন্যু

পুরাইব; কিন্তু অগ্রে এই রণস্থল;
করিতে হইবে প্রিয়ে! স্বধর্ম পালন।

উত্তরা

স্বধর্ম!

অভিমন্যু

স্বধর্ম! প্রিয়ে! এ সুখ স্বপন
ছিল জীবনের মম আশা অন্যতম।
আজি সন্ধ্যাকালে বসি মায়ের চরণে
বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি জ্ঞানের নয়নে,
অসার স্বপন নহে মানব-জীবন।
মানব-জীবন কর্ম, স্বধর্ম পালন।
ধর্ম-যুদ্ধে প্রিয়তমে! স্বধর্ম আমার,
এই কুরুক্ষেত্র মম ত্রিদিবের দ্বার;
কুরুক্ষেত্রে করি অগ্রে স্বধর্ম পালন,
করি ধর্মরাজ্য এই জগতে স্থাপন,
তবে পুরাইব শান্তি-স্বপ্ন আপনার;
নহে অগ্রে, পরে শান্তি যুদ্ধ ঝটিকার।
কালি হতে ঘোরতর করিব সংগ্রাম,
সঁপি ধর্ম-রাজ্য ব্রতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ।

উত্তরা

না না, নাথ! উত্তরার থাকিতে জীবন,
দিবে না তোমায় যুদ্ধে করিতে গমন।
যতক্ষণ থাক যুদ্ধে, প্রাণেশ আমার!
জান না কি করে প্রাণ তব উত্তরার?
স্বয়ং শ্বশুর যুদ্ধ করিছেন যবে,
কি কায তোমার বল গিয়া সে আহবে?
বালক বালিকা নাথ! আমরা দুজন,
করিব তাঁদের সেবা,—স্বধর্ম পালন।

অভিমন্যু

উত্তরে! উত্তরে! ওই জনক আমার
করিছেন কি ভীষণ যুদ্ধ আনিবার!
কত অস্ত্রাঘাত, ভীম বজ্রাঘাত কত,
সহিছেন অবিচল হিমাদ্রির মত।
তাঁহার তনয় আমি রমণী-অঞ্চল
ধরিয়া রহিব এইরূপে অবিচল?
না, না, প্রিয়ে! কালি আমি প্রবেশিব রণ,
দেখাইব অভিমন্যু অর্জুননন্দন।
বাঁচি যদি, ধর্ম-রাজ্য করিয়া স্থাপন
সেই কল্পনার স্বর্গে কাটিব জীবন।
মরি যদি, মহাযুদ্ধে ত্যজিয়া জীবন
ওই চন্দ্রলোকে প্রিয়ে! করিব গমন।
স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি, গ্রহ তারাগণ
মনে হয় মানবের ভবিষ্য আশ্রম।
পুণ্য অনুসারে ওই গ্রহ তারাগণ
জন্ম জন্মান্তরে নর করে বিচরণ।
পুণ্যময় চন্দ্রালোকে যাইব আমরা,—
পিতা, মাতা, পুত্র, পুণ্য-জ্যোৎস্না উত্তরা।
নারায়ণ পদতলে বসিয়া সকলে,
লভিব অনন্ত-শান্তি অমর মণ্ডলে।
বালিকার ক্ষুদ্র মুখ হইল গম্ভীর,

পড়িল মেঘের ছায়া যেন জ্যোৎস্নায়।
চাহি চন্দ্র পানে, রাখি পতি-বুকে শির,
রহিল নীরবে; নেত্র মুদিল নিদ্রায়।
চাহি চন্দ্রপানে অভিমন্যু কতক্ষণ,
রহিল নীরবে বসি; কতই ভাবনা
হইল উদয় মনে, জাগিল তখন
প্রতিভা সিন্ধুর বক্ষে কতই কল্পনা।
নিদ্রিতা বালিকা স্বপ্নে করিয়া চীৎকার
কহিল,—"না প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি, ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!"
কুমারের দুই চক্ষু হইল সজল।
রহিলা চাহিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—
জ্যোৎস্না-প্লাবিত যেন মুদিত কমল।
ধরি দুই করে পুষ্পনিভ দুই পাণি
চুম্বি প্রেমভরে মুখ রাখি উপাধানে,
জানু পাতি ভূমিতলে বসি ভক্তিভরে,
চন্দ্রিকাপ্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে
চাহিয়া, কহিলা কর-যোড়ে সকাতরে—
"নারায়ণ! এ স্বপ্ন কি তব মনস্কাম?
দিও বালিকায় শান্তি, পদাম্বুজে স্থান।"

দ্বাদশ সর্গ

সুখ-তত্ত্ব

কৃষ্ণ

গুরুদেব! বৃন্দাবনে, নির্জনে গোচারণে,
শুনিতাম কি স্বর্গ-সঙ্গীত!
কি যেন অপ্সরা-কণ্ঠ গাহিত আকাশে নিত্য
মন প্রাণ করিয়া মোহিত।
গাহিত—"অশান্তিপূর্ণ জগতের হাহাকার,
পশে না কি শ্রবণে তোমার?
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্মে কোথাও না পাই শান্তি;
জগত করিছে হাহাকার!
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে রাজ্যে রাজ্যে,—
কিবা ঘাত, কিবা প্রতিঘাত।
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে সমাজেতে,—
কি স্বার্থের ভীষণ সংঘাত!
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, দুই বিদ্যুতাগ্নি পূর্ণ মেঘ
ছুটেছে কি বেগে খরতর
আঘাতিতে পরস্পরে, মত্ত আধিপত্য তরে;—
নিবারিতে বাড়া'বে না কর?
ধর্মেও মোহান্ধ নর কামনার মরীচিকা
নিরন্তর করি অনুসার,
কি দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে নিরন্তর;—
কাঁদে না কি হৃদয় তোমার?
নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম; যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম;
ধর্ম কৃষ্ণ! সর্বভূত-হিত।
তাহার সাধন কর্ম, নারায়ণে কর্ম-ফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।
উত্তীর্ণ কৈশোর তব, হও কর্মে অগ্রসর,
জগত করিছে আবাহন
কাতর করুণ কণ্ঠে; হও অগ্রসর, কর
জগতের দুঃখ বিমোচন।"
নীরবিলা বাসুদেব! নীরব শিবির।
নীরবে মহর্ষি ব্যাস বসি অধোমুখে
চিন্তামগ্ন, চিত্রবৎ। নীরব নিশীথ।
নীরবে জ্বলিছে ধীরে সুবাস প্রদীপ।
নীরবে কেশব ধীরে আনত বদনে
ভ্রমিছেন। শোভিতেছে পবিত্র গৈরিক
পরিধানে, অংসোপরে উত্তরীয় মত।
নাহি অস্ত্র-চিহ্নমাত্র কৃষ্ণের শিবিরে!
শোভিতেছে এক দিকে বসন ভূষণ
সারথির, অন্য দিকে গ্রন্থ অগণন।

কৃষ্ণ

অধ্যয়ন অস্ত্রশিক্ষা অবসরে এইরূপে
শুনিতাম করুণ সঙ্গীত!
কে গায়, কোথায় গায়, এইরূপে কিশোরের
ক্ষুদ্রপ্রাণ করি আকুলিত?
কে গায়? কেমনে হায়! করিবে রাখালশিশু
জগতের দুঃখ বিমোচন?
কেমনে পতঙ্গ ক্ষুদ্র বেদরূপী হিমাচল
করিবেক করে উত্তোলন?
বেদভারে প্রপীড়িত, যজ্ঞধূমে মেঘাচ্ছন্ন,
উষ্ণ জীব-শোণিতে প্লাবিত,
প্রদীপ্ত কামনানলে ভারতে করিবে হায়!
এই মহাধর্ম প্রচারিত?
যে দিন মহর্ষি গর্গ সেই নিয়তির রেখা
আঁকিলেন অদৃষ্ট গগনে,*
সে দিন হইতে নিত্য এই নিয়তির গীত
শুনিতাম, ভাবিতাম মনে!
কখনো বৈরাগ্য ঘোর ভাসিয়া উঠিত প্রাণে;
ভাবিতাম ত্যজিয়ে সংসার
সন্ন্যাস গ্রহণ করি করিব নির্বাণ দুঃখ,
নব ধর্ম করিয়া প্রচার।
কিন্তু দেখিলাম ঊর্ধ্বে, দেখিলাম চারিদিকে,
কি জগত অনন্ত বিস্তার!
সুখ সৌন্দর্যেতে ভরা, কর্মের সঙ্গীতে পূর্ণ,
কি উচ্চ অচিন্ত্য লয় তার।
গগনেতে গ্রহ তারা, ধরাতলে গিরি, গুল্ম,
তরু, তৃণ, নদী, পারাবার;

---

* রৈবতকের সপ্তম সর্গ

যেখানে যাহার সৃষ্টি, সেইখানে কর্ম তার,
সেই কর্ম নিয়তি তাহার!
কেবল মানব সৃষ্টি ভ্রম কি হে বিধাতার?
জন্মক্ষেত্রে নাহি কর্ম তার?
এ সংসার, এই গৃহ, পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র,—
সকলি কি ভ্রম বিধাতার?
হৃদয়ের উচ্চতম পবিত্র প্রবৃত্তিচয়
দৃঢ় করে করিয়া ছেদন,
জন্মভূমি জন্মগৃহ ত্যজিয়া যাইব বনে,—
এই তব ইচ্ছা, নারায়ণ?
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, একটি মানব, হায়!
যদি ভাল নাহি বাসিলাম,
অনন্ত মানব জাতি কেমনে বাসিব ভাল,
অনন্ত অচিন্ত্য ভগবান্?
আপনার জন্মভূমি, জননীর স্নেহ ক্রোড়,
রঙ্গভূমি কৈশোর ক্রীড়ার,
নাহি ভাল বাসি বিশ্ব কেমনে বাসিব ভাল,
অচিন্ত্য অতীত কল্পনার?
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গর্ভে জনমিয়া ভাগীরথী
পায় তবে সাগর সঙ্গম।
অঙ্কুর হইতে ক্ষুদ্র জনমিয়া মহীরুহ
করে তবে আচ্ছন্ন কানন।
গৃহ ছাড়ি গেলে বনে, মনের কামনা শত
অনায়াসে হয় কি বিলীন?
বিশাল কণ্টক তরু করিলে কি স্থানান্তর
হয় তাহা কণ্টকবিহীন?
সংসারের প্রলোভন কামনা করে সৃজন,
করিয়া ইন্দ্রিয় বিমোহিত!
প্রবেশি নির্জন বনে ইন্দ্রিয় করিলে ধ্বংস,
কামাগ্নি কি হবে নির্বাপিত?
অন্ধের কি দর্শনের, বধিরের শ্রবণের
নাহি থাকে কামনা প্রবল?
চক্ষু হীন, কর্ণ হীন, হলে কি মানবজাতি
পরমার্থ লভিত কেবল?
হরি! হরি! মানবের ধারণের,—ধরমের,—
এই পথ নহে কদাচিত।
ধ্বংসের ও অধর্মের এই পথ ঘোরতর,—
দেখি প্রাণ হইল ব্যথিত।
ইন্দ্রিয়, কামনা, ধ্বংস করি যদি, মানবের
মানবত্ব কিসে থাকে আর?

পাদপের পাদপত্ব থাকে কিসে, ফল পুষ্প,
শাখা, পত্র, করিলে সংহার?
শরীর, ইন্দ্রিয়চয়, মানবের অদ্বিতীয়
সুখের ও শিক্ষার সোপান।
কামনা ইন্দ্রিয়-জাত মানবের সুখ পথে
অদ্বিতীয় কর্মের নিদান।
স্রষ্টা কি কামনা-হীন? চেয়ে দেখ মহাসৃষ্টি!
বিশ্ব-সুখ-কামনা তাঁহার
ঘোষিতেছে মহাবিশ্ব, অনন্ত প্লাবিয়া কণ্ঠে;—
এ কামনা অশ্রান্ত অপার।
এ কামনা সিন্ধু-গর্ভে, কামনা-জাহ্নবী নর
শত মুখে করিয়া বিলীন,
করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র আত্ম-সুখ
জগতের সুখের অধীন,
উন্মেষিয়া আত্ম-শক্তি, জগতের সুখ পথে
যত নর হবে অগ্রসর,
আপন সুখের তার সিন্ধুমুখী নদ মত
ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর।
কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,—
একমাত্র ধর্ম সনাতন
মানবের গৃহে, বনে, ধর্মক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর,—
বন নহে,—গৃহের প্রাঙ্গণ।
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ, এই ধর্ম-পথে
কিবা অবলম্বন সুন্দর!
তাহে ভর করি উঠি দেখে সুখ-স্বর্গ নর,
নারায়ণ সুখের সাগর।
চলিলাম গৃহে, প্রভু! মানবের ধর্ম-ক্ষেত্র
করি গৃহ অভ্যন্তরে বাস,
কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,
বুঝিলাম প্রকৃত সন্ন্যাস।
চলিলাম গৃহে, প্রভু! গৃহে এই মহাবিশ্ব,
বিশ্ববাসী মহাপরিবার!
এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত অনন্ত বিশ্ব;
এক প্রাণ অনন্ত আধার।
এক মহা পিপাসায় আকুল অনন্ত বিশ্ব;
সুখ সেই পিপাসার ধন।
কামনার পুষ্পে পুষ্পে মত্ত মধুকর মত
করে নর সুখ অন্বেষণ।
জল-সিন্ধু সুখ যাহা, জল-বিন্দু সুখ তাহা,
নাহি সুখ দ্বিতীয় তাহার,—

এই মহা সুখ-তত্ত্ব না জানিয়া দুঃখপূর্ণ
জগত করিছে হাহাকার।
যে অনন্ত নীতিচক্র মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ, বর্ধন,
তাহাই মানবধর্ম ; তাহার শিক্ষক—শাস্ত্র,
কর্ম-ধর্ম-শিক্ষা ও পালন।
এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনন্ত সিন্ধু-মুখে !
সিন্ধু,—চিদানন্দ নারায়ণ।
অনন্ত এ মনুষ্যত্ব, অনন্ত মানবসুখ,
মোক্ষ সেই সাগর-সঙ্গম।
চলিলাম গৃহে প্রভু ! এই মহা সুখ-তত্ত্ব,—
নব ধর্ম,—করিয়া প্রচার,
দেখাইয়া ক্ষুদ্রাদর্শ, ঘোর দুখার্ণব হ'তে
এ জগত করিতে উদ্ধার।
কিন্তু কি দুরূহ ব্রত ! জানি নাহি কুরুক্ষেত্র
কর্মক্ষেত্র হইবে আমার।
মানবের মুক্তিপথে এই দাবানল ঘোর !—
নারায়ণ কি লীলা তোমার !

ব্যাস

বাসুদেব ! বজ্রাঘাত, ঝটিকা ভীষণ,
মহাসংহারক মূর্তি ঘোর দাবানল,
প্লাবন ভীষণ, নিত্য করি দরশন
জগতের সাধিছে কি অচিন্ত্য মঙ্গল।
এই মহা বজ্রাঘাত, ঝটিকা তুমুল,
করিবে ভারতাকাশ পবিত্র নির্মল।
কু-বৃক্ষ কণ্টক বন দহিয়া আমূল,
উর্বর সুবৃক্ষ-ক্ষেত্র করিবে অনল।
এ প্লাবনে প্রসারিয়া পবিত্র পল্বল,
সঞ্চারিবে নব শক্তি, নব ধর্ম বল।

কৃষ্ণ

"মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত,"—
মহর্ষির মহাবাক্য অব্যর্থ, অমর।
মানব খদ্যোত ক্ষুদ্র অনন্ত তিমিরে
অদৃষ্টের করে ক্রীড়া করে হাস্যকর !
কোথায় অনন্ত শান্তি করিব স্থাপন,
কোথায় ঘটিল এই অনন্ত সমর !
কোথায় হাসিবে শূন্যে শান্তি সুধাকর,
কোথায় ঝটিকা এই বহে ভয়ঙ্কর !
কোথায় করিব ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
কোথায় এ অধর্মের বিপ্লব ভীষণ !

দেখিলে কণ্টক এক চরণে কাহার,
কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে !
একাদশ দিন এই হত্যা, হাহাকার,
সহিতেছি হায় ! আমি অম্লান বদনে,—
আমি যেন অবিদীর্ণ আগ্নেয় ভূধর,—
সৌম্য মূর্তি, বহ্নি হৃদে কি গৈরিক ঝড় !

ব্যাস

অনন্ত মঙ্গলময়, অনন্ত করুণালয়,
অনন্ত জ্ঞানের পারাবার,
বৎস ! যেই নারায়ণ, তাঁহার সৃষ্টিতে নিত্য
কত হত্যা, কত হাহাকার !
তথাপি তাঁহার মুখ, কি প্রসন্ন প্রীতিময়,
কি অনন্ত প্রেমের দর্পণ
আপনি দেখিছ তুমি ; কে দেখিতে পায় আর
এ জগতে তোমার মতন ?
ভবিষ্যৎ কণ্ঠ, প্লাবি বর্তমান হাহাকার,
করিতেছ আপনি শ্রবণ ;
দেখিতেছ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পৃষ্ঠদেশে
কত অক্ষৌহিণী অগণন।
গলদশ্রু দুনয়ন কহিলেন নারায়ণ—
"দেখিতেছি সেই মুখ কৃপায় তোমার !
বসি অর্জুনের রথে কুরুক্ষেত্রে, গুরুদেব !
সেই মুখ বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কিছু নাহি শুনি আর বিনা ভবিষ্যৎ-কণ্ঠ ;
অনন্ত নরের সেই গীত করুণার
কহিতেছে—"দয়াময় ! দেখ দুঃখময় ধরা ;
ধরার এ দুঃখ-ভার করিয়া মোচন,
কর কৃষ্ণ ! আমাদের উদ্ধার সাধন।"
কি করুণ হাহাকার !" - কাঁদিয়া কহিল হরি,
কাঁদিলেন নিজে দ্বৈপায়ন,—
"জগতের এই দুঃখ !—বিদরে হৃদয়, নাথ !
হইল না, হবে না মোচন।"

ব্যাস

হতেছে, হইবে; কৃষ্ণ আবির্ভূত; দ্বাপর হতেছে শেষ
নব অবতার, নব যুগ ধর্ম, করিতেছে পরবেশ !
সাধুদের ত্রাণ, দুষ্কৃত দমন, অধর্ম হতেছে ক্ষয়
এই কুরুক্ষেত্রে ; ধর্মের সাম্রাজ্য হইতেছে সমুদয়।
এই নরমেধ করি সমাপন, সাম্রাজ্য করি স্থাপন,
অর্জুন-সারথ্য ত্যজিয়া জগৎ-সারথ্য কর গ্রহণ।

কৃষ্ণ

হরি! হরি! কে জানিত ভীষ্ম দ্রোণ হায়!
হয়ে ঘোর অধর্মের সারথি এমন
এইরূপ নরমেধ করি সংঘটন,
মানব-শোণিত-স্রোতে ভাসাবে ধরায়!
ভীষ্মের ভীষণ দশ দিবসের রণ,—
মৃত্যুর ভীষণ ক্রীড়া,—করিলে স্মরণ,
হৃদয় বিদরে শোকে; আবার এখন
করিছেন দ্রোণাচার্য কি রণ ভীষণ!
রথী ধনঞ্জয়, আমি সারথি তাহার,—
ভেবেছিনু দুই দিনে এই বজ্রানল
নিবিবে; ভস্মিয়া মহা মহীরুহচয়
বিপক্ষের, রক্ষা পাবে তৃণ গুল্মদল।
কিন্তু জানি নাহি হয়। অর্জুন-হৃদয়ে
কি করুণা পারাবার! বাড়বাগ্নি মত
যদিও ক্ষত্রিয় ধর্ম জলে নিরন্তর,
তথাপি পার্থের কর করুণায় শ্লথ।
রূপে নব জলধর, বীরত্বেও হায়!
নব জলধর পার্থ! জীমূত-গর্জন
গাণ্ডীব-টঙ্কার, বজ্র সায়ক নিচয়;
করুণা-সলিলে সিক্ত শর, শরাসন।
নয়নে অনল, হৃদে জল সুশীতল;
বাহুতে অজেয় বল, হৃদয় দুর্বল।
যদি কোনো ঘটনার ভীষণ আঘাত
নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ কঠিন,
এইরূপে দ্রোণাচার্য মৃত্যু-অভিনয়
বিভীষণ, করিবেক আরো কত দিন!
গুরুভক্ত ধনঞ্জয় করুণ-হৃদয়,
করে গুরুসহ মাত্র রণ অভিনয়।

ব্যাস

প্রচণ্ড ঝটিকা, কৃষ্ণ! প্রচণ্ড অনল,
হয় আশু নির্বাপিত,—নীতি নিয়ন্তার।
এই মহা যুদ্ধানল,
ভস্মিয়া অধর্ম বল,
নিবিবে অচিরে; নব ধর্ম-সুধাকর
উদিবে শীতল, শান্তি পাবে চরাচর।

কৃষ্ণ

নাহি অন্য মেঘ-ছায়া সম্মুখে কি আর?

ব্যাস

আছে—আছে মেঘমালা দুর্বাসাপ্রমুখ।
এই দীর্ঘকাল আমি
বেড়াইয়া স্থানে স্থানে
দেখিয়াছি এই মেঘ হতেছে সঞ্চার
ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে লভিছে বিস্তার।
উড়াইয়া তৃণচয়,
বায়ু কোন দিকে বয়,
চেয়েছি বুঝিতে, আমি বুঝেছি নিশ্চয়
এই শরতের মেঘ রহিবার নয়।
জগতের শীর্ষস্থল
ব্যাপি যেই হিমাচল—
অনন্ত গগনস্পর্শী—উঠিছে ভাসিয়া,
যে পুণ্য উত্তরানিল উঠিছে জাগিয়া,
পবিত্র নিঃশ্বাসে তার
সুশীতল পুণ্যাসার
তাপিত মানব প্রাণে করি বরিষণ,
ল'বে উড়াইয়া মেঘ, রবে কতক্ষণ?

কৃষ্ণ

নারায়ণ!
অর্জুন তোমার চক্র, শঙ্খ দ্বৈপায়ন।
তব ধর্ম মন্দিরের
ধনঞ্জয় ভুজবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন;
বিশ্বকর্মা দ্বৈপায়ন
করিবেন জ্ঞানবলে
এই পরিখায় তব মন্দির সৃজন।
মহর্ষির কম্বু কণ্ঠ
প্লাবিয়া অনন্ত কাল,
অনন্ত মানব যাত্রী করি আবাহন
ত্রিপথে, দেখাবে এই শান্তি নিকেতন।
অর্জুনের কুরুক্ষেত্র
হইতেছে অন্তর্হিত;
মহর্ষির কর্মক্ষেত্র, অনন্ত বিস্তার,
হইতেছে প্রসারিত;
দুষ্কৃত দমন ব্রত
অর্জুনের মহর্ষির সুকৃত উদ্ধার।
তাঁহার গাণ্ডীব,—জ্ঞান; অস্ত্র,—তত্ত্বরাশি;
অক্ষয় কবচ,—গীতা, নিত্য অবিনাশী।
সসৈন্যে মহর্ষি এবে
হউন রণে অগ্রসর;

চক্রে ওই অধর্মের করিছে সংহার ;
আনন্দে করুক শঙ্খ ধর্মের প্রচার।

ব্যাস

তোমারই শঙ্খ, চক্র, কবচ তোমার।
চালাইবে চক্র, শঙ্খ বাজাবে যেমন,
চলিবে বাজিবে তথা ;
পার্থ, দ্বৈপায়ন,
তব করধৃত অস্ত্র, যুগল ভূষণ।
শুনিলাম যেই দিন
অপূর্ব স্বর্গীয় শিশু
বৃন্দাবনে ইন্দ্র যজ্ঞ করেছে বারণ,
ভক্তিতে বিহ্বল গোপাঙ্গনাগণ
দেবভাবে আকর্ষণ
করিতেছে প্রাণ মন,
পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান,
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছুসিত প্রাণ,
—বুঝিলাম সেই দিন
দ্বাপর হতেছে শেষ,
জগতের নবযুগ হ'তেছে সঞ্চার,
আবির্ভূত বৃন্দাবনে যুগ অবতার।
সেই দিন হ'তে ব্যাস
তোমার মহিমা ধ্যান
করিতেছে নিরন্তর আত্ম-সমর্পণ
করিয়াছে তব পদে, নর-নারায়ণ।
কেবল তোমার লীলা
করিবারে দরশন,
করেছে প্রভাস-তীরে দ্বিতীয় আশ্রম।
অদূরে কুটির ক্ষুদ্র
করিয়াছে নিরমাণ
কুরুক্ষেত্রে তব লীলা করিতে দর্শন।
একমাত্র কর্ম তার,
না জানে দ্বিতীয় আর,
গাহিবে ভকতি ভরে তব **ভাগবত** ;
গাহিবে মহিমাপূর্ণ এ **মহাভারত**।

ত্রয়োদশ সর্গ

সম্মিলন

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ; নির্মল আকাশে
ভাসে নিরমল শশী নব হেমন্তের ;
ধীরে নব হেমন্তের বহে সমীরণ
সুশীতল ; কুরুক্ষেত্র নীরব নিদ্রিত।
"কি শান্তির মহামূর্তি"—চাহি চন্দ্র পানে
কহে দ্বৈপায়ন-শিষ্য ভ্রমি ধীরে ধীরে—
"কি শান্তির মহামূর্তি অনন্ত আকাশ,—
নীরব, নিদ্রিত ! নীচে নীরব নিদ্রিত
কুরুক্ষেত্র ;—কি বিরাট মূর্তি অশান্তির !
বিরাট রাক্ষস-মূর্তি বীরত্ব ভীষণ
ভারতের, দিবসেতে জীমূত নির্ঘোষে
গরজি অসংখ্য কণ্ঠে, সংখ্যাতীত ভুজে
প্রহারি অসংখ্য বজ্র, অসংখ্য চরণে
বীর দর্পে বসুন্ধরা করিয়া কম্পিত,
যোজন যোজনান্তর বিরাট শরীরে
ব্যাপি আত্মঘাতী এবে নীরব নিদ্রিত,—
ঝটিকান্তে সুপ্ত মহা পারাবার মত !
হায় মা ! হায় মা ! শিবে ! শান্তিস্বরূপিণি !
দিবসে তুমি মা গৌরী, মা গো রজনীতে
কৃষ্ণভাগে তুমি কালী, শুক্লভাগে শুভ্রা
জ্যোৎস্না-বরণী মা গো তুমি সরস্বতী—
সর্বত্র তোমার মুখ কি শান্ত সুন্দর !
তবে কেন তব এই জগতে, জননী !
এতই অশান্তি আহা ! এত বজ্র, ঝড় ?
সর্বাণি ! সর্বেশে ! সর্বশক্তিসমন্বিতে !
জানি তুমি নিত্যা, আর অনিত্য জগত।
কিন্তু করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শান্তির ছায়া ? শান্তিতে জন্মিয়া,
শান্তিতে এ পান্থশালে কাটিয়া দুদিন
যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া ?
আপনি করুণাময়ী, সহ মা কেমনে
জগতের এত দুঃখ ? প্রচণ্ড অনলে
পুড়িছে কেমনে হায় ! পতঙ্গের মত
বিপুল ক্ষত্রিয় কুল ? পুড়িছ বাসুকি,
অভাগিনী জরৎকারু ? পুড়িছে দুর্বাসা ?
ঋষি কুলে ধূমকেতু, জলন্ত বিদ্বেষ.
মহাক্রোধ মূর্তিমন্ত, সৃজিলে কেমনে ?
ভীষ্মের শিবির দ্বারে দিলেন বিদায়
মহর্ষি, যাইতেছিনু আশ্রমে অদূরে,
দেখিনু যোগিনী এক কৌরব শিবিরে
যাইতেছে, অলক্ষিতে চলিনু পশ্চাতে,—
কি যে অমঙ্গল ছায়া পড়িল হৃদয়ে !
এ কি দেখিলাম হায় ! এ কি শুনিলাম !
কি স্বর্গ ছায়ায় কিবা নরক ভীষণ !
সুভদ্রার সেই দয়া, ধৈর্য গোবিন্দের,
কারুর নিরাশা মরু, ষড়যন্ত্র ঘোর
নিশীথে নিবিড় বনে কর্ণ দুর্বাসার,—
আকাশ পড়িল ভাঙ্গি মস্তকে আমার।
বাছা ! তুই বারি বিন্দু ত্রিদিব প্রসূত
পড়েছিলি আমি ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে !
আমার হৃদয়-মুক্তা হৃদয় চিরিয়া
ল'তেছে কাড়িয়া হায় ! নির্দয় তস্কর,—
সহিব কেমনে আমি ? হায় ! বাছা মোর ;"—
কাঁদিতে লাগিল শোকে উন্মত্ত হৃদয়ে
নীরব, নিদ্রিত, চন্দ্র-প্রদীপ্ত-প্রান্তরে !
"যাব নারায়ণ কাছে।—হায় হিমাদ্রির
পদমূলে পিপীলিকা, সিন্ধু পদতলে
বালুকা, দুঃখের কথা কহিবে কেমনে ?
যিনি অন্তর্যামী, যাঁর জ্ঞানের নয়নে
জগতের তত্ত্বরাশি মুক্ত, অবারিত,
এই ষড়যন্ত্র হায় ! লুকাব কেমনে
তাঁর কাছে দুর্বাসার ? হইলে প্রকাশ
নাগরাজ্য উদ্ধারের ব্রত বাসুকির
ডুবিবে অতল জলে সহ বাসুকির,—
থাকিবে না অনার্যের একটি আশ্রয়।
যাইব, পার্থের কাছে ? যাইব কেমনে ?
তাঁর অনুতাপানল উঠিবে জ্বলিয়া
দেখিলে আমারে, করুণ হৃদয়ে

পাইবেন নাথ কিবা ব্যথা নিদারুণ।
যাব কুমারের কাছে!—পারিব কি হায়!
নিবারিতে তারে আমি? তরুণ ভাস্কর
উঠিছে ক্ষত্রিয়াকাশে আলোকে পূরিয়া
দশ দিশি, নিবারিতে পারিব কি আমি?
দেখেছি নক্ষত্র মত, মত্ত মৃগয়ায়
ঘোর বিপদের মুখে যাইতে ছুটিয়া
হাসি উচ্চ বাল-হাসি। করিলে বারণ
গলা জড়াইয়া ধরি কহিত হাসিয়া—
"তুই মম বনমাতা; কি ভয় আমার?
মৃগয়া আমার ক্রীড়া। দেখ্ দাঁড়াইয়া
এখনি কেমন খেলা আসিব খেলিয়া।
হাস্ মা!—হাস্ মা! তোর হাসি আদরের
কি সুন্দর! কাঁদিবি ত দিব গালে চড়'।"
স্মৃতিতে ভিজিল চক্ষু। চিন্তি কিছুক্ষণ—
"নিবারিতে নাহি পারি—আশঙ্কা অজ্ঞাত
ছাইবে হৃদয়, বল হরিবে বাহুর;
করিবেক সিংহ-শিশু বিষাক্ত দুর্বল।
না, না, যাব দয়াময়ী সুভদ্রার কাছে।
মায়ের করুণ প্রাণ হইবে কাতর,
করিবে বারণ, আশা হইবে সফল।
গুরুদেব! পরীক্ষিতে হৃদয় আমার
পাঠাইলে অপরাহ্ণে ভদ্রার শিবিরে?
আনন্দে তোমার আজ্ঞা করিনু পালন।
ততোধিক গুরুতর পরীক্ষা কঠিন
লইব; হৃদয়! চল যাইব যথায়
নিদ্রিত পার্থের বক্ষে, ত্রিদিবে আমার,
প্রেমময়ী ভদ্রা দেবী,—নিদ্রিতা এখন
স্থির হিরণ্বতী বক্ষে জ্যোৎস্না যেমন।
দেখিব একটি শিরা কাঁপে কি তোমার,
পড়ে কি না অণুমাত্র ছায়া কামনার
তোমার তরল বক্ষে। রমণী হৃদয়
তরল সলিল মত; সলিলের মত
দেখিব হয় কি তাহা নির্মল, নিশ্চল।"
পার্থের শিবির পানে ছুটিল সবেগে।
দ্বৈপায়ন-শিষ্য!—দ্বার ছাড়িল প্রহরী
সসম্ভ্রমে; প্রবেশিয়া শিবিরে তখন
অপূর্ব যোগিনী বেশ করিল গ্রহণ।
জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ সুবর্ণ আধারে।
সুবর্ণ পর্যঙ্ক অঙ্কে সুবর্ণ প্রতিমা
সুষুপ্তা সুভদ্রা দেবী, নীলমণি ময়
বীর-মূর্তি নিরুপম সুপ্ত ধনঞ্জয়।
শোভিতেছে সুভদ্রার অতুল বদন
পতি বক্ষে, নীলাকাশে পূর্ণ শশধর,—
মানস-সরসে যেন একটি কমল।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, মেঘ জ্যোৎস্নায়,
উভয়ে উভয় মুখ চাহিয়া চাহিয়া
নিদ্রাগত। নিদ্রাতেও অধরে অধরে
রয়েছে ঈষৎ হাসি চারু চিত্রাঙ্কিত।
আলিঙ্গি সৌন্দর্য শৌর্য, হিমাদ্রি জাহ্নবী,
সুবর্ণ শিঞ্জিনী নীলমণি-শরাসন,
দয়া ধর্ম, পুণ্য প্রীতি, স্বর্গ মন্দাকিনী,
উভয় উভয়-ধ্যানে মোহিত যেমন।
ঈষৎ কাঁপিল চক্ষু সংযত হৃদয়
যোগিনীর, অলক্ষিত কাঁপিল ভূতল
অনন্ত ভূধর ভারে স্থির অবিচল।
দুই হাতে চাপি বক্ষ, জানু পাতি ভূমে,
চাহি ঊর্ধ্ব পানে কহে—"হাঁ হত হৃদয়!
এ কি কম্প কামনার? না, না, প্রাণনাথ!
করিয়াছি চতুর্দশ বৎসর তোমার
আরাধনা; দেও শান্তি, শান্তিপূর্ণ বুকে
নিরখিব দেবমূর্তি মম তপস্যার।"
উঠিল, মুহূর্ত বামা নয়ন ভরিয়া
দেখিয়া যুগল রূপ। হৃদয় এখন
ভক্তি ভরে অবিচল; নীলাব্জ বদন
শান্ত স্থির; আনন্দাশ্রু পূর্ণ দুনয়ন।
মুহূর্ত,—মুহূর্ত পরে কর-নীলোৎপল,
অর্পিলেক রক্তোৎপল ভদ্রার চরণে।
চমকি বসিলা ভদ্রা, রহিলা চাহিয়া
উভয় উভয় পানে। উভয় মোহিতা
উভয়ের দরশনে, চাহি পরস্পরে,—
জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না-মাখা সরসী নীলিমা;
জ্যোৎস্না-প্রদীপ্তা স্থিরা জাহ্নবী যমুনা;
যোগিনী ও যোগারাধ্যা; শান্তি তপস্যায়;
বনদেবী গৃহলক্ষ্মী; দয়া দরিদ্রতা।
চাহি পরস্পরে যেন প্রীতি নিষ্কামতা,
প্রেমময়ী উদাসিনী, প্রতিভা কল্পনা।
অধরে যোগিনী করি অঙ্গুলি নিবেশ
করিলে সংকেত,—ভদ্রা দেখিলা সে মুখ
পুণ্যের পবিত্রাকাশ,—জড়াইয়া তারে

আদরে লইয়া বক্ষে চলিলা বাহিরে,
অদূরে জ্যোৎস্নাময়ী হিরণ্বতী তীরে।
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ভদ্রার হৃদয়
করুণার সিন্ধু; দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে
লইয়া তাহারে ভদ্রা কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা নীরবে সেই স্বর্গে তপস্বিনী
লুকাইয়া মুখ। অশ্রু কত রূপান্তর!
শোকাশ্রু ভদ্রার, সুখ-অশ্রু যোগিনীর।
ভদ্রা চাহে বুক চিরি সেই মুখখানি
রাখে বুকে চিরদিন। চাহে তপস্বিনী
চিরি বুক সেই বুকে, স্নেহের ত্রিদিবে,
পড়ে ঘুমাইয়া সুখে চিরদিন তরে।
স্নেহ তরলিত কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে
কহিলা উচ্ছ্বাসে ভদ্রা—"শৈলজে! ভগিনি
চির অভাগিনি!"—কথা সরিল না আর।
কিছুক্ষণ পরে শৈল করিল উত্তর,
বক্ষে লুকাইয়া মুখ,—"সে কি কথা দেবি!
ভদ্রার ভগিনী, স্নেহভাগিনী পার্থের
অভাগিনী যদি, তবে সুভাগিনী আর
কে আছে জগতে, দিদি! শৈলজা তোমার
বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধ অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"

অপরাজিতার সেই ক্ষুদ্র মুখখানি
তুলিলেন ভদ্রা স্নেহে; করতলে
দেখিলেন আনন্দাশ্রু যুগল নয়নে,
ঈষৎ আনন্দ হাসি ভাসিছে অধরে।
সেই মুখ শান্ত, শান্ত শোভিতেছে যেন
চন্দ্রাভ আকাশ খণ্ড হৃদয়ে তাহার।
চুম্বিলা আদরে ভদ্রা সেই মুখখানি!
সে চুম্বনে কত স্নেহ! কি সুধা শীতল
বহিল দুইটি প্রাণে! অতৃপ্ত নয়নে
উভয় উভয় পানে রহিল চাহিয়া।
"শৈল! শৈল!"—বলি ভদ্রা স্মৃতির উচ্ছ্বাসে
আত্ম-হারা চুম্বিলেন আবার আবার
সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—শৈলের কি স্বর্গ।
কহিলেন—"বল্ দিদি! থাকিবি এরূপে,—
থাকিবি আমার বুকে;—ছাড়ি আমাদেরে
আর যাইবি না;—আমি দিব না যাইতে।"
চন্দ্রকর আস্তরণ বকুল তলায়
প্রসারিত, দুই জন বসিয়া তথায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে। বাম অংসোপরে
সুভদ্রার অধোমুখ আছে শৈলজার।
চাহি শূন্যপানে ভদ্রা কহিতে লাগিলা—
"চতুর্দশ বর্ষ আজি, প্রতিমা রে তোর
পূজিয়াছি নিরন্তর হৃদয়ে দুজনে।
স্মৃতিতে শোকাশ্রু কত করিয়া মিশ্রিত,
কত বর্ণে সে প্রতিমা করেছি চিত্রিত।
কভু ভাবিতাম তুই অঙ্কে বাসুকির
নিহতা; আকুল প্রাণে কাঁদিতাম কত,
বৎসহারা বন-মৃগ-দম্পতির মত।
পুনঃ ভাবিতাম, নহে নিষ্ঠুর এমন
নারায়ণ, এই বন-মল্লিকা তাঁহার
করিয়া অদৃষ্টে পুণ্য-সৌরভ বিস্তার,
তাপিত মানব প্রাণ করিছে শীতল;—
এ জীবনে এক দিন পাব দরশন।
স্মৃতির আলেখ্য শৈল! ধরিয়া নয়নে,
আঁকি দুই জনে চারু চিত্রপট,
রাখিয়াছি শয্যাগৃহে। আঁকিতে সে ছবি
কত অশ্রু দুই জন করেছি বর্ষণ।
সেই চিত্রে এই চিত্রে কতই অন্তর!
সে নীলাব্জ কলি আজি ফুটন্ত নলিনী;
সে পঞ্চমী আজি কিবা পূর্ণিমা রজনী!
এই পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, সরলতা,
কে পারে চিত্রিতে,—এই প্রাণ-কোমলতা?
এ কোমল প্রাণে, এই কোমল শরীরে,
বেড়াইয়া বনে বনে হায়! বাণ-বিদ্ধ
বন-কুরঙ্গিণী মত, কি দুঃখ দারুণ
না জানি সহিলি বোন্! আয় বুকে আয়,
ভদ্রার্জুন ক্ষতপ্রাণে ঢালি প্রেম-ধারা
জুড়াইবে তোর প্রাণ, প্রাণ আপনার।
বিদগ্ধ খাণ্ডব বন; তব পিতৃ-ভূমি
সমুদ্ধৃত; পিতৃ-পুরী তব পুরাতন
করিয়াছে নিরমাণ, পার্থের আদেশে,
তোমার পিতৃব্য ময় শিল্পি-চূড়ামণি।
তব মরকত মূর্তি হয়েছে স্থাপিত
সে পুরীতে; সেই স্থান করিয়া গ্রহণ
পরিতাপ তুষানল কর নির্বাপিত
অর্জুনের, সুভদ্রার। এই যুদ্ধ শেষে
কিম্বা চল ইন্দ্রপ্রস্থে, চল প্রেমময়

অর্জুনের বুকে, এই বুকে সুভদ্রার।"
আবার আঁটিয়া ভদ্রা লইলেন দৃঢ়
বুকে নাগ-নন্দিনীরে, কাঁদিলা আবার
দুই জন,—ভদ্রা শোকে, সুখে নাগবালা।
কিছুক্ষণ সেই স্বর্গে রহিয়া নীরব
উত্তরিলা শৈল ধীরে—"দিদি! তোমাদের
চরণ যুগল স্বপ্ন-স্বর্গ শৈলজার।
সফল তপস্যা তার। কিন্তু কহ হায়!
কেবল কি বনে দুঃখ, গৃহে দিদি! সুখ,—
এই কুরুক্ষেত্র হায়! প্রাঙ্গণে যাহার?"
কি প্রশ্ন? ভদ্রার মুখ হইল গম্ভীর।
কেন শৈলজার মুখ শান্তির ত্রিদিব,
বুঝিলা ঈষৎ। শৈল দেখিল নীরবে
অপূর্ব শান্তির ছায়া চন্দ্র করতলে
ছাইল ভদ্রার মুখ। বিস্তৃত নয়ন
অলৌকিক প্রতিভায় হইল উজ্জ্বল;
ভাসিল জ্যোৎস্না যেন নীল সরোবরে!

সুভদ্রা

শৈলজে! সুখের তরে আকুল জগত।
সুখ-অন্বেষণ,—স্থিতি, গতি, জগতের।
এ জগত সুখময়, নিত্য-সুখময়
নিজ বিধাতার মত। অজস্র ধারায়
ঝরে সুখ জ্যোৎস্নায়, বহে ঝটিকায়,
গরজে জীমূতমন্দ্রে, বর্ষে বরিষায়,
গায় কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
মলয়ের সমীরণে, ফলে তরু দলে,
ফুটে ফুলে, ভাসে জলে, হাসে দিবালোকে।
সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্বময়।
কেবল মানব নাহি পাইয়া সে সুখ
করিতেছে হাহাকার! মানুষের সুখ
নহে গৃহে, নহে বনে; বুঝে নাই হায়!
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়!

শৈলজা

বল দেবি! কিসে তবে সুখ মানুষের?

সুভদ্রা

জগত অনন্ত কণ্ঠে দিতেছে উত্তর
এক তানে,—বিহঙ্গের বিহঙ্গত্বে সুখ,
পশুর পশুত্বে, সুখ পুষ্পত্বে পুষ্পের;
মনুষ্যত্বে তবে বোন! সুখ মানুষের।

শৈলজা

কারে বল মনুষ্যত্ব?

সুভদ্রা

চরিতার্থতায়
বিহঙ্গ-বৃত্তির, বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের!
মানুষ কি ল'য়ে বল, মানুষ; ভগিনি?—
আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়
এ তিনের মনুষ্যত্ব! যেই নীতি চয়
শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্মিক,
—মানবের মানবত্ব,—করিছে ধারণ,
তাহাই মানব ধর্ম। স্বধর্ম পালনে,
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়,
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব, সুখ নিরমল,
পূর্ণ মনুষ্যত্ব,—দুঃখ-মুক্তি, নিবারণ,
বৈকুণ্ঠ, পরম সুখ, স্বর্গ, ভগবান্!

শৈলজা

ইহা কি বৈদিক ধর্ম?

সুভদ্রা

বেদ-ধর্ম, শৈল!
এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান।

শৈলজা

এই মনুষ্যত্ব,—এই স্বধর্ম-সাধন
হয় না কি বনে দেবি!

সুভদ্রা

ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর
এ ধর্মের গৃহ, দিদি! এ মহা ধর্মের
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্বভূত হিত।

শৈলজা

চল তবে বনে দিদি! হায়! ধরাতলে
এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র কোথা আছে আর
সাধিবারে লোকহিত! এ ভারতভূমি
যাহাদের পিতৃ-ভূমি, সে অনার্য জাতি
আজি কোথা, দেখ আহা! কি দশা তাদের!
রাজ্যহীন, গৃহহীন, আহার-বিহীন,
আজি তারা বনে, আজি পশু নির্বিশেষ।
সাম্রাজ্যে, সৌভাগ্যে, সুখে আজি আর্যগণ
দেবোপম, হায়! দেবি! আছে তাহাদের

কত শাস্ত্র, কত ঋষি, কতই আশ্রম,
সাধিতে অজস্র হিত; আছে তাহাদের
পার্থ ভুজাশ্রয়, স্বর্গ ভদ্রার হৃদয়,
সুখদাতা পরিত্রাতা নর-নারায়ণ!
হইয়াছে সূর্যোদয় আবির্ভাবে তাঁর
আর্যের অদৃষ্টাকাশে; পূর্বাহ্ণ প্রভায়
সমুজ্জ্বল আর্যভূমি; অমাবস্যা ঘোর
অনার্যের হায়! দিদি! রবে কি এমন?
পতিতপাবন হরি,—এ পতিত জাতি
পাবে না তাঁহার দয়া? পাবে না তোমার?"
কি কাতর কণ্ঠ! কিবা কাতরতা মুখে!
বহিছে কি কাতরতা যুগল ধারায়
দুনয়নে! তুলি মুখ জিজ্ঞাসিল শৈল—
"পাবে না তাঁহার দয়া? পাবে না তোমার?"
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভদ্রা রহিল চাহিয়া
সে কাতর মুখ পানে। কি যেন কি মেঘ
নয়ন হইতে গেল নিমিষে সরিয়া,
নিমিষে কি যেন স্বর্গ খুলিল নয়নে।
কহিলেন—"শৈল! শৈল! এ চৌদ্দ বছর
কোথা ছিলি, কি করিলি, এই ভগিনীরে
কহ দয়া করি।" শৈল ঈষৎ হাসিয়া,
—বরিষার জ্যোৎস্না, অশ্রুতে সে হাসি—
চাহি সুভদ্রার মুখ কহিল মধুরে—
"বড় সুখে ছিল দিদি! শৈলজা তোমার!"
সুভদ্রার অংসে পুনঃ রাখিয়া বদন,
ম্লানমুখে শূন্য-নেত্রে চাহি ধরাতল।

শৈলজা

শুনিয়াছ কি নরক লইয়া হৃদয়ে
এসেছিনু রৈবতকে! কি স্বর্গ লইয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে হইনু বিদায়!
পশিনু নিবিড় বনে, ছায়ার মতন
চলিলাম; কোন্ পথে, যেতেছি কোথায়,
কেন যাই,—নাহি জানি। উপরে আকাশ
শুভ্র মেঘে ঢাকা মরুময়; মরুময়
নিম্নে ধরাতল; হুহু রবে সমীরণ
যাইছে বহিয়া। এই মহা মরুভূমে
একাকিনী অনাথিনী চলিয়াছি আমি,—
আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারি দিকে;
হুহু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।

ক্লান্ত অবসন্ন বুকে পড়িয়া ভূতলে
পড়িনু বিস্মৃতি অঙ্কে,—নিদ্রা কি মূর্ছায়
নাহি জানি। ক্রমে ক্রমে উঠিল ভাসিয়া
জগত আনন্দময়, শ্যাম শোভাময়।
ফুটিল কুসুম ছুটিল সৌরভ,
গাহিল বিহঙ্গ সুখে;
মৃদুল কিরণে হাসিল ভাস্কর,
কি হাসি মানব মুখে।
দেখিলাম পার্থ বসিয়া শিয়রে
রাখি অঙ্কে মুখ মম;
পিতৃ-স্নেহ পূর্ণ কি দুটি নয়ন—
পবিত্রতা প্রস্রবণ!
কহিছেন—"তোর পিতার শ্মশানে
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি,
দুহিতার মত পালিব রে তোরে,
জানেন অন্তরযামী।
অন্তরে অন্তরে সৃজিয়া প্রতিমা,
পুষেছি তোরে সদায়
দুহিতার মত,— এই মহা পাপ
কেমনে করিব হায়!
দেখ পিতৃ-প্রেম অনন্ত বিস্তার,
কি পবিত্র সুশীতল;
পতি-প্রেম তার কাছে তুচ্ছ কত,—
পূরিত কামনানল!
ঈর্ষার নরক নিবিল, হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল।
মেলিনু নয়ন;—বেলা অবসান,
শান্তি পূর্ণ ধরাতল!
মস্তক উপরে আনন্দ কাকলি,
গাহিছে বিহঙ্গগণ;
বসি চারি দিকে কুরঙ্গ শশক,
চাহিয়া সস্নেহ মন
আশৈশ আমি ছায়ার মতন
ভ্রমিয়াছি বনে বনে।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী, শশক শশকী
ভগ্নী যেন ভাবে মনে!
কুরঙ্গশাবক যাইছে ছুটিয়া
ঘ্রাণিয়া মুখ কখন,
খেলিতেছে সুখে, নাচিতেছে শিখী
আনন্দে ধরি পেখম।

সেই বন-শান্তি, সেই বন-স্নেহ
স্বপ্ন-স্মৃতি স্নেহময়ী,
কিন্তু নব জীবন পাইলাম যেন
আমি সেই শৈল নই।
বসিয়া আকাশ চাহি ভাবিতে লাগিনু
কি করিব, কোথা যাব? শৈশবে জনক
কহিতেন মার কাছে—"ধর্ম প্রিয়ে, সুখ;
ইন্দ্রিয় সংযম, সেই ধর্মের সোপান!
নাহি চাহি রাজ্যধন। শৈলজা আমার
হইবে ধর্মের রাণী, ধর্মের জননী
অনার্যের, বিলাইয়া হরিনাম-সুধা
বাঁচাবে অনার্য জাতি; ধর্ম বিনা আর
হইবে না কোন মতে অনার্য উদ্ধার।"
কি করিব? কোথা যাব?—পাইনু উত্তর।
আকাশে কর্তব্য-রেখা দেখিনু অঙ্কিত।
জনক জননী মূর্তি দেখিলাম আর
বিরাজিত সন্ধ্যাকাশে। অনাথিনী আমি,—
আশৈশব নিরজন বড় প্রিয় মম!
বড় প্রিয় বনভূমি। বসি নিরজনে
দেখিতাম ঊর্ধ্বে নীলমণিময় পটে
স্নেহময়ী মা আমার, পিতা স্নেহময়—
স্নেহের ত্রিদিবে, স্নেহ-দেবতা যুগল।
হায়! রৈবতকে দেখি! আসিনু যে দিন
পাপব্রতে, পুণ্য ছবি দেখি নাই আর।
আজি প্রেমময় মূর্তি দেখিয়া আবার
সুপ্রসন্ন, কি আনন্দে ভরিল হৃদয়!
যুগল শীতল ধারা বহিল নয়নে।
বুঝিলাম দেবদেবী প্রীত মম ব্রতে!
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে ভূমে, ডাকি ভক্তিভরে,
কহিলাম—"দেব! দেবি! দিয়া পদাশ্রয়
কন্যার কঠিন ব্রত করিও পূরণ।"
কোথা ছিনু? বিন্ধ্যাচলে। কি করিনু দেবি?
পার্থের প্রতিমা সৃজি, এ চৌদ্দ বছর
পূজিয়াছি ভক্তিভরে; এ চৌদ্দ বছর
শৈল ক্ষুদ্র সূর্যমুখী, পার্থ প্রভাকর।
এ চৌদ্দ বছর ক্রমে পূজিতে পূজিতে,
সেই পতিভাব দেখি! হইল বিলীন
কি অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি পারাবারে,
সিন্ধুমুখী গঙ্গামত! এই চরাচর
হইল অর্জুনময়, হইনু তন্ময়!

কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা;
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ মাতা, আমি স্নেহ নিমজ্জিতা;
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা আমি সখী বিনোদিনী:
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধীনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার;
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার।

সুভদ্রা

কি সুন্দর উপাসনা! কি প্রেম গভীর!
উপাসক, উপাসিত, কি ধন্য উভয়!
এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান!
এই প্রেমে মর্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান্।
আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
নাহি যার প্রেমে, সেই উপাস্য আমার।

শৈলজা

নহে বহু দিন গত, দিদি, এক দিন
আসিলেন দ্বৈপায়ন দাসীর কুটীরে,—
বন অন্তরালে যেন দেব অংশুমালী।
ফলিল তপস্যা মম। অন্তর্যামী প্রভু
চিনিলেন এ দাসীরে, কহিলেন—"শৈল!
সিদ্ধ তব পার্থ-পূজা, পূজ তুমি এবে
পার্থরূপে ভগবান্, অনন্ত সুন্দর,
অনন্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার।
থাকে যদি কণা মাত্র কামনা-উত্তাপ
হৃদয়ে, নিবিবে; শান্তি পাইবে পরম।"
কহিলাম,—"চিন্তাতীত সেই ভগবান্;
বুঝিবে, পূজিবে, এই অবলা কেমনে
জ্ঞানহীনা?"
"বুঝ, পূজ, ভক্তিভরে তবে
আদর্শ মানব কৃষ্ণ, যুগ-অবতার।
পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়;
এইরূপে পতঙ্গও উঠে হিমালয়।
কিন্তু বৎসে! তব এই যোগিনীর বেশ,
একি রৈবতকের সে ভৃত্য বেশ তব?"
"না না, প্রভু!"—কহিলাম পড়িয়া চরণে
"এই বেশ জীবনের ব্রত এ দাসীর।
অনন্ত অমৃতপূর্ণ জ্ঞান সিন্ধু তব;
পাইবে না অনার্য কি বিন্দুমাত্র তার?
নারায়ণ! এই নব জলধর-ধারা

পাবে না কি এই বিশ্বে চাতক কেবল ?
পাইবে না মরুভূমি ? দেহ এ দাসীরে
এক বিন্দু, বিলাইয়া বনে বনে দাসী
করিবে এ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন।”
কহিলা সজল কণ্ঠে—“চন্দ্রচূড়-সুতে !
গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
—বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিনী মত—
পতিতপাবন নাম ; অনার্য উদ্ধার
হবে এই নামে ; মন্ত্র নাহি জানি আর।”
অশ্রুজলে প্রক্ষালিয়া চরণ যুগল
কহিলাম,—“কর মন্ত্রে দীক্ষিত কন্যায় ;
পদ কল্পতরুমূলে বন লতিকায়
দেও স্থান ; নহে ভিন্ন করেছি শ্রবণ
কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।”
বহিল কি আনন্দাশ্রু মন্দাকিনীধারা
প্রভুর নয়নে—দুই চক্ষু জগতের !
আদরে লইয়া বক্ষে চুম্বিয়া ললাট
কহিলেন,—“মা আমার ! নিরুপমা এই
জ্বলন্ত পাবক শিখা পশিলে আশ্রমে
পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম।”
“অর্জুনের ভৃত্য”—আমি কহিনু সলাজে—
“হবে তবে শিষ্য-পুত্র, সেবক তোমার।”
গুরুর চরণাশ্রয়ে পাইয়াছি স্থান।
দেও স্থান, দেবি ! আজি চরণে তোমার
পড়িল বিহ্বলা শৈল চরণে ভদ্রার।
আপনি বিহ্বলা ভদ্রা। বিহ্বলা বালায়
আবার লইয়া বক্ষে, কহিলা উচ্ছ্বাসে,—
“শৈল ! শৈল ! পুণ্যবতি ! পদতীর্থ তোর
সুভদ্রার যোগ্য স্থান। ধন্য নারায়ণ !
দুর্জ্ঞেয় তোমার লীলা ; কি বুঝিবে নর ?
গৃহমুখী পতি-প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা
রুদ্ধ করি এইরূপে পিতৃ-স্নেহ শৈলে,
বহাইলে বনভূমি করিতে উদ্ধার
এইমতে, এই পথে। আয় দিদি ! আয় !
দুইজনে গৃহে বনে গাব কৃষ্ণনাম।
এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিঙ্গনে
বাঁধিব অনার্য আর্য। গাহিবে জগত
কৃষ্ণনাম ; কৃষ্ণ প্রেমে ভাসিবে ধরণী।
কুরুক্ষেত্র ঐরাবত ভাসাইয়া বেগে
ছুটিতেছে প্রেম গঙ্গা পতিতপাবনী,
আর্যভূমি, বনভূমি করিতে উদ্ধার।”
সুভদ্রা বক্ষে শৈল রাখিয়া মস্তক—
কি দেখিছে ? “ওই দেখ ! ওই দেখ, দিদি !”—
ছুটিয়া চলিল শৈল—“বসি চন্দ্রাসনে
জনক জননী মম ; কি প্রীতি বদনে !
প্রসারিয়া কর মাতা কি কহিছ ?—মাতা !
কে মাতা ?—সুভদ্রা !” শৈল ফিরিয়া আবার,
পড়িয়া ভদ্রার বুকে,—“ওমা ! মা আমার !
মাতৃ-হীনা বনভূমি,—শৈল মাতৃ-হীনা,—
নারায়ণ ! এত দিনে পাইল জননী।
পতিতপাবনী মাত ! পতিতা কন্যায়
রাখিস চরণে তোর !” হইল মূর্ছিতা
নীরব রজনী। চন্দ্র হাসিছে আকাশে
নীরবে, নিরখি কিবা স্বর্গ ধরাতলে !
মূর্ছিতা শৈলের মুখ অঙ্কে সুভদ্রার,
চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল সিক্ত নীলাম্বুজ,
সস্মিত, সুস্নিগ্ধ, শান্ত ; চাহি চন্দ্রপানে
আত্মহারা ভদ্রা দেবী। কিবা দরশন
চন্দ্রে চন্দ্রে, চন্দ্রে চন্দ্রে কিবা সম্ভাষণ
প্রীতিময়, ভাবময় ! বহিছে কপোলে
যুগল আনন্দ ধারা দর দর দর,—
কি পবিত্র ধারা ! কিবা পুণ্য নিরঝর !
তৃতীয় প্রহর নিশি, নব হেমন্তের
সুশীতল সমীরণ বহিতেছে ধীরে।
ভাঙ্গিল শৈলের মূর্ছা। বসিয়া রমণী
ভদ্রার উরসে মুখ রাখিয়া আবার
কহিল,—“রজনী, দেবি ! অবসান প্রায়।
মানবের ভাগ্যাকাশে ভদ্রার মতন
ভাসিতেছে সুখতারা অনন্ত আকাশে,—
মানবেরো দুঃখ নিশি হতেছে প্রভাত।
বিদায়ের কালে ভিক্ষা চাহে এই দাসী
তোমার চরণাম্বুজে,—কর এ প্রতিজ্ঞা
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে !
রাখিবে বাঁধিয়া, মত্ত করি-সুত মত
সুদৃঢ় স্বর্গীয় মাতৃ-স্নেহের নিগড়ে।”

সুভদ্রা

কেন, শৈল ?

শৈলজা

শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীর ধর্ম দিয়া বিসর্জন

কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের ; এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জয় গাণ্ডীব বল।

সুভদ্রা

অন্ধের সন্তান
হতভাগ্য কৌরবের, অন্ধ চিরদিন।
বুঝে নাই হায়! তারা গাণ্ডীবের বল।
নহে শিশু অভিমন্যু। গাণ্ডীবের বল
জনার্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ।
ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সনাতন,
জান শৈল? ধর্মযুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী, অভিমন্যুর জননী?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী?

শৈলজা

যোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,—
একি ধর্ম ক্ষত্রিয়ের?

সুভদ্রা

ধর্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম, ধর্ম কেশরী-শিশুর।
যোড়শ বর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি! যোড়শ বর্ষীয়
পুত্র মম মহারথী। ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধনুর্বাণ অঙ্গের ভূষণ।
পিতা করুণার সিন্ধু, পুত্র করুণার
নবঘন, শ্লথ করে করিতেছে রণ!
কৃষ্ণ সুভদ্রার যত্ন যাইছে ভাসিয়া
সেই করুণার স্রোতে। অন্যায় সমরে
করে অন্ধ কৌরবেরা বজ্রাগ্নি সঞ্চার
সেই মেঘে, বাড়বাগ্নি উত্তাল সাগরে,
চক্ষুর নিমিষে ভস্ম হবে কুরুকুল।
আজি অপরাহ্নে শিরে দিয়া দুই কর
করিয়াছি আশীর্বাদ বীর পুত্রে মম,—
পালিয়া স্বধর্ম, করি এই ঘোর রণ,
ধরাতলে ধর্ম রাজ্য করিতে স্থাপন।
"নর-হরি! নারায়ণ! বিপদ্‌ভঞ্জন!
রক্ষিও বাছায় তবে!"—সরিল না আর
রুদ্ধ কণ্ঠ শৈলজার,—"বলিয়াছে বাছা
যাইবে আশ্রমে বন-মাতার তাহার,
যুদ্ধান্তে উত্তরা সহ ; হইবে উদয়
অরুণ উষার সহ আশ্রমে আমার,—
আঁধার হৃদয়ে মম! অনাথিনী নাথ!
এই চির অনাথিনী চাহে নাহি আর,
—চাহিবে না,—দেও তারে এই ভিক্ষা, এই
একটা বাসনা কর পূরণ তাহার!"
নিরবিল শৈল। অশ্রু বহিল নীরবে
কপোলে, বহিল অশ্রু নয়নে ভদ্রার।
কেন শৈলজার এই নৈশ অভিযান
বুঝিলেন ভদ্রা। চুম্বি বদন তাহার
কহিলেন,—"অলক্ষিতা থাকিয়া জগতে
বরষিতে স্নেহ সুধা, জনম কি তোর
অভাগিনি! কত স্নেহ এই ক্ষুদ্র বুকে!"

শৈলজা

একটি হিল্লোলে আমি আকুল যাহার,
বহিছে সে স্নেহ-গঙ্গা হৃদয়ে তোমার
শান্তিময়ী, সুধাময়ী! করিয়াছ তুমি
কি অনন্ত গর্ভে লীন! বুঝিলাম, হায়,
এত দিনে কি কঠিন ধর্ম ক্ষত্রিয়ের।
বুঝিলাম এত দিনে লক্ষ্মী অনার্যের
কেন আর্য-পদানতা। বুঝিলাম আর,
শৈলজার স্থান কেন পদে সুভদ্রার।

সুভদ্রা

বড়ই কঠিন ধর্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের।
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নর।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নর, পতি বিশ্বেশ্বর।
সেই বসুন্ধরা আজি কি পাপ আধার!
মানব সমাজ আজি দুঃখ পারাবার।
দুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম,—
জগত আনন্দ রাজ্য, সুখ প্রস্রবণ।
অনন্ত চাহিয়া দেখ গ্রহ উপগ্রহ
—অসংখ্য, বিরাট মূর্তি!—ভ্রমে অহরহ
কি ভীষণ বেগে,—গতি নর-চিন্তাতীত!—
পরস্পরে পরস্পর করি আকর্ষিত
কি অচিন্ত্য প্রেমে, কিবা চিন্তাতীত ব্রতে,
কি সুখে অচিন্তনীয় নিয়তির পথে!
কি অনন্ত সৌন্দর্যের উঠিছে উচ্ছ্বাস!
কি সুখ-সঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ!
কেবল মানব পথ-ভ্রষ্ট নিয়তির।
তাই মানবের হায়! এ দুঃখ গভীর।

মানবের সুখ পথে অধর্মে সৃজন
করিয়াছে মহাবন, করিতে দহন
সে খাণ্ডব জ্বলিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ,—
শিবিরে বসিয়া ওই সাক্ষী নারায়ণ!
সুভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ
করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক,
করি ধরাতলে ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
মানবের সুখ পথ করে উন্মোচন,—
তবে শৈল ভাগ্যবতী! পুণ্যবতী আর
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার?
বহিছে যুগল ধারা জগত-মাতার
যুগল কপোলে মাতৃ-প্রেম-বিগলিত
সন্তাপ-হারিণী। শৈল কহিল উচ্ছ্বাসে,—
"পিতৃগণ! দেবগণ! কে আছ কোথায়,
দেখ পুণ্যবতীর এ আত্ম-বিসর্জন
মানব উদ্ধার ব্রতে। এ পুণ্যে মাতার,
করিয়া শৈলের স্নেহে, কবচ নির্মাণ
সমরে করিও রক্ষা বাছায় আমার!"
নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া
কিছুক্ষণ দুইজন, চাহিল বিদায়
নামিয়া চরণে শৈল। দাঁড়াইয়া ভদ্রা
সস্নেহে ধরিয়া কর কহিলেন ধীরে—
"থাক মুহূর্তেক শৈল। মধ্যম পাণ্ডবে
ডেকে আনি, ডেকে আনি নর-নারায়ণে,—
আমার তোমার দেব, উপাস্য যুগল!
পাইবেন যেই সুখ দেখি তোর মুখ
দুই জনে, পারিবে না কুরুক্ষেত্র-জয়
করিতে তুলনা তার। ভগিনীর তোর
রক্ষা কর্ অনুরোধ, এক দিন তার
থাক্ বুকে, লয়ে বুকে অভি উত্তরায়,—
কাটা রে একটা দিন স্বর্গে সুভদ্রায়।"
"না দিদি"—কহিল শৈল রাখিয়া মস্তক
সেই প্রেম-পূর্ণ বুকে,—হয় নি এখনো
শৈলজার সে যোগ্যতা, সিদ্ধি তপস্যার,
কৃষ্ণার্জুন পদ-তীর্থ করিবে দর্শন।
আজিও কাঁপিল বুঝি হৃদয় আমার
নিরখি পার্থের মুখ। হৃদয়-সংযম
প্রলোভনে,—সেই অগ্নি-পরীক্ষা ভীষণ,—
যে পারে, সে দেবী; দেবী সুভদ্রা সে জন।
শৈলের হৃদয়ে দিদি! নাহি সেই বল।
নাহি শক্তি পতঙ্গিনী দেখিবে নয়নে
কৃষ্ণপদ প্রভাকর; চিন্তায় যাহার
আলোক সাগরে ডুবে পতঙ্গের মত
তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র। পারিবে যে দিন
নিষ্কম্প প্রদীপ মত হৃদয় আমার
দেখিতে পার্থের মুখ; করিতে দর্শন
নারায়ণ পদাম্বুজ শান্তি নিকেতন;
পারিব যে দিন মিলি ভগিনী দুজনে,
আর্য অনার্যের শক্তি করিয়া মিলিত,
সেই মহা ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপিত
—রাজা অভিমন্যু, রাণী উত্তরা তোমার,—
সে মহা প্রয়াগ তীর্থ দেখিব যে দিন,—
আর্য অনার্যের শক্তি, সুভদ্রা শৈলজা,
বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা,
অভিন্না অনন্ত প্রেমে ভগিনী যুগলা;
—সে দিন আসিবে শৈল চরণে তোমার।
যত দিন এই স্বপ্ন ফলিবে না,- দেবি!
কহ এই স্বপ্ন হায়। ফলিবে কি কভু?—
তত দিন যেই উচ্চ ধর্ম রমণীর
শিখিলাম, সেই ধর্ম করিব সাধন;
তত দিন—
গৃহ ক্ষেত্র সুভদ্রার, শৈলজার বন।"
এখনো চাহিয়া
আকাশের পানে শৈল হইল নীরব;
সুভদ্রার বুকে মুখ, ধরিয়া গলায়।
সুভদ্রা চাহিয়া স্থিরা আকাশের পানে,
চন্দ্রদীপ্ত অশ্রু-সিক্ত কপোল কমলে
বহিছে সে প্রেমধারা; সিত চন্দ্রালোকে
হেম নীলমণিময় মূরতি যুগল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে স্বপ্নে মহিমার,
মানবের উদ্ধারের স্বপ্নে নিমজ্জিত,—
অপার্থিব, প্রেমময়, পবিত্রতাময়!
ধীরে ধীরে প্রসারিয়া নয়ন যুগল—
আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র,—প্রসারিয়া কর
কহিতে লাগিল শৈল উন্মাদিনী মত,—
"ওই দেখ! ওই দেখ! জনক জননী
আবার বসিয়া ওই শশাঙ্কমণ্ডলে!
কি হাসি বদনে, আহা! কি প্রেম নয়নে!
সফল হইবে স্বপ্ন? একি দেখি পুনঃ!
হইয়া যুগল রূপ ক্রমে রূপান্তর

কি মূর্তি ভাসিল ওই,—সুভদ্র অর্জুন !
পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুভদ্রা আমার।
পিত ! পিত ! মুছে ফেল শোক হৃদয়ের।
এই দেখ শৈল আজি দুহিতা তোমার।
সফল তপস্যা ; দেখ হৃদয় তাহার
পিতৃপ্রেমে অবিচল, স্থির, অকম্পিত।
মা আমার ! মা আমার ! প্রেম মুখ তোর
কি সুন্দর, কি ত্রিদিব ! কি দেখি আবার !—
এক অঙ্গে দুই রূপ হইয়া বিলীন,
কি মূর্তি মহিমাময়, নীলমণিময়,
উঠিয়া ভাসিয়া শতচন্দ্র-করোজ্জ্বল !
বাসুদেব ! নারায়ণ !"—
ধীরে ধীরে আসি
দাঁড়াইয়া আগে কৃষ্ণ ! হইল পতিতা
শৈলজা সুভদ্রা পদে, উভয় মূর্ছিতা।
চাহি আকাশের পানে, মহিমা মণ্ডিত
দাঁড়াইয়া নারায়ণ আপনি মূর্ছিত।

* * *

দাঁড়াইয়া থাক নাথ !
নিরখি নয়ন ভরি।
আর্য অনার্যের লক্ষ্মি !
থাক মা চরণে পড়ি।
অনার্য-আর্য শক্তির
এইরূপ সংঘর্ষণ—
ভারত-নিয়তি যদি,
তব ইচ্ছা নারায়ণ
এইরূপে পদতলে
হ'য়ে শেষে সম্মিলিত
উদ্ধারি পতিত, নাথ !
হয় যেন প্রবাহিত।
থাক দাঁড়াইয়া নাথ !
নিরখি নয়ন ভরি।
আর্য অনার্যের লক্ষ্মি !
থাক মা চরণে পড়ি।

চতুর্দ্দশ সর্গ

বিদায়

"উত্তরে! উত্তরে! কই, অভিমন্যু কই?"—
উত্তরার শিবিরেতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সুলোচনা
আসি উন্মাদিনীপ্রায় কহে স্নেহময়ী—
"উত্তরে! উত্তরে! কই, অভিমন্যু কই?
শুনিয়াছি মহা-রণ করিতেছে দ্রোণ আজি,
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার,
কই, অভিমন্যু কই, উত্তরে! আমার?"
ধরিয়া সখীর গলা কাঁদিয়া বিরাট বালা
কহে—"ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পাইয়া এখন,
গিয়াছেন তথা; কিছু নাহি জানি আর;
কাঁদিতেছে প্রাণ মা গো! তোর উত্তরার।
গতনিশি চন্দ্র পানে চাহিয়া চাহিয়া
হইনু নিদ্রিতা যবে, দেখিনু স্বপন—
ঘেরিল অভিরে সপ্ত শার্দ্দুল ভীষণ।
দাঁড়াইয়া দৃপ্ত সিংহশিশু মধ্যস্থলে,
পরাজিল সপ্ত শত্রু অপূর্ব্ব কৌশলে।
শশাঙ্ক হইতে ধীরে নর-নারায়ণ
মনোহর পুষ্পরথে করি আরোহণ,
নামিলেন; নিরমল রথ জ্যোৎস্নায়
আলোকিত রণক্ষেত্র অমৃত ধারায়!
অভিরে তুলিয়া রথে লইয়া আদরে
উঠিতে লাগিল রথ আকাশে মন্থরে।
কহিলাম,—"দয়াময়! লও উত্তরায়।"
করুণ নয়নে চাহি কহিলেন হায়!
জগন্নাথ,—নেত্রে স্নেহ-অশ্রু দর দর—
"না, না, বৎসে! যাবে তুমি বৎসর অন্তর!"
কহিনু—"না, প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!"
জয়নাদে পূর্ণ হ'ল পৃথিবী গগন;
নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি তারাগণ।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায়!
এ কি স্বপ্ন মা গো! অভি গেল মা! কোথায়?"

সুলোচনা

বাপ তোর পোড়া মুখ, স্বপ্ন পোড়া ছাই
মুণ্ড তার, সাত বাঘ সগোষ্ঠী বিরাট।
ননীচোরা চুরি করি আনিল বাছায়
কোলে মম, তোর বাপ পড়ে যেন পায়ে।
কহিস্ অভিরে যদি এ পোড়া স্বপন—
এমনি খাইবি মায়! চলিনু এখন,
আজি রণে যেতে তারে দিব না কখন।
অপূর্ব্ব স্বপন ব্যাখ্যা! হাসিল উত্তরা,
বরিষা-জ্যোৎস্না-খেলা,—নেত্র অশ্রুভরা।
ভাবিল—"সুলিমা ওই বাঘিনীর মত
ছুটিয়াছে শিশুহারা, আজি রণে আর
পারিবে না যেতে, আর কি ভয় আমার?
কেনই বা এত ভয় হয় আজি মনে,
থেকে থেকে কাঁপে বুক কেন অকারণে?
গোবিন্দ মাতুল যার, সুভদ্রা জননী,
পিতা ধনঞ্জয়, নিজে বীরেন্দ্র আপনি
রথি-শ্রেষ্ঠ—মহারথী, সে যাইবে রণে;
তাতে কেন এত ভয় হবে মনে মনে?
হাসি মুখে নিত্য যায়, নিত্য করে রণ,
রণক্ষেত্র যেন তার খেলার প্রাঙ্গণ।
আমি কি ডরি রণে? নহি কি ক্ষত্রিয়া?
বিরাট-তনয়া আমি, অভিমন্যু-প্রিয়া?
অর্জ্জুনের শিষ্যা আমি, সেই নাট্য ঘরে
শিখালেন অস্ত্র বিদ্যা কতই আদরে।
দেখি অস্ত্র শিক্ষা মম, লইয়া হৃদয়ে
কহিতেন—'হবে পতি অর্জ্জুন-তনয়!'
জানিত না অভি; এক দিন দ্বারকায়
সৃজিল দুর্ভেদ্য লক্ষ্য; বিঁধিনু হেলায়
সে লক্ষ্য; বিস্মিত বক্ষে লইয়া আমায়
কি চুম্বন, কি প্রশংসা, গলায় গলায়।
নাহি ডরি রণে, কিন্তু চক্ষের অন্তর
হইলে মুহূর্ত্ত, প্রাণ কাঁপে থর থর।
এত রূপ, এত গুণ! পারিজাত হার

মিলিয়াছে মম ভাগ্যে, প্রত্যয় আমার
নাহি হয় পোড়া মনে। জাগ্রতে নিদ্রায়
'হারালেম, হারালেম,'—ভয় হয় মনে।
ইচ্ছা করে, রাখি সদা নয়নে নয়নে
মিশাইয়া বুকে বুকে, জীবনে জীবনে।
কেন এত ভালবাসি, কেন তার তরে
প্রাণ মম নিরন্তর এইরূপ করে?
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, শাশুড়ী, শ্বশুর,—
কারো তরে প্রাণ নাহি করে এত দূর।
ইচ্ছা করে চিরি বুক বুকের ভিতর
রাখি মুখ খানি, দেখি জন্ম জন্মান্তর।
তাঁহার বসনখানি, পাদুকা তাঁহার,
কি সুগন্ধ! প্রতিদিন চুম্বি কতবার!
হইলে নিমেষ মাত্র চক্ষের অন্তর,
দুখানি পাদুকা রাখি বুকের উপর।
পদ-প্রক্ষালিত বারি-সুধা করি' পান,
প্রাণের পিপাসা মম করি নিবারণ।
কি যে করিতেছে প্রাণ! আজি কদাচিৎ
যাইতে দিব না রণে; এ কথা নিশ্চিত।
কিন্তু এ বিলম্ব কেন?" পতি-সঙ্গহীনা
বন-বিহঙ্গিনী মত করিছে নবীনা
ছট্ ফট্, শিবিরেতে উঠিয়া বসিয়া।
এবার বসিল বামা বীণাটি লইয়া।
গাহিতে লাগিল, কণ্ঠ হয় না মধুর।
এত যত্ন, তবু বীণা বাজিছে বেসুর।
আবার বাঁধিতে বীণা ছিঁড়ে গেল তার।
দূরে নিক্ষেপিয়া যন্ত্র, খুলিল ভাণ্ডার
পুতুলের,—ও কি! দ্বারে অস্ত্র ঝনৎকার!
বাজিল সে শব্দ বেগে প্রাণে উত্তরার।
যুদ্ধ বেশে অভিমন্যু,—মস্তকে উষ্ণীষ,
কক্ষে মণিময় অসি, তীব্র আশীবিষ।
অঙ্গে বর্ম, পৃষ্ঠে চর্ম তূণ, ধনুর্বাণ,
অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র, বক্ষে উরস্ত্রাণ।
খচিত আরক্ত নীল কৌষিকে সুন্দর
সমাবৃত দীর্ঘায়ত হেম কলেবর,—
মেঘাবৃত হিমাদ্রির কাঞ্চন শেখর।
মুহূর্ত উভয় পানে চাহে আত্মহারা,—
কৃষ্ণা-দ্বাদশীর চন্দ্র চাহি শুকতারা।
চিন্তার ঈষৎ মেঘে বদনে যুবার
করিয়াছে অনুপম গাম্ভীর্য সঞ্চার।
গেল সেই মেঘছায়া নিমেষে সরিয়া,
হাসির জ্যোৎস্না মুখে উঠিল ভাসিয়া।

অভিমন্যু

উত্তরে! কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার!
ষোড়শ বৎসর মম; সেনাপতি-পদে
করেছেন ধর্মরাজ এ দাসে বরণ
আজি রণে। এই দেখ উষ্ণীষে আমার
আশীর্বাদ, গলে বীর-বাঞ্ছনীয় হার।
দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি! ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব ভার,
কোন্ ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্ ক্ষত্রিয়ার?
দে বিদায় হাসি মুখে! খেল্ ততক্ষণ
পুতুল লইয়া তোর; পুতুলের সনে
খেলিয়া আমার খেলা আসিব এখন।

উত্তরা

হইবে বিবাহ আজি কন্যার আমার।
দেখ দেখি মেয়ে মম সুন্দরী কেমন!
কেমন সোণার নাক, রূপার নয়ন!
দেখ স্বয়ম্বর-সভা! রাজা অগণন
বসিয়াছে চারি দিকে। বর কর্তা তুমি;
তুমি গেলে, কে করিবে বর অভ্যর্থনা?
বিয়া ফেলি পাত্রী তবে যুড়িবে ক্রন্দন।
কাঁদ পোড়ামুখী!—
কন্যা কাঁদিতে লাগিল
"পিঁ পিঁ" রবে, অভিমন্যু হাসিয়া আকুল।

অভিমন্যু

থাকিতে এমন বর,—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়,
কাঁদিতে বরের তরে হইবে না তোর
দুহিতার। যুদ্ধ-অন্তে সায়াহ্নে পূরণ
হবে স্বয়ম্বর সভা; বিদায় এখন।
ছুটি বিজলীর বেগে, শিবিরের দ্বার
রুদ্ধ করি দাঁড়াইল বালা আচম্বিত,
রুদ্ধ কবাটেতে পৃষ্ঠ করিয়া স্থাপিত।
বাম পদ অগ্রে, করে কবাট চাপিয়া,
পটে যেন রতি-চিত্র উঠিল ভাসিয়া!
আলু থালু বেণী, আলুলায়িত বসন,
কেশ-বাস-সমাচ্ছন্ন অরুণ বরণ!

বিস্তৃত বিশাল নেত্র, বদন গম্ভীর,—
নবীন অরুণ বক্ষে নীল সরসীর।
দাঁড়াইয়া দুইজন, চিত্র নিরুপম,
ধ্যান ভঙ্গ দিনে যেন রতি ও মদন।

উত্তরা

না, না, নাথ! আজি রণে যাইতে কখন
দিবে না উত্তরা তার থাকিতে জীবন।
যাবে যদি, ওই বর্শা,
হান উত্তরার বক্ষে!
পড়িবে উত্তরা তব চুম্বিয়া চরণ,
লঙ্ঘি মৃত দেহ তার করিও গমন।

অভিমন্যু

প্রাণাধিকে! একি কথা! বীরের দুহিতা,
বীরের বনিতা তুমি, এই কাতরতা
সাজে কি তোমার, পুত্রবধূ অর্জুনের?
ষড়যন্ত্র করি শত্রু সংশপ্তক সনে
করিয়াছে পিতৃদেবে যুদ্ধে নিয়োজিত
ঘোরতর একদিকে; অস্ত্রগুরু দ্রোণ
অন্য দিকে চক্রব্যূহ করিয়া নির্মাণ
করিছেন মহারণ। শুন হাহাকার
করিছে পাণ্ডব সৈন্য। সঙ্কট ভীষণ
দেখিয়া পাণ্ডব-পতি করিলা বরণ
এই দাসে; আজি আমি না করিলে রণ,
ধর্মরাজে বন্দী আজি করিবেন দ্রোণ।

উত্তরা

এখনও পাণ্ডব পক্ষে আছে অগণন
রথী মহারথী।

অভিমন্যু

আছে,—দ্রোণের বিক্রম
না জান বালিকা তুমি। প্রতিজ্ঞা তাঁহার
শুন নাহি তুমি;—নাহি থাকে ধনঞ্জয়,
করিবেন ধর্মরাজে গ্রহণ নিশ্চয়।
ইন্দ্রোপম পিতা বিনা কেহ নাহি আর
পরাভবে দ্রোণে, দ্রোণ সমরে দুর্বার।

উত্তরা

করিবে কেমনে তুমি পরাভব তাঁরে?

অভিমন্যু

অভিমন্যু আমি, আমি অর্জুনকুমার।

বাম করে শেল, অসি করি নিষ্কোষিত
অন্য করে, শিবিরের চারু গালিচায়
অসি অগ্রে চক্রব্যূহ করিয়া অঙ্কিত
দেখাইলা—বীর বক্ষ উৎসাহে পূরিত—
কোন্ রূপে চক্রব্যূহ করিয়া ছেদন
পশিবেন দ্রোণসৈন্যে। আনত বদন,
উত্তরা চাহিয়া আছে জন্মের মতন!
ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে কেমনে
অমঙ্গল অশ্রুবারি আসিছে নয়নে।
তুলি মুখ অভিমন্যু কহিলা হাসিয়া,—
"এইরূপে চক্রব্যূহ করিব লঙ্ঘন,
লঙ্ঘে যথা সিংহ-শিশু ব্যাধের বন্ধন।
কিম্বা লঙ্ঘি অবরোধ মেষপালকের
পশে যথা মেষপালে কেশরি-কুমার,
প্রবেশিব কুরু-সৈন্যে। দেখিবেন দ্রোণ
আজি রণে অগ্নি-শিশু অগ্নি-পরাক্রম।
দেখিবেন পিতৃ-গুরু, এ ভুজ বিশাল
অর্জুনের, অর্জুনের এই বক্ষ মম,
প্রদীপ্ত পার্থের বীর্যে শোণিত আমার।
এ ধনু গাণ্ডীব-শিশু, এ তূণীর মম
অক্ষয় তূণীর-পূর্ণ, পূর্ণ বজ্র জালে,—
অর্জুনের অস্ত্র-শিশু, বিষধর-শিশু;
পিতৃসম তীব্র বিষধর। দেখিবেন দ্রোণ
এই ধনু, এ তূণীর, এই শরজাল
অর্জুনের পরাক্রম অরাতির কাণে
পারে কহিবারে বজ্র নির্ঘোষে ভীষণ;
পারে লিখিবারে উগ্র অনল অক্ষরে
অরাতির বুকে। নাহি থাকুক অর্জুন,
দেখিবেন দ্রোণাচার্য, অর্জুনকুমার
করিবে বিফল আজি প্রতিজ্ঞা তাঁহার।
তুচ্ছ এক মহারথী, মহারথী দশ
হয় যদি হত আজি, তথাপিও দ্রোণ
ধর্মরাজ কেশাগ্রও ছুঁইতে কখন
নাহি পারিবেন। প্রিয়ে! কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ
একে একে আজি রণে করি পরাজিত,
রাখিব ক্ষত্রিয় কুলে কীর্তি অতুলিত।

উত্তরা

কিন্তু সাতজনে যদি করে আক্রমণ?
অভিমন্যু উচ্চ হাসি উঠিলা হাসিয়া—
"এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম; জাতিতে কেশরী

ক্ষত্রিয়েরা, এই নীচ বৃত্তি শৃগালের
নহে কর্ম ক্ষত্রিয়ের। আসে সপ্ত জন,
আসে সপ্তদশ জন,—কি ভয় উত্তরে?
একা সিংহ নাহি ডরে শিবা অগণন!"
বাজিল সমরবাদ্য বিজয়ঝঙ্কারে
শিবিরের দ্বারে। বেগে ছুটিয়া কুমার,
বাম করে শেল, ধরি প্রেম প্রতিমায়
হৃদয়ে দক্ষিণ করে চুম্বিলা চুম্বন,
প্রভাতে নলিনী যেন চুম্বিয়া অরুণ।
মুহূর্ত্তের সে চুম্বনে কি অনন্ত ভরা।
কি অনন্ত প্রেম-তৃষ্ণা নীরব-মুখরা!
কি অনন্ত সুখ দুঃখ, কি অনন্ত ভাষা!
কি অনন্ত নিরাশায় কি অনন্ত আশা!
দুই হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র সম্মিলন,
দুই সমুদ্রের ক্ষুদ্র অনন্ত সঙ্গম।
সেই ক্ষুদ্র পথে কি উচ্ছ্বাস অপার,
উভয়ে উভয় প্রাণে করিছে সঞ্চার।
ঊর্দ্ধ মুখে অধোমুখে—শোভিছে কেমন,
চন্দ্র জলধির যেন শেষ দরশন
পূর্ণিমা উষার! ধীরে ধীরে উত্তরায়
সরাইয়া অভিমন্যু, যথা জ্যোৎস্নায়
সরায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ পূর্ণিমা প্রভাতে,
খুলিল শিবির দ্বার ছুটিয়া কুমার,
ছিঁড়িয়া অজ্ঞাতে কণ্ঠহার উত্তরার
শেলাঘাতে। বজ্রাঘাতে বুক উত্তরার
হইল চূর্ণিত, বামা রহিল চাহিয়া
বজ্রাহতা মত স্থিরা শূন্য নিরখিয়া।
সংশপ্তক যুদ্ধে বীরেন্দ্র ফাল্গুনী,—
ধ্যানস্থা সুভদ্রা মাতা বসিয়া পূজায়
পতির মঙ্গল ব্রতে। পশিয়া কুমার
সবেগে শিবিরে, স্থির রহিল চাহিয়া
মুহূর্ত মায়ের মূর্তি নয়ন ভরিয়া।
দ্বারে রণ-বাদ্য, কক্ষে অস্ত্র-ঝনৎকার—
ভাঙ্গিল ভদ্রার ধ্যান। রাখিয়া উষ্ণীষ
মায়ের চরণ তলে, প্রণমি কুমার
কহিলা,—"মা! দ্রোণাচার্য ঘোরতর রণ
করিছেন চক্রব্যূহ করিয়া নির্মাণ।
পিতার অবিদ্যমানে, সেনাপতি পদে
ধর্মরাজ এই দাসে করিলা বরণ।
দেও মা! বিদায় রণে; কর আশীর্বাদ,
আজি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
অর্জুনের পুত্র আমি, সুভদ্রা নন্দন,
গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য। স্বধর্ম পালন
করি, ধর্মরাজ্য, আজি করিব স্থাপন।"
গিয়াছেন পতি, পুত্র যাইছে সমরে
দুর্জ্জয় সঙ্কট পূর্ণ; জাগিছে হৃদয়ে
শৈলজার প্রতিষেধ, অমঙ্গল ছায়া,
স্থির সরোবরবক্ষে ছায়া জলদের,—
তথাপি একটি রেখা মুখে রূপান্তর
হইল না সুভদ্রার। রহিলা চাহিয়া
প্রাণাধিক পুত্র স্নেহ ছল ছল,
স্বর্ণ-দেবী-প্রতিমার মত অবিচল।

সুভদ্রা

বুঝিলাম হইয়াছে পাণ্ডব বাহিনী,
কৃষ্ণার্জুন বিনা, যেন বিপন্না তরণী
সিন্ধুগর্ভে ঝটিকায় নাবিক-বিহীনা।
হইয়াছে পাণ্ডবের মহা সৈন্য হায়!
যেন মহারথ রথি-সারথি বিহীন।
কৃষ্ণের ভগিনা তুই শিষ্য প্রিয়তম,
অর্জুনের পুত্র তুই, নিজে মহারথী,
নির্ভয়ে ধরিয়া কর্ণ, আরোহিয়া রথে,
হেলায় সমরসিন্ধু করি অতিক্রম,
আনন্দে চলিয়া যাবি বিজয়ের পার!
নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন
তোর জননীর মত? ভ্রাতা নারায়ণ,
পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
মহারথী; ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে,
জগতের এই মহাক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
আজি পুত্র ক্ষেত্রপতি! শোভিছে তাহার
গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক!
আনন্দাশ্রু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল
বীর-জননীর বক্ষে; বহিতে লাগিল
জীবন্ত উৎসাহ ধারা শক্তি সঞ্চারিণী
পুত্রের হৃদয়ে, পুত্র হইল বিহ্বল।
পুষ্পপাত্র হ'তে লয়ে চারু পুষ্পহার
দিলা কুমারের গলে সস্মিত বদন।
কুমার মায়ের বুকে রাখিয়া বদন
রহিলা নীরবে, মাতা নীরব সজল,—
কি উচ্চ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হৃদয় যুগল,

সুভদ্রা

পিতৃগুরু দ্রোণ অতি সাবধানে
বাছা রে! করিস রণ।
না করিস্ তুচ্ছ, হয় যদি শত্রু
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম।
করি আশীর্বাদ,— সুভদ্রার বুক
হইবে কবচ তোর;
সুভদ্রার অঙ্ক হবে তোর রথ;
শত্রু শরজাল ঘোর
হবে সুকুমার যেন সুভদ্রার
স্নেহমাখা পুষ্পহার;
হৃদয়ে গোবিন্দ, বাহুতে অর্জ্জুন
লক্ষ্য নর-সমুদ্ধার;
সমর প্রাঙ্গণ স্বয়ম্বর সভা
হইবে, যাদু আমার!
জয়লক্ষ্মী আজি হইবে সপত্নী
মম বধূ উত্তরার।

চুম্বিলা ললাট আবার আবার
আদরে লইয়া বুকে;
কি করিছে হায়! মায়ের পরাণ
চিহ্ন তার নাহি মুখে।
মায়ের চরণে প্রণমি কুমার
চলিল সমরে সুখে,—
শিরায় শিরায় কি অজেয় বল,
কি বীর্য জ্বলিছে বুকে!
"সুভদ্রে! সুভদ্রে! কই? মম বাছা কই?"
পাণ্ডব শিবির খুঁজি, খুঁজি অস্ত্রাগার,
সত্রাসে শিবির পুনঃ খুঁজি উত্তরার,
উন্মাদিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি সুলোচনা
ধরিল কুমারে, অস্ত্রে পড়িল ঝননা।
কহে গলা জড়াইয়া ধরি সুলোচনা,
"কোথায় যাবি রে যাদু!"
"যাব না কোথায়"—
চাপিয়া কণ্ঠের বাষ্প, অশ্রু নয়নের,
কহে অভিমন্যু—"আমি যাব না কোথায়।
তোরে ছেড়ে কোথাও কি পারি মা! যাইতে?
তোরে ছেড়ে যাই যদি, স্বর্গেও আমার
হইবে না সুখ, কোথা আছে আর?
তোর মুখ, তোর বুক, স্বর্গ যে আমার।"

সুলোচনা

তবে কেন রণ বেশ?

অভিমন্যু

চাহি একবার
দেখাইতে দ্রোণাচার্যে স্তন্যে সুলিমার
কত শক্তি, কত শক্তি ক্ষীরে সরে তার।

সুলোচনা

না না, আজি রণে আমি প্রাণান্তে কখন
দিবা না যাইতে তোরে। যাবি যদি, আগে
বসাইয়া অসি তোর সুলিমার বুকে
যা রে চলি! যাবি যদি মরিবে নিশ্চয়
এ অভাগী, মাতৃহত্যা ঘটিবে রে তোর।

অভিমন্যু

ছি! মা! হেন অমঙ্গল কথা কদাচিত
আনিস্ না মুখে। তুই গেলে মা ছাড়িয়া,
কে দিবে রে সর ননী অভিরে মা! তোর?
কে দিবে তাহারে অন্ন? কে পুষিবে তারে
এত স্নেহে? কে কাঁদিবে যুদ্ধযাত্রাকালে
পবিত্রিয়া রণ-বেশ নয়নের জলে,
শত্রু-শরজাল যেন না পারে ছুঁইতে।
গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক,—
দেখ্ মা নয়ন ভরি; কি গৌরব তোর!
পাণ্ডব সৈন্যের আজি সেনাপতি আমি!
কি গৌরবে আজি মম অসি সমুজ্জ্বল!
না যাই সমরে যদি, কি কলঙ্ক মা গো
রটিবে আচন্দ্র সূর্য! সহিবি কেমনে?
অভিমন্যু পুত্র তোর সহিবে কেমনে?

সুলোচনা

আমার এ বালসূর্যে কার সাধ্য করে
কলঙ্কের কালিমা অর্পণ?
সহস্র কলঙ্ক যদি হয় তোর, হবে তাহা
অভাগীর অঙ্গের ভূষণ।
কহিস লোকের কাছে,— "গোপকন্যা সুলোচনা
সম্বল তাহার ননী সর।
সর ননী সম প্রাণ; নাহি জানে বীরধর্ম্ম,
নাহি দিল করিতে সমর।"
যাক্ তার পোড়া মুখ আরো পুড়ি, তবু তুই
থাক্ বুক অঙ্ক যুড়ি তার।
কলঙ্ক-ভঞ্জন কৃষ্ণ দিলা যারে পদ-ছায়া,
কলঙ্কে মা! কি ভয় তাহার?

আছে দেবী সুভদ্রার দেব পতি, দেব ভ্রাতা,
কর্মক্ষেত্র অনন্ত সংসার।
সুলোচনা দুঃখিনীর কে আছে, কে আছে আর?
এই তুই সর্বস্ব তাহার।
তুই ধর্ম, তুই কর্ম তুই প্রাণ, তুই মর্ম,
তুই অবলম্বন আমার।
তোর চন্দ্রমুখ স্বর্গ, তোর গৃহ কর্মক্ষেত্র,
তুই মম সকল সংসার।
আজন্ম অনাথা আমি, জানি কৃষ্ণার্জুন স্বামী,
সত্যভামা সুভদ্রা রুক্মিণী।
আমার ভগিনী তিন, তুই এক মাত্র পুত্র
আমি তোর যশোদা জননী।
বড় সাধ বৃন্দাবনে ল'য়ে তোরে সাজাইব
বনমালী গোপাল আমার;
হয়েছিল কৃষ্ণরূপে বিমোহিত বৃন্দাবন,
গৌর রূপে মোহিব আবার।
কৃষ্ণ হারা বৃন্দাবন কাঁদিতেছে নিরন্তর,
গৌর রূপে উচ্ছ্বসিবে প্রাণ।
হাসিবেক স্বর্ণ হাসি, কালিন্দী হইয়া গৌরী
মনসুখে বহিবে উজান।
না, না, হৃদয়ের নিধি! চিরি অভাগীর বুক
আজি রণে যাইতে কখন
দিব না দিব না তোরে না জানি আমার প্রাণ
আজি কেন করিছে এমন!

অভিমন্যু

কেন মা! নিত্য ত রণে যাইতেছি, কোন দিন
করিস্ নি এমন বারণ?

সুলোচনা

ছিল কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিবারে রণ-ক্ষেত্রে
অভাগীর শাবক রক্ষণ।

তাহাতে দ্রোণের আজি প্রতিজ্ঞা ভীষণ;
দুর্বিজয় চক্রব্যূহ, দুর্নিবার রণ!—
আজি রণে যেতে তোরে দিব না কখন।

অভিমন্যু

অর্জুনের পুত্র আমি, সুভদ্রা-কুমার,
কৃষ্ণের ভাগিনা শিষ্য; কি ঘৃণা মা! তুই
ডরিস্ ব্রাহ্মণ দ্রোণে। ভাবিস্ কেমনে
সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্রোণ ফেলিবে উপাড়ি
এই শাল বৃক্ষ তোর পালিত বর্দ্ধিত?
যাদব পাণ্ডব শক্তি, যমুনা জাহ্নবী,
মিলি জননীর গর্ভে, প্রয়াগে যেমতি,
বহিতেছে এই ভুজে ধারা সম্মিলিত;—
দ্রোণের কি সাধ্য, গতি রোধিবে তাহার?
একা পার্থে, একা কৃষ্ণে, ডরে বৃদ্ধ দ্রোণ;
—একাধারে কৃষ্ণার্জুন দেখিবেন আজি।
দেখিবেন পার্থ রথী, গোবিন্দ সারথি,
একাধারে মম রথে; এই ভুজ মম
দুর্জয় পার্থের বল, শিক্ষা গোবিন্দের।
তুচ্ছ দ্রোণ; বিশ্বজয়ী পিতা ও মাতুল
আসেন সমরে যদি, নাহি ডরি আমি।
একা পার্থ, একা কৃষ্ণ, পারে জিনিবারে
ত্রিভুবন এক রথে; কে সহিবে তবে
কৃষ্ণ-পার্থ-সম্মিলিত পরাক্রম মম?
তুচ্ছ চক্রব্যূহ, ওই বালির বন্ধন,
উড়াইয়া মুহূর্তে মা! সিন্ধু-পরাক্রমে
প্রবেশিব দ্রোণ-সৈন্যে মহা সিন্ধু বেগে
উদ্বেলিত, ভাসাইয়া বালি তৃণ মত
অরাতির অনীকিনী। রথী, মহারথী—
দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য—করিব না আমি
পিতার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ, বধিয়া পরাণে।
মরণ অধিক যুদ্ধে হইয়া লাঞ্ছিত
পলাইবে দাঁতে তৃণ লইয়া কেমনে,
শুনিয়া হাসিবি তুই, হাসিবে জগত;
অনন্ত কালের স্রোতে বহিবে সে হাসি।
ওই শোন্! ওই শোন্! ওই সিংহনাদ
কৌরবের, পাণ্ডবের ওই হাহাকার!
ছেড়ে দে মা! ছেড়ে দে মা!

ঘোর হাহাকার
উঠিল পাণ্ডব সৈন্যে—"কুমার! কুমার!
হায়! হায়! আজি দ্রোণ করিবে সংহার
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য।" নক্ষত্রের বেগে
ছাড়িয়া ধাত্রীর-কর ছুটিলা কুমার;
বাজিল সমর-বাদ্য বিজয় ঝঙ্কার।
সুলোচনা ভূমিতলে হইল পতিতা
বন্ধনবিহীনা স্বর্ণ-প্রতিমা, মূর্চ্ছিতা।

পঞ্চদশ সর্গ

বীরের শোক

ভারতের—জগতের—এবে অবসান
মহাদিবা। কি শোকের, কি সুখের দিন।
মানব পবিত্রকারী এই মহাশোক;
এই শোক মানবের সুখের সোপান।
অবসান? না না, এই দিবসের নাহি
অবসান। ব্যাপি চারি যুগ, মহাকাল
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এই দিবালোক
জ্বলিতেছে, জ্বলিবেক;—ঘোর অন্ধকার
কাননের পথে ফুল্ল জ্যোৎস্নার হার।
সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ
ফিরিতেছে ধীরে ধীরে; শোকভারে রথ
ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত রথীর হৃদয়।
কিন্তু সারথির সেই প্রশান্ত হৃদয়ে,
প্রশান্ত ললাট স্বর্গে নাহি সেই ছায়া।
পড়ে মেঘ-ছায়া ক্ষুদ্র বক্ষে সরসীর;
অতল জলধি বক্ষে যায় মিশাইয়া।
"হা কেশব! এ ছিল কি নিয়তি আমার!—
বাষ্প-গদ-গদকণ্ঠে কহিলা ফাল্গুনী,—
"তব নারায়ণী সেনা, অতুল জগতে,
এরূপে অর্জুন হায়! করিবে সংহার!
সত্য, দেব দ্বৈপায়ন! বুঝিনু আবার—
মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার!"
"বৃথা অনুতাপ পার্থ!" প্রশান্ত বদনে
উত্তরিলা নারায়ণ,—"সেনা নারায়ণী
সাধিবারে নারায়ণ-কার্য ধরাতলে
হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ-কার্য
এই দীর্ঘকাল, আজি জলবিম্ব রাশি
মিশাইল মহাজলে ইচ্ছায় তাঁহার;—
গাণ্ডীবী গাণ্ডীব মাত্র করেতে তাঁহার।
এখনো বুঝিলে না কি, ধ্বংস ক্ষত্রিয়ের,
কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,—
ইচ্ছা তাঁর? অধর্মের যেই মহা বিষে
ক্ষত্রিয়ের রক্ত মাংস মজ্জা জর্জরিত,
কার সাধ্য সেই বিষ করিবে উদ্ধার?
এখনো বুঝিলে না কি, হায়! ক্ষত্রিয়ের
ধ্বংস বিনা ধর্ম-রাজ্য হবে না স্থাপিত,
নিম্ব বৃক্ষে আম্র নাহি ফলিবে নিশ্চিত?"
ধীরে চলিয়াছে রথ। নাহি ক্ষুদ্র পথ
কুরুক্ষেত্রে; মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে
বিকৃত মানব শবে,—দৃশ্য করুণার!
কেহ বা নিদ্রিত যেন, প্রশান্ত বদন;—
কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটি, ঘূর্ণিত নয়নে
চাহি আকাশের পানে, মুষ্টিবদ্ধ কর;—
কেহ দন্তে তৃণ কাটি, আলিঙ্গি বসুধা—
পড়ে আছে স্থানে স্থানে শোণিত কর্দমে।
কারো অস্ত্র-ক্ষতে হায়! ঝলকে ঝলকে
এখনো শোণিতধারা বহিতেছে বেগে,
অঙ্গে অঙ্গে নানা অস্ত্র রয়েছে বিঁধিয়া।
জীবিত আহত কোথা করি নিষ্পেষিত
ছুটিতেছে পড়িতেছে ক্ষিপ্ত অশ্ব গজ
অঙ্গহীন শত শত, পূরি রণ-স্থল
ভীম নাদে, মৃত্যুমুখে! কোথায় আহত
শত শত চাহিতেছে উঠিতে, চলিতে,
—হস্তহীন, পদহীন, ছিন্ন কলেবর,—
করিতেছে হাহাকার ব্যথায় ব্যাকুল।
ছিন্ন হস্তে পদে শিরে, কবন্ধ শরীরে,
ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব গজে,
আচ্ছন্ন সমর ক্ষেত্র ক্রোশ ক্রোশান্তর।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল, কুকুর
করি ঘোর কোলাহল করিছে ভক্ষণ
অভিন্ন জীবিতে মৃতে। সায়াহ্নে গগনে
আহতের আর্তনাদ,—ভিক্ষা করুণার,
হিংস্র পশু পক্ষীদের ঘোর কোলাহল,
ভীষণ চীৎকার ক্ষত গজ তুরঙ্গের,
মিশি এক ঘোর রবে, কণ্ঠে প্রলয়ের
উঠিছে কি হাহাকার! কিবা হাহাকার
সায়াহ্নের সমীরণে যাইছে ভাসিয়া!
অবতরি স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়

আহতের ক্ষতে করি অমৃত সিঞ্চন,
করি মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তি বরিষণ,
চলিলেন অশ্রুজলে প্লাবিয়া বদন
সর্বত্র আহতগণ জিজ্ঞাসে ডাকিয়া—
"আজি কোথা আমাদের সুভদ্রা জননী ?
যন্ত্রণায় যায় প্রাণ।" কহিলেন পার্থ—
"কেন আজি সুভদ্রায় সেবক, সেবিকা,
সৈন্য-চিকিৎসক সহ, না দেখি, কেশব !
রণস্থলে ? প্রাণ বড় হয়েছে আকুল ;
সত্বর শিবিরে চল, আসিব ফিরিয়া
সুভদ্রার সহ পুনঃ। কি যে ঘোর রণ,
ধ্বংসের ভীষণ ক্রীড়া, হইয়াছে আজি !—
না পারি দেখিতে আর পাণ্ডব-সৈন্যের
এই দশা ! নাহি জানি সৈন্যে কৌরবের
হইয়াছে অস্ত্রে মম কি দশা ভীষণ !"
চলিতে লাগিল রথ। বসি অন্যমনা
উভয় সারথি, রথী ; অজ্ঞাতে কেমনে
পড়িয়াছে চক্র এক দেহে অচেতন,—
অভাগা করুণ কণ্ঠে করিল চীৎকার !
উভয় করুণ কণ্ঠে করিয়া চীৎকার
পড়িলেন ভূমিতলে, লইলেন তুলি
রথে পুনঃ—অচেতন দেহ অভাগার।
"কৌরব সে"—সৈন্য কেহ কহিল বিস্ময়ে।
প্রেম-অশ্রু-পূর্ণ মুখে, কণ্ঠে করুণার
কহিলেন কৃষ্ণ—"ভাই ! শত্রু যুদ্ধকালে
কৌরবেরা, যুদ্ধ অন্তে ভাই পাণ্ডবের।
ঝটিকায় যে তরঙ্গ উত্তাল ফেনিল
মহাদ্বন্দ্বী, ঝটিকান্তে অভিন্ন সলিল।"
আবার চলিল রথ। নীরব উভয়
রহিলেন কিছুক্ষণ। অজ্ঞাত শোকে
দুইটি হৃদয় যেন আচ্ছন্ন, অচল।
সাশ্রুকণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয়
কহিলা—"কেশব ! কেন হৃদয় আমার
ভীত আজি, মরু সম বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ ?
বুঝিয়াছি, নিঃক্ষত্রিয় করিতে জগত
জন্ম মম। করিয়াছি আত্মীয় বিনাশ
সে নিয়তি অনুসরি ত্রয়োদশ দিন ;—
হয় নাই প্রাণ মম কাতর এমন।
কি যে অমঙ্গল ধ্বনি বাজিছে শ্রবণে,
অদূর মরুর যেন উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
তৃষ্ণাতুর অবসন্ন পথিকের কাণে !
কি যে অমঙ্গল দৃশ্য মনের নয়নে
ভাসিতেছে, অবসন্ন নেত্রে পথিকের
অনন্ত উত্তপ্ত যেন মরু বিভীষণ !
চক্রব্যূহ করি, হায় ! দুর্বিজয় দ্রোণ
করিলা কি ধর্মরাজে বন্দী আজি রণে ?
কিম্বা অভিমন্যু তব আছে ত কুশলে ?
দেখিতে তাহার মুখ, প্রীতি পুষ্পবন,
আজি কেন প্রাণ মম কাতর এমন ?"
চাপি অমঙ্গল চিন্তা স্থিরকণ্ঠে ধীরে
কহিলেন বাসুদেব,—"আছেন কুশলে
ধনঞ্জয় ! মহারাজ অমাত্য সহিত।
দুর্ভাবনা কর দূর। মঙ্গল-নিদান
করিবেন তোমাদের অজস্র কল্যাণ।"
উত্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিলা অদূরে
দুই জনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
আকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা—"কেশব !
বাজে না মঙ্গলতূরী, দুন্দুভি, পঠহ ;
নীরব মুরজ বীণা। পরাভবি সংশপ্তক
আসিতেছি ; কই, নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রসরি স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল সঙ্গীত ?
পুর-নারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরের দেয় উলুধ্বনি,
করে পুষ্প বরিষণ ? কই পুত্রগণ ;
কই, অভিমন্যু কই ;—আসে না ছুটিয়া
প্রীতিপূর্ণ মুখে করি প্রীতি সম্ভাষণ,
নারায়ণ !"—অর্জুনের ভিজিল নয়ন।

চক্রব্যূহ মহা ক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহা দুর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জন-স্রোত বেগে
ছুটিয়াছে এক স্রোতে সেই দুর্গ পানে ;—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে রথ সেই দিকে।
কহিলা কেশব,—"পার্থ ! চক্রব্যূহ করি
আজি যুঝিলেন দ্রোণ ; সেই চক্রব্যূহ
হইয়াছে শব-ব্যূহ দেখ কি ভীষণ !

স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর,—
রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর মত শোভিছে কেমন!
কোন্ বীরমণি আজি জগত-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্তিমালা পরিল গলায়!
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন!"
আর চলিল না রথ; পড়িলা ভূতলে
লম্ফ দিয়া দুই জন; করিয়া লঙ্ঘন
ঊর্ধ্বশ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিয়া সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শব-চক্র মহাবেলা; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডব সৈন্য, ঊর্মির মতন
উদ্বেলিত মহা শোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তুণ।
রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকর তলে।
বাণ-বিদ্ধ মীন মত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্ছিত বিরাটপতি; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহা শিশু! ক্ষত কলেবর
রক্তজবা সমাবৃত; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্ছিতা; মূর্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণ-নাম। মূর্ছিত অর্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—অর্জুন! অর্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীর-ধর্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি;
বীর-শোক, অশ্রু নহে;—অসির ঝঙ্কার।"
মুহূর্ত আগ্নেয়গিরি হইল কম্পিত।
হইয়া বিদীর্ণ তবে, মুহূর্ত বর্ষিয়া
তরল শোকাগ্নি, বেগে বর্ষিতে লাগিল
বজ্রানল কুরুক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
"অসি! অসি!"—বেগে অসি করি নিষ্কোষিত,
—বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরি বর্ষিল গৈরিক,—
"বসাইব কার বুকে কহ, মহারাজ?
অর্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বল?—
প্রহারিল এই বজ্র হৃদয়ে তাহার?
কেশব, পার্থের, আহা! দেবী সুভদ্রার
হৃদয় বিদীর্ণ করি, হৃদয়ের ধন
কে হরিল এইরূপে? দেব-প্রতিভায়,
বিক্রমে, মাহাত্ম্যে, জ্ঞানে, অভিমন্যু মম
কেশবের সমকক্ষ; রথি-গণনায়
আমার অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্ধগুণে;
হেন মহাবাহু পুত্রে কে জিনিল রণে?
ওই দেখ, ভূপতিত আদিত্যের মত
মণ্ডিত কিরণজালে, শোভে পুত্র মম
বিমণ্ডিত শরজালে! সস্মিত বদনে
কুঞ্চিত কেশান্ত মৃদু, ভ্রূযুগ বঙ্কিম,
স্থির নিমীলিত মৃগ-শাবক নয়ন,
সমুন্নত কলেবর শালবৃক্ষ সম
মৃত্যুরো ছায়ায় দেখ শোভিছে কেমন!
সুদর্শন-সংরক্ষিত অমৃত ভাণ্ডার
হরিল কি মৃত্যু আজি? হা পুত্র আমার!
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু-পুরী,
মৃত্যু-পুরী স্বর্গ আজি প্রভাবে তোমার!
জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্বাহ্নে অস্ত? কবিতা জ্যোৎস্না
অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সঙ্গীতের বীণা

নীরবলি আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে ?
প্রকৃতির অতুলিতা তুলি বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম আভাসে ?
হায় ! মাতঃ বসুন্ধরে ! প্রকৃতি জননি !
ক্ষত্রিয়ের কুল-লক্ষ্মি ! এ দারুণ শোক
তোমরা পার্থের মত সহিবে কেমনে ?
উঠ বৎস ! উঠ ! না না, নাহি মৃত্যু তোর।
দেবীপুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের,
দেবশিশু তুই ; ওরে, করিতে প্রচার
জগতে দেবত্ব—তোর জন্ম ধরাতলে।
দেবতার নাহি মৃত্যু। উঠ বৎস! উঠ!
অচেতনা দেবীমাতা বসিয়া শিয়রে ;
অভাগিনী সুলোচনা বক্ষে অচেতনা ;
অচেতনা পদতলে আনন্দ প্রতিমা
আমার উত্তরা বধূ। নিজে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর, মৃত্যুঞ্জয় হরি,—
কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটে রে তোর !
উঠ বৎস ! উঠ ! এই পাপ ধরাতলে
এখনো ত ধর্মরাজ্য হয় নি স্থাপিত।
মানব-উদ্ধার বৎস ! হয় নি সাধিত।
উঠ বৎস ! উঠ ! চল পিতা পুত্র মিলি
এখনি পশিব রণে, নিশীথ আহবে
বিনাশিয়া কুরুকুল, অধর্ম-খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে,—ভীষণ কানন,—
ধর্মরাজ্য ইন্দ্রপস্থে করিব স্থাপিত।
বাজাও সমর বাদ্য ! সাজ সৈন্যগণ !
চল সখে ! পিতা পুত্র আজি এক রথে
যুঝিব, নাশিব শত্রু ; করিব স্থাপিত
ধর্মরাজ্য ; উদ্ধারিব নর নিপতিত।"
শোকোন্মত্ত ধনঞ্জয় যাইতে ছুটিয়া
আস্ফালি গাণ্ডীব অসি, ধরিলা কেশব ;—
জ্ঞানবক্ষে শোকবেগ হইল রোধিত।
"এই বিশ্ব লীলা-ভূমি ;—গদ গদ স্বরে
কহিলেন নারায়ণ,—"বিশ্বনিয়ন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান
করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।
জ্বলিছে নিবেছে দীপ আলোকিয়া গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য গৃহস্থের।
আলোক প্রদান, পার্থ ! নিয়তি দীপের।
আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ।
আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার।
জন্মিতেছি, মরিতেছি,—নিয়তি আমার
পালিতেছি এইরূপে জন্ম জন্মান্তরে
নারায়ণ-লীলাভূমে। ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহা লীলাযন্ত্রে ; নিয়তি পালন
সুখ মম ; ঘোর শোক—নিয়তি লঙ্ঘন।—
ধনঞ্জয় ! নাহি শোক দ্বিতীয় আমার।
দেখ বৎস সাধি বীর-নিয়তি তাহার
মানব উদ্ধার ব্রতে, ব্রতে নিয়ন্তার,
লভিয়াছে সুখ-নিদ্রা কোলে জননীর
শান্তিময়ী, প্রীতিময়ী। নহে শোক-অশ্রু,
ধনঞ্জয় ! আনন্দাশ্রু কর বরিষণ।
তোমার, আমার, আজি ভগ্নী সুভদ্রার,
সার্থক জীবন। আজি ধন্য জগতের
তুই মহাকুল। দুই শক্তি স্রোতস্বতী
অভিমন্যু বীরদর্পে করি সম্মিলিত,
করিয়াছে কি প্রয়াগে আজি পরিণত !
কর শোক পরিহার ! করি অনুসার
চল এই মহাগতি,—সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে, দুই জনে লভি নিরবাণ !"
ধনঞ্জয় শোকবেগ করি সম্বরণ
পুত্র-সারথির পানে চাহি জিজ্ঞাসিলা—
"কহ সুত ! কোন্ মতে করি মহারণ
লভিল এ মহা শয্যা কুমার আমার ?"
"ওকি দেখা যায় !"—ত্রস্তে কহিলা সারথি,
চমকিল শ্রোতাগণ আতঙ্কে বিস্ময়ে—
"ওকি দেখা যায় ওই স্থির, বিভীষণ !—
চতুরঙ্গে বিনির্মিত, অস্ত্রে ঝলসিত,
কণ্টকিত যেন ঘন অটবী-সজ্জিত,
ভাস্কর-প্রদীপ্ত দূর-অদ্রি-শ্রেণী মত !
ওকি চক্রব্যূহ ?" মনে মানিয়া বিস্ময়
কহিনু,—"কুমার ! হায় ! লঙ্ঘিবে কেমনে
—এখনো বালক তুমি—এ ব্যূহ ভীষণ ?"
হাসিয়া কেশরি-শিশু কহিলা নির্ভয়ে—
"খেলিয়াছি এত দিন, করি নাই রণ।
আজি সবিস্ময় সুত ! দেখিবে জগত
'অর্জুনের পুত্র আমি, শিষ্য গোবিন্দের।'
কালের প্রস্তর বক্ষে আজি অসিধারে
লিখিব কৌরব রক্তে অমর-অক্ষরে,—

'অর্জ্জুনের পুত্র আমি, শিষ্য গোবিন্দের'।"
লইয়া রথের রশ্মি করে আপনার,
ইরম্মদ বেগে রথ ছুটিল তখন।
দেখিলাম, বজ্রাঘাতে মহা শৈলমালা
হয় যথা বিচুর্ণিত, হইল চুর্ণিত
কুমারের অস্ত্রে চক্রব্যূহের প্রাচীর।
বিদারিয়া হুহুঙ্কারে শৈল অবরোধ
ছুটি যথা মহানদ প্রবেশে সাগরে
ফেনিল তরঙ্গে সিন্ধু করি প্রকম্পিত,—
মুহূর্তে বিদারি চক্রব্যূহ পরাক্রমে,
উড়াইয়া মহাবেগে, তৃণ-মুষ্টি মত,
মত্ত করী সিন্ধুরাজ দ্বার-রক্ষাকারী,
পশিল কুমার কুরু-সৈন্যের সাগরে
উৎক্ষোভিত, উদ্বেলিত, ভীত, প্রকম্পিত।
বিস্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর।
শোভিতেছে চক্রাকারে চতুরঙ্গ বেলা
মাতঙ্গে, তুরঙ্গে, রথে, সৈন্যে স্তরে স্তরে,
আচ্ছন্ন আয়ুধারণ্যে, ধ্বজ পতাকায়
ঝলসি মার্তণ্ড করে বনরাজিলীলা।
বহির্মুখ, অন্তর্মুখে—সৈন্য দুই মুখে
সুসজ্জিত; মহাবনে শৈলশৃঙ্গ মত
মহারথে মহারথী দর্পে স্থানে স্থানে
রক্ষিতেছে মহা ব্যূহ; হইতেছে রণ
বহির্ভাগে ঘোরতর, হইতেছে আর
পাণ্ডবের হাহাকারে বিদীর্ণ গগন।
মুহূর্তে অন্তর-সিন্ধু নীরব নিশ্চল।
মুহূর্তে কুমার-বীর্য প্রভঞ্জন দর্পে
বহিল জলধিগর্তে, জলধি-নির্ঘোষে
ধ্বনিল বিজয় শঙ্খ, প্রতিধ্বনি তুলি
শত শত মহাশঙ্খে কৌরব-বেলায়।
কৌরবের সৈন্যারণ্যে উঠিল জ্বলিয়া
হুহুঙ্কারে দাবানল অস্ত্রে কুমারের;
কৌরবের হাহাকারে ছাইল গগন।
দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা,
বৃহদ্বল, দুঃশাসন, শল্য—একে একে
করিয়া সংগ্রাম ঘোর হইয়া লাঞ্ছিত,
পলাইল বার বার শৃগালের মত।
কৌরব-দুর্গতি দেখি কুমার লক্ষ্মণ
পশিলে আহবে, হাসি সুভদ্রা-নন্দন
কহিলা ডাকিয়া স্নেহে,—'ভাই রে লক্ষ্মণ!
আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র নহে এ প্রাঙ্গণ।
পিতার দুলাল তুমি, আদরে পালিত
সুখের শয্যায়, শত সম্ভোগের কোলে।
যে অনল দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা
না পারি সহিতে গেল পলাইয়া ত্রাসে
বার বার, তুমি ভাই ননীর পুতুল
কেন ঝাঁপ দিলে সেই ঘোর দাবানলে?
কেন তাত দুর্যোধন এইরূপে হায়!
করিছেন আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগত?
বিপুল পৃথিবী,—ক্ষণজীবী নর;
বিপুল কৌরব-রাজ্য; কৌরব পাণ্ডব
দুই ভাই; এ দুয়ের হয় না কি স্থান
এ বিস্তীর্ণ-পিতৃরাজ্যে দুদিনের তরে?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার,—
তুমি ভানুমতী-পুত্র, আমি সুভদ্রার।
এক ক্ষুদ্র আস্তরণে, গলাগলি করি
থাকিতে পরম সুখে পারিব আমরা;
পারিব থাকিতে, স্বর্গে ইন্দ্রের মতন,
মাতা ভানুমতী-অঙ্কে, মাতা সুভদ্রার।
যাও সেই স্বর্গে, যাও শিবিরে তোমার।'
'ওরে দুরাচার! এত আস্পর্ধা রে তোর!'
গর্জিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে তেয়াগিলা শর।
অনিচ্ছায়, অযতনে, কুমার তখন
তেয়াগিলা প্রতি-অস্ত্র। কাটি অর্ধ পথে
লক্ষ্মণের শর, খেলি অগ্নি প্রতিঘাতে,
ছুটিল আয়ুধ দৃপ্ত বিদ্যুতের মত।
ডাকিলা কুমার ত্রাসে,—'সম্বর লক্ষ্মণ!'
না পারিল সম্বরিতে দেখিলা যখন,
আঁখি নাহি পালটিতে কাটিতে সে শর
আপনি দ্বিতীয় অস্ত্র করিলা প্রেরণ।
প্রবেশিল পূর্ব শর লক্ষ্মণ-গ্রীবায়
যে মুহূর্তে, সে মুহূর্তে নিল উড়াইয়া
সে শর দ্বিতীয় শরে—কি শিক্ষা-কৌশল!—
তবু ছিন্নগ্রীব ভূমে পড়িলা লক্ষ্মণ।
এক লম্ফে রথ হ'তে পড়িয়া ভূতলে
কে যায় ছুটিয়া ওই?—পার্থ!—পুত্র তব!
পড়িয়া লক্ষ্মণ বক্ষে, শক্তিশেলে হত
লক্ষ্মণের বক্ষে যেন পড়িলা শ্রীরাম!
'লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই! প্রাণের লক্ষ্মণ!'—
শোকেতে অধীর শিশু কহিলা কাঁদিয়া,—

'লও এই অসি ভাই। হান এই বুকে,
দুই ভাই এক সংগে যাইব রে চলি,
এক বৃন্তে দুই ফুল ফুটিবে ত্রিদিবে
নারায়ণ পদতলে। মুছাইয়া অশ্রু,
মৃত্যু-মুখে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণ—
'না না, ভাই অভিমন্যু! থাক তুমি ভাই!
নারায়ণ পদতলে ফুটিয়া এথানে,
পবিত্রিয়া পিতৃ-কুল, মোহিয়া জগত!
হায়! যেই পাপানলে ভস্মিছে কৌরব,
ভস্মিছে ক্ষত্রিয় জাতি, একটি পল্লব
নাহি ছোঁয় যেন তব,—এই ভিক্ষা চাহে
নারায়ণ পদতলে মুমূর্ষু লক্ষ্মণ!'
কুরুক্ষেত্র শোকক্ষেত্র। কিন্তু শোকতর
দৃশ্য আরো ছিল ভাগ্যে ভাবি নি তখন।
বর্ষিল শোকের বর্ষা; জীমূত গর্জনে
গর্জি দুঃশাসন আসি কহিল গর্জিয়া,—
'ওরে কাপুরুষগণ! এখনো কি তোরা
রেখেছিস এই পুত্র-হন্তায় জীবিত?
যা রে দুরাচার শিশু! যা রে রথে তোর;
লক্ষ্মণের সঙ্গী তুই হইবি এখনি।'
আবার বাজিল রণ। দন্তোলি-দর্শন
ছুটিল আয়ুধরাশি। মুহূর্তেক পরে
নির্বাপিত বজ্রমত গেল লুকাইয়া
সংজ্ঞাহীন দুঃশাসন। একে, একে, একে,
সপ্ত মহারথী পুনঃ পশিলা সংগ্রামে।
গর্জিয়া কহিলা কর্ণ,—'কাপুরুষ-সুত!
পিতা তোর নপুংসক করিয়া আশ্রয়
করে রণ লজ্জাহীন; তোর রণ-সাধ
বড় হাস্যকর। শুধু স্নেহেতে কেবল
এতক্ষণ তোর আমি রেখেছি জীবন।
যা চলি এখন, আমি দিলাম অভয়।'
"তাত কর্ণ!"—হাসি শিশু করিল উত্তর,—
"বড় দুঃখ, এ স্নেহের দিতে প্রতিদান
অশক্ত এ ক্ষুদ্র শিশু। হইলে নিধন
তোমরা আমার অস্ত্রে স্নেহ বিনিময়ে,
হবে পিতা পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
তাই পলায়ন-পথ উন্মুক্ত এখন।
নাশিব না তরু আমি; কিন্তু শাখাগণ
তোমাদের কর রক্ষা,—পারিলে না হায়!
রক্ষিতে লক্ষ্মণে কেহ? দিতেছি প্রথম
পিতৃ-নিন্দুকের দণ্ড, কর সম্বরণ।"
ছুটিল কর্ণিক অস্ত্র কাক-পক্ষ-ময়,
ফুটিয়া কর্ণের কর্ণে অলক্ষিত বেগে
রহিল ঝুলিয়া—শল্য উঠিল হাসিয়া;
অন্য অস্ত্রে কর্ণানুজ পড়িল ভূতলে।
শল্যানুজ এই রূপে শল্যের সম্মুখে
হইল পতিত; শেষে হইল পতিত
মহারথী বৃহদ্বল; ছয় রথী আর
সিন্ধু-বেলা প্রতিহত লহরীর মত,
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে গেল লুকাইয়া।
তখন ব্যূহিত সৈন্যে, ধনু বীরেন্দ্রের
বর্ষিতে লাগিল মৃত্যু বরিষার মত;
পড়িল কৌরব-সৈন্যে মহা হাহাকার।
নিরুপায় সপ্তরথী একত্রে তখন
—ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে?—
আক্রমিল এক মাত্র শিশু অসহায়,
আক্রমে নিষাদগণে শার্দূল যেমতি
জালাবদ্ধ,—বসুন্ধরে! যাও রসাতল!
কর্ণ কাটিলেন ধনু;—অশ্ব, ভোজরাজ।
ছিন্নধনু, রথহীন, খড়্গ চর্ম ধরি
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িলে ভূতলে
শত্রু মধ্যে, মেঘ মধ্যে ক্ষিপ্ত সিংহ যথা,—
দ্রোণ অসি, কর্ণ চর্ম, ফেলিল কাটিয়া।
তখন ধরিয়া চক্র, চক্রধর মত
শোভিল কুমার তব। কাটিয়া অরাতি
আসিছে ফিরিয়া চক্র করে কুমারের
মুহুর্মুহু, খেলা করি বিদ্যুতের মত।
বরষি অজস্র শর সপ্তরথী মিলি
কাটিলা সে মহাচক্র, বিঁধিলা শরীর
বীরেন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন। সেই বীর-শোভা,
পুষ্পিত কিংশুক সম বিক্ষত মূরতি,
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ, আরক্ত নয়ন
আকর্ণ বিস্তৃত, ঊর্ধ্বে ধৃত-চক্র বাহু,
সপ্তরথী-সম্বেষ্টিত সে নির্ভীক রণ,
ঘন ঘন সিংহনাদ ঘোর অট্টহাসি,
যে দেখেছে, যে শুনেছে তব তনয়ের—
ভুলিবে না ইহ জন্মে। ছিন্ন-চক্র; শিশু
তখন লইয়া গদা, গদাধর মত
ছুটিল; পড়িয়া ভূমে ভয়ে দ্রোণাত্মজ
রথ হ'তে তিন লম্ফে গেল পলাইয়া।

সুবলনন্দন সপ্ত, সপ্ততি গান্ধার,
রথী সপ্তদশ, দশ মাতঙ্গ বিনাশি,
চূর্ণ করি অশ্ব রথ সারথি সহিত
দুঃশাসন তনয়ের, গদা যুদ্ধে ঘোর
গদাঘাতে দুই জন পড়িলা ভূতলে।
না উঠিতে পুত্র তব,—অবসন্ন প্রাণ,
রণ-শ্রমে, রক্তস্রাবে,—দুঃশাসন সুত
—ক্ষত্রকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,—
প্রহারিল গদা অর্ধ-উত্থিত মস্তকে ;—
ধনঞ্জয়! পুত্র তব উঠিল না আর।
'অধর্ম! অধর্ম! ঘোর'—ঘোর হাহাকার
জলধি-কল্লোল মত উঠিল চৌদিকে।
অধোমুখে সপ্তরথী ফিরিলা শিবিরে,—
রাধেয় মূর্ছিত রথে। নিক্ষেপিয়া দূরে
কুরুসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র, মুমূর্ষু বেড়িয়া
করিতে লাগিল শোকে অশ্রু বরিষণ!
কহিলা কুমার—"সূত! ললাটে আমার
লেখ হৃদয়ের রক্তে শরের জিহ্বায়,
কৃষ্ণার্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার ;
লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।"
খুলিলাম শিরস্ত্রাণ, ছিঁড়ি উরস্ত্রাণ
লিখিলাম,—হায়! লেখা যাইতেছে ভাসি
অশ্রুজলে লেখকের। চাহি উর্ধ্বপানে
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্র, গাহিতে গাহিতে
পুণ্য নাম চতুষ্টয়, কহিতে কহিতে—
'নারায়ণ—ধর্মরাজ্য—পতিত উদ্ধার,'
শুনিতে শুনিতে—"জয়! অভিমন্যু জয়!'—
অনন্ত কৌরব কণ্ঠে, মুদিল নয়ন ;
—ঘুমাইল শিশু যেন কোলে জননীর ;—
দেখিলাম দুই রবি গেল অস্তাচলে।
দেখ এই বীর-শয্যা ; এই দেখ আর
মৃত-চক্র-ব্যূহ কিবা বীরত্ব অপার!
দেখ ক্ষত কলেবর তব সারথির।
পুত্র-সারথির দেখ অক্ষত শরীর!"
"অদ্ভুত! অদ্ভুত! এ নহে সম্ভব।
পুত্রের যে এ বীরত্ব পিতার দুর্লভ!"—
ভ্রমি অধোমুখে ধীরে কহিলা ফাল্গুনী,—
"শুনিয়াছিলাম যেন কহিছে যুযুৎসু—
'অধার্মিক রথিগণ! এ অধর্ম ফল
অর্জুনের অস্ত্রমুখে লভিবি অচিরে!
নারায়ণ! তুমি কি তা করনি শ্রবণ?
হায়! হায়! সুধৌতাগ্র সপ্তরথী শরে
হইয়া পীড়িত বুঝি অসহায় শিশু
স্মরিল—'হা পিত! কোথা, কোথায় মাতুল?'
না না, সে যে পুত্র মম, ভাগিনা তোমার,
সুভদ্রার গর্ভজাত, এ বীরত্ব গাথা
যে লিখিল কাল-বক্ষে, হেন আর্তনাদ
সে কেন করিবে? কিন্তু—ধিক্ ধর্মরাজ!
ভ্রাতৃগণ! সমবেত পাণ্ডব, পাঞ্চাল!
এইরূপে ব্যাধগণ বধিল শিশুরে!
ছিলে কি নিদ্রিত সবে? বর্ম, চর্ম, অসি,
রমণী-ভূষণ মত কর কি ধারণ?"
নত শিরে যুধিষ্ঠির বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলা কাতর শোকে,—"ধনঞ্জয়! তুমি
জিজ্ঞাসিলে কার বুকে বসাইবে অসি?
হান মম বুকে, আমি পুত্রহন্তা তব।
প্রবেশিল অভিমন্যু আদেশে আমার
চক্রব্যূহে বজ্র-বেগে ; সার্থক জীবন,
দেখিলাম সে বীরত্ব মানব-অতীত।
দাঁড়াইল জয়দ্রথ, অবরোধি দ্বার
হিমাচল শৃঙ্গ সম, টলাইতে তারে
না পারিল সমবেত পাণ্ডব পাঞ্চাল।"
"হা পুত্র!"—নিঃশ্বাসি দীর্ঘ বিধূমিত গিরি
করিতে লাগিল পুনঃ অগ্নি বরিষণ—
"হায় পুত্র! মত্ত সিংহ-শাবকে এরূপে
লোহার পিঞ্জরে করিয়া কৌশলে,
ভুলিয়া সৌহৃদ্য মম, ভুলি প্রাণ-দান,
জয়দ্রথ করিল কি অবরুদ্ধ দ্বার!
জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!"—কৌরব শিবির
চাহিয়া গর্জিলা ক্রোধে উন্মত্ত অর্জুন ;
কুরুক্ষেত্র থর থর উঠিল কাঁপিয়া।
নিক্ষেপি গাণ্ডীব ধনু বামে ও দক্ষিণে,
কাঁপায়ে কোদণ্ড-শব্দে কুরুক্ষেত্র পুনঃ
কহিলেন,—"ধর্মরাজ! এ প্রতিজ্ঞা মম,—
না লয় আশ্রয় তব কালি জয়দ্রথ,
না লয় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আশ্রয়,
কালি জয়দ্রথে আমি করিয়া সংহার
বরষিব শান্তি-বারি এই শোকানলে
আমাদের। নারায়ণ!"—পড়ি পদতলে
গোবিন্দের—"নারায়ণ! এই পাদপদ্ম,

অর্জ্জুনের শান্তি-ধাম, করিয়া ধারণ,
চাহি পুত্র পানে বীর-শয্যায় শায়িত,
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা,—দেখিয়া জীবিত
জয়দ্রথ কালি রবি হয় অস্তমিত,
এইখানে হুতাশন করি প্রজ্জলিত,
পিতা পুত্র এক চিতা করিবে প্রবেশ।
কে বুঝিবে তব লীলা! ঘোর অমঙ্গলে
এইরূপে সাধ তুমি মানব-মঙ্গল!
বুঝিলাম এই শোক, শিক্ষা অর্জ্জুনের।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায়!
এত দিনে, এত দূরে। বুঝিলাম আর,
ধনঞ্জয় শ্লথ করে, আবৃত অসিতে
যুঝিয়া করিতেছিল বৃদ্ধি নর-মেধ,
মায়াবশে ভ্রান্ত মতি। সপ্তরথী আজি
খুলিল অসির সেই স্নেহ-আবরণ,
শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
শ্লথ করে বিদ্যুতাগ্নি, খুলিল নয়ন,—
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুঝিনু এখন।"
উঠি বেগে নিষ্কোষিত করি ভীমা অসি,
আস্ফালি,—"এখন এই অসি অর্জ্জুনের
অজস্র শোণিত-উৎস করিবে খনন
অধর্ম্মী অরাতি-বক্ষে; গর্জ্জিবে গাণ্ডীব
প্রলয়ের মেঘ মন্দ্রে; ছুটিবে আয়ুধ
কেন্দ্রভ্রষ্ট প্রলয়ের সূর্য্যগণ মত।
পারিল না পিতা, পুত্র করিল স্থাপিত
আজি ধর্ম্মরাজ্য—দিয়া আত্ম-বলিদান।
বাজাও বিজয় শঙ্খ, মহারথিগণ!
কালি জয়দ্রথে বধি, ষষ্ঠাহ অতীত
না হইতে অরিকুল করি নির্ম্মূলিত,
আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত।"
মহাশব্দে পাঞ্চজন্য উঠিল বাজিয়া
দেবদত্ত শঙ্খসহ; বাজিল তখন
সহস্র সহস্র শঙ্খ;—ঝটিকা গর্জ্জন
উঠিল ভরিয়া যেন সায়াহ্ন গগন।

ষোড়শ সর্গ

শোকে শান্তি

হত-বৎস-শার্দ্দূলের ভীষণ গর্জন মত
শোকে ক্রোধে নিনাদিত শঙ্খের ঝঙ্কার
মূর্ছা বধূ উত্তরার ভাঙ্গিল ; উঠিয়া বালা
দাঁড়াইল উন্মাদিনী চিত্রিতা আকার।
কুন্তল আলুলায়িত করিয়াছে বিমণ্ডিত
সোণার প্রতিমাখানি ; হাসি খল খল
কহে বাহু প্রসারিয়া,—"সুলিমা ! সুলিমা !
চক্রব্যূহ জিনি অভি আসিছে রে, চল
আজি বীর-পত্নী মত রণজয়ী বীরে—
চল্ যাই আবাহন করিব অভিরে।
উঠ্ পোড়ামুখি ! উঠ্ ! তোর এই চিরকাল ;—
দুঃখের সময় তুই কাঁদিস্ সতত,
সুখের সময় নিদ্রা যাস্ এই মত।
উঠ অভাগিনি ! উঠ !"—কহে করে ঠেলি।
"নারায়ণ ! নারায়ণ !"—পড়িয়া গলায়
গোবিন্দেরে কহে পার্থ—"এই দৃশ্য আর
না পারি সহিতে, বুক বিদারিয়া যায়।"

"একি ? রক্ত ! একি ? অভি ! কোথা আমি ?"—
চারি দিক চাহি উন্মাদিনী মত ঘূর্ণিত নয়নে,—
"ও কে কাঁদিতেছে ? বাবা ! ও কে অধোমুখে ওই ?
নারায়ণ। কেন দেব ! বিষণ্ণ বদনে ?"
ছুটি উন্মাদিনী গলা ধরি গোবিন্দের
কহিল কাঁদিয়া,—"দেব ! কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে, নাথ !
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
মামা যার নারায়ণ, জনক গাণ্ডীব-ধন্বা,
জননী সুভদ্রাদেবী, এই দশা তার।
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার,
রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার ;
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর ?
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো রয়েছে পড়ি,
উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল,
—মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
দেখিলাম স্বপ্নে আমি, আনি চারু পুষ্পরথ
নিলে তুলি ভাগিনারে ;—লও উত্তরায়।"
—চরণে পড়িয়া কাঁদে চাহি মুখ পানে,—
"দয়াময় ! কর দয়া দুঃখিনী-কন্যায়।
নহে যুগ, নহে বর্ষ, কেবল ছয়টি মাস
লিখিলে কি এই স্বর্গ কপালে তাহার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?"
"হা হত হৃদয় !"—পার্থ না পারি করিতে রুদ্ধ
শোকবাষ্প, উচ্চৈঃস্বরে উঠিলা কাঁদিয়া
বালিকা সে মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া
আবার উঠিল হাসি, ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকা আসি
আবার ছাইল ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার ;
পার্থের গলায় পড়ি স্বর্ণের হার
কহে,—"বাবা! না-না, তুমি কাঁদিও না; অভি তব
করিয়াছে অভিমান—আমি তাহা জানি ;
জান না কি অভিমন্যু বড় অভিমানী ?
পিতামহ-শর-শয্যা কালি সে আঁকিতেছিল,
আমি সেই ছবিখানি লইনু কাড়িয়া ;
শর-শয্যা অভিনয় করি তাই নিরদয়,
জননীর কোলে দেখ রয়েছে শুইয়া ;
—ওই দেখ রাখিয়াছে হাসিটি চাপিয়া।
পোড়ামুখী সুলোচনা কত জানে ছল, ওমা !
দেখ সত্য সত্য যেন রয়েছে মরিয়া ;
কেমন রেখেছে বিষ-জিহ্বাটি চাপিয়া !
কাঁদিও না বাবা তুমি, যাই আমি বীণা আনি,
এখনি দেখিবে, শুনি বীণার ঝঙ্কার
দু'জনের অভিনয় হবে চুরমার।"
যায় ছুটি উন্মাদিনী, ধরিলেন ধনঞ্জয়,
মূর্ছিতা হইয়া বামা পড়িল গলায় !
পুত্রপাশে পুত্র-বধূ রাখিয়া ধরায়,

অতৃপ্ত নয়নে পার্থ নিরখিয়া কিছুক্ষণ
কহিলেন—"যদুনাথ! দেখ একবার,
হত হুতাশন, পার্শ্বে ছিন্ন পুষ্পহার।
উঠ মা আনন্দময়ি! কালি জয়দ্রথ-জয়ী
ধনঞ্জয় আনিবে মা! বসন ভূষণ;
উঠ মা বিরাটবালা! আবার সাজাবে ডালা
পুতুলের; আমরা মা পুতুল যে তোর;
তোর এ পুতুল খেলা হয় নাই ভোর।
উঠ বোন্ সুলোচনা! তোর এ পুতুল দুটি
কি খেলা খেলিছে আজ বুঝিতে না পারি,
ওই দেখ ধরাতলে রহিয়াছে পড়ি।
সত্য বুঝি অভিমন্যু করিয়াছে অভিমান,
করিয়াছে এই শর-শয্যা অভিনয়।
উঠ মা উত্তরা! তোর কথা মিথ্যা নয়।
একদিন দ্বারকায় যাদব শিশুর সনে
খেলিতে খেলিতে শিশু কহিল ডাকিয়া—
'দেখ বাবা, মামা তুমি, দেখ না চাহিয়া
কেমন সুন্দর খেলা, খেলেছি আমরা আজি।'
ছিনু অন্যমনে, কেহ না দিনু উত্তর।
খেলিল না শিশু, করি অভিমান ঘোর
রহিল ভূতলে বসি দুই নেত্র অশ্রু খসি
শোভিল নক্ষত্র দুটি, কেশব ছুটিয়া
অভিমানী পুতুলটি লইলা তুলিয়া!
আজি বুঝি সেই মতে চক্রব্যূহ একরথে
ভেদিয়া, করিয়া এই ভীষণ প্রলয়,
—আমি যে অর্জুন যাহা আমার বিস্ময়—
হাসি শিশু খল খল, উল্লাসে কহিল বুঝি,—
'দেখ বাবা, মামা তুমি দেখ না আসিয়া,
বার বার সপ্তরথী যায় পলাইয়া।'
ছিনু সংশপ্তক রণে, না শুনিনু দুই জনে,
সেই অভিমানে বুঝি শর-শয্যা করি
রহিয়াছে ধরাতলে এইরূপে পড়ি।
উঠ বাবা! উঠ চল! মনে বড় কুতূহল
জনক মাতুল তোর সেই মহারণ
দেখিবে, করিবে আর সার্থক জীবন।
উঠ ভদ্রা, উঠ দেবি, বীর জননীর মত
সাজাইয়া বীরপুত্রে বীর আভরণে
চল যাই, এই রণ দেখি তিন জনে।
পতি-রথ-রশ্মি ধরি দেখেছিলে একবার
যে বীরত্ব, রথ-রশ্মি ধরি আরবার
পুত্রের বীরত্ব দেখ কত কল্প শ্রেষ্ঠতর,
কোথায় সরসি, আর পয়োধি ফেনিল!
কোথায় ঝটিকা, আর মলয় অনিল!"
"না না, ধনঞ্জয়!"—কৃষ্ণ কহিলা করুণ কণ্ঠে—
"কুরুক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র, রঙ্গভূমি নয়।
বড় ভাগ্য আমাদের, বড় ভাগ্য মানবের
এই মহা শর-শয্যা নহে অভিনয়।
ওই শর-শয্যা পার্থ! এই শর-শয্যা আর
—উভয় মহিমাময়। কিন্তু কত—দূর!
প্রৌঢ়ের বীরত্বে, আর শূরত্বে শিশুর!
ভীষ্মদেব মরুভূমি; অভিমন্যু উপবন
নব কিশলয়ে পুষ্পে সুন্দর শ্যামল!
সে ভীষণ লবণাম্বু; এ পবিত্র সুধা সিন্ধু।
সে বন্ধুর বিন্ধ্যগিরি; এই হিমাচল।
শিরে দেবী মন্দাকিনী সুভদ্রা-রূপিণী ওই,
বহে বক্ষে দুই ধারা, জাহ্নবী যমুনা,
পত্নী-প্রেম মাতৃ-প্রেম, উত্তরা ও সুলোচনা;
—বারাণসী-বক্ষে যেন অসি ও বরুণা!
সম্মিলিত এই স্রোতে, বীরত্বের ব্রহ্মপুত্র
মিশিয়া করেছে কিবা তীর্থের সৃজন—
এই শর-শয্যা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম!
সেই সিন্ধু নারায়ণ। মাতৃ-প্রেম, ধাত্রী-প্রেম,
পতি-প্রেম, পিতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম আর,
এইরূপে শত প্রেম, উপজিয়া শত ক্ষেত্রে,
মিলি এক স্রোতে,—নর-প্রেম দুর্নিবার,
পশিয়াছে শত মুখে প্রেম-পারাবার।
কুরুক্ষেত্র; কর্মক্ষেত্র; কিন্তু কত রূপান্তর,
বীর ব্রতে প্রৌঢ়ের সে সমর্পণ প্রাণ!
নরহিতে শিশুর এ আত্ম-বলিদান!
সুভদ্রে!"—ডাকিলা কৃষ্ণ উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে।
পশে নাই যেই কর্ণে শঙ্খের গর্জন
শত শত, প্রবেশিল মৃদু সম্ভাষণ।
ধীরে ঊর্দ্ধ-তুনয়ন নামিল, রহিল চাহি
কেশবের মুখপানে, ভক্তি ছল ছল।
"সুভদ্রে!"—কহিলা কৃষ্ণ—"নাহি আমাদের শোক;
গাও প্রেমপূর্ণ স্বরে মানব-মঙ্গল!
যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি,
কোন্ জননীর পুত্র লভেছে কখন?
আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত,
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।

সফল জীবন-ব্রত, অধর্ম হয়েছে হত,
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
গাহিছে মানবজাতি কি মঙ্গল গীত!"
এতক্ষণে জননীর বহিল নয়নে দুই
নিরমল বারিধারা, নহে শোক-জল,
আনন্দাশ্রু—ভকতির আলোকে উজ্জ্বল।
"দয়াময়! নাহি শোক",—বাজিল ত্রিতন্ত্রী যেন
ভকতির পরশনে করুণা হিল্লোলে,—
"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।
ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ; ভুজবলে তাঁর পণ
ষোল বৎসরের শিশু লঙ্ঘিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী এক রথে
ষোল বৎসরের শিশু জিনিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখি ভীষণাহবে
এই শর-শয্যা শেষে হইল যাহার,
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর?
ক্ষুদ্র লতা দুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল,
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল;
তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহা ফল,
সাধিয়াছে যদি দেব! মানব-মঙ্গল,—
লতার ত এই সুখ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক
মাতৃ-প্রেমে, পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার?
সমগ্র মানবজাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক নর-পুত্র মম হারাইয়া লভিয়াছি
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর!
বড় ভাগ্যবান্ পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ!
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণনাম হয় নি প্রচার।
অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে, শিখাইব নাম নিরমল;
কর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব মঙ্গল।"
নীরব নিশ্চল কৃষ্ণ, বিস্ফারিত দুই নেত্রে
চাহি আকাশের পানে শান্তির আধার।
শোক-ঝড়-বিলোড়িত হৃদয়েতে অর্জুনের,
শান্তির অনিল ধীরে হইল সঞ্চার।
চাহি দূর শূন্য পানে অস্ফুট অস্ফুট যেন
দেখিলা সে পুত্রমুখ অনন্ত অমর,
ছুটিল হৃদয়ে নব প্রীতির নির্ঝর।
মুখ ফিরিইয়া কৃষ্ণ ডাকিলেন—"সুলোচনে!"
শুনিল না সুলোচনা, শুনিবে না আর।
পরশি ললাট কৃষ্ণ দেখিলেন, রহিলেন
চাহিয়া নীরবে, মুখ গাম্ভীর্য আধার।
"না না, দেব! নিদ্রা তার"—কহিলেন ভদ্রাদেবী—
"না না, দেব! নিদ্রা তার ভঙ্গিবে না আর।
তাঁহারো নিয়তি পূর্ণ, কি দয়া তোমার!
তব পদ হিমাচলে উপজি আনন্দ কলে
যে অনন্ত নির্ঝরিণী বহিল ছুটিয়া,
তার এক ক্ষুদ্র ধারা—পুণ্যময়ী সুলোচনা—
ভদ্রার্জুন প্রেম-স্রোতে গেল মিলাইয়া,
অভিমন্যু পুত্রে আজি হৃদয়ে লইয়া।
হাসে নাহি নিজ সুখে, কাঁদে নাহি নিজ দুঃখে
চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান,
সুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণগত।
তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেব! কি গভীর!
কি নিষ্কাম, নিরমল, কিবা পুণ্যাধার!
অতি ক্ষুদ্র কর্ম পথে, মানব যাইতে পারে
অনন্ত সুখের পার, বৈকুণ্ঠে তোমার;
—পুণ্যবতী সুলোচনা আদর্শ তাহার।
যাও দিদি, যাও তবে; হায়! অভিমন্যু সহ
হইয়াছে পরিপূর্ণ নিয়তি তোমার।
আশীর্বাদ কর, যেন তুমি পুণ্যবতী মত
পর-পুত্র বুকে প্রাণ যায় সুভদ্রার,—
নারায়ণ! পূর্ণ কর নিয়তি তাহার!"
সঙ্গে শিষ্য দ্বৈপায়ন আসিলেন ধীরে ধীরে,
উভয়ের ঊর্ধ্বনেত্র, ঊর্ধ্ব বাহুদ্বয়,
সুপবিত্র হরিনাম, উভয়ে করিছে গান,
বিগলিত প্রেম-অশ্রু দুনয়নে বয়।
স্থির গাত্র, ঊর্ধ্বনেত্র, চিত্রার্পিত কুরুক্ষেত্র
এ সঙ্গীত ভক্তিভরে করিল শ্রবণ।
চাহি অর্জুনের পানে শান্ত স্থির দুনয়নে
কহিলেন দ্বৈপায়ন উচ্ছ্বসিত মন,—
"ধনঞ্জয়! শোক তব কর পরিহার;

বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার।
এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়, - নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীব-বীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ছিল কত শত বীজ, আজি নাই আর;
কত শত নব জীব হইবে আবার
কে বলিবে? কিবা মহাকালের হুঙ্কার
উঠিছে পশ্চাতে, আর সম্মুখে তোমার!
কালের তরঙ্গে যদি লয় ভাসাইয়া
মানব-জীবন-বীজ, দেয় মুছাইয়া
পৃথিবীর বক্ষ হ'তে মানবের নাম,
সর্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান,
তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া
অনন্ত কালের গর্ভে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহা বিবর্তন।
এই বিবর্তন গর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর,
কেমনে রহিব স্থির, হইব অমর?
পুত্র যাবে পৌত্র হবে, প্রপৌত্র আবার,
এই বিবর্তনে,—শোক কর পরিহার।
সৃজন, পালন, লয়, করিছে সাধন
মুহূর্তে অনন্ত এই নীতি-বিবর্তন।
কি সে নীতি, কে নিয়ন্তা, কিছুই না জানি;
আছেন উভয়, জানি ক্ষুদ্র নর আমি!
চেয়ে দেখ বীণা যন্ত্র;—কত ভিন্ন তার!
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার।
কিন্তু সর্ব তার হয় এক স্বরে লয়,
সেই মূল স্বরে তার বাঁধা সমুদয়!
মহা যন্ত্র বিশ্ব-রাজ্য কর দরশন!
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন।
আকৃতি, প্রকৃতি, গতি,—স্বতন্ত্র সকল;
নিত্য বিবর্তিত বিশ্ব তবু সুশৃঙ্খল
একা মহা নীতি বলে; কি নীতি না জানি,
কে নিয়ন্তা নাহি জানি, এই মাত্র জানি
সেই নীত এই বিশ্ব করিছে ধারণ;
—বিশ্বের সে মূল নীতি, ধর্ম সনাতন।
আর জানি—সে নিয়ন্তা এই বিশ্ব-স্বামী;
তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি অন্তর্যামী।
তাঁহার নীতিতে বিশ্ব হতেছে চালিত
কল্প কল্পান্তর, হ'য়ে ঘোর বিবর্তিত,
অনন্ত উন্নতি পথে। এই বিবর্তনে—
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব-নয়নে,
ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব-বদনে।
কেন অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি;
সকলি তাঁহার ইচ্ছা। এই আমি জানি—
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
আমি সে মানব-অংশ, পুত্রও আমার;
আমি মরি, মরে পুত্র, শোক কি আবার?
মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব।
নাহি হয় উন্নতির তিলার্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় পার্থ! মিশাইয়া জলে।
একে ভাটা, অন্য দিকে জোয়ার উছলে।
এই উন্নতিই সুখ; শোক, বিঘ্ন তার।
এ শোকে মানব আজি করে হাহাকার।
নর-শোকে পুত্র-শোক করি নিমজ্জিত,
আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত,
তব বীর-পুত্র মত, হও অগ্রসর
মানব-উন্নতি পথে। ওই শিরোপর
নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি!
চারি দিকে উন্নতির বিবর্তন-গতি
বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া
কি প্রখর বেগে বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া!
চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল,
আনন্দে গাহিয়া 'হরে! মুরারে' কেবল।"
শিষ্যা উদাসিনী স্থির দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,
ঊর্ধ্বনেত্রে আত্মহারা হৃদয় অচল।
জানু পাতি বসি ধীরে, মৃত কুমারের শিরে
বর্ষিল চুম্বন, দুই বিন্দু অশ্রুজল।
নীরবে উঠিয়া গিয়া পড়ি পার্থ-পদতলে,
কহিল—"চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
তব পদতলে, পূর্ণ তপস্যা তাহার।"
"শৈলজে! শৈলজে!" পার্থ উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত প্রায়
লইয়া তুলিয়া বুকে নীলাব্জ প্রতিমা,
শোভিল সুনীলাকাশে সন্ধ্যার নীলিমা।
"শৈলজে! শৈলজে! শৈল!"—সরিল না কথা আর!
শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে ছুটিল উচ্ছ্বাস,
নাহি তার ভাষা; পার্থ স্থির চিত্রাঙ্কিত প্রায়
রহিলেন আত্মহারা চাহিয়া আকাশ।

—ৈ সজা পড়িয়া পুনঃ অর্জুনের পদতলে।
হি শান্ত ছলনয়নে, কহে পুনর্বার—
“অ নী মানব নাথ! কল্পনা করিয়া যথা
নারায়ণ রূপ, পূজা করি দেবতার,
হয় পূর্ণ মনোরথ, দেখে জীবনের পথ,
দেখে শান্তি-সুধা-পূর্ণ জীবন-নির্ঝর,
অন্ত অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর;
তেমতি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়,
ক্ষুদ্র নিয়তির রেখা করেছি দর্শন;
পূজি নর, পাইয়াছি নর-নারায়ণ।
পতিত-পাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
শুনিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
আজি পুত্র পুণ্যবান্ দিয়া আত্ম বলিদান,
লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয়।
চতুর্দশ বৎসরের তপস্যার পরে নাথ!
ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার,
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া,
পতি, পিতা, পুত্র, তুমি আজি শৈলজার;
পুণ্যবতী—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।
আমি তার বনমাতা, বনে তার কত ভ্রাতা
করিবে বিরহে তার বনে হাহাকার;
বনের আলোক আজি হইল আঁধার।
পুত্র-প্রেম-প্রস্রবণ, উদ্ধার করিতে বন,
শূন্য করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার,
গেল উড়ি প্রেম-পাখী; শূন্য অঙ্কে—মুছ আঁখি,—
বন পুত্রগণে তব দেও অধিকার—
প্রেমময়! পুত্রশোক রবে না তোমার।
উঠ মা! উঠ মা!”—শৈল ধরি সুভদ্রার কর
কহিল—“উঠ মা! না না, আমরা কখন
করিব না আজি শোক-অশ্রু বরিষণ।
জগতে কাঁদিয়া আসি এইরূপে গেল হাসি
কাঁদায়ে জগত যেই শিশু দেবোপম,
আমরা তাহার তরে কাঁদিব না, তার তরে
করিবে অনন্ত কাল অশ্রু বরিষণ।
বর্ষিব না অশ্রুবিন্দু আমরা কখন।
উঠ মা! উঠ মা! ওই সর্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিব বুকে পুত্র সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাহি কৃষ্ণনাম, মা গো! জুড়াই জীবন!
স্নেহের শৃঙ্খল তোর, স্নেহের শৃঙ্খল মোর,
কাটিলেন বিধি যদি, উধাও উড়িয়া
তুই—গৃহে, আমি—বনে, বন-বিহঙ্গিনী মত
গাব কৃষ্ণনাম মা গো! বিশ্ব জুড়াইয়া।”
উচ্ছ্বাসে উঠিয়া গিয়া অর্জুন লইয়া তুলি
এক করে পুত্র, পুত্র-বধূ অন্য করে
অর্পিলেন গোবিন্দের বক্ষে প্রেমভরে।
পুণ্যবতী সুলোচনা পড়িয়া চরণতলে,—
সেই পাদপদ্ম বিনা স্বপনেও আর
জানে নাহি অনাথিনী জীবনে তাহার।
বসি পাদপদ্মতলে শৈলজা, সুভদ্রা, পার্থ,
প্রীতির শান্তির তিন মুরতি সুন্দর।
এতক্ষণে সুভদ্রার বহিল যুগল নেত্রে
পতিত-পাবনী প্রীতিধারা দরদর।
এক করে মৃত-পুত্র, অন্য করে পুত্র-বধূ
মূর্ছিতা বিমুক্তকেশী লইয়া হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া নারায়ণ; কি মূর্তি মহিমাময়!
ঊর্ধ্বনেত্রে নিরমল প্রীতিধারা বয়।
ঊর্ধ্ববাহু দ্বৈপায়ন, ঊর্ধ্ববাহু কুরুক্ষেত্র,
অশ্রুনেত্রে, প্রেমকণ্ঠে সায়াহ্ন-গগন
পূরিয়া গাহিল ‘হরে মুরারে!” তখন।

সপ্তদশ সর্গ

মহাভারত

অতীত তৃতীয় যাম, নিবিড় নীরব নিশি;
আকাশ ও ধরাতল আঁধারে গিয়াছে মিশি।
জ্বলিতেছে ক্ষীণালোক, নীরব শিবির তলে
বসিয়া রমণী এক; শুষ্ক নয়নের জলে
অঙ্কিত কপোল শুষ্ক, যেন দেবী নিশীথিনী
হেমন্তের মূর্তিমতী,—শিশিরাক্ত, বিষাদিনী।
পড়েছে গৈরিক ঢাকি ধূসরিত কেশভার,
হেমন্তের মূর্তিমতী.—শিশিরাক্ত, বিষাদিনী।
দক্ষিণ কপোল বামা রাখিয়া দক্ষিণ করে
চেয়ে আছে অধোমুখে শোকের আবেগ ভরে।
শোভিতেছে অঙ্কে সুপ্তা মূর্ছিতা রমণী আর,
নিশীথিনী কোলে যেন বিশুষ্ক কুসুম-হার।
আচ্ছন্ন করিয়া অঙ্ক পড়িয়াছে কেশাবলী,
শৈবালে পড়িয়া যেন ছিন্ন কমলের কলি।
শোকে শুভ্র অর্ধ কেশ, নয়ন গিয়াছে বসি;
শোকে শুষ্ক দেহলতা, বরণ হয়েছে মসী।
বিশুষ্ক আরক্তাধর; ক্ষীণ বহিতেছে শ্বাস;
নিদ্রা যাইতেছে যেন ছিন্ন-বীণা-শোকোচ্ছ্বাস।
বহুক্ষণ পরে বালা মেলিল নয়ন ধীরে;
চাহি আত্মহারা মত স্থির নেত্রে রমণীরে
জিজ্ঞাসে—"কে আমি?"
"তুমি উত্তরা মা! আদরিণী!"
"উত্তরা কে?"—"উত্তরা মা!
বিরাট-রাজ-নন্দিনী।"
"উত্তরা! উত্তরা আমি! বিরাট-রাজ-নন্দিনী!"
বিস্ময়ে কহিয়া, রহে শূন্য চাহি বিষাদিনী।
শিবির প্রাচীরে দীর্ঘ প্রশস্ত দর্পণ পানে
চাহিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ—"কারা বসে ওইখানে?"
আত্মহারা বালিকার ভগ্ন-কণ্ঠে নারীপ্রাণ
উঠিল কাঁদিয়া; বামা করিল উত্তর দান,—
"কেহ নহে, দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মা! তোমার
দেখিতেছ, দেখিতেছ প্রতিবিম্ব মা! আমার!"
"উত্তরা—উত্তরা আমি! প্রতিবিম্ব উত্তরার!
উত্তরার শুভ্র কেশ! ওই মুখ! চোখ আর!"
ভিজিল তাপসী আঁখি;—ছয় দিনে উত্তরার
কি দারুণ শোকে শুভ্র হইয়াছে কেশভার!

"কে তুমি?"—শৈলজা আমি বনবালা উদাসিনী।"
"না, তুমি মা! স্বপ্ন দেবী। স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি,
পূর্ণচন্দ্র বক্ষ হ'তে হায় মা! পড়িনু আমি
আঁধার পাতালে, শৈলে,—কি কঠিন শিলাখানি!
চূর্ণিত হইল দেহ, বিচূর্ণ হইল বুক।
আসিলেন নারায়ণ,—কি করুণাপূর্ণ মুখ!
পাতাল হইল পূর্ণ কি আলোকে নিরমল,
কি মধুর হরিনামে পূর্ণ হ'ল রসাতল!
চুম্বিয়া ললাট, করি সঞ্জীবনী সুধা দান,
পবিত্রা দেবীর এক অঙ্কেতে দিলেন স্থান।
তুমি কি সে স্বপ্ন-দেবী? এ বা কোন্
পুণ্যভূমি?—
স্বপ্ন-রাজ্য? দেব-রাজ্য?"—"তোমার শিবিরে
তুমি।"
"শিবিরে! শিবির কোথা?"—"কুরুক্ষেত্র
ধর্মক্ষেত্রে।"
রহিল বালিকা শুনি চাহি শূন্য স্থির নেত্রে।
কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণ চন্দ্র-কর-লেখা
যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা,
স্মৃতির আলোকে ধীরে মনোরাজ্যে উত্তরার
ভাসিতে লাগিল, ভেদি আত্ম-ভ্রান্তি অন্ধকার
অনেক দিনের দূর-বিস্মৃত সঙ্গীত মত
পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা যত
সুখপূর্ণ, শোকপূর্ণ;—পিতৃগৃহ, নাট্যালয়,
বৃহন্নলা, সে অপূর্ব উত্তর-গোগৃহ জয়,
কৌরবের বেশ ভূষা, আনন্দে পুতুল খেলা,
পাণ্ডবের পরকাশ, বিবাহ—আনন্দ মেলা,
ছয় মাস সুখস্বপ্ন, কুরুক্ষেত্র মহারণ,
এ শিবির চক্রব্যূহ, হত-পতি-দরশন,—
তার পর অন্ধকার,—মনে পড়িল না আর;
পড়ে গেল যবনিকা; রুদ্ধ নাট্য-গৃহ-দ্বার!
স্মৃতির সমীরে ধীরে জ্বালাইল শোকানল,
কাঁদিতে চাহিল বালা, কিন্তু কোথা অশ্রুজল?
শোকের সন্তাপে তীব্র নয়নের নিরঝর
গিয়াছে শুকায়ে; শুষ্ক ক্ষুদ্র মুখ ইন্দীবর
লুকা'ল শৈলজা-বক্ষে হায়! শৈলজার প্রাণ

আবার উঠিল কাঁদি। করিতে চুম্বন দান
উষ্ণ দুই অশ্রুবিন্দু পড়িল ঝরিয়া মুখে
উত্তরার বিমলিন,—শুষ্ক শতদল বুকে
নিশির শিশির যথা। বিস্ময়ে কহিলা বালা,—
"কেন মা কাঁদিস্ তুই ? তোর বুকে এই জ্বালা
কে জ্বালিল ? বনমাতা তুই কি অভির হায় ?"
—শৈলজার অশ্রুধারা বহিল বেগে ধারায়।
"আমি তার বনমাতা, আমি সেই পুণ্যবতী।"
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল কাতরে অতি—
"হায় মা! হায় মা! তোরো এ অমৃত-প্রস্রবণে
জ্বালিলা বাড়বানল বিধি অকরুণ মনে ?"
"না মা!"—উত্তরিলা শৈল—"মরুভূমে অভাগীর,
দিয়া আত্ম-প্রাণ বাছা, ঢালিয়াছে প্রেমনীর
বরিষার মেঘ মত, সহি বুকে বজ্রাঘাত ;
ধর্মরাজ্য তরে করি এইরূপে প্রাণ পাত।
বনমাতা হয় যেন হায়! যোগ্য মাতা তার
স্বর্গে সে আসিবে তবে পুণ্য অঙ্কে শৈলজার।"
"কালি নিশীথিনী-অঙ্কে"—মূর্চ্ছাগতা উত্তরার
নাহি জ্ঞান ছয় দিন গিয়াছে বহিয়া আর,—
"কালি নিশীথিনী-অঙ্কে, বসি এই বাতায়নে
নবোদিত চন্দ্রকরে, প্রেম-উচ্ছ্বসিত মনে
মা গো! তোর প্রেম কথা গাহিল সঙ্গীত মত
অপূর্ব কল্পনা বলে সৃজি স্বর্গ শত শত।
ফলিল না একটিও ভাগ্যে হায়! উত্তরার,
অভাগিনী তার মত কে আছে জগতে আর ?
বালকের ধূলা সৃষ্টি একই নিঃশ্বাসে হায়!
নিল মা গো! উড়াইয়া নিদারুণ বিধাতায়।
বড় সাধ ছিল মনে যুদ্ধ অন্তে অভাগীরে
ল'য়ে যাবে বনে তোর, মা গো! তোর স্নেহ-নীড়ে।
ভাবে নাই, ভাবি নাই, হায়! হেন অনাথিনী
আসিব মা অঙ্কে তোর!"—রুদ্ধ শোক নিঝ'রিণী
উথলিল যেই বেগে বক্ষে চক্ষে শৈলজার,
বুঝিল বিরাটবালা ;—কথা কহিল না আর।
"রেখে গেছে অভিমন্যু ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি ওর"—
চাপি শোক কহে শৈল—"মা গো! পুণ্যগর্ভে তোর
পুত্র কোলে করি তুই যাইবি আমার বনে।
এ অভির বন-খেলা নিরখিব দুইজনে।
গৃহভূমি, বনভূমি, বাঁধিয়া প্রেম-বন্ধনে
নির্মাইব ধর্ম-রাজ্য, বসাইব সিংহাসনে
পুত্রে তোর ; রাজলক্ষ্মী হবি তুই মা আমার।
পুত্র সুখে, প্রজা সুখে, রহিবে না শোক আর।"
"রবি অস্ত গেলে হায়!"—ফেলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
কহিতে লাগিল বালা চাপিয়া শোক-উচ্ছ্বাস—
"রবি অস্ত গেলে হায়! দিবা কি থাকিতে পারে ?
অস্ত গেলে শশধর, লয়ে যায় জ্যোৎস্নারে।
পাদপ হইলে ভস্ম, ছায়া কি থাকে কখন ?
নির্ঝর হইলে শুষ্ক—ধারা হয় অদর্শন।
প্রদীপ হইলে ভগ্ন, শিখা কি কখনো রয় ?
বাঁচে কি নলিনী, যদি শুষ্ক হয় জলাশয় ?
কুরুক্ষেত্র-মহাঝড়ে তরু উত্তরার হায়!
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যদি শুকাইয়া এ লতায়,
আশীর্বাদ কর মাগো! সমর্পিয়া ফল তার—
করে মাতা সুভদ্রার, সুলোচনা, শৈলজার—
তরু পদ মূলে যেন করে সমর্পণ প্রাণ ;
আনন্দের সহ যেন হয় হাসি তিরোধান।
তৃতীয়ার চন্দ্র যদি হলো অস্তমিত হায়!
অস্ফুট জ্যোৎস্না যেন সঙ্গে মিশাইয়া যায়।
হায় মা! হায় মা! বিধি"—দর্পণে পড়িল আঁখি,
মুহূর্ত বিরাট-বালা নীরবে চাহিয়া থাকি—
"হায় মা! হায় মা! বিধি সে আশাও উত্তরার
বুঝি বিনাশিলা, মন কি কঠিন বিধাতার!
ওই মুখ, ওই চোখ, ওই শুষ্ক কেশ হায়!
নিরখিয়া প্রাণনাথ চিনিবে কি উত্তরায় ?"

উভয় নীরব রহে শোকাবেগে কিছুক্ষণ।
উত্তরা কহিল পুনঃ পর-দুঃখে আর্দ্র মন—
"নাহি জানি কুরুক্ষেত্র—এই শোক-পারাবার—
ভাঙ্গিবে কপাল মা গো! আরো কত উত্তরার!"
"হইয়াছে যুদ্ধ শেষ।"
"শেষ"!—চমকিল বালা।
"শেষ"—উত্তরিলা শৈল বিষাদিনী—"মহাজ্বালা
নিবিয়াছে জগতের ; ভস্মিয়া ক্ষত্রিয়-বন
নিবিয়াছে অধর্মের যুগব্যাপী হুতাশন।
ছিল যেই স্নেহ সিক্ত অর্জুনের বীর্যানল,
হরিলে কৌরব সেই অভিমন্যু স্নেহ-জল,
উদ্গীর্ণ করিল গিরি যে গৈরিক প্রস্রবণ
কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্র, আচ্ছন্ন করি গগন,
দুদিনে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য পরাক্রম ;
দুই দিনে কর্ণ আর,—কর্ণ করে নাহি রণ,
শিশু-হত্যা-পাপে প্রাণ করিয়াছে বিসর্জন।

এক দিবসের যুদ্ধে হত শল্য, দুর্যোধন।
কালি হইয়াছে শেষ, হইয়াছে অবসান
অধর্মের দীর্ঘ দিবা, ভারত করি শ্মশান!
কৃপ, কৃতবর্মা, আর দ্রোণ-পুত্র দুরাশয়,—
আছে মাত্র কৌরবের এই মহারথী ত্রয়।

উত্তরা

পাণ্ডব ও নারায়ণ?

শৈলজা

আছেন মঙ্গলে সব;
পরিণামে ধর্মের মা! নাহি হয় পরাভব।

উত্তরা

মা সুভদ্রা?

শৈলজা

দেবী তিনি, তাঁর অমঙ্গল নয়
সম্ভব মা।

উত্তরা

সুলোচনা?

শৈলজা নীরবে রয়।

উত্তরা আকুল শোকে কহিল উচ্ছ্বাসে—"হায়!
তুই ও মা! গেলি চলি ফেলি তোর উত্তরায়।
আছিল হৃদয় তোর ক্রীড়া গোলকের মত
অভিমন্যু সমীরণে প্রপূরিত অবিরত!
হায়! নিদারুণ কাল কেমনে লইল হরি
সেই স্নেহ-সমীরণ গোলক বিদীর্ণ করি!
যেই শিশু-বৃক্ষ মা গো! হৃদয়ে করি রোপণ
পালিলি ষোড়শ বর্ষ,—কুরুক্ষেত্র প্রভঞ্জন
উপাড়ি ফেলিল ভূমে; কোমল হৃদয় তোর
ফেলিল উপাড়ি, – তবু ছিঁড়িল না স্নেহ-ডোর!"
নীরবে রহিয়া বালা জিজ্ঞাসিল আরবার—
"কুশলে ত আছে বল পিতা ভ্রাতা মা! আমার?"
নীরব রহিল শৈল। সে নীরব সমাচার
পশিল বালিকা-প্রাণে, তুলিল কি হাহাকার!
অশ্রুবিন্দু নাহি দিল স্তিমিত নয়নে দেখা;
না হইল রূপান্তর মুখের একটি রেখা।
করিতে সে শোকচিত্রে রেখাটি গভীরতর
না পারিল পিতৃ-শোক ভ্রাতৃ-শোক চিত্রকর!
হায়! বিষধর যারে দংশিয়াছে একবার,
শত বিষধরে দংশি কি আর করিবে তার?
হইয়াছে এক বজ্রে ভস্ম যেই উপবন,
কি আর করিবে তার শত বজ্র প্রহরণ?

কেবল কহিল বালা—"হায়! তবে উত্তরার
পিতার গৃহও শূন্য, হইয়াছে অন্ধকার!
সে বিরাট-রাজপুরী, বিরাট শ্মশানপ্রায়
করিতেছে হাহাকার করাল কাল ছায়ায়!
হায় বাবা! হায় দাদা! বড় আদরের ছায়া
ছিল যে উত্তরা; হায়! কেমনে কাটিয়া মায়া
এক সঙ্গে পিতা পুত্র গেলে চলি পতি সনে,
ফেলি এই বালিকায় হেন অকরুণ মনে?
হায় মা! আছিল অঙ্কে উত্তর উত্তরা তোর।
উত্তর গিয়াছে চলি, উত্তরার স্বপ্ন ভোর!
সকলে মা! গেল চলি"—চাহি শৈলজার মুখ—
"তথাপি বিদীর্ণ নাহি হইল আমার বুক!
ছয় দিন মৃতপ্রায় ছিলাম মূর্ছিতা আমি,
তবু নাহি মরিলাম,—আমি কি পাষাণখানি!"

শৈলজা

জীবনের আশা বাছা! ছিল কি তোমার আর?
যোগস্থ হইয়া হরি জাগাইলা পুনর্বার!

উত্তরা

কেন দয়াময় হরি অনাথিনী এ কন্যায়
বাঁচাইয়া, শুষ্কলতা অর্পিলা অনলে হায়?

শৈলজা

তুমি কৌরবের লক্ষ্মী; আছে মা! গর্ভে তোমার,
একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার।
মানবের আশা-তরু, ধর্মরাজ্য-ভিত্তিভূমি,
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম-রাজ্য-লক্ষ্মী তুমি!

উত্তরা

আছে ত কুশলে মাতঃ! দেবর পঞ্চ আমার?

শৈলজা

পাণ্ডব, সাত্যকি, কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি আর।
নিশীথে পশিয়া, মেষ-শালায় শার্দুল মত,
অশ্বত্থামা পঞ্চ শিশু নিদ্রায় করেছে হত।
কালী নিশীথিনী অঙ্কে হইয়াছে অভিনীত
অধর্মের শেষ অঙ্ক, পাপপূর্ণ, শোকান্বিত।
পড়িয়াছে যবনিকা, জ্বলিয়াছে কি শ্মশান
কুরুক্ষেত্রে!—নারায়ণ! কর পূর্ণ মনস্কাম!
এ অধর্ম রাক্ষসের কবল হইতে নর
উদ্ধারিতে, দিল প্রাণ দেবতুল্য পুত্রবর।
আমাদের শোকে মা গো! জগত পাইবে সুখ;
ভুলি পত্নীপ্রেম, কর মাতৃপ্রেমে পূর্ণ বুক।"
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভীতা। উত্তরা নীরবে রয়

শোকাকুলা, চিন্তান্বিতা, বদন গাম্ভীর্যময় ;
হ'ল যেন মেঘময় শীতের বিশদাকাশ।
বহুক্ষণ এইরূপে ভাবিল, না বহে শ্বাস।
উঠি ধীরে ধীরে শেষে, কহিল—"মা! চল যাই।"

শৈলজা

কোথায় ?

উত্তরা

মা! উত্তরার এক ভিন্ন স্থান নাই—
পতির জলন্ত চিতা।

কাঁপিয়া উঠিল বুক
শৈলজার দুরু দুরু ; কহে অশ্রুপূর্ণ মুখ—
"পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ'তে আর
নাহি কি রমণী-ব্রত উচ্চতর, মা আমার ?"
"আছে ;"—স্থিরকণ্ঠে বামা কহি দাঁড়াইল ধীরে—
"পালিব তা' মাখিয়া মা! পতিপদ-ভস্ম শিরে।"
নীরবে শিবির হ'তে বাহিরিল দুই জন!
আর চলিল না পদ—ও কি দৃশ্য বিভীষণ!
তৃতীয় প্রহর নিশি ; জ্বলিতেছে অগণিত
চিতা কুরুক্ষেত্র-বক্ষে,—জ্বলিতেছে সংখ্যাতীত
চিতা বক্ষে ভারতের, জ্বলিতেছে অনিবার
ক্ষত্রিয়ের গৃহে গৃহে, বক্ষে বক্ষে অনাথার।
নিবিড় সূচিকাবিদ্ধ অমাবস্যা অন্ধকারে
জ্বলিতেছে চিতাশ্রেণী ; কুরুক্ষেত্র চিতাহারে
কালের জীবন্ত মূর্তি করি যেন অভিনয়,
দেখাইছে কাল-গর্ভ—বিরাট শ্মশানালয়।
যোজন যোজন ব্যাপি, স্থানে স্থানে নদীতীরে
জ্বলে রথীদের চিতা, প্রতিবিম্ব নদীনীরে
জ্বলিছে অনন্ত চিতা—কি যে কি ভীষণ ছবি!
নদীগর্ভে অস্ত যেন হতেছে অনন্ত রবি!
হায়! এক মহাচিতা—ততোধিক বিভীষণ—
যথায় হইল ভস্ম অনাথ সৈনিকগণ,—
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী,—ক্ষুদ্র অগ্নি পারাবার!—
জ্বলিতেছে দূরে, মনে আতঙ্ক করি সঞ্চার।
মহা নরমেধ যজ্ঞ হইয়াছে সমাপন,
নিশিশেষে ধীরে ধীরে নিবিতেছে হুতাশন।
অনন্ত শ্মশান-ধূমে সমাচ্ছন্ন শীতাকাশ ;
একটি নক্ষত্র নাহি হইতেছে পরকাশ।
ঘোর কৃষ্ণ নৈশাকাশ ; শোকেতে নক্ষত্র যত
পড়ি ধরাতলে যেন শোভিতেছে চিতামত।
মুক্তকেশী শোকাকুলা সংখ্যাতীত বীরনারী,
—সবিদ্যুৎ কাদম্বিনী,—বরষিয়া অশ্রুবারি
কাঁদি সারাদিন আম্র-পল্লব লইয়া করে,
অন্বেষিয়া মৃত পতি পুত্র পিতা সহোদরে,
ঘুড়িয়া সমর-ভূমি করিয়াছে হাহাকার
লয়ে ছিন্ন বক্ষে ছিন্ন বক্ষ প্রাণ-প্রতিমার।
শোকের বরিষা এবে হইয়াছে অবসান ;
এখনো কাঁদিছে কেন ভগ্নকণ্ঠ, ভগ্নপ্রাণ,
আঁধার শিবিরে ধীরে ? শকুনি শৃগালদল
ঘন নৈশ নীরবতা বিদারিয়া কোলাহল
করিতেছে স্থানে স্থানে, করিতেছে ছুটাছুটি ;
কত বিভীষিকা যেন আঁধারে উঠিছে ফুটি।
কাঁপিল বালিকা-বক্ষ, ধরি শৈলজার গলা,
রাখি বুকে মুখ, কহে বালিকা শোকবিহ্বলা—
"হায় মাতঃ! ধীরে ধীরে নিবিছে এ চিতাগণ,—
আমাদের বক্ষ-চিতা এরূপে কি নির্বাপণ
হইবে মা ? হইবে মা, এইরূপে অবসান
আমাদের শোক-নিশি, হায় ? জুড়াইবে প্রাণ ?
কর চিতা আমাদের ?" কহে শৈল সাশ্রুচক্ষে,—
"দেখ মা! অনন্ত চিতা ভারত-মাতার বক্ষে!
পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম তিমির রাশি,
নব-ধর্ম-উষা ওই আনন্দে উঠিছে ভাসি।
ওই কাকলির কলে উঠিছে মা! কৃষ্ণনাম ;—
জুড়াতে জগৎ-প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ।"
লয়ে উত্তরায় বক্ষে বনবালা ধীরে ধীরে
গেল পতি-চিতা-মূলে। দূর হিরণ্বতী-তীরে
অশোক পাদপ-মূলে সে পবিত্র তীর্থধাম
প্রণমিলা ; কি উচ্ছ্বাসে উছলিল দুটী প্রাণ!
প্রিয় পুত্র লয়ে বক্ষে সুলোচনা পুণ্যবতী
লভিয়াছে নিরবাণ একই চিতায় সতী।
ত্রিদিব বীণার বক্ষে যেন পুণ্যময় গীত
হইয়াছে লয়, বীণা হইয়াছে অন্তর্হিত।
ব্যোম-বিহারিণী তরী হইয়া গগনোত্থিত,
আলোক সহিত যেন হইয়াছে অলক্ষিত।
নির্বাপিত প্রায় চিতা! ক্ষীণালোকে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া অন্তরালে করিলেন দরশন
উত্তরার শোক-ছবি, বিদীর্ণ হইল বুক,—
কি আলোকে, ও কে বসি, হায়! এ কাহার মুখ!
গিয়াছে বহিয়া যেন কত যুগ উত্তরার,
ঘটাইয়া কি বিপ্লব ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার!
নব যৌবনের সেই পুষ্পাকীর্ণ রঙ্গালয়ে

করিতেছে প্রৌঢ়তায় কি দারুণ অভিনয়!
রিশুক অস্ফুট ফুল, নিবিয়াছে আলোরাশি,
ফুটন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে শোক উঠিয়াছে ভাসি।
হাসি-ভরা, ক্রীড়া-ভরা, সে চঞ্চলা সৌদামিনী,
হ'য়েছে গাম্ভীর্যভরা কি নিবিড়া কাদম্বিনী!
জ্যোৎস্না-প্লাবিতা সেই ফুটন্ত কুসুম লতা,
এবে শুষ্কা, অর্ধদগ্ধা হায়! বজ্রাঘাতে যথা।

অশোকপাদপ-মূলে শোকে দাঁড়াইয়া হরি,
অদৃশ্য, আঁধারে স্থির, বুকে শির রক্ষা করি,
ঘোর ঝটিকায় পূর্ণ যেন মহাজলধর,
রুদ্ধ করি, সে বিপ্লব রহিয়াছে স্থিরতর।
অনিমিষ-নেত্রে কৃষ্ণ চাহি উত্তরার পানে;
দেখে না উত্তরা, কহে উদ্দেশে আকুল প্রাণে,—
"কোথায় রহিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি!
এই শোক পারাবারে দেও নাথ! পদতরী!
তোমার নয়ন সম ছিল যেই নেত্রদ্বয়,
ছিল তব রূপ সম যে রূপ মাধুর্যময়,
মাতা সুভদ্রার ছবি সেই মুখ মনোরম,
তোমার দেবত্বে মাখা পার্থ-বীর্যে হুতাশন,
বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি, স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার,
এরূপে কি হ'ল ভস্ম? চিহ্ন রহিল না তার।
অর্জুনের প্রাণ-পুত্র, প্রাণ-পুত্র সুভদ্রার,
গোবিন্দের পুত্র, শিষ্য,—না, না, নাহি মৃত্যু তার।
ঝলসিয়া চন্দ্রালোক কি গৌরবে প্রাণেশ্বর!
বিরাজিছ। শিরে কিবা কিরণ-কিরীটবর!
কি সুন্দর বীরবেশ! কিবা স্বর্গ মনোহর!
আনন্দে অপ্সরাগণ বর্ষিতেছে নিরন্তর
কি কুসুম সুবাসিত! কি সঙ্গীত সুকোমল
উথলিছে! বরষিছে কি অমৃত সুশীতল!
সতৃষ্ণ নয়নে নাথ! দেখিছ কি উত্তরায়?
চিনিতে কি পার তারে? তার এই দশা, হায়,
কেমনে রয়েছ চাহি? লও বুকে এক বার,
কহিয়া একটি কথা জুড়াও জীবন তার।
পৃথিবীতে ছয় মাস দিয়া তারে স্বর্গসুখ,
কেমনে চলিয়া গেলে বিদীর্ণ করিয়া বুক!
প্রেমের মুকুল তব সঞ্চারিয়া এ লতায়,
কেমনে চলিয়া গেলে অকরুণ প্রাণে হায়?
ক্ষমা কর ছয় মাস; প্রসবিয়া সেই ফুল,
রাখি তব প্রতিরূপ, রক্ষা করি কুরুকুল,
ছয় মাস পরে,—নাথ! ছয় যুগ উত্তরার—
উত্তরা আসিবে অঙ্কে, স্বর্গে তার তপস্যার।
পতির চিতায় এই মৃত প্রাণ সমর্পণ
নহে মৃত্যু, অনাথার দীর্ঘ মৃত্যু এ জীবন।
কর আশীর্বাদ, নাথ! এ অনন্ত মৃত্যু-ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ!"
বসি আত্ম-হারা শৈল চাহি আকাশের পানে
সেই চন্দ্রলোক, চন্দ্র নিরখিতেছিল ধ্যানে।
স্বপ্ন-উত্থিত মত চিতা-ভস্ম লয়ে করে,
উভয় ললাটে মাখি কহিল উচ্ছ্বাস-ভরে—
"কর আশীর্বাদ, বৎস! তব বনমাতা ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ!"
বিরাট, উত্তরা, চিতা-পার্শ্বে প্রণমিয়া, ধীরে
নীরবে উভয় শোকে চলিলা শূন্য শিবিরে।
এখনো অশোক-মূলে দাঁড়াইয়া নারায়ণ,
প্রস্তর-মূরতি যেন অনিমিষ দুনয়ন।
আসিলেন ধনঞ্জয় সুভদ্রা জননী সঙ্গে,
বসিলেন চিতামূলে;—উত্তাল শোক-তরঙ্গে
অর্জুনের ভাসিতেছে শান্তি ছায়া; জননীর
অনন্ত অতলস্পর্শী শোকসিন্ধু এবে স্থির।
একটি লহরী মাত্র, তুলিল এক উচ্ছ্বাস,
পুত্রের শ্মশান ছায়া; বহিল একটি শ্বাস।
কেবল একটি কথা কহিলেন ধনঞ্জয়—
"এইরূপে আমাদের হইল ভস্ম হৃদয়।"
"না না, নাথ!"—ভদ্রাদেবী উত্তরিলা কণ্ঠস্বর—
"পবিত্রিত, বিগলিত, তরলিত প্রেমনীড়
এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ,
জুড়াতে জগৎ-প্রাণ, বিলাইতে কৃষ্ণনাম।
সুলোচনা-মাতৃপ্রেম, অভিমন্যু আত্ম-দান,—
নব ধর্ম-রাজ্য-ভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম।
সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্মব্রত শ্রেষ্ঠতর,
মাখি পুত্র-ভস্ম বুকে হও কর্মে অগ্রসর।
পুত্রের সুযোগ্যা মাতা, পুত্রের সুযোগ্য পিতা,
হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্লাবিতা
এই নব ধর্মামৃতে; দুঃখ রহিবে না আর
জগতের হবে ধরা সুখ শান্তি পারাবার।
শুনিতে শুনিতে যেন বিশ্ব-কণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
একই চিতায় লভি পতি পত্নী নিরবাণ!"
পুত্রের চিতার ভস্ম উভয় মাখিয়া বুকে,
যোগী-যোগিনীর বেশে, চলিলা শিবিরমুখে।

হইল ঝটিকাপূর্ণ জলধর বিচলিত,—
হয়ে অগ্রসর কৃষ্ণ, হৃদয়েতে উদ্বেলিত
মাখিলেন সেই ভস্ম ; ঊষার আকাশ পানে,
চাহিয়া কহিলা শোক-প্রীতি-উদ্বেলিত প্রাণে—
"মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি ; মানবের মুক্তি-পথ
রক্ত-সিন্ধু গর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ ;
একই নির্ঘাতে নাথ ! একই নিমিষে হায় !
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়
একই শ্মশান মাত্র করি নাথ ! প্রজ্জ্বলিত,
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত ?
এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত
যে শোণিত-পারাবার, কৃষ্ণের তপ্ত শোণিত
প্রতিবিন্দু সে সিন্ধুর ; হা নাথ ! প্রতি শ্মশান
করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।
প্রতি রমণীর কণ্ঠ, অনাথার হাহাকার,
গান্ধারীর শোকোচ্ছ্বাস, শোক-ছবি উত্তরার,
অর্জুনের উন্মত্ততা, সে বৈরাগ্য সুভদ্রার,
করিয়াছে কৃষ্ণ-প্রাণে শেলাঘাত অনিবার।
রাজসূয়ে বিনির্মিত ধর্মরাজ্য বাতাহত
পড়িল ভাঙ্গিয়া যবে বালির সৃজন মত,
বুঝিলাম তব ইচ্ছা, বিনা এই রক্তদান,
এ অগ্নিপরীক্ষা বিনা, হইবে না নিরমাণ
ধর্মরাজ্য ধরাতলে ; হইবে না কদাচিত
খণ্ড এ ভারতে মহাভারতরাজ্য স্থাপিত।
দিলাম অনলে ঝাঁপ, হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্ত-ধারা অষ্টাদশ দিন ধরি,
তথাপিও প্রাণাধিক কুমারের এ শ্মশান
জ্বালালে কৃষ্ণের প্রাণে হায় নাথ ! অনির্বাণ।
নিষ্পাপ মানব-পুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানবের পরিত্রাণ ?
নাহি দুঃখ, তব প্রাণ মানবের মহাপ্রাণ,
তুমি সহিতেছ যদি, কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান
পাইবে না শোক ; কর পূর্ণ তব মনস্কাম !—
কর এবে ধরাতলে ধর্মরাজ্য নিরমাণ !
ওকি দৃশ্য !"—নারায়ণ স্বপনে যেন নিদ্রিত
দেখিলেন কুমারের চিতা পুনঃ প্রজ্জ্বলিত
ছাইল সমরক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত চিতানল।
উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্তি,—মাতা রাজরাজেশ্বরী।
নব ধর্ম-বেদি-মূলে বসিয়া দেবতাগণ—
আর্য অনার্যের—ধ্যানে ; বেদি-বক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্তি ; তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুল্য প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম মল, রক্তবর্ণ কলেবর ;
অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
—সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র—হইয়াছে শোভমান
চারি ভুজে চারি দিকে ; ত্রিনেত্রে ত্রিকাল-জ্ঞান।
ধর্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা ছবি,
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বাল-রবি।
অনন্ত মানব-ব্যাপী ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,
নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাহিতেছে কৃষ্ণনাম।
পূর্ণ জীবনের ব্রত ; মন প্রাণ উদ্বেলিত,
"মা ! মা !"—বলি নারায়ণ আনন্দাশ্রু বিগলিত,
পড়িলেন ধরাতলে মানব-প্রেমে মূর্ছিত
কুমারের চিতাপার্শ্বে ;—পূর্বাকাশ বিভাসিত
হইল প্রভাতালোকে, বাজিয়া উঠিল ধীরে
অনন্ত মঙ্গলবাদ্য, প্লাবিয়া আনন্দনীড়ে
কুরুক্ষেত্র সুমঙ্গল উঠিল আনন্দ-গীতি,
ধর্মরাজ,—ধর্মরাজ,—করি উচ্চে বিঘোষিত।
আসিলেন ভদ্রার্জুন, উঠিলেন নারায়ণ,
আসিলেন ধীরে ধীরে শৈল সহ দ্বৈপায়ন।
অগ্রে কুমারের চিতা, পূরব গগন পানে
চাহি স্থির নারায়ণ রহিলেন যোগধ্যানে।
পার্শ্বে স্থির ধনঞ্জয়, ভদ্রাদেবী মধ্যস্থলে।
উভয়ের, তিন মুখ ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে।
তিনের গৈরিক বেশ, বুক চিতাভস্মে মাখা,
ভদ্রার গৈরিক আলুলায়িত কুন্তলে ঢাকা।
চিতার অপর পার্শ্বে জানু পাতি ধরাতলে
বসিয়াছে শৈল, শোভে কপোল ধারা-যুগলে।
পার্শ্বে স্থির দ্বৈপায়ন, কপোলে যুগল ধারা,
কহিলেন দেব-ঋষি প্রেমানন্দে আত্ম-হারা—
"কি ত্রিমূর্তি অপার্থিব ! ভারত জগতবাসি !
দেবগণ ! ঋষিগণ ! একবার দেখ আসি !
জ্ঞানদেব নারায়ণ ; বলদেব ধনঞ্জয় ;
মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা ! সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্ম-বিসর্জন ; জ্ঞান, বল, আত্ম-দান,
ভক্তির নিষ্কাম সূত্রে সম্মিলিত, সমপ্রাণ।

এই চতুর্বর্গ, এই মানবের মোক্ষধাম,—
দ্বাপরের অবতার! পূর্ণ তব মনস্কাম!
পূর্ণকাম দ্বৈপায়ন, এই মহাতীর্থ ধাম
দেখিল নয়ন ভরি, দেখিল ভরিয়া প্রাণ।
নারায়ণ! জগন্নাথ! দেও শক্তি, ধরি' ধ্যান
আনন্দে গাহিল তব এ মহাভারত গান।
শুনিয়া সে গীত, করি কৃষ্ণনামামৃত পান,
মানব লভিবে মুক্তি, ধরা হবে স্বর্গধাম।"
গুরুদেব-পদরজ শৈলজা লইয়া শিরে,
আকুল কাঁদিয়া বালা কহিতে লাগিল ধীরে,
"হে গুরো! কৃপায় তব, হা পুত্র! স্নেহেতে তোর,
অনার্য মাতার তোর আজি নারী-জন্ম ভোর।
জগন্নাথ! জগৎপতে! আর্য অনার্যের হরি!
হে নীলমাধব! দেও পদাম্বুজ দয়া করি
পতিত অনার্যগণে, পতিতপাবন নাম
দেও বনপুত্র মুখে ধর্মরাজ্যে দেও স্থান।"
নির্গুণ নবীন তৃণে অঙ্কুরিয়া দুটি ফুল,
একটি পড়িল ঝরি অকালে পুষ্প-মুকুল
তোমার পবিত্র অঙ্কে। নির্মল কোরক আর
আছে তার প্রেম-বৃন্তে! এই কলি সুকুমার
ফুটাইয়া প্রেম-করে, হৃদয়েতে দলে দলে
লিখিও তোমার নাম পিতৃ-প্রেম-অশ্রুজলে।
দিও জ্ঞান, ভক্তি, বল! দিও শিক্ষা আত্ম-দান।
দিও পদাম্বুজ-ছায়া! ধর্মরাজ্যে দিও স্থান!
শুনিতে শুনেতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান!

প্রভাস

(প্রথম প্রকাশ—১৮৯৬)

রৈবতক উৎসর্গিত পিতার চরণে,
কুরুক্ষেত্র উৎসর্গিত চরণে মাতার
প্রভাস পত্নী ও পুত্র নির্মলের করে
অর্পিলাম, নারায়ণ ! নির্মাল্য তোমার।

রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি-লীলা কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।

প্রথম সর্গ

ছায়া

নির্মল আনন্দরাশি, নির্মল আনন্দ হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু। আনন্দ নির্মল,—
জলরাশি ; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল।
অপরাহ্ন,—বসন্তের শুক্লা চতুর্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে,—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা ; বেলায় তরঙ্গ-খেলা ;
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দগীত, চুম্বি অনিবার।
সিন্ধুবক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণুবক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।
বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
বিচিত্র কেতনশিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
সিন্ধুমত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত।
আসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—
গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি সিন্ধুমত।
কিছু দূরে মনোহর বঙ্কিম বেলায়,
নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি ঊর্ধ্বে শির
শোভিতেছে যেন দেব পবিত্র মন্দির।
শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিরুপম,
নীল কেতনের বক্ষে, পীত সুদর্শন
কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র-অনিলে ধীরে,
করিছে মহিমাময়! সিন্ধু অবিরাম
অসংখ্য তরঙ্গ করে করিছে প্রণাম।
সুবর্ণ-পর্যঙ্ক অঙ্কে আনন্দরূপিণী
চারু উপাধানে অর্ধশায়িতা রুক্মিণী।
সত্যভামা পাশে বসি, নিরানন্দ মুখশশী ;
সত্যভামা পার্শ্বে শোভা বিদর্ভ-সুতার,
দীপ্ত সন্ধ্যা পার্শ্বে যেন ফুল্ল জ্যোৎস্নার।
নির্নিমেষ নেত্র চারি, চাহিয়া অনন্ত বারি,
অনন্ত বারির ক্রীড়া অনন্ত সুন্দর,—
চিন্তাকুলা সত্যভামা, কুঞ্চিত অধর।
বিমুক্ত কবরীরাশি, পড়েছে পর্যঙ্কে ভাসি ;
সুধাকর হ'তে যেন নীলামৃত ধারা ;
সান্ধ্য-গগনের মত স্থির নেত্র তারা।
সেই মুক্ত কেশপটে সে রূপের খেলা,—
সন্ধ্যা-পটে বসন্তের অপরাহ্ন বেলা।
উভয়ে নীরবে ধ্যানে, চাহিয়া সিন্ধুর পানে ;
রুক্মিণীর দৃষ্টি,—দৃষ্টি শান্ত জ্যোৎস্নার।
সত্যভামা দৃষ্টি,—দৃষ্টি গাম্ভীর্য সন্ধ্যার।
চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধা বিদর্ভনন্দিনী—
"কি অনন্ত শোভা! দিদি!"—কহিলা রুক্মিণী।
"অপরাহ্ন শেষে শান্ত সমুদ্রহৃদয়
হইয়াছে সমুজ্জ্বল নীলমণিময়।
সিন্ধু যেন পুণ্যরাশি ; কিরণ আনন্দ হাসি ;
সিন্ধুবক্ষে বসন্তের সান্ধ্য রবিকর,—
পুণ্যবক্ষে আনন্দের আলোক সুন্দর।
আনন্দ মণ্ডিত, পুণ্যে পূর্ণিত অর্ণব,
চেয়ে দেখ!"—সত্যভামা নিস্পন্দ নীরব।
নিস্পন্দ নীরব চাহি চাহি কিছুক্ষণ
কহিলা রুক্মিণী—"দিদি! সৃষ্টির প্রথম
অনন্ত সলিলবক্ষে ছিলা নারায়ণ
ভাসমান,—দেখ সেই দৃশ্য নিরুপম।
দেখ সেই পারাবার! ভাসিতেছে বক্ষে তার
জ্যোতিরূপী নারায়ণ—সায়াহ্ন কিরণ!
অনন্ত সলিল বক্ষে দেখ নারায়ণ!
হায়! দিদি, আমাদের পতি নারায়ণ!
ওই পারাবার মত, হয় যদি পরিণত
আমাদের শিলাময় কঠিন হৃদয়
প্রেম-পারাবারে, হেন অনন্ত অক্ষয়!
এমনি নির্মল প্রেম, এমনি অতল,

আনন্দ লহরীময়, এমনি শীতল!
আমাদের হৃদয়েতে তবে নারায়ণ
ভাসিতেন যেন ওই রবির কিরণ!"
আনন্দে রাণী বিহ্বলা ধরি সত্যভামা-গলা
কহিলা উচ্ছ্বাসে; দুই মুক্তা নিরমল
ভাসিল রাণীর দুই নয়নে সজল!
দুই মুক্তা সমুজ্জ্বল, দুই বিন্দু অশ্রুজল,
ভাসিল নয়নে—প্রেম-সমুদ্র বিভব
রমণীর;—সত্যভামা নিস্পন্দ নীরব।

সেই নেত্র ছল ছল, সে মুখ অরুণোজ্জ্বল
মেঘাচ্ছন্ন নিরখিয়া কহিলা, রুক্মিণী,—
"এ কি, দিদি, কেন তুই এত বিষাদিনী?
উৎসব আনন্দে প্রাণ, সকলের ভাসমান,
উৎসবে যাদবগণ উন্মত্ত অধীর;
তোর মুখে কেন এই বিষাদ গভীর?"
বিষাদ-গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তরিলা রাণী,—
"সত্য, দিদি, কি অজ্ঞাত বিষাদে না জানি
ডুবিয়া যেতেছে যেন হৃদয় আমার,
যত ভাসাইতে প্রাণ চাহিতেছি, তত জ্ঞান
হইতেছে শিলাময়; ডুবিছে হৃদয়
বিষাদ-সিন্ধুর গর্ভে নিরানন্দময়।
শুধু দিদি আজ নয়, প্রাণ নিরানন্দময়
বহু দিন, বহু দিন হৃদয়ে আমার
হইয়াছে কি যেন কি ছায়ার সঞ্চার।

রুক্মিণী

কেন দিদি, কি ছায়া সে? কেমনে সঞ্চার,
হইল হৃদয়ে তোর? কেন এ বিষাদ ঘোর?
আমরা রাজার কন্যা, প্রেয়সী রাজার,
পতি নর-নারায়ণ বিষ্ণু অবতার।
পুত্রগণ ইন্দ্রসম, রূপে গুণে নিরূপম;
রূপ গুণ প্রেম তোর জগতে দুর্লভ।
তোর হৃদয়েতে ছায়া, এ কি অসম্ভব।

সত্য

শুন নাই তুমি, দিদি, কত অমঙ্গল;
ঘটিয়াছে যাদবের রাজ্যে অবিরল।
বলি নাই, কে বলিবে? তোর প্রাণে ব্যথা দিবে,
নাহি চাহে কারো প্রাণ। সরল তরল
তোর প্রাণ, শিশিরাক্ত কামিনী কোমল,
পড়ে ঝরে পরশনে; তোরে অকরুণ মনে
কে কহিবে অমঙ্গল দুঃখ-সমাচার?
নিক্ষেপিবে শিলা প্রাণে যূথিকামালার?
ত্রিদিবের কোমলতা, ত্রিদিবের প্রেমলতা,
ত্রিদিবের পবিত্রতা, এ মর্ত্যে কঠিন
কেমনে আসিলি তুই, ভাবি চিরদিন।
আছিস্ এ মর্ত্যে পড়ি, এই দেবীরূপ ধরি,
এ মাটির পৃথিবীর তুই কিছু নয়,
মাটির বাতাস তোর প্রাণে নাহি সয়।

রুক্মিণী

বড় নিরাশ্রয়া আমি, বড়ই দুর্বলা,
সত্য দিদি; কিছু আমি, সংসারের নাহি জানি;
আমার আশ্রয় তোর, সুভদ্রার, গলা।
দুই দিকে দুই জন, না থাকিলে অনুক্ষণ,
কবে এত দিনে, দিদি, এই লতা ক্ষীণা
যেতো শুকাইয়া অবলম্বন-বিহীনা!
কি ঘটেছে অমঙ্গল, কিছুই না জানি, বল!
কুশলে ত আছে বল পুত্রকন্যাগণ?
আশ্রমে আছেন ভাল ভদ্রা নারায়ণ?

সত্য

সকলে আছেন ভাল। কিন্তু অমঙ্গল
বহু দিন হ'তে, দিদি, ঘটিছে কেবল।
বহু দিন অনাবৃষ্টি; মহানদীচয়
হইয়াছে শুষ্কপ্রায়; মহাশব্দে বয়
ঝটিকা শর্করবর্ষী; নীহারে আবৃত
প্রদোষে প্রভাতে দিক; পড়ে অনিবার
উল্কারাশি যদুরাজ্যে বরষি অঙ্গার।
নাহি দিবাকর আর তেমন উজ্জ্বল;
ধূলি ধূসরিত যেন আদিত্য মণ্ডল।
শ্যামল, অরুণ, ভস্ম, বর্ণের বিকৃত
অবয়বে চন্দ্র সূর্য গগন আবৃত।
ঘন ঘন ভূমিকম্প! ভূধর উদরে
কি ঘর্ঘর শব্দ! শুনি শরীর শিহরে।
মূষিকের উপদ্রব স্থান নির্বিশেষ;
ঘুমালে যাদবগণ কাটে নখ কেশ।
গৃহ, পথ, সরোবর, বন, উপবন,
মৃত মূষিকেতে নিত্য পূর্ণ অগণন।
দিবা নিশি পশু-পক্ষী, পালিতা সারিকা,
ডাকিছে বিকৃত কণ্ঠে, যেন বিভীষিকা
দেখিতেছে অনুক্ষণ; বহে অনিবার
তপ্ত রুক্ষ বায়ু যেন করি হাহাকার।

রুক্মিণী

দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, আমি এ সকল।
কিন্তু দিদি, প্রাণে মম, ভাসে নাই তোর সম
কোনো অমঙ্গল ছায়া; বিষাদে আঁধার
করে নাই কই, দিদি, হৃদয় আমার।
মঙ্গল ও অমঙ্গল, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল,
যাঁহার সৃজন, তিনি মঙ্গল-নিদান।
তিনি দয়াময় প্রেমময় ভগবান।
আমরা এ ক্ষুদ্র জীব, কিবা শিব, কি অশিব,
কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, আলোচনা তার,—
পতঙ্গের প্রগল্‌ভতা বিশ্ব বুঝিবার!
স্রষ্টার এমন সৃষ্টি, যে ভাবে করিবে দৃষ্টি,
দেখ মঙ্গলের ভাবে মঙ্গল সকল।
অমঙ্গল ভাবে দেখ সব অমঙ্গল।
কি মঙ্গল, অমঙ্গল, সুখ দুঃখে যাহা বল,
সকলি মানব মনে; জগত কেবল
সুখময়, শোভাময়, অনন্ত মঙ্গল।
দিদি, ভ্রান্তি কর দূর, হয়েছে যাদবপুর,
হইয়াছে বসুন্ধরা অমঙ্গলময়
অনাবৃষ্টি হেতু; দিদি, আর কিছু নয়।
হইবে সুবৃষ্টি যবে, ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে
আবার যাদব-রাজ্য, হাসিবে আবার
বসুন্ধরা, হবে বিশ্ব সুখ-পারাবার।

সত্য

ভারত যুদ্ধের কালে ঘোর অমঙ্গল
ঘটেছিল এইরূপ শুনিয়াছি আমি।
ফলিল তাহার হায়! কি ভীষণ ফল!
যদুকুল ভাগ্যে, দিদি, কি আছে না জানি!

রুক্মিণী

ভারত-যুদ্ধের ফল ভীষণ এমন,
কে বলিল সত্যভামা?
ভারত-যুদ্ধের ফল, কি আনন্দ নিরমল!
ভারত ব্যাপিয়া শান্তি, ধর্মের উত্থান,
ভারত ব্যাপিয়া উঠিতেছে হরিনাম।
জরাসন্ধ, শিশুপাল, অসংখ্য অবনীপাল,
অধর্মের মহীরুহ, নাহি দুর্যোধন,
আপনার পাপানলে ভস্ম পাপিগণ!
কুতৃণ কৃষকগণ কাটি যথা অগণন,
সুতৃণে পূর্ণিত ক্ষেত্র করে আপনার,
হতেছে সুতৃণে পূর্ণ ভারত আবার!

সত্য

দেখেছি যা দুনয়নে, স্বপ্নে নহে, জাগরণে,
দেখিতে যদ্যপি তুমি, হৃদয়ে তোমার
হইত নিশ্চয় দিদি ভীতির সঞ্চার।
কত নিশি, ঘোরতরা, সমাচ্ছন্ন বসুন্ধরা
নিবিড় তিমিরে, ঘোর কৃষ্ণ আবরণে,
দেখিয়াছি—স্মরিলেও ভয় হয় মনে!
দেখিয়াছি শয্যাকক্ষে, দেখিয়াছি এই চক্ষে,
মহামেঘ-প্রভা কৃষ্ণা নারী উন্মাদিনী,
মুক্তকেশী, মহামেঘে কৃষ্ণা সৌদামিনী।
হাসিতেছে খল খল, দুনয়নে কি অনল
জ্বলিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে মহিমা-স্বপন,
করে ধনু, পৃষ্ঠে তুণ, গর্বিত বদন।
কি গর্ব কুঞ্চিতাধরে, পীনোন্নত বক্ষোপরে!
কি গর্ব চরণক্ষেপে, সৌন্দর্য ভীষণ!
আসিত যাইত বামা উল্কার মতন।

রুক্মিণী

সত্যভামা! পরিহাস তোরে নিরন্তর
করিতে বাসেন বড় ভাল প্রাণেশ্বর।
নিশ্চয় এ তাঁর খেলা। তোর কক্ষ! অবহেলা
করিবে সে ত্রিদিবের, সাধ্য দেবতার
নাহি দিদি, তুচ্ছ অপদেবতা কি ছার?
যে পবিত্র স্বর্গধাম প্রবেশিতে কাঁপে প্রাণ
পুণ্যের ভকতিভীত; করিবে প্রবেশ
পাপের কি সাধ্য বল সে পবিত্র দেশ!

সত্য

যে অশান্তি ঘোরতর হয়েছে সঞ্চার
যদুকুলে, গৃহে গৃহে,—এও লীলা তাঁর?
গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে, যাদবের বক্ষে বক্ষে,
বিধূনিত যে ভীষণ অশান্তি অনল,
পড়ে নাহি ছায়া তব হৃদয়ে সরল।
থাক উদাসিনী মত পতিধ্যানে অবিরত,
বালিকার মত তব হৃদয় তরল,
নাহি জান চারিদিকে কি যে হলাহল
জ্বলিতেছে নিরন্তর, জর্জরিত কলেবর
কি বিদ্বেষে যাদবেরা, কি হিংসা অনল
কক্ষে কক্ষে, বক্ষে বক্ষে, জ্বলে অবিরল।
এ অনলে সুরাপান করিছে আহুতি দান
কি ভীষণ! নিরন্তর, বিনা হৃষীকেশ,
নর নারী সুরাপানে মত্ত নির্বিশেষ।

কেহ কারে নাহি মানে, কেহ কারে নাহি জানে,
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, কিছু নাহি জ্ঞান,
নাহি লজ্জা ভয়, পাপে বদন অম্লান।
পরস্পরে কি বিদ্বেষ! ব্যভিচার কি অশেষ!
পিতাপুত্র পতিপত্নী পবিত্র বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন।
সত্য, বুঝি মূর্তিমতী, সেই ভীমা রূপবতী,
ভ্রমিছে অশান্তি কক্ষে কক্ষে দ্বারকায়,
আচ্ছন্ন করিয়া পুরী বিশাল ছায়ায়!

রুক্মিণী

কি ভীষণ চিত্র দিদি! আঁকিলি নয়নে!
এও তাঁর লীলা, মম হইতেছে মনে।
কিন্তু তোর, এ কি ভ্রান্তি! ভারতের সে অশান্তি
লুকাইল স্বপ্ন মত লীলায় যাঁহার,
তিনি যাদবের পতি, তিনি কর্ণধার।
দেখিবি যাদবগণ করি সুখে অতিক্রম
এ অশান্তি পারাবার, শান্তির বেলায়,
প্রভাস উৎসব অন্তে, যাইবে হেলায়।
ওই শুন কি তরঙ্গ, শুন কি তরঙ্গ-ভঙ্গ
হইতেছে আনন্দের শিবিরে শিবিরে,
সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুকারি তীরে।
কোথাও অশান্তি ছায়া, কালের সে কালী কায়া,
দেখিস্ কি? শুনিস্ কি শ্রবণে এখন
কোথাও সে অশান্তির অস্ফুট নিঃস্বন?
তাঁহার লীলার তীর কে পাইবে? অশান্তির
দুই ভিন্ন লীলায় কি হবে পরাভব?—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস লীলা, প্রভাসে উৎসব?

বহুক্ষণ সত্যভামা রহিলা নীরবে
চাহি সান্ধ্য সিন্ধুপানে, নিমজ্জিতা যেন ধ্যানে।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসি সিন্ধু নীলিমায়
মাখিছে নীলিমা আরো গভীর ছায়ায়।

"দিদি, যাহা কহ তুমি; আমায় হৃদয়-ভূমি"
কহিলেন সত্যভামা—"ছাইয়া সতত
সিন্ধু-বক্ষে ধীরে ওই সন্ধ্যা-ছায়া মত,
হইতেছে গাঢ়তর সেই ছায়া নিরন্তর;
এই আনন্দের ধ্বনি শ্রবণে আমার
ধ্বনিতেছে যেন অশান্তির হাহাকার।
দেখ ওই সিন্ধু নীর, কেমন প্রশান্ত স্থির!
মুহূর্তে, ঝটিকা তাহে হইল সঞ্চার
দেখিবে হইবে বিধূনিত পারাবার।
এই শান্তি যাদবের, এই ধ্বনি আনন্দের
শুনিতেছ, কোন দিকে দেয় দরশন
যদি মেঘ, উঠিবে কি ঝটিকা ভীষণ!"

নারায়ণ ধীরে ধীরে পশিলেন এ শিবিরে
প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্তি! আয়ত নয়ন
প্রশান্ত প্রসন্ন, যেন সায়াহ্ন গগন।
প্রণমিলা দুই রাণী পরশিয়া পা দুখানি,—
অগ্রে সত্যভামা, পরে বিদর্ভনন্দিনী,
অগ্রে উষা, পরে দিবা সুচারুহাসিনী,
নর্মলা উদয়াচল পদতল নীলোজ্জ্বল,
শরতের সুপ্রভাতে; বসিলা কেশব
পর্যঙ্কে; বসিয়া দুই রমণী বিভব।
লইয়া পতির কর নিজ করে ক্ষুদ্রতর,
রক্তোৎপলে নীলোৎপল করিয়া স্থাপিত,
কহিলা রুক্মিণী—"নাথ! হইয়াছে ভীত
সত্যভামা! দয়াময় দূর কর তার ভয়,
অমঙ্গল অশান্তির ছায়া কি ভীষণ
করেছে আচ্ছন্ন তার হৃদয়-গগন!
উৎসবের এ উচ্ছ্বাসে, তাহার হৃদয়াকাশে,
একটিও আনন্দের নক্ষত্র উজ্জ্বল
ফুটে নাই, মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কেবল।"

স্মিতমুখ ইন্দীবর, কৌতুক কুঞ্চিতাধর,
"মহিষি!"—কহিল কৃষ্ণ—"বিচিত্র কি আর
নিত্য এই ভাব সত্যভামার তোমার।
বিধাতার এ মঙ্গল শান্তিপূর্ণ ধরাতল
শোভাময়, সুখময়, এই পুণ্যময়,
উৎসবের আনন্দের অনন্ত আলয়
সুখশান্তি সুমঙ্গল, সত্যভামা, তুমি বল,
দেখেছ কি এ জীবনে কোথাও কখন?
পেচক আলোক নাহি দেখে কদাচন।
খুঁজি এই ভূমণ্ডল কোথা পাবে অমঙ্গল,
কোথায় অশান্তি পাবে, সত্যভামা চায়;
যে চায় যেরূপ রাণি! সেইরূপ পায়।
চন্দ্রে সে কলঙ্ক খোঁজে, কুসুমে কণ্টক,
জ্যোৎস্নায় মেঘছায়া, ত্রিদিবে নরক।
নাহি সাধ্য বিধাতার নির্দোষ হবেন পার,

এ জগতে একমাত্র পূর্ণ-নির্বিকার -
সত্যভামা,—সত্যভামা,—সত্যভামা আর।"

রুক্মিণী

এ কৌতুক ত্যজ নাথ! করো না প্রাণে আঘাত,
আজি নহে সত্যভামা মানিনী তোমার,
উঠিয়াছে প্রাণে তার বড় হাহাকার।
যাদবের অমঙ্গল, কি যে ঘন মেঘদল,
ছাইয়াছে স্নেহপূর্ণ হৃদয় তাহার ;—
তুমি যে যাদবপতি, অমঙ্গল তার ?

মুকুন্দ ফিরায়ে মুখ, কিবা মূর্তিমতী দুঃখ!
দেখিলেন সত্যভামা, চাহিয়া নীরবে
আত্মহারা ঘোর কৃষ্ণ সায়াহ্ন-অর্ণবে!
পতির কৌতুকবাণী, চিন্তা-নিমজ্জিতা রাণী
শুনে নাই! যেই জিহ্বা শ্লেষের আগুন
তপ্ত অঙ্গারের মত বর্ষণে নিপুণ,
অচল সে! রসরঙ্গে, রঙ্গের তরঙ্গ-ভঙ্গে,
যেই হৃদয়ের, কৃষ্ণ যেতেন ভাসিয়া,
সেই সিন্ধু স্থির, মেঘে রেখেছে ছাইয়া!
দীপালোকে সত্যভামা বসি, বিষাদিনী বামা,
শেষ সন্ধ্যা মত, দেহ অবিচল স্থির,—
দেখি গোবিন্দের মুখ হইল গম্ভীর।
নতমুখ, অন্য মন, শিবিরেতে কিছুক্ষণ
ভ্রমিয়া কহিলা দেব,—"শান্তি অমঙ্গল
সকলেই মানবের নিজ কর্মফল।
সেই কর্মফল রেখা,—উহাই অদৃষ্ট-লেখা—
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন ?
রুক্মিণি! ফিরায়ে নেত্র, রাজসূয় যজ্ঞক্ষেত্র
একবার শান্তভাবে কর দরশন!
হায়! ভারতের সেই অশান্তি ভীষণ
রাজসূয় যজ্ঞস্থলে নিবারিনু কি কৌশলে!
বলি দিয়া অশান্তির দুই অবতার,
করিলাম শান্তির সে সাম্রাজ্য প্রচার!
কিন্তু কি হইল বল? অধর্মী প্রচণ্ডানল
জ্বালাইয়া কুরুক্ষেত্রে, পতঙ্গের মত
হইল ভস্মিত, করি শ্মশান ভারত।
কত যত্ন করিলাম, জান তুমি অবিরাম
নিবারিতে কুরুক্ষেত্র, হইল নিষ্ফল,—
পূর্ণ অধর্মের রাশি! ধ্বংস কর্মফল।
অধর্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান,
সে অধর্ম যাদবের অস্থিমাংসগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল;
কেমনে নিবারি,—কেন নিবারিব আমি?
নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী।"

"আমি মানবের স্বামী"—শিহরিয়া দুই রাণী
দেখিলা যোগস্থ মূর্তি নীলমণিময়
দীপিতেছে দীপালোকে ঊর্ধ্ব নেত্রদ্বয়!
দূর ঝটিকার মত ও কি শব্দ অবিরত
আসিতেছে ভাসাইয়া আনন্দ-উৎসব —
মানবের হাহাকার, পক্ষী-কলরব!
কাঁপিতেছে ঘন ঘন ধরা ক্ষুদ্র দোলা সম,
রুক্মিণী ও সত্যভামা পতিপদতলে
পড়িলেন শয্যাভ্রষ্টা প্রকম্পন বলে।
পতনে অর্ধমূর্ছিতা, ধরিয়া বিস্মিতা ভীতা
পতির চরণদ্বয়, উঠিলা কাঁদিয়া,
সমুদ্র-গর্জন তাহা নিল ভাসাইয়া।
কাঁপে ধরা ঘন ঘন; জীমূত গর্জন সম
গর্জিতেছে মহাসিন্ধু ভীম বেশ ধরি;—
কেবল যোগস্থ স্থির দাঁড়াইয়া হরি।

দ্বিতীয় সর্গ

অভিশাপ

অতীত প্রহর নিশি ; মহর্ষি দুর্বাসা
রৈবতক গিরি কক্ষে বসি চিন্তাকুল ;
বসি চিন্তাকুল পার্শ্বে ঋষি কতিপয়।
কক্ষের সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশি অজ্ঞাতে
বসন্তের নৈশানিল কাঁপাইছে ধীরে
এক ক্ষীণা দীপশিখা। কম্পিত আলোক
কাঁপাইয়া প্রাচীরেতে নানা অবয়বে
বিকৃত, বীভৎস, কৃষ্ণ ছায়া ঋষিদের,
দেখাইছে কক্ষ ক্ষুদ্র প্রেতভূমি মত।
আরম্ভিলা ঋষি এক—"মহর্ষি! যথায়
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য, আবর্ত্ত ঋতুর,
তুলিয়া অনন্ত শির অনন্ত আকাশে
তুষারমুকুটসহ,—মণ্ডিত রজতে
শশধর শুভ্রকরে, তপ্ত স্বর্ণময়
উদয়াস্ত ভাস্করের কর পরশনে—
বিরাজেন হিমাচল, তুলিয়া মস্তক
প্রসারি অনন্ত ফণা নাগেন্দ্র যেমতি
অনন্ত, অনন্তব্যাপি ক্ষীরোদ সাগরে।
তাঁহার ছায়ায় আমি উত্তর ভারতে,
জাহ্নবী যমুনা শৈলসুতা অসংখ্যের
সরল কৈশোর লীলা করি দরশন,
দেখি শৈল অঙ্কে অঙ্কে নাচিয়া ঘুরিয়া
সেই ক্রীড়া, সেই লম্ফ প্রস্তরে প্রস্তরে,
শুনি সেই সুমধুর কৈশোর সঙ্গীত,
ভ্রমিয়াছি বহু বর্ষ।"

"ভ্রমিয়াছি আমি"—
কহিল দ্বিতীয় শিষ্য—"মহর্ষি! যথায়
পঞ্চমুখ বিনিঃসৃত সুধাস্রোত মত
সঙ্গীতের সুশীতল, নির্ম্মল শীতল
বহিতেছে পঞ্চনদ ; শোভিতেছে পঞ্চ
নীলমণি হার বক্ষে পঞ্চনদ-ভূমি
প্রসবি ঐশ্বর্য শৌর্য ; হিমাদ্রি মুকুট
শোভে শিরে সুরঞ্জিত কাশ্মীর কুসুমে,
সিন্ধু বক্ষে পাদপদ্ম সদা ভাসমান,
বিষ্ণু পদাম্বুজ মত। ভ্রমিয়াছি আমি
শৈলে বিচিত্রিত, শৈল-প্রাচীরে রক্ষিত,
গান্ধারীর জন্মভূমি পবিত্র গান্ধার।"
কহিল তৃতীয় শিষ্য—"গুরুদেব! আমি
ভ্রমিয়াছি স্বর্ণপ্রসূ পূরব ভারত
মিথিলা, মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ উৎকল ;
শতমুখী শতভুজা জাহ্নবী যথায়,
শতমুখে শতধারা সুধা সঞ্জীবনী,
শতভুজে রত্নরাশি, করিয়া বর্ষণ,
রেখেছেন সাজাইয়া নিকুঞ্জ নিথর
প্রকৃতির, ফলে পুষ্পে, পাদপে লতায় ;
উত্তাল যৌবনগর্ব্বে শৈলজা যথায়
শতমুখে উচ্ছ্বসিত সিন্ধু বিচুম্বিয়া
ঢালিছেন প্রেমধারা বসুধা প্লাবিয়া।"
কহিল চতুর্থ শিষ্য—"ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি
ভ্রমিয়াছি মরুভূমি মধ্য ভারতের।
যেই বিধি সৃজিলেন কমলে কণ্টক,
শশাঙ্কে কলঙ্ক, শমী হৃদয়ে অনল,
কামনা দুষ্পূরণীয় মানব হৃদয়ে,
সেই বিধি বুঝি হায়! নিদারুণ মনে
হৃদয় করিল মরু ভারত মাতার!
রাখিল চাপিয়া বক্ষে বিন্ধ্য, আরাবলি,
ভীষণ কঠিন শৈল অচল যুগল!
কিম্বা বুঝি ভ্রান্তি মম ; - বিন্ধ্য, আরাবলি,
বুঝি মাতৃস্তনদ্বয় ; হায়! অবিরল
বহি চারি স্তন্যধারা অমৃত শীতল,
মহানদী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, তপতী,
পালিয়া সন্তানগণে যুগ যুগান্তরে,
হইয়াছে জননীর বিশুষ্ক হৃদয়,—
হায়! নরাধম মোরা!" হইল সজল
ঋষির নয়নদ্বয়। কহিল কাতরে—
"মাতৃভক্তি, মাতৃপ্রেম দিয়া প্রতিদানে
করি নাই সে হৃদয় সজল শ্যামল!
হইল কেমনে হায়! ভারত-সন্তান
সহৃদয়, অহৃদয় মেঘের অধম?

নিদাঘে বসুধা-স্তন্য পান করি মেঘ,
বরিষায় সেই ঋণ করে পরিশোধ
অজস্র ধারায়।"
ঋষি কহিল পঞ্চম—
"ঋষীন্দ্র! দক্ষিণাপথ ভ্রমিয়াছি আমি,
রাম সীতা লক্ষ্মণের পদাঙ্ক অমর
অনুসরি; পত্নীপ্রেম, আত্মবিসর্জন
পতি-প্রেমে, ভ্রাতৃ-প্রেমে, করি নিরীক্ষণ
চিত্রিত অমর বর্ণে, চিত্রপটে যেন,
অঙ্কে অঙ্কে পথে পথে দক্ষিণাপথের,
পবিত্র দণ্ডকারণ্যে, পম্পা সরোবরে;
শুনি অন্তরীক্ষে যেন সে করুণ গীত,
অমৃতবর্ষিণী সেই বীণা বাল্মীকির।
দেখেছি মলয়, নীল, অচল যুগল—
জননীর সুপবিত্র যুগল চরণ,
সম্মিলিত কুমারীতে, ভাসিতে সাগরে
আকক্ষ, তরঙ্গ তুলি লীলা মহিমার;
সুপবিত্র স্বর্ণময় করি লঙ্কাপুরী
জননীর শ্রীচরণে রেণুর শৃঙ্খলে।
জননীর কটিতটে নীলমণি মালা
দেখিয়াছি কৃষ্ণা, আমি শুনেছি চরণে
কল্লোলিনী কাবেরীর শিঞ্জিনী শিঞ্জন।"

দুর্বাসা

উত্তম।
নীরব ঋষি, নীরব সকল।
কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে চাহিয়া দুর্বাসা
কক্ষ প্রাচীরের পানে; সেই মুখ পানে
চাহি শিষ্য পঞ্চ জন;—নীরব সকল।

দুর্বাসা

কি দেখিলে, কি শুনিলে?
অবনত মুখ
করিলেন ঋষি পঞ্চ, রহিলা নীরব।

দুর্বাসা

কি দেখিলে,—কি শুনিলে?

প্রঃ শিষ্য

যোগীন্দ্র! সকলে
দেখিয়াছি চক্ষে, কর্ণে শুনিয়াছি যাহা,
নাহি শক্তি, নাহি ভাষা, নিবেদিতে পদে।
যে অশান্তি, পূর্ব ছায়া ঘোর ঝটিকার,
ছিল কুরুক্ষেত্র পূর্বে ব্যাপিয়া ভারত
প্রলয়ের মেঘমত, ঝটিকা গর্জন,
ভীষণ জীমূত মন্দ্র, সেই অশান্তির,—
ঈর্ষা ক্রোধ বিস্ফুরণ বিদ্যুদগ্নি মত
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে, নগরে নগরে,
গৃহে গৃহে, নরে নরে,—ঘন বজ্রপাত,
রাজ্যে রাজ্যে সংঘর্ষণ, আকেন্দ্র ভারত
আসমুদ্র হিমাচল, করি প্রকম্পিত,—
আসিন্ধু অচল, দেব! আগঙ্গা গান্ধার,
সাধুদের হাহাকার, ঘোর হুহুঙ্কার
দুষ্কৃতের, অধর্মের সে নৃত্য ভীষণ,—
নাহি আর। সে অশান্তি গিয়াছে সরিয়া
তিমিরা-রাক্ষসী যেন দিবাকর-করে।
কুরুক্ষেত্র-ঝটিকায় গর্জিয়া, বর্ষিয়া,
অসংখ্য অশনিপাতে করিয়া নিপাত
আপনার জন্মদাতা মহীপতিগণ,—
অধর্মের সে করাল মহামেঘমালা
হইয়াছে নিঃশোষিতা আত্ম-বিনাশিনী।
ভীষণ ঝটিকা অন্তে প্রকৃতির মত
হাসিছেন মেঘমুক্তা ভারতজননী
কি মধুর শান্তির-হাসি! ভারতজননী
অশান্তির দাব-দগ্ধা, হইয়া শ্যামলা
আজ বিমণ্ডিতা কিবা শান্তি-জ্যোৎস্নায়
নিরমল সুশীতল! নীলাম্বু সাগরে
ভাসমানা নিত্য মাতা নীলাব্জ রূপিণী,
আজি ভাসিছেন কিবা শান্তির সাগরে
নিঃমল সুশীতল নীলামৃতময়!
প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য। ব্যাপিয়া ভারত
এক মহারাজ্য ছত্র। ছায়ায় তাহার
খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম
শান্তির কোমল অঙ্কে; হতেছে চালিত
শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত।
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ। সৌর শক্তি মত
করিয়াছে নব ধর্ম প্রেমে শৃঙ্খলিত;
করিয়াছে কি উন্নতি-পথে সঞ্চালিত!
বাণিজ্যের রুদ্ধ স্রোত ছুটেছে আবার
প্লাবি ধনধান্যে ধরা; রুদ্ধ জ্ঞান-স্রোত
দর্শন বিজ্ঞান পক্ষে ছুটেছে আবার
লঙ্ঘি গ্রহ উপগ্রহ, রাজ্যে অনন্তের,
তত্ত্ব রত্নে পূর্ণ করি জ্ঞানের ভাণ্ডার,
এক সিন্ধু গর্ভে; এক স্বর্ণ সরসিজে,

বিরাজিত নব প্রেমে গলাগলি করি
ধনমাতা, জ্ঞানমাতা,—চির বিরোধিনী—
আলিঙ্গিয়া নারায়ণে। শান্তি পারাবার
সেই সিন্ধু; নব রাজ্য সেই শতদল:
সেই নারায়ণ কৃষ্ণ। শান্তি পারাবার
গাহিতেছে কৃষ্ণ নাম অনন্ত উচ্ছ্বাসে।
নব রাজ্য নীরজের অক্ষয় মৃণাল
কৃষ্ণনাম; নব ধর্ম মন্ত্র কৃষ্ণনাম।
আসমুদ্র হিমাচল ভারত কেবল
গাহিতেছে কৃষ্ণ নাম আনন্দে বিহ্বল।
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা দুর্বাসা—
"হায়! জড় মূর্খ নর! বুঝিল না কেহ
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ লীলা দুর্বাসার।
কৃষ্ণের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের
এই মহা নরমেধ করে উদযাপন!
সাজি পাণ্ডবের দূত কতই কৌশলে
পেতেছিল ষড়যন্ত্র সন্ধির কারণ
প্রাণপণে! নারায়ণ দাঁতে তৃণ লয়ে
মাগিলেন পঞ্চ গ্রাম। "সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব"—শুনিলেন মন্ত্র দুর্বাসার।
"ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক
পোড়াইয়া আধিপত্য বেদ ব্রাহ্মণের
রক্ষিতে, করিয়া সেই যজ্ঞ নরমেধ
স্থাপিলাম এই শান্তি আসিন্ধু অচল;—
কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন!
হা বিধাতঃ! তথাপি কি হইল প্রচার
সেই গোপালক নাম! ইন্দ্র, চন্দ্র ছাড়ি
গোপালক, গোবর্ধন, পূজিবে ভারত!—
এই মনস্তাপ হায়! সহিব কেমনে!"
কিছুক্ষণ ঋষিবর রহিয়া নীরবে
জিজ্ঞাসিলা—"কে করিল, করিল কেমনে,
এই পাপনাম, পাপ ধর্মের প্রচার?"
কহিল প্রথম শিষ্য অবনত মুখে
সভয়—"মহর্ষি ব্যাস"—
আগ্নেয় ভূধর
গর্জিল দুর্বাসা ক্রোধে, ভীত শিষ্যপানে
চাহি কোটরস্থ ক্ষুদ্র নেত্রে প্রজ্জ্বলিত—
"মহর্ষি!—মহর্ষি!—ব্যাস! ওরে মূর্খ কহ
কে ব্যাস? মহর্ষি নাম কে দিল তাহারে
"পরাশর পুত্র"—ভয়ে কহিল কাঁপিয়া
শিষ্য।
"পরাশর পুত্র"—গৈরিক এবার
ছুটিল আকাশ পথে, গর্জিলা দুর্বাসা—
"জিতেন্দ্রিয় পরাশর, তাঁর পুত্র কভু
সম্ভবে কি ওরে মূর্খ—উড়ম্বরে ফুল?
মহাঋষি পরাশর তপস্যায় তাঁর
করিলি রে এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ!
লভিলি কি এই শিক্ষা দুর্বাসার কাছে
দুরাচার!"
"দ্বৈপায়ন"—কহিল তখন
ভীত প্রকম্পিত শিষ্য। কহিলা দুর্বাসা—
"বুঝিলাম এতক্ষণে কে মহর্ষি তোর,
কে সে ব্যাস। বুঝিলাম গর্ভে ধীবরীর
জনমিল দ্বীপে যেই জারজ সন্তান,
সে তোর মহর্ষি, মূর্খ! সেই তোর ব্যাস!
সেই পরাশর পুত্র! আর্য পরাশর
করিলেন বিসর্জন তপস্যা তাঁহার
ধীবরীর পদ্মগন্ধে দ্বীপ বালুকায়!
অপূর্ব এ নব ধর্ম! মহর্ষি—ধীবর!
গোরক্ষক—নারায়ণ! প্রণব তাহার
গোপ নাম! বেদ শাস্ত্র আছে কি তাহার?
"ভগবদ্গীতা"—শিষ্য উত্তরিল ধীরে।
করিয়া দোহন উপনিষদ সকল
দ্বৈপায়ন কি যে দুগ্ধ, জ্ঞানের অমৃত,
করিলেন সঙ্কলন এই গ্রন্থে তাঁর
বলিতে না পারি প্রভু! সাজিয়া যোগিনী
বেড়াইয়া তীর্থে তীর্থে সুভদ্রা আপনি
করিছেন বিতরণ এই ধর্মসুধা,—
কি আনন্দ উচ্ছ্বসিতা, কি প্রেমে বিহ্বলা!
পান করি সে অমৃত, গাহি কৃষ্ণ নাম,
যাইতেছে গড়াগড়ি নরনারীগণ,
নয়নে কি প্রেমধারা আনন্দ হৃদয়ে!—
না দেখিলে নেত্রে প্রভু না হবে প্রত্যয়।

দুর্বাসা

আমার সে মহাগ্রন্থ!—নির্বোধ তোমরা
শিখেছ ত; শিখিয়াছ বেদ-ব্যাখ্যা মম;
তোমরা কি এতকাল ছিলে নিদ্রাগত?

প্রঃ শিষ্য

না প্রভু; শুনিলে সেই মহাগ্রন্থ নাম,
সে অপূর্ব ধর্ম ব্যাখ্যা, হাসে নরনারী।

আর যাহা বলে দেব! কহিতে না পারি।
হাসিয়া ঈষৎ ঋষি কহিলেন ধীরে—
"হায় মূর্খ শিষ্যগণ! না জান তোমরা
বর্ত্তমান কত ক্ষুদ্র! কতই অসীম
ভবিষ্যৎ! নাহি চাহি বর্ত্তমান যশঃ,
ভবিষ্যৎ মহাকীর্ত্তি গাহিবে আমার!
খদ্যোতের ক্ষুদ্রালোক নিকট উজ্জ্বল।
কিন্তু ভাস্করের জ্যোতিঃ দাঁড়াইয়া কাছে
কে পারে দেখিতে বল? কে পারে দেখিতে
হিমাদ্রির সে মহিমা বসি পদতলে?
কয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পুত্র ধীবরীর
করিয়াছে প্রণয়ন? দর্শন, বিজ্ঞান,
শ্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ,
সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, অঙ্ক, ইতিহাস—
আমার অনন্ত গ্রন্থ, অনন্ত মৈনাক
মহাকাল-সিন্ধু-বক্ষে রহিবে অচল;
ধীবরের তৃণরাশি যাইবে ভাসিয়া।
আমার অনন্ত গ্রন্থ সাধিবে উদ্ধার
অনন্ত-কালের তরে অনন্ত জীবের।"
কহিল স্বগত ধীরে শিষ্য একজন—
"অনন্ত জীবের সত্য,—অনন্ত কীটের
এই মহাগ্রন্থ স্তূপ সাধিবে উদ্ধার।
একখানি মাত্র হায়! পড়িতে তাহার
আমি এ জীবের দন্ত, ক্ষুদ্র বুদ্ধি খানি,
অনন্তকালের তরে লভেছে উদ্ধার।"
রহি মৌন কিছুক্ষণ মহর্ষি গম্ভীরে
জিজ্ঞাসিলা—"শিষ্যগণ! কহ শুনি পুনঃ
তোমাদের ঘোরতর সেই অপমান
যাদব শিশুর হস্তে,—কৃষ্ণ ভুজঙ্গের
শিশু সর্প বিষধর।"

আনত বদনে
কহিল প্রথম শিষ্য—"প্রভুর আদেশে
গিয়াছিনু দ্বারকায় আমরা সকলে
গুপ্তচর। পুরদ্বারে যদু শিশুগণ
খেলিতেছে অপরাহ্ণে; দূরে আমাদেরে
নিরখিয়া, শিশু এক সাজায়ে গর্ভিণী
জিজ্ঞাসিল—"কহ ঋষি! করিয়া গণনা
কি প্রসব করিবে এ গর্ভিণী রমণী?"
খল খল শিশুগণ লাগিল হাসিতে।

দুর্ব্বাসা

উত্তম—তাহার পর?

প্রঃ শিষ্য

এই উপহাসে
হইয়া অধীর ক্রোধে লোহিত লোচনে
কহিলাম—"হে দুর্বৃত্ত গর্বিত বালক!
করিবে এ ছদ্ম-নারী প্রসব মুষল।
গর্বিত যাদব কুল হইবে নির্ম্মূল।"
বহু বর্ষ গত প্রভু! স্মরিলে তথাপি
সে নিগ্রহ অপমান হয় প্রবাহিত
ধমনীতে অগ্নি-স্রোত, দগ্ধ হয় প্রাণ।

দুর্ব্বাসা

মাভৈ মাভৈ বৎস! এক দিন আর
হও দগ্ধ! শিষ্যগণ! এক দিনে আর
ফলিবে এ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে,
অদৃষ্টের লিপি সম বজ্রের নির্ঘাতে।
মুষল যাদবগণ করেছে প্রসব;
অচিরে যাদব কুল হইবে নির্ম্মূল।
যাও চলি শিষ্যগণ নিশ্চিন্ত আশ্রমে!
কর গিয়া আপনার তপস্যা সাধন।

তৃতীয় সর্গ

দুই ভগিনী

ফুল্ল জ্যোৎস্নায় স্নাত শৈলমালা,
শেখর উন্নত নত
শোভিতেছে শান্ত রজত সাগরে
স্থির তরঙ্গের মত।
একটি শেখরে বসি একাকিনী
বাসুকীর ভগ্নী কারু ;—
সুমলয় বয় চুম্বি কুবলয়,
চুম্বি মুক্তকেশ চারু।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
চন্দ্র-নীলাম্বর তলে
চন্দ্র নীলাম্বর-নির্মিত কুসুম,
নীলাম্বুত দলে দলে।
চন্দ্র-নীলাম্বরে বিস্তৃত সুন্দর
চাহিয়া অনন্ত পানে,
আকর্ণ বিস্তৃত অনিমিষ নেত্রে,
জরৎকারু বসি ধ্যানে।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
চন্দ্র-নীলাম্বর তলে
নীল শৈলমালা নিষ্কম্প নীরব,
নীরবে মলয় চলে।
নীরবে শেখরে বিরল পাদপ
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে,
স্থানে স্থানে গুল্ম বসিয়া নীরবে
চাহি চন্দ্রাকাশ পানে।
সস্মিতা প্রকৃতি অবগাহি অঙ্গ
জ্যোৎস্নায়, মুগ্ধপ্রাণে
রয়েছে চাহিয়া নিষ্কম্প নীরব
চন্দ্র নীলাম্বর পানে।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর
নীলাকাশে ফুল্লতর
চন্দ্র ফুল্লতর উঠিল ভাসিয়া,—
কারুর হৃদয়েশ্বর।
সেই আকাশের সেই চন্দ্র কারু
দেখিছে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছে কারু কৈশোরে যৌবনে
সেই চন্দ্র মুগ্ধপ্রাণে।

নীল, নীলতর, নিরাশা আকাশে
ফুল্ল ফুল্লতর ধীরে,
হইয়াছে শশী ; আজি ফুল্লতম ;—
অতীত যৌবন-তীরে
বসি অভাগিনী দেখিছে সে শোভা !
প্লাবিয়া হৃদয় তার,
প্লাবিয়া ভারত, কি মহা পূর্ণিমা
করেছে বিশ্বে সঞ্চার !
সেই পূর্ণিমায় লভিছে ভারত,
লভিছে জগতবাসী,
কি শান্তি শীতল ! কেবল কারুর
হৃদয় কি অগ্নিরাশি ?
অভিমান-স্ফীত হৃদয় পূর্ণিত
নিরাশ অনলে দহি
জ্বলিয়া, গলিয়া, ছুটিয়া, গর্জিয়া,
গৈরিক ধারায় বহি
পড়িছে হৃদয়ে, অজস্র ধারায়,
কত ধারা অবিরত !
বিদীর্ণ, বিক্ষত, বিদগ্ধ হৃদয়
আগ্নেয় ভূধর মত।
মানস আকাশে সেই পূর্ণ চন্দ্র,
সেই চন্দ্র করে চারু,
বিদীর্ণ সে গিরি, গৈরিক প্রবাহ
নীরবে দেখিছে কারু।
"দিদি" !—অকস্মাৎ নিবিড় নীরব
শেখরে উঠিল ভাসি,
নিবিড় নীরব জগতে ভাসিল,
কি যেন অস্ফুট বাঁশী !
সুদূর বিশ্রুত কি যেন সঙ্গীত
উঠিল স্মৃতিতে জাগি,
সুদূর বিস্মৃত কি সুখ-স্বপন
প্রাণের, কাহার লাগি।
ধীরে ধীরে ধীরে, সে অস্ফুট বাঁশী
বিশ্রুত জ্যোৎস্না-গীত,

বিস্মৃত-স্বপন, সুখের স্নেহের
শীতল সুধা-মণ্ডিত,
উঠিল ভাসিয়া শুভ্র জ্যোৎস্নায়
কারুর নয়ন আগে,
শান্ত আকাশের শান্তিবালা যেন,—
কি শান্তি বদনে জাগে!
"কে তুমি? আকাশ হইতে কি তুমি
নামিলে এ গিরি শিরে?
কে তুমি? মানবী, কহ কিবা দেবী?"—
জিজ্ঞাসিল কারু ধীরে
বিস্ময়ে স্তম্ভিতা—"আকাশের দেবী?
কিম্বা বনদেবী বল?
কিম্বা শশাঙ্কের অঙ্ক-বিহারিণী
শান্তি সুধা নিরমল?"
"দিদি"—কি মধুর ডাকিল আবার
শান্তির ত্রিদিব লতা!
শান্তি সরোজিনী প্রভাত সমীরে
কহিল কি প্রেম-কথা!
আবার বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল কারু—
"কেন দেবি! এলে তুমি,
অভাগিনী শৈল, ধরি তার রূপ
ছলিতে এ মরুভূমি।
সেও অভাগিনী, অভাগিনী আমি,—
নিষ্ঠুর বিধির খেলা!
জ্বালিল যে মরু উভয়ের প্রাণে,
নাহি তার সীমা বেলা।
রমণীর প্রাণে জ্বলে যেই মরু
অনির্বাণ অনিবার,
জগতের মরু, শয্যা কুসুমের
হায় তুলনায় তার!
প্রান্তরের মরু, মারে এক দিনে;
প্রাণের সে মরু, হায়!
পলে পলে দহে, দহে তিল তিল,
পলে কত যুগ যায়!
সে মরু-দহনে দহিয়া দহিয়া
আমার সে শৈল ফুল,
হয়েছে আকাশে ওই শান্তি তারা,
দেখ কি শোভা অতুল!
আমি সে দহনে দহিয়া দহিয়া
বসি নৈশাকাশ তলে,
ওই তারা পানে চাহিয়া চাহিয়া
ভাসি স্মৃতিস্রোতোজলে।"
"দিদি! দিদি! আমি সেই শৈল তব,
মরে নাই শৈল তোর"—
শৈলজা পড়িল গলায় কারুর
স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভোর।
ভগ্নী পুণ্যবতী, পুণ্যবান ভাই,
প্রেম পুণ্য পারাবার,
তোমাদের পুণ্যে শৈল পুণ্যবতী,
দিদি কি অভাগ্য তার?"
"তুই শৈল!—তুই আমাদের শৈল!
সেই ক্ষুদ্র স্নেহলতা!"
আঁটিয়া হৃদয়ে উন্মাদিনী কারু
উচ্ছ্বাসে সরে না কথা;—
"তুই শৈল! সেই স্নেহের পুতুল!"
কাঁদে কারু শিশুপ্রায়—
"চাপি মুখখানি রাখ, দিদি! রাখ!
হৃদয় যে ফেটে যায়!
তুই সেই শৈল, স্নেহ-মন্দাকিনী,
আমার প্রাণের আধা!
তুই ক্ষুদ্র বীণা শৈল জরৎকারু,
এক স্বরে প্রাণে বাঁধা।
নাগরাজ প্রেম সেই এক স্বর,
আমাদের একপ্রাণ;
পিতৃমাতৃহীনা আমরা দুজন—
সে প্রেমে হয়নি জ্ঞান।
নাগরাজ মাতা, নাগরাজ পিতা,
নাগরাজ ভগ্নী, ভ্রাতা,
করুণ কিশোর প্রেমময় ভ্রাতা
আমাদের প্রাণদাতা।
বাঁচি সেই প্রেমে, নাচি সেই প্রেমে,
খেলি সেই এক খেলা,
সেই প্রেমবক্ষে দুদিকে দুজন
ঘুমায়েছি দুই বেলা।
সেই বুক হায়! শুষ্ক আধখানি
শৈল রে বিরহে তোর!
বিরহে রে তোর হইয়াছে শুষ্ক
আধখানি বুক মোর।
অর্ধশুষ্ক বুকে আয় দিদি! আয়!
ডাক পুনঃ দিদি বলি,

দেখি এই মুখ, শুনি সেই কথা,
পাষাণ যাউক গলি।
দেখি নাই মুখ, শুনি নাই কথা,
হায়! দিদি! কত দিন!
আয় দিদি! আয়! আয় মুখে মুখ,
বুকে বুক করি লীন।"
"দিদি!—দিদি!—দিদি! –দিদি প্রেমময়ি!
ভগিনী জননীসমা!
অহো! দুটি প্রাণে দিয়েছি কি ব্যথা!
দিদি! কি করিবি ক্ষমা?"
কারুর চরণ ধরি দুটি করে,
উর্দ্ধনেত্রে দর দর—
"দিদি! দিদি!—ওমা"—ডাকিছে শৈলজা;
ও কি কথা!—ও কি স্বর!
উন্মাদিনী কারু লইল তুলিয়া
বুকে সেই প্রেমলতা,
চুম্বিল বদন, চুম্বিল নয়ন,
কারুর না সরে কথা।
গলিল পাষাণ, গলিল জগত,
গলিলেন সুধাকর,
কি সুধা ঝরিল, জগত ভরি,—
কারুর হৃদয়-সর।
মোহিত জগত, কারুর হৃদয়
হইল মোহিত ধীরে,
মুখ হ'তে মুখ পড়িল সরিয়া
শৈল বুকে সিক্ত নীরে।
তুলি মুখ—"দিদি! দিদি! মা আমার!"
ডাকে শৈল দর দর
তুলিয়া কারুর মূর্ছিত বদন,
ভগ্নবৃন্ত ইন্দীবর।
"গুরুদেব! এ কি! কি হইল হায়!
হায়! কি করিলে হরি!"—
কাঁদিল শৈলজা অবশ বদন
বাম অংসোপরে পড়ি।
"নাহি জানি নাথ! কোথায় তোমার
গোলোক আনন্দময়,
বুঝি এই প্রেম তব পদাম্বুজ,
সে গোলোক এ হৃদয়।"
যোগস্থা শৈলজা বসি কিছুক্ষণ
চাহি নীলাকাশ পানে,
ধীরে বুলাইল কারু মুখে কর,
সঞ্চারি তাড়িত প্রাণে।
ধীরে ধীরে কারু মেলিল নয়ন,
মুখ অঙ্কে শৈলজায়।
রহিল চাহিয়া শৈল মুখ পানে
নীরব চিত্রিতাকার।
চাহিয়া চাহিয়া স্মৃতি ধীরে ধীরে
উঠিল হৃদয়ে ভাসি,
উঠিল আকাশে আবার ভাস্কর
সরাইয়া মেঘরাশি।
উঠিয়া হৃদয়ে লইয়া শৈলেরে
কহে কারু কণ্ঠে স্থির—
"শৈল রে! আমরা কি ক্রীড়া-পুতুল
নিদারুণ নিয়তির!
আমাদের মত দুঃখী তিন জন
আছে কি জগতে আর?
আমাদের মত সুখী তিন জন?—
এত সুখ ছিল কার?
শৈশবে দুজনে মৃগশিশু মত
কাননে করি বিহার,
ছুটিতাম বনে মৃগশিশু সনে,—
এত সুখ ছিল কার?
নাচিলে শিখিনী পেখম খুলিয়া,
অঞ্চল করি প্রসার
নাচিতাম বনে আমরা দুজনে,—
এত সুখ ছিল কার?
কাননের শ্যামা গাহিলে মধুরে,—
অনুকারি স্বর তার
গাহিতাম সুখে শ্যামা বনবালা,—
এত সুখ ছিল কার?
সহকার পত্রে লুকাইয়া কুহু
ডাকিলে কোকিল আর,
ডাকিতাম পত্রে লুকায়ে আমরা—
এত সুখ ছিল কার?
সিন্ধুতীরে বসি মধ্যাহ্ন ছায়ায়,
ফুল্ল জ্যোৎস্নায় আর,
প্রস্রবণ পারে, প্রপাতের ধারে,
গাঁথিতাম পুষ্পহার,
গাহিতাম গান, খেলিতাম খেলা,
কহিতাম কত কথা,

—কিশোর উচ্ছ্বাস—মুখে মুখে দুই
 বন-কপোতিনী যথা।
নবীন কিশোর ভ্রাতা নাগরাজ
 গলায় গলায় তাঁর
বেড়াতেম বনে, শেখরে শেখরে,—
 এত সুখ ছিল কার?
তিন খণ্ড করি এক বনফল,
 একই আহার আর,
খাইতাম সুখে অনাথ এ তিন,—
 এত সুখ ছিল কার?"
আকাশের পানে মুগ্ধ কারু,
 শান্ত দু'নয়ন স্থির।
ধরি গলা শৈল আকাশের পানে,
 চাহি দু'নয়নে নীর!
"এক দিন বনে—পড়ে কি গো মনে?"
 পুনঃ কারু কহে কথা,
দেখিলাম এক সলতা পাদপ,—
 বিশুষ্ক পাদপ, লতা।
চারিদিকে চারু শোভে বনস্থলী
 পল্লবে কুসুমে ফলে,
এ পাদপ লতা ফল পুষ্পহীন,
 ঝরে পত্র পলে পলে
শুষ্ক বৃক্ষলতা দেখি করুণায়
 দুটি প্রাণ ছল ছল—
পড়ে কি গো মনে কতই করুণা,
 ঢালিলাম কত জল?
আজি নাগরাজ সেই শুষ্ক তরু
 আমরা সেই শুষ্ক লতা।
ফলফুলহীন হায়! তিন জন!
 বিশুষ্ক পল্লব যথা,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া, পড়িছে ঝরিয়া,
 দেহ-শোভা পলে পলে,
শুষ্ক তিন জন একই উত্তাপে,
 একই নিরাশানলে!"

"নিরাশা! নিরাশা! নিরাশা কি দিদি!"
 —শান্ত কণ্ঠে শৈল কহে—
"সুখের সংসারে হায়! এইরূপে
 নরে মরীচিকা দহে!
সুভদ্রার প্রেম, দিদি! কৃষ্ণপ্রেম,
 যাদের প্রাণের আশা,
সুধার সাগরে ডুবেছে যাহারা
 কি নিরাশা! কি পিপাসা!"
"অর্জুনের প্রেম"—গ্রীবা বাঁকাইয়া
 কহে মৃদুস্বরে কারু—
"অর্জুনের প্রেম, নহে মরীচিকা?
 সে কি সরোবর চারু!"

শৈল

আছে শৈশবের, আছে কৈশোরের,
 আছে খেলা যৌবনের।
অর্জুনের প্রেম যৌবনের খেলা
 উন্মেষিত হৃদয়ের।
কিন্তু দিদি! খেলা নহে মরীচিকা,—
 সুখের সোপান-স্তর;
খেলিয়া খেলিয়া সোপানে সোপানে
 উঠ ঊর্ধ্বে নিরন্তর!
পুতুল লইয়া খেলিয়া পূজিয়া,
 খেলিতে পূজিতে শিখি
মানুষ-পুতুল লইয়া যৌবনে;
 খেলিয়া পূজিয়া দেখি
মানুষ-পুতুল ছাড়িয়া হৃদয়
 অন্বেষি পুতুল আর
সে পুতুল কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য
 জীবনের এ খেলার।
সে প্রেম-সাগরে হইবে নিবৃত্তি
 আশার ও পিপাসার,
সে সুধা-সাগরে না উঠে গরল,
 মরীচিকা নিরাশার।
"কৃষ্ণপ্রেম!"—যেন দংশিল ভুজঙ্গ,
 শৈলেরে শিলায় ফেলি
দাঁড়াইল কারু, কুঞ্চিত অধর,
 আকর্ণ নয়ন মেলি!
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি শৈলজায়
 "কৃষ্ণপ্রেম!"—কারু কহে
"সুধার সাগর কৃষ্ণপ্রেম, শৈল!
 যে প্রেমে হৃদয় দহে!
কৃষ্ণপ্রেম সুধা! দন্তে ভুজঙ্গের,
 সুধা তবে রহে বল!
সুধা তবে রহে আগ্নেয়-ভূধরে,
 গৈরিক সুধা তরল!

যেই কৃষ্ণপ্রেমে জলিয়া পুড়িয়া
এরূপ হইনু ছাই!
যেই প্রেমশিখা এই ভস্ম মাঝে
জলিছে, বিরাম নাই।
যেই প্রেমে জলি উন্মাদিনী মত
ছুটিয়াছি বনে বনে!
ডুবিয়াছি জলে, পড়েছি অনলে,
পশিয়াছি ঘোরে বনে!”

শৈল

তুমিই কি সেই উন্মাদিনী নারী
যাদব পুরীরে ঘুরি,
ভীমা মুক্তকেশী বেড়াতে নিশীথে
আতঙ্কে পুরিয়া পুরী?

কারু

আমি।

শৈল

তুমি!

কারু

আমি? আমি মুক্তকেশী,
ভীমা উন্মাদিনী আমি!
জলি সে জালায়—কি দারুণ জালা
জানেন অন্তরযামী!—
মস্তকের মণি খুঁজিত ফণিনী
বেড়াইয়া কক্ষে কক্ষে
দেখিতাম মণি কভু সত্যভামা,
কভু রুক্মিণীর বক্ষে।
দেখিতাম—চক্ষু পড়িত খসিয়া
কি উগ্র অনলে জলি!
বহিত হৃদয় নয়ন ধারায়
কি উগ্র অনলে গলি!
সেই স্মৃতি, শৈল!—জলিছে নয়ন,
পড়িছে হৃদয় গলি—
হু'করে নয়ন চাপিয়া, শৈলের
হৃদয়ে পড়িল ঢলি।
উভয় নীরব—তরল অনলে
ভাসিছে শৈলের বুক।
বহে শান্তিধারা শৈলের নয়নে,
চাপি হৃদে সেই মুখ।
“কিন্তু দিদি! তুমি,—ঋষিপত্নী,
তুমি পুত্রবতী নারী।
জান তুমি দিদি! রমণীর প্রেম
পবিত্র জাহ্নবী-বারি।”
কহে শৈল ধীরে। হাসি উচ্চ হাসি
করে কারু হাসি মুখে—
“শত রবি শশী, নক্ষত্র অশেষ
ভাসে না জাহ্নবী বুকে?”

শৈল

ভাসে প্রতিবিম্ব, জানে না জাহ্নবী
যায় এক সিন্ধু পানে

কারু

এক পারাবারে গতিই আমার—
কি গতি এ দগ্ধ প্রাণে!
পড়ে প্রতিবিম্ব জাহ্নবীর বুকে,
নাহি পড়ে এই প্রাণে।
এক প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ বুক
জাগ্রতে, নিদ্রায় ধ্যানে।
ঋষিপত্নী আমি!—পুত্রবতী আমি!—
দিদি রে! ছলনা সার,
আর্য ঋষি কভু অনার্যা নারীরে
করে কি বিবাহ আর?
“কৃপা করি তব হইলাম পতি”—
কহিলেন ঋষিবর,
এই ত বিবাহ! হইলে ভ্রান্ত
শিশুসম নাগেশ্বর।
ছল-পতি ঋষি, এই ছলনায়
সাধিতে স্বকার্য তার;
ছল-পত্নী আমি দিদি অনার্যের
করিতে রাজ্য উদ্ধার!

শৈল

দিদি! পুত্র তব?

কারু

রাধেয় দ্বিতীয়!
হরিয়া সতীত্ব কার
ঋষি দুরাচার আনিল কুমার,
অর্পিল করে আমার।
নিরাশ্রয় শিশু, নিরখিয়া মুখ
দ্রাবিল হৃদয় মম,
সরল সুন্দর এ শিশু হীরক
পালিয়াছি খনি সম।
জানে শিশু আমি জননী তাহা

নিরখি তাহার মুখ,
এ দগ্ধ হৃদয়ে পাই কি সান্ত্বনা !
কি আনন্দে ভরে বুক !
যেই দিন দিদি ! নথ মাত্র মম
ছুঁইবেন ঋষিবর,
জানেন আপনি, হইবে চূর্ণিত
সে দিন অস্থি পঞ্জর।
শৈশবে কৈশোরে সিন্ধু নদ তীরে
বসিয়া দুজনে সুখে,
দেখিতাম রবি সহস্র হইয়া
ভাসিতে সিন্ধুর বুকে।
সেইরূপ দিদি ! সহস্র হইয়া
ভাসে কৃষ্ণ এ হৃদয়ে,
ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,
কৃষ্ণ শিরাস্রোতে বহে।
হৃদয়েতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নয়নেতে,
অধরেতে কৃষ্ণনাম,
শ্রবণেতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরশনে,
নাসিকায় কৃষ্ণঘ্রাণ।
এই দেখ দিদি !—নিষ্কোসিয়া অসি
করিয়া বক্ষে প্রহার—
"কৃষ্ণ বিনা, দিদি ! এ দেহে, হৃদয়ে,
কিছু মম নাহি আর।"
বিজলীর বেগে শৈল সেই অসি
নিক্ষেপিল দূরে বলে,—
বহে রক্তধারা,—আত্মহারা শৈল
পড়ে কারু-পদতলে,—
"দিদি ! দিদি ! ওমা তুমি প্রেমময়ি !
প্রেমস্বরূপিণী তুমি !
দেও কৃষ্ণপ্রেম ভগিনী কন্যায় !
উদ্ধার এ বনভূমি !
দেখ পতি তব জগতের পতি,
খুলি নেত্র-আবরণ !
তিনি পতি তব, তিনি পতি মম,
তিনি নর-নারায়ণ !"

চতুর্থ সর্গ

যোগানল

এখন(ও) দুর্বাসা ঋষি বসি সেই শৈল-কক্ষে
একাকী নীরব চিন্তাকুল।
দেখাইছে ক্ষীণ দীপ কাঁপি নৈশানিলে কক্ষে
ঋষিবরে প্রেত সমতুল।
ধীরে ধীরে পশি কক্ষে, নাগেন্দ্র বাসুকি, কারু
প্রণমিল চরণে ঋষির।
শুনিয়া চরণ-শব্দ মুদিলেন নেত্র ঋষি,
হইলেন ধ্যানমগ্ন স্থির।
ছলধ্যানে ঋষিশ্রেষ্ঠ রহি স্থির কিছুক্ষণ
মেলিলেন নেত্র ধীরে ধীরে,
সস্মিত বিকট মুখে কোটরস্থ যুগ্ম নেত্রে
চাহিলেন কারু বাসুকিরে।

দুর্বাসা

তোমার বিলম্ব দেখি, এই সপ্ত দিবা নিশি
রহিয়াছি যোগে নিমজ্জিত,
যোগবলে আকর্ষিয়া আনিনু তোমারে আজি
করিবারে ব্রত উদ্যাপিত।
সসৈন্যে আগত তুমি?

বাসুকি

সসৈন্যে আগত আমি!
কোথায় পাইব সৈন্য ঋষি!
যথায় হিমাদ্রি-সানু নীলাকাশে নীলতর
অভ্রভেদী রহিয়াছে মিশি,
যথায় নীলাম্বু-বেলা সিন্ধু সহ করে খেলা,
সিন্ধু, বেলা, আকাশে মিশিয়া,
আসিন্ধু আকাশ-তট ব্যাপিয়া ভারতভূমি
বহুবর্ষ আসিনু ভ্রমিয়া।
বেড়াইনু বনে বনে, হিমাচল, বিন্ধ্যাচল,
আরাবলি, মহেন্দ্র, মলয়;
নীলমণি আভরণ অঙ্গে অঙ্গে ভারতের
বেড়াইনু অনার্য আলয়।

দুর্বাসা

কি দেখিলে? কি শুনিলে?

বাসুকি

শুনিলাম, দেখিলাম,
শুনি নাই, দেখি নাই, যাহা!
সাধ্যাতীত! চিন্তাতীত! মানব কল্পনাতীত!
মানবের কার্য নহে তাহা।
হায়! কুরুক্ষেত্র-পূর্ব ভারতের সে অশান্তি!
এই শান্তি কুরুক্ষেত্র-পর!
সেই হিংসা, এই প্রেম! সে অধর্ম এই ধর্ম,
সে নরক, এ স্বর্গ সুন্দর!
আসিন্ধু অচল ব্যাপী পাণ্ডব সাম্রাজ্য-ছায়া
কি শীতল, কিবা পুণ্যময়!
নাহি সেই রক্ত-স্রোত, প্রেম-স্রোতে নর নারী
জুড়াইছে তাপিত হৃদয়।
সেই কুরুক্ষেত্র ঋষি! দেখিয়াছ নেত্রে তব,
এই কুরুক্ষেত্র একবার
দেখ গিয়া নেত্র ভরি! দেখিলে হইবে দ্রব
প্রেমহীন হৃদয় তোমার!
এ কুরুক্ষেত্রেও ঋষি! রথী সেই নরদেব,
রথে বসি ভদ্রা-ধনঞ্জয়,
বর্ষিতেছে নিরন্তর কৃষ্ণ-প্রেমামৃত শর,
প্রেমে মত্ত দুইটি হৃদয়!
এ গাণ্ডীব কৃষ্ণনাম, দেবদত্ত কৃষ্ণনাম,
তূণ কৃষ্ণ-প্রেমামৃতে ভরা;
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী তুচ্ছ, প্রেম-রণ-রঙ্গে
দেখ গিয়া মাতিয়াছে ধরা!

দুর্বাসা

ইন্দ্রজাল! ইন্দ্রজাল! মুগ্ধ ইন্দ্রজালে ঘোর
আর্যজাতি ব্যাপিয়া ভারত।
জরৎকারু যোগবলে ছিন্ন হবে ইন্দ্রজাল,
ক্ষুদ্র উর্ণনাভ-জাল মত।
কিন্তু সেই পাপনাম সরল অনার্য-ভূমে
কেমনে পশিল বল হায়?

বাসুকি

কৃষ্ণনাম পাপনাম! পুণ্যনাম তবে আর
আছে ঋষি কোথায় ধরায়!
প্রেমে প্লাবি বৃন্দাবন, ভাসাইল ব্রজভূমি
শৈশবে কৈশোরে যেই নাম,

যৌবনে বিজয়মন্ত্র কুরুক্ষেত্র যেই নাম,
যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র নিষ্কাম!
ভারতের শান্তি-মন্ত্র, ভারতের রাজ্য-মন্ত্র
মুক্তি-মন্ত্র প্রৌঢ়ে ভারতের,
যেই সুপবিত্র নাম, সেই নাম পাপনাম!
পুণ্যনাম তুমি পাপিষ্ঠের!
কেমনে সে নাম ঋষি! পশিল অনার্য ভূমে?—
কারু! কারু! শৈলজা আমার
প্রচারিয়া সেই নাম, পতিত অনার্য ভূমি
পুণ্যবতী করিছে উদ্ধার!

দুর্বাসা

শৈলজা! শৈলজা! কে সে? একটি রমণী ক্ষুদ্র
হইয়া কণ্টক তব পথে
রহিল জীবিত নাগ! প্রচারিতে সেই নাম
এ প্রত্যয় করি কোন মতে?

"নরাধম! দুরাচার! নৃশংস মানব-পশু!"
—দাঁড়াইল গর্জি নাগরাজ—
"এ মুহূর্তে ভাঙ্গি গিরি পড়িল না শিরে তোর,
পড়িল না এ মুহূর্তে বাজ!
পশুবৎ অত্যাচার করিতে রমণী প্রতি
আর্য ঋষিদের ধর্ম জানি।
নারীহত্যা ধর্ম তোর; সরল অনার্যদের
মহাপাপ ওরে নর-গ্লানি!
অনার্যের দেবী নারী; ধর্ম রমণীর পূজা;
কেশমাত্র যেই নরাধম
পরশিবে রমণীর, ছুঁইবে তাহার ছায়া,
অনার্যের বধ্য সেই জন।
কে শৈলজা? হায় ঋষি! শৈলজা ভগিনী মম,
প্রাণের পুতুল বাসুকির,"—
ক্রোধে রক্ত দুনয়নে বহিল যুগলধারা
বাড়ব কুণ্ডের যেন নীর।
"হায়! নিদারুণ বিধি, করি পিতৃমাতৃহীন
অকালে আমরা তিন জন,
অর্পিল আমার অঙ্কে দুই ভগ্নী, শিশু বৃক্ষে
দুই শিশু লতার মতন।
কারু ভগ্নী সহোদরা, শৈলজা পিতৃব্য-কন্যা,
আমি প্রাণ, তারা দুটি কায়া;
হায়! ঋষি, প্রাণ দিয়া পালিয়াছি দুই কায়া,
প্রাণের অভিন্ন দুই ছায়া।
কিন্তু কি যে দুরাশায় দিনু ঝাঁপ, হায় আমি!
সেই মহা দুরাশা অনলে
পোড়াইনু ভগ্নী দুটি! সেই অনুতাপে ঋষি
কি যে অগ্নি এ হৃদয়ে জ্বলে!"—
উচ্ছ্বাসে উঠিয়া কারু, ধরি বাসুকির গলা,
কহে—"দাদা! দাদা! পিতৃ সম!
হইও না আত্মহারা! তোমার ভগিনী দুটি—
তাহাদের ভাগ্য নিরুপম।
তোমার এই মহাব্রতে নাহি দিত ঝাঁপ যদি
হইত কি ভগ্নী যোগ্যা তব?
তাহাদের ততোধিক আছে কি জগতে সুখ!"
প্রেমোচ্ছ্বাসে উভয় নীরব।

বাসুকি

কারু! কারু! প্রাণাধিকে! তুই এই প্রেমময়ী!
পুণ্যময়ী, পবিত্রতাময়ী!
কারু রে! শৈলজা আর!—আমি তোরা দুজনের
ভ্রাতার কদাচ যোগ্য নাহি।
ভেবেছিনু যে শৈলজা, আমি পাপিষ্ঠের ভয়ে,
বনলতা শুকায়েছে বনে;
আজি সে শৈলজা দেবী, সে শৈলজা সন্ন্যাসিনী,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে!
সে ধারায় বনভূমি হইতেছে পুণ্যভূমি,
হইতেছে অনার্য-হৃদয়;
পশুতুল্য সে হৃদয় যাইতেছে প্রেমে গলি,
প্রেমে গলিতেছে শিলাচয়।
কহে শৈল কৃষ্ণকথা, গায় শৈল কৃষ্ণনাম,
কহে শৈল -'কহ কৃষ্ণ! হরি!'
"হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ!"—কহিয়া অনার্যগণ
যাইছে ভূতলে গড়াগড়ি।
গায় বৃদ্ধ কৃষ্ণনাম, গায় যুবা কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম যুবতীর মুখে,
গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে,
লুকাইয়া মুখ মা'র বুকে!
বনের পাখীও যেন গাহিতেছে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনামে নাচে মৃগ, শিখী,
বহিছে বন-নির্ঝর, মর্মরিছে তরুগণ,
কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি।
বনপুত্রপুত্রীগণ সাজিয়া গৈরিক বাসে,
কৃষ্ণ অঙ্গে লিখি কৃষ্ণনাম,

নাচিতেছে বাহু তুলি বেড়ি মম শৈলজায়,
অশ্রুজলে ভাসি অবিরাম।
ত্যজিয়া পতির শয্যা, ত্যজিয়া কোলের শিশু,
ছুটি পত্নী, ভগিনী, জননী,
পড়িয়া শৈলের পায়, কহে—"দে মা! কৃষ্ণনাম!
একবার দেখা নীলমণি!"
সাজি বনশিশুগণ শিশু কৃষ্ণ, গোপ শিশু,
শিরে চূড়া, অঙ্গে পীত ধড়া,
বাম করে ক্ষুদ্র বেণু, পাচনি দক্ষিণ করে,
ফুল-অঙ্গ বনফুলে ভরা;
সাজি গোপী বনবালা—চারু বনফুল মালা—
বনফুল অঙ্গে চারুশীলা,
জলে, স্থলে, গিরি-শৃঙ্গে, গৃহে গৃহে, বনে বনে,
কি মধুর করে ব্রজলীলা!
কে বলে অনার্য দুঃখী, অনার্যের নাহি রাজ্য?
হিংস্র পশু অনার্য বর্বর?
আজি কি আনন্দ-ভূমি হইয়াছে বনভূমি!
অনার্যের কি রাজ্য সুন্দর!
অনার্যের প্রেমরাজ্য, আমার শৈলজা রাণী,
রাজকর প্রেম-অশ্রু জল;
প্রেম-অশ্রুজলে রাণী শাসিতেছে বনভূমি,
নাহি হিংসা, নাহি অমঙ্গল।
রাজদণ্ডে গুরুতর হয় নাই প্রশমিত
যে অনার্য নৃশংস হৃদয়,
আজি সেই শিলা-বক্ষ, হইয়া দ্রবিত প্রেমে
শীতল নির্মল সুধাময়!
করিব সে দেবী হত্যা!—লুকাইয়া অন্তরালে
সেই দেবী দেখিয়া নয়নে,
শুনিয়া সে কৃষ্ণনাম, দেখিয়া সে ব্রজলীলা,
মরিয়াছি আপনি মরমে।
এই দেবীকেই আমি করেছিনু নিয়োজিত
কিবা ঘোরতর মহাপাপে!
করি কণ্ঠ নিষ্পীড়িত চেয়েছি ত্যজিতে প্রাণ
সেই ঘোরতর পরিতাপে—

বাসুকি আপন কণ্ঠ পীড়িতেছে ব্যাঘ্রবৎ
আপনার লৌহময় করে,
কারু বিজলীর বেগে সরাইল কর কাঁদি'
"দাদা! দাদা!" বলি উচ্চৈঃস্বরে।

বাসুকি

চাহিয়াছি কতবার পড়ি গিয়া পদতলে
আমার পালিতা শৈলজার,
মাগি ভিক্ষা ক্ষমা তার, মাগি কৃষ্ণনাম আর,
দ্রব করি পাষাণ আমার।
হায়! সেই পাপস্মৃতি করিয়াছে শিলাময়
এই দেহ পাপের আধার,
জ্বলিয়াছে কি অনল হায়! চারিদিকে মম,
এক পদ সরেনি আমার!

দুর্বাসা

কেবল সে পাপনাম, কেবল সে নাম-গীত,
কেবল সে পাপ কথা আর,
যাহার তাহার মুখে, কত আর সব হায়!
জ্বলি বুক হইল অঙ্গার!
আন নাই সৈন্য তবে!

বাসুকি

কোথায় পাইব সৈন্য?
অনার্য ভাঙ্গিয়া নাগ-ভূমি
ছুটেছে প্রভাস মুখে, হরিনাম, কৃষ্ণনাম
বিনা আর কিছু নাহি শুনি।

দুর্বাসা

নাহি দুঃখ নাগপতি! আমি ঋষি জরৎকারু,
যোগবলে মম দুর্নিবার
জ্বালাইয়া গৃহ-দ্বন্দ্ব, দেখেছে ক্ষত্রিয় কুল
কুরুক্ষেত্রে করিতে সংহার।
নাহি দুঃখ যদুকুল যোগবলে সেই রূপে
গৃহ-দ্বন্দ্বে করিব সংহার;
ভাসে বন কৃষ্ণ-প্রেমে,—ভাসিতেছে কৃষ্ণ-পুরী
সুরা-প্রেমে মহাপারাবার।

বাসুকি

সুরা-প্রেম কৃষ্ণ-পুরে!

দুর্বাসা

কৃষ্ণ-পুরে, নাগরাজ!
কৃষ্ণ-প্রেম,—ইন্দ্রিয়-সংযম,—
কেবল পরের তরে; নিজ পুরে সুরা-প্রেম;—
এই তব নর-নারায়ণ!
আমার আদেশে কারু পাঠাইয়া নাগবালা
রূপসী যুবতী দ্বারকায়,
বিলাইল কৃষ্ণ-প্রেম—শ্রীবিষ্ণু! সুরার প্রেম,—
দ্বারাবতী মগ্নবতী প্রায়।

গোপনে যাইয়া কারু করিয়াছে নিরীক্ষণ,
সুরাসক্তি, রূপাসক্তি আর ;
অনাসক্ত ধর্ম-পুরী করিতেছে টল টল,
টল টল যুগ অবতার !

বাসুকি

নরাধম! নরপশু! অরক্ষিতা অবলায়
কেমনে পাঠালি দ্বারকায়
পুরাইতে পাপতৃষ্ণা? অনার্যের নারী দেবী ;
পণ্য নাহি জানে অবলায়।
কারু! কারু! এই পাপে কেমনে হইলি রত
নাগ-রক্ত করি কলুষিত—

কাঁপিতেছে থর থর মহাক্রোধে নাগরাজ
সাপটিয়া অসি কোষস্থিত।
দেখিলা ভগ্নীর মুখ কি যে নিরাশার ছবি!
কি যে স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া!
নাগপুরে বাপীতীরে একদিন নিরাশায়
ছিল কারু এরূপে বসিয়া।
সে স্মৃতি বিজলী বেগে আলোকিল দূরাতীত,
নাগরাজ বুঝিলা তখন
কেন সেই যদুপুরে গোপনে যাইত কারু
এই পাপে হ'ল নিমগন।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, জালবদ্ধ সিংহ মত
দাঁড়াইলা কক্ষে অধোমুখে ;
নিবিল এ ক্রোধানল ; নির্বাপিত প্রতিহিংসা
জ্বলিয়া উঠিল পুনঃ বুকে।

দুর্বাসা

নাগরাজ ভ্রান্ত তুমি। জানি বিন্ধ্যাচল সম
অনার্যার চরিত্র অটল।
কার সাধ্য অনার্যার কলুষিবে সে চরিত্র,
কলুষিবে জাহ্নবীর জল!
দেখি অগ্নি-শিখা জ্ঞান পতঙ্গ উড়িয়া পড়ি
হয় আত্মঘাতী অগণন।
অপবিত্র অগ্নি-শিখা হয় কি? যাদবকুল
আত্মঘাতী হইবে তেমন।
অনার্যার তীব্র সুরা, অনার্যার তীব্র রূপ,—
কামানলে মত্ত যদুকুল।
কামানলে ঈর্ষানল জ্বালায়েছি যেই রূপে,
যদুকুল হইবে নির্মূল।
পারিলে না আনিতে কি তোমার আপন সৈন্য?

বাসুকি

নাগ-সৈন্য হইয়া সজ্জিত,
প্রভাস-যাত্রীর মত আসি কালি সন্ধ্যাকালে
মহাবনে হবে একত্রিত।

দুর্বাসা

উত্তম। তোমার করে ছিল যেই কার্য ভার?

কারু

হইয়াছে, হইবে সাধিত।

দুর্বাসা

উত্তম! পড়িবে পুনঃ উর্ণনাভ নিজ জালে
হবে কালি সবংশে নিহত!

বাসুকি

না, না, ঋষি! নাগ-সৈন্য করিবে না অস্ত্রাঘাত
কৃষ্ণার্জুন প্রতি সুভদ্রার ;
নখাগ্রও তাহাদের ছুঁইবে না।

দুর্বাসা

কেন নাগ!

বাসুকি

এই তিন দেবতা আমার।
বিস্মিত নয়নে কারু দুর্বাসা বিস্মিত নেত্রে,
চাহিলেন বাসুকির পানে।
উর্দ্ধনেত্রে শৈল কক্ষে, শৈল প্রতিমূর্তি মত,
নাগরাজ দাঁড়াইয়া ধ্যানে।

বাসুকি

শুন ঋষি জরতকারু, শুন অভাগিনি কারু
যেই স্বর্গ দেখেছি নয়নে
আসিতে আসিতে পথে অদূরে সিন্ধুর তীরে,
দ্বৈপায়ন মহর্ষি আশ্রমে।
কি আশ্রম পুণ্যময়, শান্তিময়, প্রীতিময়,
আনন্দ-আলয় সুশীতল!
আমি হিংস্র বনপশু, কেমনে কহিব তাহা,—
সে ত নহে এই ধরাতল!
সুনীল আকাশ-পটে, শ্যামল ধরার বক্ষে,
ধ্যানমগ্ন শান্ত শৃঙ্গচয়,
শোভিছে চিত্রিতমত, নীলমণিময় পটে,
শ্যাম অঙ্গ মরকতময়।
কি শান্ত কানন-শোভা! কাননে কি মনোলোভা
পুণ্যনীরা সরসী, নির্ঝর!
জলচর, স্থলচর, হিংসক, হিংসিত, পশু
বেড়াইছে যেন সহোদর।

আশ্রমের পুণ্য লতা, আশ্রমের পুণ্য ফুল,—
ঋষিপুত্রকন্যা—নিরন্তর
খেলে পশু পক্ষী সহ, আলিঙ্গি শার্দূল, সিংহ,
পশু পক্ষী যেন সহোদর।
অসংখ্য কুটীর দ্বারে, কাননছায়ায় বসি,
যেন শান্ত পবিত্র নির্ঝর
কহিতেছে শাস্ত্রকথা আর্য ও অনার্য ঋষি,
যেন প্রেমময় সহোদর।
যোগশৃঙ্গ-বক্ষে শোভে রজতের উত্তরীয়
সরস্বতী-স্রোত মনোহর,
দেখিলাম সেই শৃঙ্গে, সেই সরস্বতী-তীরে,
কি পবিত্র কুটীর সুন্দর!
যে পার্থের ভুজবলে, যে ভদ্রার পুণ্যবলে,
যে কৃষ্ণের দেবত্বে স্থাপিত
ক্ষত্রিয়ের ধর্মরাজ্য, সেই তিন দেব মূর্তি
এ ক্ষুদ্র কুটীরে বিরাজিত।
সেই রাজ্য-চন্দ্রালোক পশিল নিবিড় বনে,
—আমরা পতিত আর নহি—
কারু রে! যাহার প্রেমে, সেই শৈল তাঁহাদের
চরণ-সেবিকা প্রেমময়ী।
কুটীরের তিন কক্ষ,—সম্মুখের কক্ষে চিত্র,
সুভদ্রার তুলিতে অঙ্কিত,
শোভিতেছে কৃষ্ণলীলা; পশ্চাতের এক কক্ষ
শৈলজার চিত্রে সুশোভিত,—
পাতালে অনাথা, রৈবতকে ভৃত্য বেশ,
বনে বনমাতা কুমারের,
প্রেমময়ী সন্ন্যাসিনী, বনভূমি উদ্ধারিণী,
অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাননের।
শোভে অন্য কক্ষে চিত্র অভিমন্যু উত্তরার,—
এই কক্ষ শোকপারাবার।
পাষাণ যাইবে গলি' দেখিলে এ চিত্রাবলী,
মানবের কথা কি আবার!
সেই দুই শেষ চিত্র—সেই চক্রব্যূহ-শায়ী
মাতৃ-অঙ্কে বীরেন্দ্র কুমার!
আর সেই চিতা-চিত্র!—না, না, পারিব না আর,
কারু! বুক ফাটিছে আমার।
সরল শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলা শোকে
নাগরাজ করি হাহাকার;
কাঁদিল উচ্ছ্বাসে কারু; কেবল রহিল শুষ্ক
কোটরস্থ নেত্র দুর্বাসার।

বাসুকি

সপত্নী অনার্য আর্য ঋষিগণ মিলি যবে,
মিলি যবে ঋষি-শিশুগণ,
গায় সবে কৃষ্ণ-নাম সহ শৈল ভদ্রার্জুন,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃতমন;
হৃতমন প্রেমোচ্ছ্বাসে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে
সেই কৃষ্ণমূর্তি মহিমার!
কারু রে, সে প্রেমোচ্ছ্বাসে পাষাণ যায় রে গলি,
মানবের কথা কি আবার!
এক দিন সে সময় পশি তস্করের মত
সে নির্মল পবিত্র কুটীরে,
প্রণত হইয়া ভূমে কক্ষে কক্ষে চিত্রাবলী
নমিয়াছি ভাসি অশ্রুনীরে।
অলক্ষিতে চতুষ্টয়—কৃষ্ণার্জুন ভদ্রাশৈল—
নমিয়াছি দিনে শত বার;
কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! রেখাটিও পারে নাই
কাল তাহে করিতে সঞ্চার!
কি রহস্য!—এক দিন জিজ্ঞাসিনু ঋষি একে;
তপস্বী কহিল ধীরে হাসি—
যুবক! জান না তুমি পুষ্পটিও ত্রিদিবের
কখন হয় না শুষ্ক বাসি।
কৃষ্ণ নর-নারায়ণ; নর-দেব, নারী-দেবী,—
তাঁহার বিভূতি তিন জন;
কালের অতীত তাঁরা, যায় যুবা! কাল বহি
প্রণমিয়া তাঁদের চরণ।"
যুবক! যুবক! আমি যুবক! যুবতী তুই!
কারু! এ ত মিথ্যা কথা নয়।
নহে দেব, নহে দেবী, আমরা দুরাশা-মোহে
দেব-দ্বন্দ্বী মাত্র দুরাশয়!
কিন্তু আর হইবে না। আর্য অনার্যের এই
সম্মিলিত মহারাজ্যে স্থান
মাগি ল'ব ভ্রাতা ভগ্নী; পতিতপাবন কৃষ্ণ!—
আনন্দে গাহিব কৃষ্ণনাম।

ভক্তির নির্ঝর শান্ত নাগরাজ দুনয়নে
বহিতেছে ধারা নিরন্তর;
ভগিনীর নেত্র সিক্ত ভকতির সে উচ্ছ্বাসে;
শুষ্কনেত্র মাত্র ঋষিবর।

দুর্বাসা

নাগেন্দ্র! কি ভ্রান্তি তব! বুঝিয়াও বুঝিলে না

কতবার চক্র এ চক্রীর।
কুরুক্ষেত্রে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে ভারত-ভূমি;
অনার্য তুলিয়া যদি শির
হয় এবে অগ্রসর লইতে ভারতরাজ্য,
কি করিবে একা যদুকুল?
শিমুল পুষ্পের মত কোথায় যাইবে উড়ি!
ক্ষত্র জাতি হইবে নির্মূল।
তাই এই ধর্মরাজ্য, তাই এই প্রেমরাজ্য,
আর্য অনার্যের সম্মিলিত;
গেছে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ, যায় আর কিছুকাল,
ক্ষত্র বংশ হইবে বর্ধিত।
তখন খাণ্ডব শত জ্বলিবে অনার্য-ভূমে,
হবে শত ইন্দ্রপ্রস্থ আর;
তখন এ ধর্মরাজ্যে অনার্য ও ব্রাহ্মণের
চিহ্ন মাত্র রহিবে না আর!

অকস্মাৎ কি গর্জন! ভূমিকম্প কি ভীষণ!—
নাগরাজ পড়িলা শিলায়।
মস্তক হইল ক্ষত, ছুটিল শোণিত ধারা,
চাপি করে, থর থর কায়
কাঁপিতেছে ভ্রাতা ভগ্নী, ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ;
প্রসারিত ক্ষুদ্র দুনয়ন
কহিলা দুর্বাসা—"নাগ! এ কক্ষে করিলে যেই
মহাসন্ধি, করিতে লঙ্ঘন
এখন উদ্যত তুমি! ক্রুদ্ধ তাহে ভূতনাথ,—
সেই ক্রোধে এই প্রকম্পন।
দেখিবে প্রমাণ আরো? আইস"—ইঙ্গিতে ঋষি
ডাকিলে, ভয়েতে জ্ঞানহত
চলিলা ভগিনী ভ্রাতা ঋষির পশ্চাতে, দুই
ক্রীড়নক সূত্রে আকর্ষিত।
পর্বতশিখরে উঠি দেখিলা বিশাল হ্রদ;
হ্রদে ওকি দৃশ্য বিভীষণ।
গর্জিছে পর্বত গর্ভে কি ভীষণ অগ্নিসিন্ধু
ধূমরাশি করি উদ্গীরণ।
অগ্নিসিন্ধু কি ভীষণ! কি গর্জন! কি ঘূর্ণন!
অগ্নিশিখা শত সংখ্যাতীত,—
ভীমা অগ্নি-ভুজঙ্গিনী—ছুটিতেছে, গর্জিতেছে,
অগ্নি-সিন্ধু করিয়া মথিত।
শতধা বিদীর্ণ করি যেন এই শৈল-গিরি
রুদ্ধ ক্রুদ্ধ অগ্নি-পারাবার
চাহিছে ছুটিতে বেগে নাশিতে আকাশতল,
ধরাতল করিয়া সংহার।
এই অগ্নি-হ্রদতীরে, নিশীথ আকাশ-তলে,
দুর্বাসা প্রসারি ক্ষুদ্র কর
কহে—"দেখ নাগরাজ! জরতকারু যোগানল,
ওই দেখ অনার্য ঈশ্বর।"
হ্রদের অপর তীরে ছদ্ম ভূতনাথ ধীরে
মহাক্রোধে করিয়া গর্জন
কহিলেন—"নাগাধম! লঙ্ঘিবি প্রতিজ্ঞা তোর?
মম আজ্ঞা করিবি লঙ্ঘন?
পাণ্ডব কৌরব বংশ ভস্মীভূত কুরুক্ষেত্রে,
যদুবংশ মাত্র আছে আর,
প্রভাস উৎসব ক্ষেত্রে কালি গুপ্ত অস্ত্রে তুই
যদুকুল করিবি সংহার
জরতকারু যোগবলে! করিবি অনার্য রাজ্য
আসমুদ্র অচল স্থাপিত!"
অগ্নির গর্জন সহ মিশিল যে ভীম রব,
ভীম মূর্তি হ'ল অন্তর্হিত।
ঘন ঘন কাঁপে ধরা; শৈলশৃঙ্গ কাঁপে ঘন,
সিন্ধু-গর্ভে যানযষ্টি মত;
বাসুকি বিহ্বল ভয়ে, ভয়েতে বিহ্বলা কারু
পড়িলা শিখরে মূর্ছাগত।

পঞ্চম সর্গ

মহাপান

উদ্বেল আনন্দে, লীলায় উজ্জ্বল,
　　প্রভাসে সিন্ধু উঠিল ভাসি
মধুর বাসন্তী-পূর্ণিমা উষায় ;—
　　হৃদয়ে অনন্ত মাধুরী রাশি।
উষার আলোকে উঠিল ভাসিয়া
　　সুদর্শন চূড়া, কৃষ্ণের শিবির ;
"হরি বোল হরি! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি।"
　　উঠিল গাহিয়া আনন্দে অধীর
কণ্ঠ লক্ষ লক্ষ ; লক্ষ লক্ষ যাত্রী
　　পড়িল সৈকতে প্রণমি শিবির ;
"হরে! কৃষ্ণ! হরে।"—গায় প্রকম্পিত
　　করি মহাসিন্ধু প্রভাসের তীর।
গাহিয়া, নাচিয়া, করতালি দিয়া,
　　আর্য ও অনার্য শিশু, নারী, নর,
ছুটে সিন্ধু পানে, ছুটে যেই রূপে
　　সৈকত-বালুকা বহে যবে ঝড়।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গাহিয়া গাহিয়া
　　অবগাহে যাত্রী—শিশু, নারী, নর ;
বিচিত্র বরণ, বিচিত্র বসন,
　　প্রভাসের আজি কি শোভা সুন্দর!
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—বলি দেয় ডুব,
　　"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—ভাসিয়া কহে।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায় পারাবার,
　　"হরে! কৃষ্ণ!" সিন্ধু অনিলে বহে।
করি সিন্ধু-স্নান, অঙ্গে লিখি নাম,
　　বেড়িল শিবির যাত্রী অগণন,
আকুল হৃদয় করিতে দর্শন
　　নরচক্ষে সেই নর-নারায়ণ!
ধীরে ধীরে হরি হইলা উদয় ;
　　হইল উদয় দুই দিনকর!
এক সূর্যে দীপ্ত সিন্ধু প্রভাসের,
　　অন্য সূর্যে মহাকালের সাগর।
চূড়াবদ্ধ কেশ,—মোহন মুকুট!
　　নীলমণি অংসে, উরসে আর,
শোভে গৈরিকের উত্তরীয় চারু ;
　　অঙ্গে অঙ্গে কিবা লীলা মহিমার

করুণা মহিমা ললাটে নয়নে,
　　করুণা মহিমা উরস ভরা,
সুধাকর-সুধা করুণা-মহিমা
　　বহিতেছে যেন প্লাবিয়া ধরা।
কি সুদীর্ঘ দেহ, কণ্ঠ সুবঙ্কিম!
　　যাত্রী-সিন্ধুবক্ষে উঠিল ভাসি
শ্রীমুখমণ্ডল, যেন সিন্ধু বক্ষে
　　আকণ্ঠ ভাস্কর ভাসিল হাসি।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—যাত্রী লক্ষ লক্ষ
　　গাহি এক কণ্ঠে প্লাবিয়া গগন,
পড়িল ভূতলে ভক্তিতে অধীর
　　সাষ্টাঙ্গে প্রণত প্রণমি চরণ।
অনন্ত তরঙ্গ ভুজে প্রণমিয়া
　　হইল পয়োধি প্রণত স্থির ;
এই মহাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একা
　　আপাদ ভাস্কর বক্ষে জলধির।
অনিমিষ নীল নীলাব্জ নয়ন,
　　আকর্ণ বিশ্রান্ত, প্রেমে ছল ছল,
চাহি বসন্তের নীলাকাশ পানে
　　নীলমণি-মূর্তি স্থির অবিচল।
তুলি লক্ষ শির প্রভাসের তীর,
　　লক্ষ শির তুলি প্রভাস সাগর,
সেই দেব-মূর্তি চাহি অনিমিষ,
　　চাহি অনিমিষ বিশ্ব চরাচর।
দেখে অনিমিষ ব্রজবাসিগণ—
　　ব্রজের গোপাল যশোদা-দুলাল,
শিরে শিখি চূড়া, অঙ্গে পীত ধড়া,
　　করেতে পাঁচনি, কণ্ঠে বনমাল।
ব্রজের কিশোরী দেখে অনিমিষ
　　ব্রজের কিশোর ত্রিভঙ্গ শ্যাম,—
কি মধুর হাসি, কি মধুর বাঁশী,
　　করিছে কি প্রেমে উদাস প্রাণ!
দেখে ক্ষত্রিয়েরা নেত্রে অনিমিষ
　　অর্জুন-সারথি পাঞ্চজন্যধর,
রথ-চক্র মত মহা রণ-চক্র
　　করিছে চালন কি বিস্ময়কর!

অনিমিষ নেত্রে দেখি যোগিগণ
মহাযোগি-মূর্তি যোগে নিমগন ;
দেখে অনার্যেরা নেত্রে অনিমিষ
দয়াময় হরি, পতিতপাবন !
দেখে যাদবেরা নেত্রে অনিমিষ,
দেখে কামাসক্ত সুরাসক্তগণ,
মহাকাল মূর্তি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
নব কুরুক্ষেত্রে ভীম-দরশন ।
সুভদ্রা শৈলজা সঙ্গে দুই জন,
চলিলেন হরি প্রসন্ন বদন ।
শত নর নারী দেয় গড়াগড়ি
পড়ি পাদপদ্মে, চলে না চরণ ।
ভক্তি-অশ্রু-জলে প্রক্ষালি চরণ
ভিজিছে সৈকত পবিত্র নীরে,
গায় "কৃষ্ণ! হরি!" নাচে ভক্তগণ,
মাখি সেই ধূলা ললাটে শিরে ।
যেতেছেন হরি পবিত্র করিয়া
যেই ধূলারাশি, তাহাতে পড়ি
"হরি! কৃষ্ণ! হরি!" বলি নর নারী,
আর্য ও অনার্য, যায় গড়াগড়ি ।
যেই থানে হরি, উঠিছে সেখানে—
"হরি! কৃষ্ণ! হরি! পতিতপাবন!
"জয় বনমাতা!—সুভদ্রা-জননী!"—
উঠে পুণ্যরব বিদারি গগন ।
তোলে প্রতিধ্বনি যোজনে যোজনে
ব্যাপিয়া প্রভাস মত্ত যাত্রীগণ—
"জয় বনমাতা! -সুভদ্রা-জননী!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! পতিতপাবন!"
কোথা বৃদ্ধা নারী কণ্ঠ জড়াইয়া
কহে "বুকে আয়! আয় নীলমণি!"
মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধা উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া,
কহে—"আমি তোর যশোদা জননী ।
বেঁধেছিনু তোরে, মেরেছিনু তোরে,
তাই ওরে নিরদয় ননীচোর
আসিলি ছাড়িয়া? আয় বুকে আয়!"—
কহে যশোদার ভাবেতে বিভোর ।
কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেমে ভোর
গলা জড়াইয়া—"গোপাল আমার ।
কত কাল হায়! অশ্রু-স্রোত মম
যমুনার স্রোতে বহে অনিবার!"

শ্রীদাম-সুদাম-ভাবে ভোর কেহ
কহে ডাকি—"ওরে ভাই রে কানাই!
বেলা হ'ল ভাই, চল গোষ্ঠে যাই!
তুই বিনা ভাই! যায় না গাই!"
গোপী-ভাবে ভোর যুবতী সকল
ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ প্রাণ,
নাহি লজ্জা ভয় দিয়া আলিঙ্গন,
নাচে হাসে রাসে, গায় প্রেম-গান ।
কহে—"পতি পুত্র নাহি পড়ে মনে,
তুমি প্রাণপতি তুমি প্রাণেশ্বর ।
কত কাল হায়! জ্বলিনু বিরহে,
জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর!
ওই ত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে শ্যাম!
যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর,
কত অশ্রুধারা ঝরিয়াছে হায়!
আমরা বিরহ-বিধুরা বালার ।
দেও আলিঙ্গন জুড়াও এ প্রাণ!
দেও পাদপদ্ম হৃদয়োপর!"
ধরে পাদপদ্ম অনাবৃত বক্ষে,
শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল্ল ইন্দীবর ।
কেহ বা বিবশা পড়িয়া চরণে,
অঙ্গে অঙ্গে কেহ, কেহ বক্ষোপর,
ভক্তির চরম প্রেমে আত্মহারা ;
আপনি কেশব প্রেমেতে বিভোর!
বহে অশ্রুধারা রমণী-নয়নে,
বহে অশ্রুধারা নয়নে হরির,
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!—গায় নর নারী
নাচে আত্মহারা বহে নেত্রে নীর ।
দাঁড়াইলে কৃষ্ণ সলীল সমীপে,
ব্রজকিশোরীর ভাবে নারীগণ
দলে দলে দলে পড়ে সিন্ধুজলে,
কোথায় ভূষণ, কোথায় বসন!
আকক্ষ আবক্ষ সলিলে ডুবিয়া,
কহে যোড়করে—"ত্রিভঙ্গ শ্যাম!
কদম্বের ডালে বাজাও বাঁশরী,
ব্রজকিশোরীর জুড়াও প্রাণ!
লও কুল মান, যাহা আছে আর,
লও প্রেম, লও চরণে প্রাণ!"
ভাসে অনুরাগে অধীরা অবলা,
সাগর-তরঙ্গে কুসুমরাশি,

"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায় তীরে নীরে
নর নারী প্রেম-তরঙ্গে ভাসি।
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
কেহ কহে—"পিতা আমি পুত্র তব।"
কেহ কহে—"প্রভু! তব দাস আমি
যাবত জীবন চরণে রব।"
কেহ পুষ্পমালা পরায় গলায়,
চাঁচর চূড়ায় পরায় কেহ,
করে, পদে, অঙ্গে, দেয় পুষ্পমালা,
চন্দনে চর্চিত করিয়া দেহ।
কেহ দেয় করে সুমোহন বাঁশী,
কেহ দেয় করে পাঁচনি বাড়ি,
কেহ করে তুলি দেয় চারু শিঙ্গা,
ব্রজলীলা-রঙ্গে মত্ত নর নারী।
কোথায় বাৎসল্য তরঙ্গে ভাসিয়া
গায় নর নারী শৈশব লীলা,
গায় গোষ্ঠলীলা কোথায় আবার
সখ্য প্রেমোচ্ছ্বাসে দ্রবিয়া শিলা।
গায় রাসলীলা হইয়া তন্ময়
কান্ত ও মধুর প্রেমে বিহ্বল;
কোথায় বা গায় কুরুক্ষেত্র-লীলা
শান্ত দাস্য প্রেমে নেত্র ছল ছল।
সকলেই দেখে আপন গলায়,
অঙ্কে বক্ষে, কৃষ্ণ করিছে বিহার।
কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো সখা,
কারো প্রাণপতি, প্রণয়ী কাহার।
এরূপে বাৎসল্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য,
কান্ত ও মধুর প্রেমে ভাসমান
পবিত্র প্রভাস—নব বৃন্দাবন,
প্রেমে সিন্ধু আজি বহিছে উজান।
লক্ষ লক্ষ যাত্রী ব্যাপিয়া প্রভাস
প্রেমের সাগরে মত্ত ভাসমান,
করিতেছে পান অজস্র ধারায়,—
কিবা মহাসিন্ধু!—কি মহাপান!
মানব-সিন্ধুর প্রেমের তরঙ্গে
ভাসিয়া ভাসিয়া করি দিবাতীত,
আসিলেন কৃষ্ণ ফিরিয়া শিবিরে,
জুড়ায়ে তাপিত, উদ্ধারি পতিত।
প্রেমের আবেশে আপনি অধীর
শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি,
দেখিয়া অনন্ত সিন্ধুর সৈকতে
মানব-সিন্ধুর অনন্ত লহরী।
অনন্ত যন্ত্রের অনন্ত সঙ্গীত
ছুটিছে মধুরে লহরে লহরে।
লহরে লহরে বক্ষে সঙ্গীতের
বহিছে ছুটিয়া—"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"
নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, নাহি অবসাদ,
আর্য কি অনার্য নাহি কিছু জ্ঞান,
গাহিছে নাচিছে গলাগলি করি,
করিতেছে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান।
যোগী সংখ্যাতীত বসি স্থানে স্থানে
ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে করে গীতা গান,
কেহ বা যোগস্থ, সমাধিস্থ কেহ,
করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।
কুরুক্ষেত্র পূর্বে অম্বর বিগ্রহে
যে বাণিজ্য-ক্ষেত্র ছিল মরুময়,
আজি সেই ক্ষেত্র মহারত্নাকর,
অনন্ত রত্নের অনন্ত আলয়।
আসিন্ধু অচল ব্যাপি মহাস্রোতে,
ঢালিয়াছে রত্ন সেই রত্নাকর
প্রভাসে অজস্র, বিপণিমালায়
দিগন্ত সজ্জিত, কি শোভা সুন্দর!
বিহ্বল বিক্রেতা গায় কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম-ক্রেতা গাহিছে বিহ্বল,
পণ্য কৃষ্ণনাম, মূল্য কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণ-প্রেম যেন বাণিজ্য-সম্বল।
দেখিলেন হরি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম,
তিন মহাস্রোতে করিয়া প্লাবিত
সমগ্র ভারত, আজি এ প্রভাসে
কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে হয়েছে মিলিত।
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে আকুল উচ্ছ্বাসে
কহে শৈল দর দর দুনয়ন—
"দেখ নরনাথ! দেখ নারায়ণ!—
আর্য অনার্যের প্রেম-সম্মিলন!
ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ,
তব প্রেম-স্রোতে গিয়াছে ভাসি।
দেখ ধর্মরাজ্য!—প্রেম-রাজ্য তব!
কি প্রেম!—কি শান্তি!—অমৃতরাশি!"
কহিলেন হরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে
আকুল আনন্দে অধীর প্রাণ—

"এ যে প্রেম-রাজ্য ভদ্রা শৈলজার !
শৈল ! আজি মম পূর্ণ মনস্কাম।"
আকুল উচ্ছ্বাসে পড়িয়া চরণে
কহিলা উদ্ধব—"পূর্ণ মনস্কাম
উদ্ধবের আজি ! দেখিল এ লীলা,
বিদায় তাহারে দেও ভগবান।"
কহিলেন কৃষ্ণ—"উদ্ধব ! উদ্ধব !
একমাত্র তুমি সখা দ্বারকায়।
সায়াহ্ন জীবনে একই সান্ত্বনা,
যাইও না তুমি ছাড়িয়া আমায়।
ব্রজের উচ্ছ্বাসে উদ্ধব ! আমার
আমি উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত প্রাণ।
নাহি নন্দ পিতা, যশোদা জননী,
নাহি সখা মম শ্রীদাম সুদাম।
গোষ্ঠের সঙ্গিনী, বন-বিহারিণী
প্রেমের প্রতিমা কিশোরীগণ,
ভক্তিবিলাসিনী, নাহি মম আর,
নাহি সে যমুনা নাহি বৃন্দাবন।
ব্রজের সে খেলা সাঙ্গ বহু দিন,
সে প্রেম-স্বপন হইয়াছে শেষ ;
সেই বনমালা গেছে শুকাইয়া,
বাজে না সে বাঁশী, নাহি সেই বেশ।
ছাড়ি প্রেমময় বক্ষ যশোদার,
জনক নন্দের অঙ্ক প্রেমময়,
ছাড়ি প্রেমময় ব্রজের রাখাল,
ছাড়ি প্রেমময়ী কিশোরী-হৃদয়,
উদ্ধব ! উদ্ধব ! ছাড়িয়া আমার
প্রেমের প্রবাহ গাভী বৎসগণ,
ছাড়ি প্রেমময়ী যমুনা আমার,
প্রেম-পুষ্পময় ছাড়ি বৃন্দাবন,
কি মহা মরুতে দিয়েছিনু ঝাঁপ !
দুই ভুজ মম পার্থ দ্বৈপায়ন ;
দুই ভুজ বলে জ্বালাইনু হায় !
কত কুরুক্ষেত্র খাণ্ডব ভীষণ !
সেই মরুভূমি, সেই বনভূমি,
আসিন্ধু হিমাদ্রি হইলে উদ্ধার,
অন্য দুই ভুজ লতা ভদ্রা শৈল
সৃজিয়াছে কিবা প্রেম-পারাবার।
আজি চতুর্ভুজ মূরতি আমার
গদা পার্থ-বল, শঙ্খ গীতা আর,
সুভদ্রার বক্ষ শান্তি শতদল,
প্রেম মধুচক্র বক্ষ শৈলজার।
পূর্ণ আজি মম জীবনের ব্রত,
পূর্ণ দ্বাপরের নিয়তি কঠোর,
অধর্মের কৃষ্ণপক্ষ ঘোরতর,
হইল নীরবে কুরুক্ষেত্রে ভোর !
আত্ম-বলিদান দিয়া অভিমন্যু
সেই শুক্লপক্ষ করিল সঞ্চার,
পবিত্র প্রভাসে হইল উদিত
সুশীতল পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমার।
কি চন্দ্র শীতল ! কি শান্তি জ্যোৎস্না !
কি ঘোর ঝটিকা অমাবস্যা পরে !
যেও না উদ্ধব ছাড়িয়া আমায়
এ মহা উচ্ছ্বাসে, নিষ্ঠুর অন্তরে।"
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
প্রভাস সিন্ধুর গর্ভে ভাসমান
কিবা পূর্ণচন্দ্র, মহাকাল গর্ভে
নব মহাধর্ম যেন মূর্তিমান।
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস;
আসিন্ধু অচল শান্তি জ্যোৎস্নায়
ভাসিছে ভারত, ধর্ম শশধর
বর্ষিতেছে সুধা অনন্ত ধারায় !
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
প্রভাস-সাগর কত ক্ষুদ্রতর।
অভিন্ন আর্য ও অনার্য হৃদয়,
অনন্ত প্রেমের কি মহাসাগর !
কহিল উদ্ধব যোড়করে পুনঃ—
"কৃপাসিন্ধু ! দাসে হইয়া নিদয়,
রাজনীতি মরুভূমিতে তাহার
একটি জীবন করিতেছে ক্ষয় !
দেখাইয়া তারে মূরতি কঠোর,
করেছ কঠোর হৃদয় তাহায়
মহামরুভূমি ! আজি সে মরুতে
একটি নির্ঝর হয়েছে সঞ্চার।
পান করি এই সুশীতল নীর
কি শান্তি জীবনে হয়েছে সঞ্চার,
পড়িয়াছে খসি নেত্র-আবরণ
কি স্বর্গ খুলেছে নয়নে আমার !
যাইব গোপাল। তব বৃন্দাবনে,
যমুনার তীরে যাইব তোমার,

ভ্রমি কুঞ্জে কুঞ্জে যমুনা-পুলিনে,
শুনিব তোমার বাঁশীর ঝঙ্কার।
পিতা নন্দ তব, জননী যশোদা,
দেখিব তোমার বিরহ-বিধুর।
দেখিব শ্রীদাম দেখিব সুদাম,
সেই গোষ্ঠ-লীলা দেখিব মধুর।
যমুনা পুলিনে বিরহ-বধূরা
ব্রজের কিশোরী হারাইয়া শ্যাম,
দেখিয়া নয়নে, পড়িয়া চরণে,
চাহিব কাতরে তব প্রেম দান।
বিদায় এ দাসে দেও দয়াময়!
দিয়া পাদপদ্ম পাষাণ উদ্ধার
কর এ দ্বাপরে!"—কাতরে কাঁদিয়া
পড়িল উদ্ধব চরণে আবার।
ব্রজের স্মৃতিতে কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত
কহিলেন কৃষ্ণ করুণ-হৃদয়,—
"কে দেখিতে যায় বল না উদ্ধব!
উৎসবের অন্তে উৎসব আলয়?
কে দেখিতে যায় বল রঙ্গালয়,
হইলে উদ্ধব! অভিনয় শেষ?
ব্রজের উৎসব হইয়াছে শেষ,
নাহি সেই গীত, নাহি সেই বেশ।
বহু দিন গত যবনিকা হায়!
পড়িয়াছে, আজ শূন্য রঙ্গালয়!
কি দেখিতে বল যাইবে উদ্ধব!
নাহি অভিনেতৃ, নাহি অভিনয়!
যে ক্ষুদ্র নির্ঝরে জন্মিলা জাহ্নবী,
রহিলা কি রুদ্ধ সেই নিরঝরে?
উড়াইয়া শৈল, জুড়াইয়া মরু,
পতিতপাবনী মিশিলা সাগরে।
ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে—ক্ষুদ্র নিরঝরে—
গোপের গোপীর হৃদয় তরল
যে প্রেম-জাহ্নবী জন্মিলা উদ্ধব!
ষড়মুখী, করি অশান্তি অনল
নির্বাপিত, ঘোর অধর্মের শৈল
বলে কুরুক্ষেত্রে করি বিতাড়িত;
জুড়াই তাপিত, উদ্ধারি পতিত,
হইল প্রভাসে সাগরে মিলিত।
বিশ্ব চরাচর আজি বৃন্দাবন,
মহাকাল ধারা যমুনা তাহার,
নরনারী, নন্দ, যশোদা জননী,
নর নারী গোপ-কুমারী কুমার।
ব্রজ কুরুক্ষেত্র, প্রভাস,—ত্রিভঙ্গ,
নবধর্ম মম কদম্ব শীতল;
নর নারী প্রেম, চারু বনমালা;
বাঁশী বিশ্ব-কণ্ঠ বাজে অবিরল।
দেখ কি মধুর এই বৃন্দাবন!
কি মাধুরী এই যমুনা বয়!
দেখ কি ত্রিভঙ্গ! কদম্ব সুন্দর!
শুন কি বাঁশরী মাধুরীময়!"
কহিল উদ্ধব—"পারিল না পার্থ
বুঝিতে, সহিতে, নর-নারায়ণ
যেই বিশ্বরূপ, সে অনন্ত রূপ
কেমনে উদ্ধব করিবে ধারণ?
যেই সৌর রাজ্যে অনন্ত অসীম,
আদিত্য আপনি যান হারাইয়া,
কি বুঝিবে তাহা পতঙ্গ খদ্যোত,
ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী আলোক লইয়া?
হায়! বিনা শিক্ষা বিনা সাধনায়,
না পারি লভিতে ক্ষুদ্র শিল্পজ্ঞান।
বিনা শিক্ষা, আমি বিনা সাধনায়,
অনন্ত অচিন্ত্য পূর্ণ ভগবান
বুঝিবে কেমনে? লঙ্ঘিয়া কেমনে
অনন্ত জ্ঞানের মহাপারাবার,
দেখিব তোমার চিদানন্দ রূপ;—
এখানো উদ্ধব শিখেনি সাঁতার।
ভাষার, শিল্পের, চিত্র, সঙ্গীতের,
রয়েছে অক্ষর, রয়েছে বিধান,
অক্ষর বিধান আছে সেই রূপে
লভিতে অনন্ত তব তত্ত্বজ্ঞান।
আজি এ প্রভাসে পেয়েছি অক্ষর,
এ প্রভাসে আজি পেয়েছি বিধান,
বুঝিয়াছি তুমি জ্ঞানের অতীত,
ভক্তির অতীত নহ ভগবান!
তব ভক্তি ক্ষেত্র, প্রেম-ক্ষেত্র তব,
যাব বৃন্দাবন, ভজিব তোমায়।
তুমি হবে প্রভু, আমি হব দাস,
পরে পুত্র, তুমি পিতা করুণায়।
আমি পিতা মাতা কিছুদিন পরে,
তুমি ননীচোরা দুলাল আমার,

পরে প্রেমময় সখা দুই জন,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রেমে করিব বিহার।
তখন হইবে তুমি প্রাণপতি,
আমি প্রাণ-পত্নী হইব তোমার ;
তুমি যে রমণ, রমণী যে আমি,
এই জ্ঞান শেষে রবে না আর।
ভক্ত ভগবান, প্রেমিকা প্রেমিক,
হইব চিন্ময়, আনন্দময়,
রাসনিশি শেষে, চরণে বিদায়
লইল উদ্ধব করুণাময় !"
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
পবিত্র ধূলায় ধূসরিত কায়,
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গর্জি বাহু তুলি'
উদ্ধব নাচিয়া নাচিয়া যায়।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গর্জিল প্রভাস,
ছুটিল উন্মত্ত নরনারীগণ
উদ্ধবে বেড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
ফুল্ল জ্যোৎস্নায়, অতুল দর্শন।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায় দীন কবি,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে আনন্দে বিহ্বল,
উদ্ধব! তাহারে লও বৃন্দাবনে,
দেখ বক্ষ ভাসি বহে অশ্রুজল।
আমিও উদ্ধব! তোমার মতন
রাজনীতি মহা মরুতে পড়িয়া,
কাটাইনু এই একটি জীবন,
শত মনস্তাপে জলিয়া পুড়িয়া।
প্রেম-পিপাসায় এ তাপিত প্রাণ
বড়ই কাতর পিপাসাতুর ;
উদ্ধব! আমায় লও বৃন্দাবনে,
সেই ব্রজলীলা দেখিব মধুর।
চতুর্দশ বর্ষ বসি এক ধ্যানে
দেখিয়াছি সেই লীলা চিন্তাতীত ;
পাইয়াছি শান্তি মরুদগ্ধ প্রাণে,
হয় নাই তবু তৃষ্ণা নির্বাপিত।
উদ্ধব! আমারে লও বৃন্দাবনে!
সেই ব্রজলীলা দেখিয়া মধুর
জুড়াইব প্রাণ,—মরুদগ্ধ প্রাণ
বড়ই কাতর, বড় তৃষ্ণাতুর।

ষষ্ঠ সর্গ

প্রতিজ্ঞা

"বনবালা! বনবালা! কত কাল আর
এই পিপাসা অনল
বহিব এ মরু-বুকে?—বহিব শোণিতে
এ অনল তরল?"—
অতীত প্রহর নিশি, ফুল্ল নীলাম্বরে মিশি'
হাসিতেছে বৈশাখের প্রফুল্ল চন্দ্রিমা;
নীলাম্বর নীলিমায়, উচ্ছ্বসিত মহিমায়,
ভাসিতেছে সেই হাসি পূর্ণ মধুরিমা।
বৈশাখের পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সুধাধার,
সমুজ্জ্বল সে সুধায় প্লাবিত আকাশ;
প্লাবিয়া আকাশ অঙ্গ, শীতল সুধাতরঙ্গ
তুলিয়াছে সিন্ধুনীরে কি সুধা-উচ্ছ্বাস!
নারী-মুখ সুধাকর চাহি সেই শশধর,
রূপের সুধায় মুখ পূর্ণিত প্লাবিত;
প্লাবি মুখ নীলাম্বর, ঝরিতেছে সুধা-কর
চন্দ্র-দীপ্ত সিন্ধুতীর করি আলোকিত।
সিন্ধুতীরে শিলাসনে, বিস্ফারিত দু'নয়নে,
বসি বামা, নারী-গর্বে প্রদীপ্ত নয়ন;
নারীগর্বে পূর্ণ মুখ, পূর্ণিত পীবর বুক,
শোভিছে বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘখণ্ড সম।
অনার্যের সেনাপতি সাজিয়াছে রূপবতী,
কেশের উষ্ণীষ শোভে ললাট উপর;
উষ্ণীষে চূড়ার শোভা চন্দ্রকরে মনোলোভা,
উরস্ত্রাণাবৃত উচ্চ উরস সুন্দর।
পৃষ্ঠে তূণ, শরাসন, নিদ্রিত ভুজঙ্গ সম,
কটিবন্ধে ক্ষীণ কটি শোভে ক্ষীণতর;
খচিত কোষে ঝলসি নিতম্ব-বিলম্বী অসি,
শোভিছে সফণা ফণী তীব্র বিষধর।
শোভে ভুজে সুকুমার - মনমথের কণ্ঠহার—
রতন কঙ্কণ কিবা আদরে আবরি'!
সুপ্রকোষ্ঠে মনোলোভা, বিলোল বলয়-শোভা
খেলে কর সঞ্চালনে কিবা লীলা করি!
কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় খেলে কিবা লীলাময়!
সুগোল কোমল কণ্ঠে কণ্ঠী মনোহর;
কোমল কৌষিক শোভা কি উরুতে মনোলোভা
সুগোল চরণে শোভে মঞ্জীর মুখরা।
রয়েছে ঈষদ হাসি অধরকোণায় ভাসি,
চাহি চন্দ্র পানে বামা বসি অবিচল,
চাহি সেই মুখ পানে, অধীর মদিরা পানে,
বসি শিলাতলে কহে সাত্যকি বিহ্বল।—
"বনবালা! বনবালা! কত কাল আর
এই পিপাসা অনল
বহিব এ মরুবুকে?—বহিব শোণিতে
এই অনল তরল?
কত কাল!—এক দিন নিদাঘ নিশীথে
শয্যা-কক্ষে, স্বপনে যেমন,
অপূর্ব রমণী-মূর্তি নীলিমা মাধুরী
দেখিলাম, মেলিয়া নয়ন।
নয়ন না পালটিতে চপলার মত
হইল অন্তর সুলোচনা।
ভাবিলাম স্বপ্নদেবী হইয়া কি মূর্তিমতী
করিলেন আমারে ছলনা।
বিস্মিত ত্যজিয়া শয্যা, স্বপনে যেমন,
কক্ষ হইতে হইয়া বাহির
দেখিলাম, অশ্বপৃষ্ঠে অপূর্ব কৌশলে
বীরবালা লঙ্ঘিল প্রাচীর।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত দেহ রোমাঞ্চিত,
দাঁড়াইয়া অচেতন প্রায়,
ভাবিতাম,—এ কি স্বপ্ন! কিম্বা কোন দেবী
এইরূপে ছলিল আমায়!
একি দৃশ্য! কি রহস্য!—চিন্তি সারানিশি,
দেখিলাম প্রভাতে উঠিয়া,
নহে স্বপ্ন, প্রাচীরের মূলে তুরঙ্গের
পদ-চিহ্ন রয়েছে পড়িয়া!
কে রমণী? কেন কক্ষে পশিয়া গোপনে
এই রূপে হ'ল অন্তর্হিত?
সেই অশ্ব-পদ-চিহ্ন হৃদয়ে আমার
হায়! যেন হইল অঙ্কিত।

বুকের উপর দিয়া তুরঙ্গ-বাহিনী
যেন বেগে গিয়াছে চলিয়া,
কি যেন মদির স্মৃতি, অজ্ঞাত উচ্ছ্বাস,
রূপ-স্বপ্ন গিয়াছে রাখিয়া।
কি যেন দারুণ ব্যথা মরমে মরমে
অকস্মাৎ হইল সঞ্চার ;
কি যেন আবেশে দেহ হইল অবশ,
প্রাণে যেন কিবা হাহাকার !
কত দিন, কত নিশি, এই রূপে হায় !
বাণ-বিদ্ধ কপোতের মত,
কাটিলাম যাতনায়, দিবা অনাহারে,
যাতনায় নিশি অনিদ্রিত।
দেখিলাম কত বার, বিদ্যুৎবিক্ষেপী
নবীন নীরদময়ী বালা
দাঁড়াইয়া কক্ষে মম, বিদ্যুৎবিক্ষেপে
অন্ধকার কক্ষ করি আলা।
ছুটিলাম উন্মত্তের মত কত বার
ধরিতে সে দীপ্তা কাদম্বিনী ;
ধরিলাম,—কিন্তু কই ? কক্ষ অন্ধকার
ছলিয়াছে ভ্রান্তি মায়াবিনী।
দিবা নিশি কত বার, হায় ! শত বার,
আরোহিয়া অট্টালিকা-শির,
দেখিতাম আত্মহারা নেত্রে অনিমিষ
সেই অশ্ব লঙ্ঘে কি প্রাচীর !
একদা নিশিতে যেন দেখিনু রমণী
সেই রূপে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া,
বকুলে বাঁধিয়া অশ্ব, কুঞ্জের প্রাসাদে
সশঙ্কিতা যাইছে চলিয়া।
ছুটিলাম হৃদয়ের আবেগের বশে
শরাসন-ভ্রষ্ট শর মত,
শুনি পদ-শব্দ মম অশ্বারূঢ়া বামা
উল্কাবৎ হ'ল অন্তর্হিত।
ছিল সুসজ্জিত অশ্ব নিকটে আমার
অশ্বপৃষ্ঠে লঙ্ঘিয়া প্রাচীর
ছুটিনু, ছুটিল বেগে তুরঙ্গ যুগল
অন্ধকারে যেন দুই তীর।
বায়ুগামী তুরঙ্গের ঘোর হ্রেষারব
ঘন ঘন উঠিছে ভাসিয়া
নৈশ নীরবতা বক্ষে, অশ্ব-পদাঘাতে
অগ্নি-কণা পড়িছে ছুটিয়া।

কিবা অশ্ব-সঞ্চালন ! কত ক্ষুদ্র স্রোত,
কত বিঘ্ন, করি উল্লঙ্ঘন
ছুটিয়াছে বীরাঙ্গনা, বসি অশ্বে বামা
চারু শৈল প্রতিমা যেমন।
এইরূপে বহু ক্রোশ তুরঙ্গ যুগল
মহাবেগে করি অতিক্রম,
প্রসারিত পদোপরে অবসন্ন পড়ি,
অকস্মাৎ ত্যজিল জীবন !
এক লম্ফে পড়ি ভূমে ফিরাইয়া মুখ,
রাখি বক্ষে করোপরে কর,
দাঁড়াইয়া বীরবালা, যেন বনকুরঙ্গিণী
ব্যাধ অগ্রে সংগ্রাম-তৎপর।
আঁধার নির্মলা নিশি জ্বলিছে আকাশে
দীপালোক অংসখ্য নীরব ;
সেই আলো অন্ধকারে মরি ! কিবা রূপ।
ভূতলের অতুল বিভব !
বিমুক্ত কুন্তল পটে শোভিতেছে কিবা
স্বেদ-সিক্ত বদন সুন্দর !
শ্যাম চিত্র-পটে শিল্পী রেখেছে আঁকিয়া
যেন পূর্ণ নীল শশধর।
সমেখলা কটিবন্ধে, উচ্চ কটিতটে,
আঁধারে ঝলসে ভীমা অসি ;
অশ্ব-সঞ্চালন বেগে দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণী
পীন বক্ষে পড়িয়াছে খসি।
অশ্ব-সঞ্চালন-শ্রমে উঠিছে, পড়িছে,
লীলা করি উন্নত উরস ;
তরঙ্গিত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে,
ফুটোন্মুখ যুগ্ম তামরস !
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি নির্ভীক মূরতি
দাঁড়াইয়া দলিতা ফণিনী,
জিজ্ঞাসিনু—'কহ তুমি দেবী কি মানবী ?'
'কহিব না'—কহিল গর্বিণী।
'কিবা জাতি ?'—'কহিব না।' 'কি নাম তোমার ?'
'কহিব না'—সুদৃঢ় উত্তর।
'কেন এই নিশি-যান তব ?'—'কহিব না।'
বজ্রকণ্ঠে কাঁপিল অন্তর।
'তবে গুপ্ত চর তুমি ধরিব তোমায়' ;—
'ধর শক্তি যদি থাকে তব !'
'জান কি সাত্যকি আমি বীরচূড়ামণি ?'
'জানি'—বামা রহিল নীরব।

'সিংহের সহিত ক্রীড়া!'—'আমিও সিংহিনী।'
'খোল তবে অসি তীক্ষ্ণ ধার!'—
'খুলিব না, হান অসি! পাতিয়াছি বুক!
কাপুরুষ ঘোষিবে সংসার।'
কি ঘোর সংকট! কিবা মূর্তি গরবিণী,
শিলা সম দাঁড়ায়ে নির্ভীক!
কি রূপ বিদ্যুতপ্রভা! ধাঁধিল নয়ন;
ঘুরিতে লাগিল চারিদিক।
কি যেন মদিরা-স্রোত ছুটিল শোণিতে,
দেহ মম অবশ অধীর,
কহিলাম—'নারী-রত্ন! মানিলাম পরাজয়;
এই রূপ নহে অবনীর!
হৃদয় বিজিত কত রক্তজবা সম
রূপ-পাত্রে লও উপহার।'—
'লইলাম;—এইখানে এমন সময়ে
পক্ষান্তরে মিলিব আবার!'
সগর্বে ফিরায়ে মুখ চলিল মন্থরে,
কি গর্বিত সুন্দর গমন!
কি গর্বিত দেহভঙ্গি, রূপ-গরবের
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ কেমন!
রূপের তরঙ্গ-লীলা, চাহিতে চাহিতে,
মিশাইল নৈশ অন্ধকারে;
অস্ত গেল চন্দ্র মম হৃদয়-আকাশে,
অন্ধকারে আবরি তাহারে।
আত্মহারা কিছুক্ষণ ভ্রমি, শিলাখণ্ডে
রাখি মম অবসন্ন শির,
বসিলাম ধরাতলে, অবসন্ন দেহে
শোণিতপ্রবাহ যেন স্থির।
চাহিলাম নীলাকাশ, দেখিলাম যেন
নিবিয়াছে তারকা সকল,
মূর্তিমতী নিশাদেবী শোভিছে চন্দ্রমা,
নীলাকাশ করিয়া উজ্জ্বল।
সেই স্মৃতি করিতেছে অবশ হৃদয়,—
দেও সুরা-পাত্র, বনবালা!
অধর-মদিরা মাখি! জ্বলিল এ প্রাণে
নিদারুণ সেই স্মৃতিজ্বালা।"
ঢালি সুরাপাত্রে সুরা, পান করি বামা,
সাত্যকিরে করিল অর্পণ;
পান করি কহে—"উহু! কিবা তীব্র সুরা!
তরল বিদ্যুত অনুপম!—

মিলিলাম পক্ষান্তরে, মিলিলাম আর
কত স্থানে, হায়! কত বার!
প্রহেলিকা স্বরূপিণী এখনো যে তুমি!
পূরিল না পিপাসা আমার।
মন্ত্র-মুগ্ধ ফণী মত এই দীর্ঘ কাল
চলিয়াছি ইঙ্গিতে তোমার,
তোমার ইঙ্গিতে আমি করিয়াছি হায়!
কি নরক যাদব-সংসার!
তোমার ইঙ্গিতে হায়! স্থাপিনু গোপনে
দ্বারকায় শৌণ্ডিক-আলয়;
রাখিলাম লুকাইয়া দ্বারকা নগরে
সর্পী-সম শৌণ্ডিক নিচয়।
অনার্যার সুরা-সুধা, রূপ-সুধা আর,
গরলে গরল উগ্র মিশি,
উন্মত্ত যাদবকুল দুই মহাবিষ
হায়! পান করি অহর্নিশি।
অনার্যার প্রেমানল, অনার্যার সুরানল,
হিংসা-কুণ্ড করি প্রজ্বলিত,
পুড়িছে যাদবকুল; কৃষ্ণের শাসনে
হইল না অগ্নি নির্বাপিত।
নাহি সে শৌণ্ডিকালয়, তথাপি গোপনে
করিতেছে দুই বিষ পান;
দ্বারকা অশান্তিপূর্ণ, না জানি ঘটিবে,
যাদবের কিবা পরিণাম!
কহিলে—অনার্য জাতি, যারা এক দিন
ছিল এই ভারত-ঈশ্বর,
হইয়াছে অন্নাভাবে হা অদৃষ্ট! তারা
হীনজীবী শৌণ্ডিক ইতর!
তুমি কুরুক্ষেত্র-জয়ী, করুণ-হৃদয়,
শ্রীকৃষ্ণের ভুজ অন্যতর;
অনার্যেরে দেও ছায়া! হও যদুপুরে
অনার্য-আশ্রয় তরুবর!
অনূঢ়া অনার্য-রাণী,—এই হেতু তার
তব কক্ষে নৈশ অভিসার।
দেও ভিক্ষা! যথাকালে দিবে পদে তব
জীবন, সর্বস্ব, অনূঢ়ার'—
দেও সুরাপাত্র!—আহা! কি তীব্র অনল!
কাল পূর্ণ হয়েছে কি বল?
তাই কি প্রেরিলে পত্র? নাহি পারি আর
সহিতে এ পিপাসা অনল।"

আবার মদিরা পান, সুধা বিনিময়
দুই জনে আবার আবার;
বিলোল কটাক্ষ সহ কি লীলা করিয়া
দেয় বামা পাত্র মদিরার!
কহিল রমণী,—কিবা কণ্ঠ প্রেমময়!
বিলাস-বিহ্বল মদিরায়,—
"বীরেন্দ্র! এ দীর্ঘ কালে বল কি তোমার
এই ভ্রান্তি ঘুচিল না হায়!
তুমি আর্য-কুল-রবি প্রখর উজ্জ্বল,
পতিতা অনার্যা আমি আর,
আর্যের উদ্যান-ভৃঙ্গ,—তব বাঞ্ছনীয়
আছে কিবা আমি অনার্যার?"
সুরা-শ্লথ কণ্ঠে মত্ত কহে যুযুধান,—
"নীলাব্জের লীলা নীলিমার
দেখি নাই যত দিন, ভাবিতাম মনে
তামরস ত্রিদিব শোভার।
শ্যামাঙ্গিনী অনার্যার রূপে যে মদিরা,
আছে যেই লালসা প্রখরা,
গৌরাঙ্গিনী আর্যবালা-রূপ জ্যোৎস্নায়
নাহি এই লাবণ্য মুখরা।
অনার্যা কানন-বালা কানন-মদিরা,
বিদ্যুৎ-পূরিতা উগ্র সুরা,
উদ্যান দাড়িম্ব-সুধা আর্যা-বামাঙ্গিনী,—
পুষ্প-সুধা কোমলা মধুরা।
প্রৌঢ় আমি, করিয়াছে তব রূপ প্রাণে
কি বিদ্যুৎ আবেগ সঞ্চার,
নব যুবকের মত আত্মহারা আমি,
প্রাণ মম মরু পিপাসার!
কে বলে যৌবন মাত্র প্রেমের সময়?
পারে নদ মধ্যম জীবনে
দেখাতে কি সেই লীলা, তরঙ্গ উত্তাল,
খেলে যাহা সাগর-সঙ্গমে?
প্রৌঢ়ে মম যে তরঙ্গ, উত্তাল উচ্ছ্বাস,
খেলিতেছে হৃদয়ে আমার,
যৌবনের যে উচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র জলক্রীড়া
বালকের তুলনায় তার।
প্রভাসের সিন্ধু সম অনন্ত অতল
আজি প্রেম-সাগর আমার;
তব পূর্ণচন্দ্র-মুখ তীব্র আকর্ষণে
করিছে কি লহরী সঞ্চার।
দেও সুরা-পাত্র,—সুরা চুম্বি প্রেমাবেশে!
অহো! কিবা সুধা তীব্রতরা
ঢালিয়াছে, প্রেমময়ি! অধর তোমার!
কি আনন্দে ভাসিতেছে ধরা!
কি সুন্দর! কি সুন্দর! ওই মুখখানি!
মন্মথের কি লীলা-কমল
শোভিতেছে চন্দ্র করে ললাট, কপোল,
মাধুরীর স্বর্গ সমুজ্জ্বল!
মদিরাক্ত দুনয়নে কি অরুণ আভা!
কি আবেশে হয়েছে পূরিত!
অরুণ আবেশময় কটাক্ষ বিলোল
কি তাড়িত করিছে সিঞ্চিত!
ছদ্মবেশে কিবা শোভা অঙ্গে মনোলোভা!
কি তরঙ্গ-রঙ্গ কালজয়ী!
এই দীর্ঘ কাল দেখি ক্রমে পূর্ণতর,
আজি পূর্ণতম প্রেমময়ী!
আজি সেই পূর্ণতায় অভুক্ত-সুধার
প্রাণ মম হয়েছে বিকল।
এস প্রিয়ে! এস প্রিয়ে!"—বাড়াইল কর
সুরামত্ত সাত্যকি বিহ্বল।
বিজলীর মত কারু পড়িল সরিয়া,
দাঁড়াইল নিষ্কোষিয়া অসি।
জানু পাতি ভূমিতলে বসিয়া সাত্যকি
কহে—"ক্ষম প্রেয়সি! প্রেয়সি!"
কহে কারু—"এত দিনে বুঝিলে না তুমি
নারীত্ব—সতীত্ব—অনার্যার
এমন সুলভ নহে, বন-ভুজঙ্গিনী
না দেয় মস্তকমণি তার
থাকিতে জীবন দেহে। হও অগ্রসর,
এই অসি হৃদয়ে তোমার
পশিবে আমূল, অসি পশিবে আমূল
এ গর্বিত হৃদয়ে আমার!
স্থির হও! শুন তবে! এ প্রহেলিকা
যথাকালে খুলিব এখন,
ডাকিয়াছি সেই হেতু; শুধু তব তরে
এত দিন রেখেছি গোপন।
শুন তবে! এক দিন নৈশ অভিসারে
কৃতবর্মা দেখিল আমায়,
করি অশ্ব-অনুসার ধরিল পাপিষ্ঠ,
পরাজিয়া যুদ্ধে অবলায়!

কহিল—"আমায় বর ! দিব ভিক্ষা প্রাণ ;
নহে প্রাণ সতীত্ব সহিত
হরিব,—খাইব মধু, করি নিষ্পীড়িত
এই পুষ্প সুধায় পূরিত।"
রক্ষিতে সতীত্ব,—প্রাণ তুচ্ছ অনার্যার,—
কহিলাম—"প্রণয়ী আমার
যদুকুল অবতংস বীরেন্দ্র শৌনেয় ;
আমি নারী অস্পৃশ্য তোমার।"
কিবা উপহাস হাসি হাসি দুরাচার,
পশু সম করি ব্যবহার,
'সাত্যকি বীরেন্দ্র যদি'—কহিল হাসিয়া—
'কাপুরুষ জগতে কে আর ?'
মাগিলাম নিরুপায় সময় তখন,
মহা সত্য করিয়া কঠোর ;
সেইকাল হবে পূর্ণ, পূর্ণ শশধর
গেলে অস্ত ; হবে স্বপ্ন ভোর !"
পদাহত ফণীমত সাত্যকি উঠিয়া
গরজিল নিষ্কোষিয়া অসি—
"নহে আমি যুযুধান, কৃতবর্মা-শির
এ নিশিতে নাহি পড়ে খসি !
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা ! আজি কাপুরুষ
শতবার ডাকিব তাহায় ;
সাত্যিকি কি কৃতবর্মা রজনী প্রভাতে
রহিবে না প্রেয়সি ! ধরায়।
"বিদ্যুৎ !"—ডাকিল বীর, হ্রেষিয়া তুরঙ্গ
বন হ'তে আসিল ছুটিয়া ;
সাত্যকি উঠিল লম্ফে, লুকা'ল বিদ্যুৎ
জ্যোৎস্নায় বিদ্যুৎ খেলিয়া।
বন হ'তে সেনাপতি তক্ষক আসিয়া
কহিল কারুর পদে পড়ি,—
"উৎসবের সন্নিকটে সৈন্য সুসজ্জিত,—
নাগ-মাতা চল ত্বরা করি !"
কাঁপিয়া উঠিল ধরা নাচিল সাগর,
পুনঃ প্রকম্পনে ঘোরতর,
আসিছে তরঙ্গমালা ভাসাইয়া বেলা,
অশ্বে কারু ছুটিল সত্বর।

সপ্তম সর্গ

লীলা শেষ

হাসিছে প্রভাস ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
মধ্য নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বসন্তের
করি সমুজ্জ্বল ঊর্ধ্বে আকাশ মণ্ডল,—
চরু চন্দ্রাতপ নীল অমৃতে রঞ্জিত,
নিম্নে মহাসিন্ধু নীলামৃতে তরঙ্গিত।
শিবির অনতি দূরে ধবল বেলায়—
যূথিকার পুষ্পাসন ধৌত চন্দ্রকরে,
বসি নর-নারায়ণ, বেদি নীলোৎপলে,
মানব অদৃষ্টাকাশ করি সমুজ্জ্বল,
করি সমুজ্জ্বল মহাকাল পারাবার।
নীলমণিময় দেহ-তীর্থের অন্তরে
যেন শত পূর্ণচন্দ্র হইয়া উদিত,
করিতেছে নীলামৃত কৌমুদী নিঃসৃত,
সুশীতল, সমুজ্জ্বল, পতিতপাবন,
আলোকিয়া চন্দ্র করে আলোকিত বেলা।
উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ, রাখি ঊর্ধ্ব শির,
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্রে, করুণা নির্ঝর,
চাহি অনন্তের পানে প্রশান্ত বদন।
অঙ্গে অঙ্গে রাজ-বেশ মস্তকে উষ্ণীষ,
জ্বলিতেছে ততোধিক ললাট, বদন।
শৈলজা আসিয়া ধীরে প্রতিমা প্রীতির,—
প্রেমাশ্রুতে ছল ছল নেত্র ইন্দীবর ;
নীলামৃতে ছল ছল, গৈরিকে আবৃত,
শান্ত সুললিত দেহ ; বেণী অমসৃণ
বেষ্টিয়া মস্তক চারু, চূড়ায় সুন্দর
শোভিছে অসাবধানে ললাট উপর ;
শোভিছে গলায় ভক্ত-দত্ত পুষ্পমালা,
রত্নমালা কণ্ঠে যেন দেবী-প্রতিমার ;—
আসি চন্দ্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল
নারায়ণ পদাম্বুজে। অর্পিয়া চরণে
কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার, রাখিয়া হৃদয়ে
দেবপদ কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে,
বসিল শৈলজা, যেন সন্ধ্যা নিরমলা
বসিল সুনীল শান্ত নীলাম্বর পদে।
"প্রাণনাথ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বাস,—"
কাতরে কহিল শৈল—"এই শৈলজার
প্রেম বরিষায় পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল,
লও শান্তি-সিন্ধু পদে, পুরাও বাসনা!
মধ্য-উৎসবেতে বজ্র নিনাদের মত
শুনিল স্তম্ভিত যাত্রী—'সমাপ্ত উৎসব।
কৃষ্ণের আদেশে,—যাত্রী যাবে রজনীতে
পঞ্চক্রোশ, আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন!'
থামিল উৎসব-সিন্ধু কল্লোল নিমিষে।
লীলা-গীত অর্ধ তানে, বাদ্য অর্ধ তালে,
থামিল, মৃদঙ্গে কর রহিল লাগিয়া।
নৃত্যশীল ঊর্ধ্ববাহু ভক্তবৃন্দ তব
বজ্রাহত দাঁড়াইল প্রতিমূর্তি মত।
মুহূর্ত, উৎসব ক্ষেত্র, নিষ্কম্প নীরব,
দেখিলাম চন্দ্রালোকে মহাচিত্র মত!
ব্যাপিয়া প্রভাস তীর উঠিল ভাসিয়া,
সেই নীরবতা বক্ষে, সমুদ্র গর্জন
মুহূর্ত ; মুহূর্ত পরে যাত্রী-হাহাকার
উঠিল ভাসিয়া প্লাবি জলধি কল্লোল।
সৈকত ধূলায় পড়ি গড়াগড়ি দিয়া
কহিল কাঁদিয়া—'হরি! দুটি দিন আর
ছিল সাধ নিরখিয়া পতিতপাবন
জুড়াইব প্রাণ, কেন হইলে নিদয়?'
কহিল কাঁদিয়া—'মা গো! তোরা দুই জন
এ পাপী সন্তানগণে দিয়া পদাশ্রয়
ল'য়ে চল বৃন্দাবনে, দেখা গোপালের
সে কিশোর লীলাভূমি পতিতপাবনী।
অবগাহি যমুনার সুশীতল নীরে,
আলিঙ্গিয়া সুশীতল কদম্ব তমাল,
কৃষ্ণ-পদে পবিত্রিত শ্যাম দূর্বাদলে
—ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত সুশীতল—
রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেম-পিপাসা
জুড়াইব, প্রাণ মা গো! বড়ই আকুল।'
চলিল না পদ মম, সুভদ্রা আপনি
চলিলেন, ভক্তগণ বেষ্টিয়া তাঁহায়
সরল শিশুর মত নাচিয়া নাচিয়া,

গাহিয়া গাহিয়া নাম-গীত সুমধুর,
ছুই নেত্রে প্রেম-ধারা, গিয়াছে চলিয়া।
বড়ই আকুল প্রাণ তব শৈলজার।
আসিল ছুটিয়া রাখি চরণ যুগল
জুড়াইতে এ হৃদয়ে, আকুলতা তার।
উৎসবান্তে উৎসবের আলয়ের মত
করিতেছে হাহাকার এই পুণ্য ভূমি,
এই নব কুরুক্ষেত্র, নব বৃন্দাবন।
প্রাণনাথ! দীনবন্ধো! তুমি দয়াময়!
করুণার সিন্ধু তুমি! কেন এইরূপে
ভাঙ্গিলে উৎসব নাথ! দিলে ব্যথা প্রাণে
ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে?"
রাখিয়া দক্ষিণ কর শৈলজার শিরে,
নারায়ণ স্নেহ-কণ্ঠে কহিলা—"বুঝিবে।"
সেই সুপ্রসন্ন মুখ প্রদীপ্ত শীতল,
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র চাহিয়া চাহিয়া
কহিতে লাগিল শৈল—"পতিতপাবন!
সমস্ত পতিত জাতি করিলে উদ্ধার,
ভাসাইলে এ ভারত প্রেমের প্রবাহে!
আর্য ও অনার্য, নাথ! ছুই মহাস্রোত
এ প্রেম-প্রবাহে আজি হইয়া পতিত,
সলিলে সলিল যেন হইয়া বিলীন,
ছুটিল কি সিন্ধু-মুখে শান্তি পারাবার!
আজি এ ভারত নাথ! বৈকুণ্ঠ তোমার,
তুমি নর-নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন।
আজি ভদ্রা শৈলজার পূর্ণ মনোরথ!
এ পতিতা শৈলজার স্বজাতি কেবল
রহিল পতিত নাথ! তাহাদের প্রতি
হইলে নিদয় কেন? কেন নিবারিলে
এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন,
শুনাইতে কৃষ্ণনাম সে পতিত বনে?
শৈলজার জন্মস্থান, জাতি শৈলজার,
রহিল পতিত নাথ! রহিল পতিত
শৈলজার পিতা-পুত্র-ভ্রাতা নাগপতি;
জরৎকারু, মাতা-কন্যা-ভগ্নী শৈলজার,
বনের সুস্বাদু ফল, বন নারিকেল,
বনবাসী ভ্রাতা মম; দৃঢ় আবরণ,—
হৃদয় মধুর শস্তে মধুর সলিল।
ভগ্নী নিদাঘের নদী অন্তরসলিলা;
রমণীর অভিমান তপ্ত আবরণে
বহিতেছে প্রেম-ধারা নির্মলা শীতলা।
আশার এ নিরাশার কি উগ্র অনল
জলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়
মহা বাড়বাগ্নি সম!—দয়াময় তুমি,
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয়?
আবার প্রসন্ন মুখে উত্তরিলা হরি
সস্নেহে—"বুঝিবে শৈল!"
চারু নেত্রে চারি
চাহি পরস্পরে স্থির পূর্ণচন্দ্রালোকে,—
প্রভাত-শিশির-সিক্ত চারি ইন্দীবর
চাহি পরস্পরে, শান্ত, স্থির, অবিচল।
দেখিল শৈলজা যেন কি প্রেম-উচ্ছ্বাস
উঠিল ভাসিয়া দেব-নেত্রে ছল ছল।
কহিলা কোমলতর কণ্ঠে নারায়ণ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!"—শৈলজা প্রথম
শুনিয়া যুগল নাম কণ্ঠে কেশবের
এত দিনে, এত দূরে! কি কণ্ঠ মধুর!
কিবা প্রেম-বিগলিত! কহিল প্রেমিক
চির প্রেমিকের; যেন চির প্রেমিকার,
চির মধুময় নাম চির প্রেমময়।
আশৈশব এই নাম শুনিয়াছে শৈল
প্রেমময়ী, শুনে নাই এমন মধুর!
মুহূর্ত নীরব রহি কহিলেন পুনঃ—
"বাসুকি ও জরৎকারু! ইহাদের সম
ভক্ত মম নাহি শৈল! এই ধরাতলে।"
ভগবন্! তব মুখে বড়ই মধুর
ভক্ত নাম!—ভক্ত তব, ভক্তের যে তুমি!
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!"—
কাঁদিয়া পড়িল শৈল লুটা'য়ে চরণ।
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!
বাসুকি ও জরৎকারু ভক্ত তব যদি
কেন তাহাদের এই অশান্তি অনলে
পোড়াইলে হায় নাথ! একটি জীবন?
চল নাথ! চল যাই পতিত পাতালে!
নাগপুর হবে তব নব ব্রজপুর;
বাসুকি শ্রীদাম সখা; শৈল জরৎকারু,
—হায়! নাথ! জরৎকারু মহা মরুভূমি,
চির প্রেম-পিপাসিনী, চির-উন্মাদিনী!—
হইবে ব্রজের গোপী; বহিবে যমুনা
সিন্ধুনদে সিন্ধুমুখে, গাহিয়া গাহিয়া

পতিতপাবন নাম ; সাগর সঙ্গমে
হইবে ব্রজের প্রেম অনন্ত অসীম।
হইল উদ্ধার নাথ। অহল্যার মত
পতিত অনার্য-ভূমি ; হইল উর্বর
উষর অনার্য-ভূমি ; হইল শোভিত
মরুভূমি প্রেমপুষ্পে, প্রেম সরোবরে,
তব কৃপা-জাহ্নবীর প্রবাহে শীতল ;
কেবল কি নাগভূমি রবে মরুময় ?
কেবল কি নাগপতি, কারু কি কেবল,
হৃদয়ে বহিবে মরু ? নিবিবে না হায় !
কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা ?"
"নিবিবে—নিবিবে—শৈল।"—ধীরে নারায়ণ
কহিলেন স্থিরকণ্ঠে গাম্ভীর্য-পূরিত—
"পূর্ণ কাল ;—পূর্ণ ব্রত ;—পূর্ণ মনোরথ।"
সে মুহূর্তে অকস্মাৎ যাদব শিবিরে
উৎসব-নিনাদ বক্ষে উঠিল ভাসিয়া
ঘোর হাহাকার ধ্বনি ; উঠিল কাঁপিয়া
শৈলজার বক্ষ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ।
সে ভীষণ হাহাকার হইতেছে ক্রমে
অধিক অধিকতর, ধীরে দূরায়াত
মহা ঝটিকার মত। হইল অধীর
শৈলজার প্রাণ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ !
"যদুনাথ !—জগন্নাথ !—বিপদভঞ্জন !
কর রক্ষা যদুকুল !" ঊর্ধ্বশ্বাসে আসি
দারুক চরণতলে হইয়া পতিত
কহিল কাতর কণ্ঠে, "উন্মত্ত সুরায়
সাত্যকি ও কৃতবর্মা নিন্দি পরস্পরে,
সাত্যকির খড়্গাঘাতে হইয়াছে হত
কৃতবর্মা। জ্বলিয়াছে হায় ! ঘোরতর
অন্তর বিগ্রহানল। উন্মত্ত সুরায়
যদুকুল সে অনলে মরিছে পুড়িয়া
আঘাতিয়া পরস্পরে,—রক্ষ যদুকুল !"

অকস্মাৎ ভূমণ্ডল উঠিল কাঁপিয়া,
দুলিল ফণায় স্থিত ক্ষুদ্র মণিমত
ভুজঙ্গের। মুহূর্তেক উঠিল ভাসিয়া
বিহঙ্গের কলরব, ভীত, নিদ্রোত্থিত ;
দূরস্থিত যাদবের মহা হাহাকার
হইল ভীষণতর ; মুহূর্তেক পরে
হ'ল নিমজ্জিত মহাজলধি গর্জনে।

করিয়া ভীষণতর সে ভীম নির্ঘোষ
উঠিল ঘর্ঘরধ্বনি গর্ভে বসুধার !
সংখ্যাতীত রথে যেন মত্ত দৈত্যগণ
মহারবে ;—হইতেছে ভীম বেগে যেন
রথে রথে অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম সংঘর্ষণ !
বিদীর্ণ করিয়া ধরা, রৈবতক গিরি,
দুর্বাসা-আশ্রম-শৃঙ্গ, শত বজ্রনাদে
হইল বিক্ষিপ্ত কিবা ভীম বহ্নিরাশি !
কিবা দর্পে, কিবা বেগে ছাইল গগন !
নভঃস্থল, ভূমণ্ডল, উঠিল জ্বলিয়া
নীল রক্ত বৈশ্বানরে ;—কি ক্রীড়া ভীষণ,
আস্ফালন অনলের, ঘোর বিলোড়ন !
ঘন ঘন ভূকম্পন, ঘর্ঘর গর্জন !
নিবিল সে বহ্নিরাশি। ধূম বিভীষণ
নিবিড় মেঘ-তরঙ্গে ছাইল গগন,
আবরিল পূর্ণশশী, করি নিমজ্জিত
অমাবস্যা-অন্ধকারে বিশ্ব চরাচর।
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, বৃষ্টি সাগরের
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ মৎস্য নানাবিধ,—
যেন মহা তিমিঙ্গিল গিরি রৈবতক
প্রসারি ভীষণ মুখ করিতেছে বেগে
উৎক্ষেপিত বহ্নিরাশি ! গিরি-অঙ্গ বাহি
পড়িছে গৈরিক ধারা অগ্নিধারা মত
মহাস্রোতে স্থানে স্থানে ; পড়িতেছে বেগে
প্রজ্জ্বলিত ধাতু পিণ্ড, উল্কারাশি মত,
অস্ত্র-ভেত্ত অন্ধকারে, ভস্ম-বরিষণে।
যাদব শিবির শ্রেণী মহা অন্ধকারে
উঠিল জ্বলিয়া মহা দাবানল মত
অকস্মাৎ ;—ছুটিলেন বেগে নারায়ণ,
দারুক শৈলজা সহ, ঘোর ভূকম্পনে
সাবধানে দৃঢ় পদে, লইয়া উভয়ে,
অর্ধ মূর্ছাগত, ভুজ-বন্ধনে হেলায়
অতিক্রমি সে ভীষণ বৃষ্টি, অন্ধকার।
দেখিলেন নারায়ণ, দাবানল মাঝে
পতঙ্গপালের মত মরিছে পুড়িয়া
যদুকুল, আঘাতিয়া হায় ! পরস্পরে,
দূরাগত গুপ্ত অস্ত্রে হইয়া আহত।
দেখিলেন যদুকুল উন্মত্ত সুরায়,
নাহি জ্ঞান আত্ম-দ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব,
গুপ্ত শত্রু-আক্রমণ। কি দৃশ্য ভীষণ !—

জলিছে শিবির-শ্রেণী ব্যাপিয়া যোজন !
যাদবের অস্ত্র-ক্রীড়া, অসি-বিঘূর্ণন,
রজত বিদ্যুতনিভ—ঝলসি নয়ন !
সেই ঘাত, প্রতিঘাত ! সেই রক্তপাত !
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র মত !
ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মত অস্ত্র বরিষণ
গুপ্ত-শত্রু-করোৎসৃষ্ট ! ঘোর অন্ধকার !
ঘন ঘন ভূকম্পন ! ঘোর গরজন,
উল্লম্ফন, জলধির ! ভীষণ নির্ঘোষ
বসুধার মহাগর্ভে ! শৃঙ্গে পর্বতের
ভীমারাবে ভস্ম, ধাতু, অগ্নি বরিষণ !
যাদবের হাহাকার ভৌতিক নির্ঘোষে
নিমজ্জিত ; যাদবের ভীষণ সে রণ
কাষ্ঠ পুতুলের ক্রীড়া-অভিনয় মত
হইতেছে প্রকটিত অগ্নির আলোকে।
আছিল উৎসবে, নাহি অস্ত্র সকলের,
তীরজাত এরকায়, মুষলে মুষলে,
প্রহারিছে পরস্পরে, হইতেছে হত
নাহি জ্ঞান গুপ্ত শরে, নহে এরকায়।
স্থিরনেত্রে নারায়ণ রহিলা চাহিয়া
সে ভীষণ মহাদৃশ্য ! ক্রমে ক্রমে হত
হইল যাদবকুল, স্নেহের আধার
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু। রথী মহারথী
ভারতের অদ্বিতীয় হইল নিহত
তস্করের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার,—
রৈবতক শৃঙ্গমালা পড়িল ভাঙ্গিয়া
একে একে যথা এই মহা ভূকম্পনে।
নিবে যথা প্রলয়াগ্নি ভীম পরাক্রমে
নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি
আত্মঘাতী যদুকুল। ধীরে ধীরে মহা
শ্মশান-অনল মত শিবির-অনল
নিবিল ; নিবিল সেই বিপ্লব ভীষণ।
নিবিল সে গিরিশৃঙ্গ, গৈরিক প্রবাহ,
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি, মহা ভূকম্পন
মহাকম্প জলধির। মাতা বসুন্ধরা
নাচিয়া তাণ্ডব নৃত্যে হাসিয়া ভীষণ
অনল গৈরিক স্রাবে মহা অট্ট হাসি,
গর্জিয়া ভীষণ মন্ত্রে, নৃমুণ্ডমালিনী
মহাকালী, যদুকুল-শোণিতে ভূষিতা,
হইলেন শান্ত ধীরে। ধীরে ভয়ঙ্করী
প্রভাসের মহানিশি হইল প্রভাত।
বীভৎস স্বপন অন্তে প্রকৃতি যেমতি
খুলিলেন ভীত আঁখি, প্রথম আলোকে
প্রভাসের চারিদিকে উঠিল ভাসিয়া
চিন্তাতীত প্রকৃতির চিত্র ভয়ঙ্কর !
চারিদিকে ভস্ম স্তরে রয়েছে পড়িয়া
কত জলজীব-শব, ধাতুপিণ্ড কত,
মহা শৈল খণ্ড সহ নানা অবয়বে।
ভীমাকৃতি শৈলশৃঙ্গ অমিত বিক্রমে
উৎপাটিত, উৎক্ষেপিত, হইয়া তাড়িত
শুষ্ক পত্র রাশি মত ক্রোশ ক্রোশান্তরে,
স্থানে স্থানে জলে স্থলে রয়েছে প্রোথিত
ক্ষুদ্র খণ্ড-গিরিমত গর্ভে বসুধার।
সুদূরস্থ রৈবতক পর্বতমালায়
কি অচিন্ত্য মহাশক্তি কি অচিন্ত্য ক্রীড়া
করিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে ! মৃৎপিণ্ডে যথা
অর্থহীন লক্ষ্যহীন ক্রীড়া বালকের।
কোথায় গগনস্পর্শী শৃঙ্গ মেঘ-প্রভা
হইয়াছে অন্তর্হিত মহামেঘ মত ;
কোথায় বা নব শৃঙ্গ উঠিয়া আকাশে
শোভিছে দিগন্তব্যাপী মহামেঘ মত
প্রসারিয়া শৈল বপু ; গৈরিকের ধারা,
কোথা জলধারা, কোথা প্রপাতের মত,
শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে ; কোথায় গহ্বর
হইয়াছে গিরি ; গিরি হয়েছে গহ্বর।
সম্মুখে যে দৃশ্য—হায় ! মানব-নয়ন
না পারে দেখিতে ; দৃশ্য না পারে সহিতে
মানব-হৃদয় হায় ! ছিল যেইখানে
ক্রোশব্যাপী যাদবের উৎসব শিবির,
বর্ষিত ভস্মের স্তরে, ভস্মে শিবিরের
রহিয়াছে ক্রোশব্যাপী যাদব-শ্মশান !
বর্ষিত ভস্মের স্তরে, ভস্মে শিবিরের
প্রধূমিত স্থানে স্থানে,—রহেছে পড়িয়া
বিকৃত যাদব-শব, দগ্ধ, অস্ত্রাহত।
কেশবের পুত্র, পৌত্র, রক্ত, মাংস, প্রাণ,
ধাতু শৈলখণ্ড সহ, কোথায় বা পড়ি
ধাতু শৈলখণ্ডতলে, অনন্ত শয়নে।
প্রভাস উৎসবক্ষেত্র শবক্ষেত্র এবে
যাদবের, প্রভাসের মহা পারাবার
এবে হায় ! যাদবের শোক-পারাবার !

"এই কি করিলে হরি!"—কাঁদিয়া দারুক
কহিল চরণে পড়ি। শান্ত কণ্ঠে হরি
উত্তরিলা, শান্ত নেত্রে চাহি অবিচল
প্রভাত আকাশ, স্থির—"দারুক! দারুক।
যাদবের কুরুক্ষেত্র। হয়েছে সাধিত
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ;
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
যুগ শেষ!—লীলা শেষ"—
উঠিল কাঁদিয়া
ধরাতল। "লীলা শেষ"—উঠিল গর্জিয়া
মহাসিন্ধু। "লীলা শেষ"—হইল অঙ্কিত
সুনীল আকাশপটে অরুণ আভায়
সুশীতল সমুজ্জল। লভিয়া উদ্ধার
"লীলা শেষ" মহাকণ্ঠে গাহিল মানব।
"লীলা শেষ"—দুষ্কৃতের ভীষণ শ্মশান
মহাকণ্ঠে কুরুক্ষেত্রে, গাহিল প্রভাস।
"লীলা শেষ" —পাদপদ্মে হইয়া মূর্ছিত
পড়িল দারুক শোকে। "লীলা শেষ"—শৈল
পড়িতে মূর্ছিতা পদে লইলেন হরি
আপন ত্রিদিব বক্ষে,—পূর্ণ শৈলজার
তপস্যা, জীবনব্রত কোমল কঠোর।

অষ্টম সর্গ

মহাপ্রস্থান

ভারতের মহানিশা, মহাদিবা জগতের
হইল প্রভাত ধীরে; হইল প্রহর;
দ্বিতীয় প্রহর ধীরে; নাহি দিবাকর।—
ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত নভঃস্থল,
অদৃশ্য মধ্যাহ্ন-রবি, অদৃশ্য অম্বর।
ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত পারাবার
গর্জিতেছে প্রভাসের ঘোরাল ধূম্রল;
আবরিত বেলা ভূমি ধূম্র ভস্ম আবরণে,
আবরিত চরাচর—নিস্তব্ধ নিশ্চল।
শিলাখণ্ডে, ধাতুখণ্ডে,—ভূগর্ভজ, সমুদ্রজ,—
নানা জীবে, দ্রব্যে নানা, সমাচ্ছন্ন তীর
ভস্মাবৃত, সমাচ্ছন্ন প্রান্ত জলধির।
রহিয়া রহিয়া ধরা কাঁপিতেছে মৃদু, গুরু,
প্রকম্পন অবিরল, অথবা বিরল;
যেন ক্রীড়াশীল শিশু দোলাইছে ক্রীড়া-দোলা,
কভু ঘন, বহুক্ষণ কখন নিশ্চল।
মহাশক্তি ধূম্রাবতী গরজি জলধি-মন্দ্রে,
রহিয়া রহিয়া নৃত্য করিতেছে ভীমা,
ধ্বংস করি দিবাকর, ধ্বংস করি চরাচর,
ক্ষুদ্র বেলাখণ্ডে যেন করিয়াছে সীমা।
কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
ঘটিবে যুগান্তকারী বক্ষে বসুধার।
মানবের ইতিহাসে, মানবের মহাকাব্যে,
এক মহাসর্গে হবে সমাপ্তি প্রচার!
কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
আসন্ন, চাপিয়া বক্ষে নারী ধূমাবতী
পড়ে আছে দীর্ঘাকার, একটি উপলখণ্ডে,
পাষাণে পড়িয়া যেন পাষাণ-মূরতি।
তার ক্ষুদ্র ইতিহাসে, জীবনের ক্ষুদ্র কাব্যে,
আসন্ন, সমাপ্তি; আজি হৃদয় তাহার
ধূম্রল ঘোরাল ওই মহাপারাবার।
কি তরঙ্গ, কি উচ্ছ্বাস! হাহাকার, কি নিশ্বাস!
কি মন্থন, বিলোড়ন! ফাটিতেছে বুক!
শিলায় চাপিয়া বুক বামা অধোমুখ।
দুই ধারা নয়নের হইয়া শতেক ধারা
পড়িছে পাষাণ বাহি ভস্ম বালুকায়,
নীরবে রমণীপ্রাণ কাঁদে উভরায়।
সে নীরব হাহাকারে, হৃদয়ের আর্দ্র তাপে
পড়িছে গলিয়া যেন কঠিন পাষাণ,—
কি শীতল শিলা, কিবা করুণানিদান!
আলিঙ্গিয়া শিলাখণ্ড রমণী চাপিছে বুক,
কোমল কপোল বামা, দারুণ ব্যথায়।
আবরিয়া শিলাখণ্ড শত গুচ্ছে কেশরাশি
পড়ি ভিজিতেছে, সেই ভস্ম বালুকায়।
নাগ-সেনাপতি বেশে এখানে সজ্জিতা বামা,
পৃষ্ঠে তূণ, কটিবন্ধ, কটিবন্ধে অসি;
"কারু!"—কে ডাকিল মৃদু, ধীরে শিলা-পার্শ্বে
আসি, কারুর উত্তপ্ত প্রাণে অমৃত বরষি?
"দাদা! দাদা!"—বলি কারু, উঠি উন্মাদিনী মত
পড়িল গলায় স্নেহ-বক্ষে বাসুকির।
উচ্ছ্বাসে ছুটিল বেগে চারি নেত্রে নীর।
"দাদা! দাদা! কহ দাদা! বড়ই আকুল প্রাণ,
পেয়েছ কি তুমি দাদা! তাঁর দরশন?
খুঁজিয়াছি সারাদিন, খুঁজিয়াছি বেলা-ভূমি;
উন্মাদিনী নিশা অন্তে দিবা উন্মাদিনী!—
খুঁজিয়াছি জল স্থলে উন্মাদিনী আমি।
যাইতে ছুটিয়া বেগে পড়িয়াছি ভস্মস্তরে,
পড়িয়াছি শিলাখণ্ডে হায়! কত বার,
ক্ষত দেহ, পাই নাই দরশন তাঁর।
পেয়েছ কি তুমি দাদা?"
"পেয়েছি।"—নিশ্বাস ছাড়ি
বাসুকি ভগিনী সহ বসিল শিলায়।
"পেয়েছ! কোথায় তিনি? কেমন আছেন কহ?
আছেন ত নিরাপদে?"—
"বিপদ তাঁহায়
পারে কি ছুঁইতে?" ঘোর মহাসিন্ধু পানে
দুজনে রহিল চাহি উচ্ছ্বসিত প্রাণে।

বাসুকি

পেয়েছি দর্শন কারু!—বহু অন্বেষণ পরে
রজতের মহামূর্তি দূর সিন্ধুতীরে
দেখি উপলাসনে, উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ,
কি মহিমা মহাবক্ষে, সমুন্নত শিরে!

অঙ্গ অবিচল, স্থির, নিমীলিত দুনয়ন,
কিবা সুপ্ত সিংহ-শোভা, নিদ্রিত গৌরব !
শৌর্যের ও সৌন্দর্যের মূরতি নীরব !
ধবল গিরির শৃঙ্গে মহামেঘ-ছায়া মত
পড়িয়াছে শোকছায়া বদনে গম্ভীর,
কপোলে গভীরাঙ্কিত শুষ্ক অশ্রুনীর।
শৈলখণ্ড-অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছি
এই দিবা-অন্ধকারে সে রূপ মহান,
হইলেন নারায়ণ ধীরে অধিষ্ঠান।
হিমাদ্রির পাদমূল বিলোড়িত ঝটিকায়,—
সানুদেশে চিরশান্তি অবিচল স্থির;
ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্মূলিত যদুকুল, -
যদুনাথ শান্ত স্থির, মূরতি গম্ভীর,
মহাশোকে নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুনীর।
'আর্য !—দেব !' নারায়ণ ডাকিলেন স্থিরকণ্ঠে,
কি যেন সঙ্গীত আহা! শুনিলাম কাণে;
সেই নিশা ভয়ঙ্করী, এই ভয়ঙ্কর দিবা,—
কি শান্তি-আলোক-সুধা প্রবেশিল প্রাণে !
বলদেব মেলি নেত্র, কহিলেন—'হায়! হরি!
এই কি করিলে ভাই! জগতে অতুল
যদুকুল, হরিকুল, করিলে নির্মূল!'
স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ, উত্তরিলা—'হরিকুল
হয়নি নির্মূল, নাহি হইবে কখন,
যুগে যুগে হবে তার নিয়তি নূতন!
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, যুগে যুগে আবির্ভূত
হবে তুমি, হব আমি, হইবে এমন
নব কুরুক্ষেত্রে, নব প্রভাস ভীষণ!'
এরূপে দুষ্কৃত ধ্বংস যুগে যুগে অঙ্কে অঙ্কে
হবে বসুধার; হবে সুকৃত উদ্ধার,
নব যমুনার কূলে, নব ধর্ম-বৃক্ষ-মূলে,
নব বৃন্দাবনে, শুনি নব গীত আর।'
কহিলা রোহিণীসুত—'হরি! এই লীলা তব
না পারি বুঝিতে; প্রাণ আকুল আমার।
পুত্র-শোকে, পৌত্র-শোকে, ভ্রাতৃ-শোকে,
বন্ধু-শোকে বিদীর্ণ হৃদয় মম; করিলে সংহার
যদুকুল, এক জন নাহি বুঝি আর!
কিবা দিবা,—কি উৎসব! কিবা নিশি কি বিপ্লব!
যাদবের বসুধার, হায় কি ভীষণ
অন্তর-বিগ্রহ! ঘোর আত্ম-বিনাশন।
কি আনন্দে নিরানন্দ! কি সুখে কি মহাশোকে!
কি মঙ্গলে অমঙ্গল, অমৃতে গরল!
হইল কি রঙ্গালয় কি শ্মশানে পরিণত!
অলিল নিকুঞ্জবনে কিবা দাবানল!
পুত্র গেল, পৌত্র গেল, ভ্রাতা গেল, বন্ধু গেল,
গেল হরিকুল, হরি! একি লীলা হায়!
ফুল গেল, ফল গেল, পত্র গেল, শাখা গেল,
ক্ষত দগ্ধ বৃক্ষ কেন রাখিলে আমায়?
'রাখিয়াছি'—উত্তরিলা স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ—
রাখিয়াছি, তব লীলা হয় নাই শেষ
ভারতে তোমার মাত্র লীলার উন্মেষ।
এ বৈরাগ্য, এই বল, এ সারল্য, এ গরল,
এ প্রেম-সাগর, এই বাড়ব আধার,
বৃন্দাবনে, মথুরায়, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকায়,
করিয়াছি ক্ষুদ্র ক্রীড়া; মহাক্রীড়া তার
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, হইবে প্রচার।
ভারত জগৎ নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা। অন্ত পারে তার
আছে মহারাজ্যচয় অনন্ত বিস্তার
আছে বহু পারাবার, আছে বহু হিমাচল,
আছে বহু নদনদী কানন কান্তার;
আছে বহু নর জাতি, নানা বর্ণ, নানা বেশ,
মুষ্টিমেয় এই নর তুলনায় তার।
মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী।
পৃথিবীর মহাদেহ, মহাদেহ মানবের,
এরূপে রেখেছে ঢাকি ধূম্র ভস্মরাশি।
জ্ঞানের আলোক নাই; শিল্পের সৌন্দর্য নাই;
নাহি বাণিজ্যের সুখ; ধর্মের সান্ত্বনা;
পৃথিবীর দেহ বন, মানবের দেহ জড়,—
অহল্যা পাষাণ নহে কবির কল্পনা।
ভারত ভূতলে স্বর্গ, দেবতা ভারতবাসী
তুলনায়, পৃথিবীর ভারত হৃদয়,
মানবের মহাশির, জ্ঞানের আলয়।
যেই শক্তি এ হৃদয়ে, যেই ধর্ম শিরে,
হইল স্থাপিত, সুখে করিয়া গ্রহণ
সেই শক্তি-বৈজয়ন্তী, সেই পুণ্য ধর্মালোক
যাও দেশ দেশান্তরে, পতিতপাবন!
সৌরাষ্ট্রের উপকূলে সজ্জিত অর্ণবযান
আছে বহু দাঁড়াইয়া তব প্রতীক্ষায়;
যাদবের পুণ্যভাগ, আছে সুসজ্জিত তীরে,

কর দেব! মহাযাত্রা, উদ্ধার ধরায়!
এ ভারতে আমাদের এই যুগ-কার্যে শেষ;
সপ্ত দিবানিশি পরে হবে অন্তর্হিত
দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে জল-বিম্ব মত।
কর দেব! মহাযাত্রা! পাষাণী অহল্যা মত,
তব পদ পরশনে লভিবে উদ্ধার
পৃথিবী, মানব জাতি; মরু হবে জনপদ;
হবে বন মহারাজ্য সম অমরার।
পশু সম নরনারী হবে দেবী দেবোপম,
যাবে শোক, পাবে পুত্র কন্যা সংখ্যাতীত:
জগতের ইতিহাসে, পুষ্প পত্রে জগতের,
হবে হরিকুল, হরিকুলেশ পূজিত।
যাও দেব! সিন্ধুগর্ভে নৃত্যশীল তরীমালা
অনন্ত কেতন করে ডাকিছে তোমায়;
করিতেছে আবাহন নৃত্যশীল পারাবার
পূরবে, পশ্চিমে, নর উদ্ধার আশায়
কর দেব! মহাযাত্রা! উদ্ধার ধরায়!'
নারায়ণ নয়নেতে বহিতেছে দুই ধারা,
প্রেম-বিগলিত ধারা বক্ষে করুণার,
আত্মহারা বলরাম পড়িলা গলায়, বক্ষে
আলিঙ্গিলা নীলাম্বর আলোক দিবার।
'দীনবন্ধো! দয়াময়! পতিতপাবন!"—
হলধর উচ্চ রবে কহিলা কাঁদিয়া—
"চলিলাম নারায়ণ! বরষিয়া তব প্রেম
মানব মরুতে নাম গাহিয়া গাহিয়া
মানবের মহাবনে, অধর্মের অন্ধকারে,
পতিত মানব জাতি করিব উদ্ধার,
কৃষ্ণনাম! হরিনাম! করিব প্রচার।
ওই—'হরে কৃষ্ণ! হরে!'—গাহিতেছে পারাবার
'হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ!'—গায় তীরে তীরে
অনন্ত অজ্ঞাত দেশ, অনন্ত অজ্ঞাত নর,
অনন্ত অজ্ঞাত-কণ্ঠে ভাসি অশ্রুনীরে।
গাহিতেছে ভবিষ্যত—'হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ!'
গাহিতেছে মহাকাল—'হরে কৃষ্ণ! হরে!'
গাহিতেছে মহাবিশ্ব, মহাগ্রহ উপগ্রহ,
অনন্ত প্লাবিয়া প্রেমে—'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে!'
"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে! হরে!"—গর্জিয়া নাচিয়া রাম
চলিলেন প্রেমানন্দে ছাড়ি বনমালী,
দুই বাহু উর্ধ্বে তুলি দিয়া করতালি।
আমাদের অন্বেষণে ভ্রমিতেছে নাগ-সৈন্য
"জয় নাগরাজ!"—বলি করি উত্তোলন
শত অসি; আক্রমিল শুনিয়া গর্জন।
"তিষ্ঠ!"—বলি নারায়ণ প্রসারি দক্ষিণ কর
রহিলেন স্থিরনেত্রে চাহি সৈন্য পানে,
চিত্রাঙ্কিত মহামূর্তি যেন মহাধ্যানে।
কাক! বনচিত্র মত দাঁড়াইল নাগসৈন্য,
উত্তোলিত শত অসি হইল অচল!
কহিলেন নারায়ণ—"বাসুকির কার্য শেষ।
বৎসগণ! তোমাদের নব কার্যস্থল
সিন্ধুর অপর পারে সুন্দর শীতল।
শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তাঁর অনুসার,
গাহি আর্য অনার্যের গীত সম্মিলন।"
দেখিলাম নাগ সৈন্য, সজ্জিত প্রাচীর মত,
নারায়ণ-পাদপদ্মে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
উঠিয়া, জলধি মন্দ্রে গাহি—"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"
অনুসারি হলায়ুধ চলিল ছুটিয়া।
কি মূর্তি মহিমাময় চাহি আকাশের পানে
কপোলে যুগল ধারা, করুণা শীতল!
মূর্তি নর-নারায়ণ!—চাহিনু পড়িতে পদে
ছুটিয়া, চরণ হায়! হইল অচল।
হায় মহাপাপী আমি! ঘুরিয়া মস্তক মম
কি মাদকে দেহ মম হইল পূরিত,
পড়িলাম ধরাতলে হইয়া মূর্ছিত।

উচ্ছ্বসিত নাগপতি ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
অন্যমনে অধোমুখে মূরতি গম্ভীর।
চাহি সিন্ধু পানে কাক দুই নেত্র স্থির।

বাসুকি

মূর্ছা অন্তে হায়! আর সেই মূর্তি মহিমার
নাহি দেখিলাম, হায়! দেখিব কি আর?
দেখিবে কি পুণ্যালোক পাপ অন্ধকার?
দেখিব কি?—দেখিতেছি। দেখিতেছি নিরন্তর
এই ঘোর অন্ধকারে স্নিগ্ধ নীলোজ্জ্বল
সেই রূপ মনোহর, চন্দ্রদীপ্ত নীলাম্বর,
সেই প্রেমময় রূপ পবিত্র শীতল।
ভীত বীর ধনঞ্জয় শুনিয়াছি এই রূপে
দেখেছিল মহাবিশ্ব; করুণা-নিলয়
আমি দেখিতেছি রূপ আজি বিশ্বময়!

ওই দেখ সেই রূপ! চল কারু! চল যাই,
পড়ি গিয়া দুই চরণে তাঁহার!
যাইছে বাসুকি ছুটি, কহিল ধরিয়া কারু
স্থিরকণ্ঠে—"দাদা! ভ্রান্তি কর পরিহার!
আমাদের আজীবন-আশা আজি পরিপূর্ণ!
যেই আশা-বৃক্ষ-মূলে সেচিলাম জল
আজীবন, ফলিয়াছে আজি তার ফল।
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল, যদুকুল প্রভাসেতে,
করিয়াছে আত্মহত্যা। হইল উদ্ধার
এত দিনে নাগরাজ্য, সাম্রাজ্য তোমার।
পূর্ণ জীবনের ব্রত! পরিপূর্ণ মনোরথ
চল যাই নাগপুরে বসাব তোমায়
সিংহাসনে, পরাইব মুকুট মাথায়।
জীবনের আশা-স্বপ্ন করি চরিতার্থ সুখে,
ভারতে অনার্য রাজ্য করিব প্রচার!
পাবে কারু এত দিনে সীমা আকাঙ্ক্ষার।"
"কালি এ প্রভাস-ক্ষেত্রে অনার্যের যেই রাজ্য
হয়েছে স্থাপিত"—কহে বাসুকি বিহ্বল—
"তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধরাতল।
আমরা বনের পশু, কোথা পাব হেন রাজ্য?
কোথা পাব সেই জ্ঞান, সে প্রেম অতুল?
কারু রে! এখন তোর গেল না কি ভুল?
রাতুল চরণদ্বয়, যে রাজ্য মহিমাময়,
চল যাই সেই রাজ্য করি অধিকার!
এমন সন্তাপ-হর রাজ্য এই ধরাতলে
আমরা পতিত নাহি পাইব রে আর!"
কাঁদিতেছে নাগরাজ! অন্তর-রোদন কারু
নিবারি পাষাণী মত কহিল আবার—
"ভুলিলে কি দাদা! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার।"

বাসুকি

শত্রু কৃষ্ণ!—না না, কারু! হায়! এ জীবনে আমি
ভাবি নাহি শত্রু কৃষ্ণ,—ভাবিব কেমনে?
পিতার রক্ষিত শিশু, আমার কৈশোর বন্ধু,
রণে বনে, মিশিয়াছি জীবনে জীবনে।
আকৈশোর তাহার সে দেব-রূপ—
পীতাম্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ শিরে।
শুনিয়াছি দেবকণ্ঠ, নর-করুণার গীত,
বনের পাষাণ আমি ভাসি অশ্রুনীরে।
করিয়াছি আলিঙ্গন দেব-দেহ লীলাময়,—
কি অমৃতে প্রাণ মম হইত শীতল!
বৃন্দাবনে, নাগপুরে, যমুনায় সিন্ধুবক্ষে,
করিয়াছি কত ক্রীড়া আনন্দে বিহ্বল!
রাখি মুখ অঙ্কে মম ঘুমাইত শিশু মত,
আমি জননীর মত দেখিতাম মুখ,
কভু গলা জড়াইয়া অংসে মম রাখি মুখ,
সখা প্রেমে পরিপূর্ণ করিত এ বুক।
কখন-নীলাব্জ-নেত্রে চাহিয়া অনন্ত পানে
দেখিত, কহিত ধর্ম-সাম্রাজ্য স্বপন;
যাহার ছায়ায় আর্য অনার্যের এই স্বর্গ,
কালি করিলাম স্বর্গ প্রভাসে দর্শন।
বসিয়া চরণতলে, লয়ে বক্ষে পা দুখানি,
পাইতাম কি যে শান্তি, কি নির্মল সুখ!
নর নারী প্রেম নহে মধুর শীতল তত,
যেই প্রেমে কভু মম উছলিত বুক!
অনার্যের রাজ্য-আশা, সুভদ্রার দেবীরূপ,
কি কুক্ষণে এ হৃদয় হইল সঞ্চার!
জ্বালাইল অভিমান, সে অনলে ঘৃতাহুতি
দিল পাপী ঋষি, স্বর্গ হরিল আমার।
জ্বলি এই অভিমানে দেখি নাই সেই রূপ
এত কাল, যাই নাই নিকটে তাহার!
জানিতাম, দেখি যদি সেই দেব অংশুমালী,
অভিমান কুজ্ঝটিকা রবে না আমার!
দেখিলাম দ্বৈপায়ন আশ্রমে সে দেবরূপ,
দেখিলাম কালি আর্য অনার্য উৎসবে,
দেখিলাম আজি আর্য অনার্যের মহাযাত্রা,
দেব-নেত্রে প্রেম-অশ্রু বহিতে নীরবে।
চাহিলাম পা দুখানি আবার লইতে বুকে,
পাপী আমি চলিল না চরণ আমার!
শত্রু মম দুরাচার সেই জরৎকারু ঋষি,
করিয়াছে কলুষিত পাপ পারাবার
আমাদের এ জীবন।—কি ভীষণ গত নিশি!
অন্ধকার, অগ্নি বৃষ্টি, ঘন ভূকম্পন!
কি ভীষণ আত্মহত্যা! নর-হত্যা নিরমম
গুপ্ত শরে! মহাপাপ,—সে ত নহে রণ।
পাপিষ্ঠের কি কৌশল! ভূগর্ভস্থ অগ্নিশিখা,
মূর্খ আমি, ভেবেছিনু তার যোগানল!
বুঝি সেই রুদ্র ছল, ছল নাম জরৎকারু,
সন্ধি, পরিণয়, হায়! সকলই ছল!

কারু

সকলই ছল দাদা! দুর্বাসা তাহার নাম।
ছলনা সে রুদ্র মূর্তি। হইয়া শিক্ষিত
শুনিয়াছি শিষ্য এক সাজি সেই রুদ্র বেশে,
অন্তরালে দুরাচার ছিল লুকায়িত!
খুলি নাই এত দিন এই প্রবঞ্চনা আমি,
খুলিলে এ ষড়যন্ত্র রহিত না আর,
হইত না অনার্যের সাম্রাজ্য উদ্ধার।

"দুর্বাসা! দুর্বাসা ঋষি!"—বাসুকি গর্জিল ক্রোধে
"অভিশাপ-ব্যবসায়ী সেই দুরাচার!
ঋষিকুলে ধূমকেতু! ছলিল বনের পশু
এইরূপে!—প্রতিশোধ লইব তাহার।
নারায়ণ!—প্রায়শ্চিত্ত চরণে তোমার!"
ক্রুদ্ধ শার্দূলের মত ছুটিল বাসুকি ক্রোধে,
মুহূর্তেকে লুকাইল দিবা-অন্ধকারে।
রাখিয়া শিলায় বুক, রাখিয়া শিলায় মুখ,
ভাসিতে লাগিল কারু নয়ন-আসারে।

নবম সর্গ

বীণা পূর্ণতান

এইরূপে কিছুক্ষণ,—কে বলিবে কতক্ষণ ?
এক ক্ষণে কত শোক কারুর হৃদয়ে !
এক ক্ষণে কত অশ্রু দুনয়নে বয় !
রাখিয়া পাষাণে বুক, রাখিয়া পাষাণে মুখ,
কারু ও পাষাণে প্রাণ করেছে অর্পণ ।
গলিল না এ পাষাণ, কারুর নয়ন-জলে,
গলিল না সে পাষাণ একটি জীবন ।
উঠি কিছুক্ষণ পরে, চাহি ধূমাবৃত ধরা,
কহিতে লাগিল কারু—"হায় ! মা তোমার
বিদীর্ণ হইয়া বুক গত নিশি যেই রূপে
ছুটিল গৈরিক ধূম্র ভস্ম অনিবার,
অনিবার সেই রূপে, নহে এক নিশি, মাতঃ !
একটি রমণী জন্ম, বিদীর্ণ হৃদয়
প্রেমের গৈরিক ধারা, অভিমান ধূম্ররাশি,
ঢালিয়াছে নিরাশার ভস্ম অগ্নিময় ।
এই বরিষণ পরে আজি মা ! তোমার মত
ধূম্র ভস্মে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার ;
কাঁপিছে তোমার মত হায় ! বারম্বার !
কেন এ কম্পন ঘন, হা হত হৃদয় মম ?"
—চাপি দুই করে বামা বক্ষ আপনার—
"ওই সিন্ধুচ্ছ্বাস সম, কি উচ্ছ্বাস হৃদয়েতে
অজ্ঞাত ? অজ্ঞাত হায় ! এ কি হাহাকার ?
কৌশলে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছে আত্মঘাতী,
ভারতে অনার্য রাজ্য হয়েছে স্থাপিত,
এই আনন্দের দিনে, কেন নিরানন্দ মনে ?
কেন প্রাণ এইরূপে হতেছে কম্পিত ?
কি যেন বিষাদ ঘোর, এই দিবসের মত,
করেছে হৃদয় মম ঘোর অন্ধকার,
কি যেন ঘটিবে আজি মহাশোক ঘোরতর,
করি বজ্রাহত ক্ষুদ্র হৃদয় আমার ।
মরুতপ্ত হাহাকার কি যেন কহিছে কাণে—
"দেখ্ ঘোরতর দিবা ! সিন্ধু ঘোরতর !
দেখ্ কিবা ঘোরতর রমণী-অন্তর !
ঘোরতরে ঘোরতর মিলাইয়া, মিশাইয়া—
জীবনের ঘোর গীত ঘোরতর তানে,
দে রে ঝাঁপ !—নাহি শক্তি রমণীর প্রাণে ?"
আছে শক্তি—দিব ঝাঁপ । কুশলে আছেন তিনি
শুনিলাম,—মনে আর নাহি মনস্তাপ ।
একবার নিরখিব আমার সর্বস্ব ধন,—
এত নহে নারী-জন্ম—ঘোর অভিশাপ !
শুনিয়াছি আজীবন, শুনিলাম ভ্রাতৃমুখে,—
তুমি নারায়ণ, তুমি পতিতপাবন ।
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি—তুমি মম জীবন মরণ !
তুমি নয়নের আভা,—তুমি রসনার সুধা
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কোমল !
তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল !
ধরার সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ, ধরার আলোক শ্রেষ্ঠ,
সুধা শ্রেষ্ঠ এ ধরার, পিপাসা যাহার,
সে কেমনে ঘোর দিনে, এই ঘোর সিন্ধু বক্ষে,
বিসর্জিবে এই ঘোর জীবন তাহার ?
নিরখিয়া সে সৌন্দর্য, নিরখিয়া সে আলোক,
নাথ ! সেই রূপ-সুধা নেত্রে করি পান,
জীবন সৌন্দর্যময়, জীবন আলোকময়,
জীবন সে সুধাময় করিবে প্রদান—
সুধাময়ে সুধা—পূর্ণ কর মনস্কাম !"

ছুটিল রমণী বেগে, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত বালা,
দেখিল অদূরে,—নিম্ব নিবিড় ছায়ায়,
আলোকিয়া অন্ধকার ওকি মূর্তি মহিমার !
নিমীলিত নেত্র, যোগ-আসনে শিলায় !
অবলম্বি মহাবৃক্ষ, সমুন্নত মহাবপু,
প্রসন্ন বদন দেহ অচঞ্চল স্থির,
স্থাপিত মূরতি যেন মহা সমাধির ।
যোগিবেশ রাজর্ষির ; নিমজ্জিত মহাধ্যানে ;
পশ্চাতে ধূম্রল ব্যোম শোভে মহাপট ।
পদতলে মহাবেদী শোভে সিন্ধুতট ।
নীরব, নিস্পন্দ, ঘোর, স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর ;
কেবল অনন্ত সিন্ধু মহাস্তুতি গীত

গাহিতেছে মহাকণ্ঠে গাম্ভীর্য-পূরিত।
এক পল অপলক নেত্রে নিরখিল কারু
মহাযোগী মহাদেব! মুহূর্তেক পর
হইল সে মূর্তি, দৃশ্য, কিবা রূপান্তর!
নিরখিল নাগপুর, নাগপুরে সরোবর,
চারু সরোবর-তটে কিশোর সুন্দরী!
সজ্জিত মৃগয়া বেশে, সজ্জিতা যেমতি কারু—
মদনমোহন রূপ প্রাণমুগ্ধকর।
কি সৌন্দর্য! কি মহিমা! কিবা বীর্য! কি গরিমা!
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দেহ, নবীন নিথর।
নবীন নীরদ অঙ্কে প্রতিভা বিদ্যুৎ রঙ্গে।
খেলিতেছে, কি তরঙ্গ-লীলা করুণার!
কিশোরী কারুর প্রাণে কি নবীন সুখ-স্বপ্ন
জাগিল, করিল কিবা অমৃত সঞ্চার!
বাপীতটে, উপবনে, নদীবক্ষে, গৃহকক্ষে,
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হ'ল অভিনীত
সেই স্বপ্ন-নাটকের কত অঙ্ক মনোহর,
অঙ্কে অঙ্কে কি গর্ভাঙ্ক অমৃত পূরিত!
শেষ অঙ্ক—প্রত্যাখ্যান! সেই ঘোর অপমান!
সে প্রতিজ্ঞা! মরুময় একটি জীবন!
মুহূর্তেক দাঁড়াইয়া সমস্ত জীবন কারু
দেখিল, যাপিল কারু হায়! সেইক্ষণ।
প্রত্যাখ্যান!—সে প্রতিজ্ঞা!—গর্জিয়া উঠিল জ্বলি
নির্বাপিতপ্রায় সেই নারী অভিমান।
ছুটিল কারুর শর, হায়! উন্মাদিনী কারু!—
শোকেতে উন্মাদ কবি, করুণানিদান!
ক্ষমিও তাহারে, প্রেমময় ভগবান!
যেই পদ কোকনদ, পূজে ভক্ত প্রেমময়
সুকোমল ভক্তি-পুষ্পে, প্রেম-অশ্রু-জলে,
ভক্তদের মরমের সেই মর্ম স্থলে,
কেমনে পাষাণ প্রাণে—না, না, পারিব না নাথ!
দেখ বুক ভাসিতেছে শোক-অশ্রুনীরে!
পড়িয়াছে সেই শর তোমার ভক্তের বুকে,
পড়িবে ভক্তের বুকে যুগ যুগান্তর,
নিবিবে না এই ব্যথা যুগ যুগান্তরে!
যুগে যুগে প্রাণনাথ! কবির হৃদয় মত
বিদীর্ণ হইয়া শরে ভক্তের হৃদয়,
এরূপে ধারায় শত, বহিবে হৃদয় রক্ত,
ঝরিবে ধারায় শত অশ্রু শোকময়।
এরূপে আমার মত উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে
প্রেমময় শিশু পুত্র, পত্নী প্রেমময়ী,
কাঁদিয়াছে কত কবি, কাঁদিবে কতই আর
যুগে যুগে!—এ গভীর শোক কালজয়ী!
কাঁদিবেক যুগে যুগে কত নর কত নারী,
কবির নয়নজলে অশ্রু মিশাইয়া,
মম পত্নী পুত্র মত আকুল হইয়া!
নিতি নিতি প্রাণনাথ! ভকতের অভিমান,
যুগে যুগে মানবের নিষ্ঠুরতা আর,
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ সুকোমল,
জড় ব্যাধে ক্ষত মৃগশিশু সুকুমার?
যুগে যুগে এইরূপে না হইলে রক্তপাত,
হায়! নাথ! মানবের রক্ত কলুষিত
হবে না কি পবিত্রিত? গলিবে না পাপ শিলা?
হইবে না অধর্মের অগ্নি নির্বাপিত?
হইবে না ধর্মের কি সাম্রাজ্য স্থাপিত?

নারায়ণ মেলি নেত্র—"কারু!"—সুপ্রসন্ন মুখে
ডাকিলেন, সেই স্বর করুণা শীতল।
পশিল কারুর প্রাণে, সে করুণা, সেই সুধা,
নিবিল সে অভিমান, সেই দাবানল।
"পাইয়াছ বহু দুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি!
উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তিধাম!"
কহিলেন প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ভগবান।
"প্রাণনাথ!"—উন্মাদিনী পড়িল কাঁদিয়া বক্ষে,
জগতের সুশীতল সেই শান্তিধাম!
পরিতৃপ্ত প্রেম, কারু পূর্ণ মনস্কাম।
প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা, গগন প্রেমেতে ভরা,
প্রেমামৃতে ভাসিতেছে বিশ্ব চরাচর;
অনন্ত আলোকরাশি, অনন্ত সঙ্গীতে ভাসি,
উঠিতেছে,—কি সৌরভ! কি স্বর্গ সুন্দর!
সেই স্বর্গ মুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া চাহিয়া কারু
করিতে করিতে সেই প্রেমামৃত পান,
মুদিল নয়ন ধীরে,—বীণা পূর্ণতান!

"কারু! কারু! কি করিলি!" - কাঁদি উচ্চে নাগরাজ
দূর হ'তে নিরখিয়া আসিলা ছুটিয়া।
"কারু! কারু! কি করিলি! হায়! কি করিলে
হরি!"
পড়িলা চরণ তলে মূর্ছিত হইয়া।
মুহূর্ত মূর্ছান্ত পরে, বাসুকি উন্মত্ত শোকে,
মুহূর্তেকে সেই শর করি উৎপাটন

হানিল আপন বক্ষে, হানিতেছে পুনর্বার,
কাড়িয়া লইয়া শর বেগে নারায়ণ,
করিলেন মহাসিন্ধু-গর্ভে বিসর্জন।
বিনা মহাপারাবার, সেই মহারক্ত আর
কে করিবে প্রক্ষালন, করিবে ধারণ?
রক্ত নারায়ণ! মহা সিন্ধু নারায়ণ!
হরির চরণ-ক্ষত ভক্তের হৃদয়-ক্ষতে,
বাসুকি সে পাদপদ্ম করিল ধারণ,—
কি মিলন পতিত ও পতিতপাবন!
কি মিলন অঙ্গে অঙ্গে, রক্তে রক্তে কি মিলন!
প্রেমে প্রেমে কি মিলন—ভক্ত ভগবান!
কিবা মহাবিনিময়! কিবা দান প্রতিদান।
এই মহাদান, এই মহা প্রতিদান,
যুগে যুগে মানবের মহা পরিত্রাণ।
এইরূপে রক্তে রক্তে, মাংসে মাংসে এইরূপে,
সিন্ধু-জলে মিশি জল-বিন্দু কলুষিত,
হয় বিন্দু পূর্ণকাম, হয় পবিত্রিত!
অশ্রুধারা দুনয়নে বহিতেছে দরদর
সেই ক্ষত সম্মিলনে; করি বিগলিত
সে অশ্রুতে পাদপদ্ম, পতিতপাবনী গঙ্গা
হইতেছে বাসুকি বক্ষে প্রবাহিত।
বাসুকি অধীর শোকে, বাসুকি অধীর প্রেমে,
প্রেম-শোক-সম্মিলনে অধীর হইয়া,
"হায়! কি করিলে হরি!—ক্ষম মুগ্ধ বালিকায়!"
কাতরে শিশুর মত কহিলা কাঁদিয়া।
কণ্ঠ জড়াইয়া কারু, অংসোপরে রাখি মুখ,
কৌস্তভের মালা যেন বক্ষে সুশোভিত;
বাম করে ধরি ভারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর
নাগরাজ শিরে, প্রেম-অশ্রু-বিগলিত
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে, কহিলেন নারায়ণ,—
"নাগরাজ! বৃথা শোক কর পরিহার!
যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্ব ভাবে মানব করে মম অনুসার।
ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন, চাহিয়াছ শত্রুভাবে,
পাইয়াছ শত্রুভাবে আজি দুইজন;
আমাদের লীলা শেষ, পূর্ণ এই যুগ-ব্রত,—
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপন।"
"হায়! হরি! দুইজন"—বাসুকি কহিলা খেদে—
"কেন হইলাম শত্রু, চরণ কণ্টক?
করিলাম এ জীবন ভীষণ নরক?
মানব যে পাদপদ্ম পূজিয়াছে, পূজিতেছে,
পূজিবে অনন্তকাল, পুষ্পে সুকোমল;
মানব যে হরিনাম, আনন্দে করিয়া গান,
করিয়াছে, করিতেছে, প্রাণ সুশীতল;
আমরা সে পাদপদ্ম পূজি নাহি একদিন,
গাহি নাই একদিন সেই হরিনাম,
আমরা সে পদাম্বুজে করিলাম হায়! নাথ!—
এই দেখ বাসুকির ফাটিতেছে প্রাণ!
আমরা তোমাকে শত্রু কেন ভাবিলাম?"
"ইহাও আমার লীলা!"—কহিলা যোগস্থ হরি।
বাসুকির সর্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি!
কহিলা কাতরে—"হায়! এ কি লীলা হরি!
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন করিলাম সমর্পণ
যৌবন প্রভাতে এই দুইটি জীবন,
নারায়ণ! কেন নাহি করিলে গ্রহণ?
এই বনফুলে স্থান কেন করিলে না দান?
—হায়! অকরুণ হরি!—ক্ষুদ্র দূর্বাদল
পায় স্থান তব পদে,—পতিতপাবন তুমি!—
পাইল না কেন কারু বাসুকি কেবল?
জগত পূজিবে পদ, জগত গাহিছে নাম,
কি স্বর্গ প্রভাসে হায়! কালি দেখিলাম!
কেবল বাসুকি কারু না পূজিল সেই পদ!
না গাহিল সুমধুর সেই হরিনাম!
না পাইল সুধাময় সেই স্বর্গে স্থান!
কারু বাসুকিরে হায়! না করিলে শত্রু তব,
বনের পতঙ্গ নাহি করিলে দাহিত
দাবানলে, ধর্মরাজ্য হত না স্থাপিত?"

"নাগরাজ! শত্রুমিত্র"—কহিলেন নারায়ণ
যোগস্থ ঈষদ হাসি—"কে বল কাহার?
আমি জগতের, এই জগত আমার!
ওই দেখ পারাবার,—কি মহাশক্তি ক্রীড়া!
কি শক্তিতে মহাসিন্ধু দেখ বিধূনিত!
ওই দেখ কি তরঙ্গ! দেখ কি তরঙ্গ-ভঙ্গ!
কি তরঙ্গে তটভূমি আহত কম্পিত!
করি সংঘর্ষণে ফেনপুঞ্জ উদ্গীরিত!
জলরাশি মুহূর্তেক না পারে থাকিতে স্থির
স্রোতবলে,—স্রোত তবে শত্রু কি তাহার?
তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত, তটভূমে প্রতিঘাত,—
ঊর্মির কি শত্রু ঊর্মি, শত্রু কি বেলার?

এই ঘাত প্রতিঘাত আমার শক্তির ক্রীড়া,
এই ঘাত প্রতিঘাতে হয়েছে সৃজিত
পলে পলে বসুন্ধরা; হইতেছে পলে পলে
প্রবাল মুকুতা রাশি সৃজিত বর্ধিত!
এই ঘাত প্রতিঘাত চেতন জগতে আছে,
মানব জগতে আছে এ ক্রীড়া আমার;
এই ঘাত প্রতিঘাত,—প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র!
এ নহে তোমার ক্রীড়া, নহে দুর্বাসার!
মানব মঙ্গল তটে অধর্ম তরঙ্গায়িত—
পতিত ক্ষত্রিয় জাতি—হইয়া প্রহত,
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে হত!
এই ঘাত প্রতিঘাতে মানবের কি অমঙ্গল
দেখিতেছ নাগরাজ হয়েছে সাধিত,
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত!
দুর্বাসার ষড়যন্ত্র, আর্য অনার্যের সন্ধি,—
আমার নীতির ক্রীড়া, নহে দুর্বাসার;
তুমি ও দুর্বাসা মাত্র, নিমিত্ত তাহার।
আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ,
শক্তির নীতির মম মহা আবর্তন!
এই আবর্তন—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন।"

এ কি কথা! এ কি মূর্তি বাসুকি বিস্ময়ে উঠি,
দেখিতে লাগিলা মূর্তি বিস্ময়ে বিহ্বল!
শুনিতে লাগিলা কাণে সে কথা কেবল।
দেখিতে ধরিতে মূর্তি নাহি পারে নর-নেত্র,
নাহি পারে সেই কথা করিতে ধারণ!
সে মূর্তি অনন্ত, ভাষা অনন্ত-নিঃস্বন!
বাসুকি বিস্ময়ে কহে করযোড়ে—"জগন্নাথ!
অনন্ত শকতি তব! তবে কেন হায়!
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজনে এ লীলা-শিখায়
পোড়াইলে অকরুণ? দাস অনুদাস করি
রাখিলেন না কেন নাথ! চরণ ছায়ায়?"

"নর-জন্ম, নরদেহ"—উত্তরিলা নারায়ণ—
"যুগে যুগে এই রূপে করিয়া গ্রহণ,
সহি কত কুরুক্ষেত্র, কতই প্রভাস সহি,
সহি আমি কত নর-দুঃখ নিরমম!

কে আমার সুখী বল?—মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র?
সুখী কি যশোদা, নন্দ, ব্রজাঙ্গনাগণ?
আমার বাসুকি, কারু, কেমনে হইবে সুখী?
কে আছে এমন মম ভক্ত প্রিয়তম?
মানব অধর্ম ফলে জলে যেই দুঃখানলে,
জলি সেই দুঃখানলে সহ নিজ গণ,
না করিলে ধর্মরাজ্য ভূতলে স্থাপন;
আদর্শ, দর্পণ মত, না ধরিলে নর-চক্ষে,
দেখিতে বুঝিতে নাহি পারে নারায়ণ
ক্ষুদ্র নর; নাহি হয় উদ্ধার সাধন!
এইরূপে যুগে যুগে সহিত স্বগণ মম
—কেহ শত্রু, কেহ মিত্র,—লভিয়া জনম
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
সাধি আমি, করি ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন।
ত্রেতার রাবণ, আর দ্বাপরের দুর্যোধন,
দুর্বাসা, বাসুকি—অঙ্গ একই লীলার;
ত্রেতার সে শূর্পণখা, দ্বাপরের জরতকারু,
রূপে মুগ্ধা ভকতির প্রতিমা আমার!
এস সখে! এস বুকে! বড়ই কাতর প্রাণ
তব প্রেম-পিপাসায়, গাও হরিনাম!
এস বুকে! আমাদের লীলা অবসান।"

নারায়ণ দুই নেত্রে বহিতেছে প্রেমধারা,
ঝরিছে কারুর বক্ষে ধারা অবিরাম,
দেখিলা বাসুকি,—প্রেমপূর্ণ ভগবান!
"কারু!"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলা বাসুকি উচ্চে,
ডাকিল জলধি "কারু" কণ্ঠে উচ্চতর,
ডাকিল গগন "কারু" কণ্ঠে ঘোরতর।
ডাকিল সে ঘোর দিবা, সে প্রকৃতি ঘোরতরা
ডাকিল, ডাকিল উচ্চে বিশ্ব চরাচর,—
শুনিল না কারু, কারু দিল না উত্তর।
সেই প্রেমময় বক্ষে, সেই প্রেমময় মুখ
চাহি প্রেমানন্দে কারু নেত্রে দরদর
রহিয়াছে,—কারু কই দিল না উত্তর!
নিরখিলা নাগরাজ,—হইয়াছে প্রেমানন্দে
প্রেমসিন্ধু-বক্ষে প্রেম-বিশ্ব সম্মিলিত!—
পড়িলা চরণতলে হইয়া মূর্ছিত।

দশম সর্গ

প্রায়শ্চিত্ত

"—ও কি হাহাকার।
সুভদ্রে! সুভদ্রে! শুন ও কি হাহাকার!"—
ছুটিয়াছে উল্কা মত নৈশ অন্ধকারে
দ্বারকা-হস্তিনাপথে তুরঙ্গ-যুগল,
মহাবনে ক্ষুরক্ষেপে তুলি প্রতিধ্বনি
নৈশ নীরবতা বক্ষে। ছুটিয়াছে বেগে, -
দিবা, রাত্রি, মহাবন, নগর, প্রান্তর,
নাহি জ্ঞান অশ্বের কি অশ্ব-আরোহীর;
নাহি, শ্রান্তি, নাহি নিদ্রা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কত দিবা, কত রাত্রি। অশ্ব মুহুর্মুহুঃ
পরিবরতিয়া পান্থশালায় কেবল
সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে চক্ষুর নিমিষে,
ছুটিয়াছে অশ্বারোহী,—পলকে প্রত্যেক,
অশ্বের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে ত্বরিত,
করিছে নির্ভর যেন জীবন মরণ;
কি যেন ঘটনা মহা করিছে নির্ভর
অশ্বের গতিতে দ্রুত। ছুটিয়াছে অশ্ব
চাপি দন্তে দন্তালিকা ফেনিল বদনে
স্বেদসিক্ত; স্বেদসিক্ত আরোহিযুগল।
ছুটিয়াছে ঊর্ধ্বশ্বাসে অশ্বপাদুকায়
কানন-কঙ্কর-পথে করি বিকীর্ণিত
অগ্নিকণা ঘন ঘন, ঘন বজ্রাঘাতে।

অকস্মাৎ নিজ অশ্ব করিয়া সংযত
কহিলেন ধনঞ্জয়—"ও কি হাহাকার।
সুভদ্রে! সুভদ্রে! শুন ও কি হাহাকার!"
নীরব নিশীথ! বন নিস্তব্ধ নীরব!
নীরব সুভদ্রা দেবী! নিশ্চল নীরব
সংযত যুগল অশ্ব! প্রকৃতি নীরব
বুঝিলেন সব্যসাচী ভ্রান্তি আপনার।
আবার ছুটিল অশ্ব, পরাভবি বেগে
গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের শর ক্ষিপ্রগতি
অতিক্রমি বহু পথ ফাল্গুনী আবার
সংযত করিয়া অশ্ব কহিলা কাতরে—
"সখে! সখে!'—ও কে ডাকে? শুন ভদ্রা! শুন!
ও যে কণ্ঠ কেশবের!" নীরব কানন;
নীরব সুভদ্রা স্থির অশ্বে আপনার।
কেবল অশ্বের ক্ষুর-বিক্ষেপ-নির্ঘোষে
ডাকিছে বিকল কণ্ঠে বনপক্ষী কোথা
ভগ্ননিদ্র; ভগ্ননিদ্রা কুরঙ্গ শশক
ছুটিতেছে; করিতেছে শার্দুল জৃম্ভণ।
আবার বুঝিলা ভ্রান্তি। ছুটিল আবার
যুগল তরঙ্গ বেগে ঘোর ঝড়বেগে।
অতিক্রমি বহু দূর আবার পার্থের
দাঁড়াইল অশ্ব, পার্থ কহিলা আবার—
"না, না, নহে ভ্রান্তি ভদ্রা। 'সখে! সখে!' বলি
কি করুণ কণ্ঠে শুন ডাকিছেন হরি!—
আসিতেছে দাস তব!"—করি কশাঘাত
ছুটিলেন ধনঞ্জয়, ছুটিলেন দেবী
ঊর্ধ্বশ্বাসে বহু দূর,—ভ্রান্তি পুনর্বার!
না পারে চলিতে আর তুরঙ্গ যুগল,
বহিতেছে অঙ্গে স্বেদধারা দর দর,
বহিতেছে দর দর অঙ্গে আরোহীর।
চলিতেছে ধীরে অশ্ব ফেলি ঘন শ্বাস,
বঙ্কিম গ্রীবায় বল্গা করিয়া চর্বিত
মুহুর্মুহুঃ, মুহুর্মুহুঃ করিয়া আহত
বক্ষঃস্থল মুখে গর্বে, করিয়া সতেজ
মুহুর্মুহুঃ নাসারন্ধ্র বিস্তৃত কুঞ্চিত।
নিবিড় তমিস্রা নিশি; নিবিড় কানন।
অশ্বপৃষ্ঠে পার্থ ভদ্রা উভয় নীরব,
অন্যমনা, বিষাদিত, চিন্তা-নিমজ্জিত।
ধীরে চলিতেছে অশ্ব। কহিলা ফাল্গুনী—
"কি নিবিড় অন্ধকার! কি ঘোরা রজনী!
কি ভীষণ মহাবন আবৃত তিমিরে!
কি যেন কি মহাশোক এই জগতের
হইয়াছে সংঘটিত! করেছে জগৎ
বিচূর্ণিত, পরিণত ঘোর অন্ধকারে;
জীবনের চন্দ্র সূর্য তারা নির্বাপিত!

কি যেন কি মহাশোকে হৃদয়-জগৎ
বিচূর্ণিত ; পরিণত নিবিড় তিমিরে ;
জীবনের চন্দ্র সূর্য তারা নির্বাপিত !
অন্ধকার ! অন্ধকার ! নিবিড় গভীর
অন্ধকার এ জগৎ ! হৃদয়-জগৎ
অন্ধকার, অন্ধকার নিবিড় গভীর !
শূন্য ! শূন্য ! সব শূন্য ! শূন্য এ জগৎ !
হৃদয়-জগৎ শূন্য ! শূন্য তুমি, আমি।
নাহি শক্তি দেহে মম, নাহি মম দেহ !
নাহি হৃদয়ের শক্তি, স্থিতি হৃদয়ের !
শক্তিহীন, দেহহীন, হৃদয়বিহীন,
কি যেন রহেছি আমি !—স্বপন ! স্বপন ! ছায়া !
অন্ধকার ! অন্ধকার !"
শান্ত কণ্ঠে স্থির
কহিলেন ভদ্রাদেবী "শোকে অভিভূত
হইও না এই রূপে ! হায় ! যাদবের
অনাথ শিশুর, আর নারী অনাথার
রয়েছে রক্ষণভার করেতে তোমার !"
"শোক ভদ্রা !"—শোকরুদ্ধ কণ্ঠে ধনঞ্জয়
কহিলেন "শোক ভদ্রা ! শোক দুই বার
পাইয়াছি এ জীবনে দুই বজ্রাঘাতে
বিদীর্ণ, বিচূর্ণ, শোকে হয়েছে হৃদয়
দুই বার দুই ক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রে,—কোলে
জননীর মহাশয্যা সে মহাশিশুর !
আশ্রমে,—সে মহাশয্যা সাধ্বী বালিকার
মাতৃকোলে, এ পাষাণ পিতৃপদতলে !
আমাদের পদতলে করি সমর্পণ
প্রসূতি প্রসূত সদ্য শিশু নিরাশ্রয়,
কহিল কাঁদিয়া—'শেষ পূজা উত্তরার
লও বাবা ! লও মাতা ! এ পবিত্র ফুলে,
উত্তরার অশ্রুজলে। শোধিল উত্তরা
আজি তোমাদের ঋণ অনন্ত স্নেহের !
ওই ডাকিতেছে অভি বসিয়া বিমানে।
আনন্দে বিদায় দেও ! জন্মজন্মান্তরে
শ্বশুর শাশুড়ী, যেন জনক জননী,
পাই তোমাদের,—বর দেও উত্তরায় !"
দুই করে, দুটি ফুলে, আলিঙ্গি চরণ
দুজনের লুটাইয়া পড়িল চরণে।
কাঁদি উচ্চে তুলি বক্ষে অর্পিলাম যবে
তব অঙ্কে, দেখিলাম কি হাসি অধরে !
দেখিলাম অনাথার সে প্রথম হাসি !
কি আনন্দ ! কি মাধুরী চির-নিদ্রাগতা !"
কাঁদিয়াছি চিরদিন সেই দুই শোকে !
কাঁদিয়াছি প্রতিদিন। সে শোক-স্মৃতিতে
গোবিন্দের মহাবাক্য, গীতার সান্ত্বনা,
বীরত্বের সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা কঠোর,
গিয়াছে ভাসিয়া। প্লাবি ধৈর্যের বন্ধন,
উড়াইয়া তৃণবৎ ধৈর্য ঐরাবত,
বহিয়াছে শোকগঙ্গা পতিতপাবনী
কিন্তু এই শোক, ভদ্রা ! নহে সেইরূপ।
প্রভাস-উৎসব কথা শুনি জনরবে
আসিতেছিলাম, পথে সংবাদ ভীষণ
শুনি যেই দিন হায় ! দারুকের মুখে
মিলিলাম আত্মহারা মথুরার পথে
তব সনে,—সেই দিন !—কত দিন আজি
নাহি জ্ঞান ; মহাকাল এ মহাশোকের
—প্রলয়ের—নাহি সাধ্য করে পরিমাণ।
সে দিন হইতে এক অশ্রুবিন্দু মম
উঠেনি হৃদয়-উৎসে বহেনি নয়নে।
হয়েছে হৃদয় শুষ্ক, শুষ্ক দুনয়ন।
হইয়াছে মরুভূমি হৃদয়, নয়ন,
পরিপূর্ণ হাহাকারে, নিবিড় তিমিরে !
সেই ঘোর অন্ধকারে, ঘোর কৃষ্ণপটে
জীবনের,—হইয়াছে বিলুপ্ত তিমিরে
দৃশ্যাবলী জীবনের—ভাসিছে কেবল
সেই দুই মহাশোক। তাহাতেও আজি
উঠিছে না হৃদয়েতে একটি উচ্ছ্বাস,
বহিছে না এক বিন্দু অশ্রু দুনয়নে।
যেই শোক-দৃশ্য আজি নিষ্প্রভ মলিন
কি অজ্ঞাত মহাশোকে ! সুভদ্রে ! সুভদ্রে !
হউক যাদব ধ্বংস, ধ্বংস চরাচর,
নাহি দুঃখ। নারায়ণ—প্রাণসখা মম –
আছেন কুশলে বল ? বল একবার
পারিব সে পদাম্বুজ ধরিতে হৃদয়ে,
জুড়াইতে হৃদয়ের এই হাহাকার ?"

"এ কি ভ্রান্তি প্রাণনাথ !" -উত্তরিলা দেবী
শান্ত স্থিরকণ্ঠে—"যিনি মঙ্গল-নিদান
জগতের, যিনি সর্বমঙ্গলমঙ্গল,
সম্ভবে কি অমঙ্গল তাঁহার কখন ?

মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ দুঃখ আর,
জন্ম মৃত্যু, শোক শান্তি, লীলা মাত্র তাঁর ;—
অনন্ত মঙ্গলপূর্ণ নিয়তি তাঁহার।
না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন
বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর ? বুঝিত কি সুখ,
না থাকিত দুঃখ যদি ? মৃত্যু না থাকিলে,
পারিত বহিতে কি এ জীবনের ভার ?
আবির্ভাব তিরোভাব স্বয়ং তাঁহার
না থাকিলে, ভক্তি-স্রোত বহিত উজান,
ধর্মের উন্নতি-চক্র হইত অচল !
হইত অচল জীব-চক্র উন্নতির
দুঃখ, মৃত্যু, অমঙ্গল না থাকিত যদি।
কর শোক পরিহার। নিয়তি তাঁহার
সুমঙ্গল বিশ্বব্যাপী পালিবেন তিনি,
সুদর্শন নীতি-চক্রে পালিবে জগৎ,
পালিব আমরা ক্ষুদ্র চক্রে আপনার
সেই মহাচক্র-গর্ভে। ততোধিক আর
ক্ষুদ্র নর আমাদের নাহি অধিকার।
যত দিন ভক্তি প্রেম থাকিবে হৃদয়ে,
তাঁহার চরণাম্বুজ প্রেম সরোবরে
ভাসিবে সতত। প্রেমে চির অধিষ্ঠান—
প্রেম বৃন্দাবনে প্রেমময় ভগবান।”
একটি শীতল ধারা হৃদয় মরুতে
বহিল পার্থের ধীরে ; এক ক্ষীণালোক
উঠিল জলিয়া দূরে ঘোর অন্ধকারে
সেই মহা মরুভূমে। সেই ক্ষীণালোকে
দেখিলেন ধনঞ্জয় ভাবী আবর্তন
নিয়তি-চক্রের ক্ষুদ্র অস্ফুট রেখায়।
চলিলা নীরবে ধীরে। উঠিল ভাসিয়া,
নিশান্তে নীরবে ধীরে অস্ফুট আলোক
ভস্মাচ্ছন্ন শশাঙ্কের। উঠিল ভাসিয়া,
কানন নীরবে ধীরে বিভীষিকাময়,
পার্থ ভবিষ্যৎ মত। উঠিল ভাসিয়া,
কাননের পথ মত, কর্তব্যের পথ
অস্ফুট আলোকে ধীরে। ছুটিল আবার
তুরঙ্গ-যুগল বেগে। করি অতিক্রম
কানন, প্রভাতে অশ্ব প্রভাস-প্রান্তরে
প্রবেশিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল তখন।
ভস্মাচ্ছন্ন দিবালোক ধীরে ধীরে ধীরে
উঠিল ভাসিয়া। ধীরে উঠিল ভাসিয়া
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন প্রভাস প্রান্তর।
“ও কি শব্দ !”—দুই অশ্ব থামিল পলকে।
নহে ভ্রান্তি এই বার,—বিকট চীৎকার
পৈশাচিক, শুনিলেন ভদ্রাও এবার।
ছুটিল যুগল অশ্ব শব্দ লক্ষ্য করি
যেন দুই ক্ষিপ্র শর লক্ষ্যে অন্ততম।
দেখিলেন ঋষি এক পড়িয়া ভূতলে
করিছে বিকৃত মুখে বিকট চীৎকার,
বক্ষে শিলাখণ্ড এক। চক্ষুর নিমিষে
অবতরি দুইজন, নিমিষে চক্ষুর
শিলাখণ্ড সব্যসাচী করিলা অন্তর।
“ওই আসে ! ওই আসে ! কোথা যাব আমি ?—
যায় প্রাণ পিপাসায় !”—করিছে চীৎকার
চাহি শূন্য পানে ঋষি বিকৃত বদনে।
ছুটিলেন ভদ্রা দেবী ; দূর নিরঝরে
প্রক্ষালিয়া ক্ষিপ্রকরে গৈরিক অঞ্চল,
আনিয়া শীতল বারি ঢালিয়া বদনে
ঋষির পিপাসাতুর। করি জল পান,
দ্বিগুণ বিকৃত মুখ করি মহাক্রোধে,
গর্জিলা—“কে তোরা পাপী ? সুভদ্রা, অর্জুন !
দূর হও পাপীয়সি, ওরে দুরাচার !
চিনিস্ না দুর্বাসায়, অভিশাপে যার
কুরুকুল যদুকুল হইল ভস্মিত ?
দূর হও ! দূর হও ! পিপাসা ! পিপাসা !”
লইয়া মস্তক অঙ্কে, বারি সুশীতল
আবার দিলেন ভদ্রা বিকৃত বদনে।
উঠিল চীৎকার পুনঃ—“ওরে পাপীয়সি !
দূর হও ! দূর হও ওরে দুরাচার !
এখনি করিব ভস্ম অভিশাপানলে !”
কহিলেন ভদ্রা দেবী কণ্ঠে করুণার—
“কর ভস্ম আমাদের ইচ্ছা হয়, দেব !
কেমনে যাইব চলি, ফেলিয়া তোমায়
এমন সময়ে হায় ! দেও অনুমতি
সেবিব চরণ প্রভু ! হও শান্ত স্থির,
পাবে শান্তি, সুমধুর গাও কৃষ্ণনাম !”
জতুস্তূপে অগ্নি যেন হইল পতিত,
গর্জিল দুর্বাসা ক্রোধে হইয়া অধীর—
“সে পাপীর ভগ্নী, ভগ্নীপতি সে পাপীর,
সেবিবে !—পবিত্র অঙ্গ ছুঁইবে আমার !
দূর হও ! দূর হও ! মহর্ষি দুর্বাসা

গাহিবে সে পাপনাম !"—ঘোর অট্টহাসি
হাসিল ঘৃণায় ঋষি প্রেতপুর মত—
"যোগানল যাঁর করি বিদীর্ণ ভূধর,
হ'য়ে উদগীরিত, স্থূল করিল ভস্মিত
যে পাপীর, দাবানলে পতঙ্গপাল মত,
গাহিবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্বাসা ?
দূর হও দুশ্চারিণি ! হব শান্ত, স্থির,
বল্ সেই যোগানলে হইয়াছে পাপী
ভস্মীভূত, কিম্বা হত অস্ত্রে অনার্যের,
ঘৃণিত পশুর মত। বল্ ফলিয়াছে
দুর্বাসার অভিশাপ,—বেদ ব্রাহ্মণের
মহাশত্রু মহাপাপী মরেছে পুড়িয়া
বেদ-যজ্ঞানলে মগ্ন, গিয়াছে নরকে ;
তাহার সে ধর্মরাজ্য গেছে রসাতলে !
শিলাখণ্ড পড়ি বুকে সে ঘোর নিশীথে
করেছে অচল দেহ। বড় দুঃখ মনে
নাহি পারিলাম হায় ! করিতে প্রদান
পূর্ণযজ্ঞে শেষাহুতি, করি পদাঘাত
পতিত শত্রুর শিরে শত শত বার।
ওই আসে ! ওই আসে !"—বিকৃত চীৎকারে
আবার কহিল ঋষি।—"জলন্ত ভীষণ
নারকীয় সুদর্শন-চক্র নরকের !
কোথা যাব ! কোথা যাব ! একে, একে, একে
নৃপতি বৈদিকদেব-পূজকের কাছে
গেলাম, আশ্রয় কেহ দিল না আমায়
ধর্মভ্রষ্ট দুরাচার। সকলের করে
অর্ঘ্য সে পাপীর তরে ! সকলের মুখে
পাপনাম ! পাপনামে পূর্ণ ধরাতল !
ওই আসে ! ওই আসে !"—দুর্বাসা আবার
করিল চীৎকার ঘোর,—"দিল না আশ্রয়
বিধর্মী বৈদিক দেব-পূজক সকল।
অধর্মে পূর্ণিত ধরা। যাইব বৈদিক
দেবতাগণের কাছে, মাগিব আশ্রয়।
যাব ওই চন্দ্রলোকে। এ কি চন্দ্রলোক !
কোথা শশধর ? কোথা রোহিণী তাহার ?
কোথায় জ্যোৎস্না ? এ কি ! অদ্ভুত ! অদ্ভুত !
এ চন্দ্রলোকের চন্দ্র শোভিছে পৃথিবী
কি সুন্দর ! কি শীতল উৎস জ্যোৎস্নার !
শিলাময়—শিলাময়—কি মরু বন্ধুর
এই চন্দ্রলোক ! তপ্ত জলন্ত আতপে
শৈলের উপরে শৈল, শৈল তদুপরে,—
বিদীর্ণ, উদগীর্ণ, মৃত আগ্নেয় ভূধর,
অনন্ত, অসংখ্য। নাহি চিহ্ন উদ্ভিজ্জের !
নাহি জীব ! নাহি জল ! কেবল প্রখর
মধ্যাহ্ন নৈদাঘ সূর্যে তপ্ত শৈল মরু !
যায় প্রাণ ! কোথা যাব !—পিপাসা ! পিপাসা !'
সিক্ত অঞ্চলের বারি সুভদ্রা আবার
ঢালিলেন। ধনঞ্জয় বিস্মিত, স্তম্ভিত,
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে করি গাণ্ডীবে নির্ভর,
বীরবেশে, আত্মহারা। বসিয়া সুভদ্রা
উদাসিনী, মুক্তকেশী, গৈরিক বসনা,
অঙ্কে দুর্বাসার শির,—মূর্তি করুণার।
"ওই আসে ! ওই আসে"—ছাড়িল চীৎকার
আবার দুর্বাসা ভয়ে। প্রলাপের মত
কহিতে লাগিল পুনঃ—"যাব সূর্যলোকে।
কোথায় আদিত্য জবা কুসুম-সঙ্কাশ,
ধ্বান্তারি, সর্বপাপঘ্ন, দেব দিবাকর ?
কোথায় তাহার রথ ? সপ্তাশ্ব কোথায় ?
সারথি অরুণ কোথা ?—অনল ! অনল !
অনন্ত, অতল, অগ্নি-মহাপারাবার !
পর্বতপ্রতিম অগ্নি-তরঙ্গ ভীষণ
ছুটিতেছে, গর্জিতেছে ! তরঙ্গে তরঙ্গে
কি আঘাত, প্রতিঘাত, বিরাট গর্জন,
অনলের অনিবার ! শত বজ্রনাদ,
বালকের করতালি তুলনায় তার।
কি শক্তিতে চিন্তাতীত অগ্নি পারাবার
বিলোড়িত, বিমোথিত, ঘোর আবর্তিত !
কি অসংখ্য অগ্নিস্তম্ভ, অনন্ত গোলক,
অনল পৃথিবীরাশি শত সংখ্যাতীত,
হইতেছে মহাশূন্যে অগ্নি-প্রস্রবণে
উৎক্ষেপিত অনিবার কি বেগে ভীষণ,
কত ঊর্ধ্বে ! হইতেছে উদ্ভিন্ন, বিদীর্ণ,
কি বিরাট মহাশব্দে ! ভীম বজ্র-মন্দ্রে
সংখ্যাতীত পরিপূর্ণ করি মহাব্যোম
অনিবার ! চিন্তাতীত, কল্পনা-অতীত,
ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
কেমনে জলন্ত সেই অনলমণ্ডলে
যাইব ! শিশুর ক্রীড়া-গোলক কেবল
তুলনায় ভূমণ্ডল ! মধ্যাহ্ন উত্তাপ
নিদাঘের তুলনায় তুষার শীতল !

কি উত্তাপ! কি উত্তাপ! যাইছে পুড়িয়া
রক্ত, মাংস, অস্থি মজ্জা!—কি জ্বালা! পিপাসা!"
যন্ত্রণায় দুর্বাসার বিকৃত-বদন
হইল বিকৃততর। যন্ত্রণায় ঋষি
করিতেছে ছট্‌ফট্‌, তীব্র যন্ত্রণায়
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, হতেছে মথিত
ঘন ঘন! সুভদ্রার করুণ হৃদয়
গলিল, বহিল অশ্রু করুণ নয়নে,—
করুণার প্রেম-গঙ্গা সন্তাপ-হারিণী।
কহিলেন—"পাবে শান্তি, লও কৃষ্ণনাম!"
"দূর হও! দূর হও!"—দুর্বাসা আবার
যন্ত্রণা-জড়িত-কণ্ঠে করিল চীৎকার।—
"আবার, আবার, সেই নাম পাপিষ্ঠের
কলুষিত করি কর্ণ!—আবার, আবার,
শ্রবণ হইতে প্রাণ করিয়া দাহিত
তরল অনল-স্রোতে! ওরে পাপীয়সি!
ব্যভিচারী দুরাচার হীন গোরক্ষক,
লইবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্বাসা?
লইবে পবিত্র স্বর্গ নাম নরকের?
পারিজাত পূতিগন্ধ মাখিবে সৌরভে?
আসুক সে বিধর্মীর চক্র বিভীষণ,
খণ্ড খণ্ড দুর্বাসার করুক এ দেহ,
করুক বিদগ্ধ, ভস্ম; তথাপি—তথাপি—
তথাপি দুর্বাসা নাহি লইবে সে নাম!
ওই আসে! ওই আসে! কি চক্র ভীষণ!
কি ঘূর্ণন! কি গর্জন! অগ্নি-উদ্গীরণ!
কোথা যাব! কোথা যাব! দেবতা বেদের
কোথা ইন্দ্র! কোথা রুদ্র! কোথায় বরুণ!
অশ্বিনীযুগল কোথা! অদ্ভুত! অদ্ভুত!
অনন্ত—অনন্ত—নীলগর্ভে অনন্তের
ভ্রমিছে অনন্ত সূর্য, অনল গোলক,
অন্তহীন, দুর্নিরীক্ষ্য! কি চক্রে মহান,
সূর্যে সূর্যে মহাশূন্যে করিয়া বেষ্টন,
ভ্রমিতেছে কত গ্রহ! বেষ্টি গ্রহগণ
কত উপগ্রহ, কত চন্দ্র ভূমণ্ডল,—
ভ্রমিতেছে অনিবার! গতি আবর্তন
মানব-কল্পনাতীত। সৌর রাজ্য কত,—
কত সৌর পরিবার,—শত, সংখ্যাতীত—
ভ্রমিতেছে নীলিমায় মহা অনন্তের,—
অশ্রান্ত, অভ্রান্ত! কিবা অনন্ত ভ্রমণ
অন্তরীক্ষে, কি অনন্ত চক্রে সংখ্যাতীত,
কি শক্তিতে, কি নীতিতে, অচিন্ত্য কৌশলে!
অসংখ্য জগৎ! সেই জগতে জগতে
কতই বিচিত্র সৃষ্টি! জড় চেতনের
কি বিচিত্র রঙ্গভূমি! জগতে জগতে
সৃষ্টি কত রূপান্তর! জগতে জগতে
রূপান্তর জীবে জীবে, উদ্ভিজ্জে উদ্ভিজ্জে,
কি বিচিত্র! কি বিচিত্র, জগতে জগতে,
উন্নতি ও অবনতি জড় চেতনের!
ভূলোক হইতে ওই পুণ্য দেবলোক,
—শোভাময়! শান্তিময়! চিদানন্দময়!
মানব হইতে ওই পুণ্যাত্মা সকল,
—শোভাময়! শান্তিময়! চিদানন্দময়!—
কি অদ্ভুত বিবর্তন জড় চেতনের
কত স্তরে, অধে, ঊর্ধ্বে, কি নীতি শৃঙ্খলে,
দৃষ্টাতীত, জ্ঞানাতীত! কই দেবলোকে
কোথা ব্রহ্মা, কোথা বিষ্ণু, কোথায় বা শিব,
বৈদিক দেবতাগণ? কাহার আশ্রয়
লইব? আশ্রয় আজি কে দিবে আমায়?
ওই আসে! ওই আসে!"—আবার চীৎকার
করিল দুর্বাসা ভয়ে। চাহি অধোমুখে
জননী করুণাময়ী, করিলেন ধীরে
সঞ্চালিত দুই কর,—দুই কোকনদ—
ঋষির বিকৃত ভীত বদন উপরে।
"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!"—বদন-বিকৃতি
ঋষির হইল দূর। কহিল উচ্ছ্বাসে—
"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! নীলমণিময়
কি বিরাট দেববপু! বিরাট পুরুষ!
দ্যুলোক, ভূলোক, ওই অনন্ত আকাশ
ব্যাপিয়াছে সেই দেহ! গ্রহ, উপগ্রহ,
চন্দ্র, সূর্য, ধূমকেতু, অসংখ্য মণ্ডল
ভ্রমিতেছে চক্রে চক্রে সে বিরাট দেহে,
আদিহীন, অন্তহীন! মুহূর্তে মুহূর্তে,
মহাপারাবারে ক্ষুদ্র জলবিম্ব মত,
জন্মি জন্মি সেই দেহে হতেছে বিলীন!
এই কি সে বিশ্বরূপ? পরম নিধান
এ বিশ্বের, নিত্য, সত্য, অব্যয়, অক্ষয়?
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা? নিয়ন্তা নীতির?
এ অনন্ত কৌশলের অনন্ত-কৌশলী?
এক, অদ্বিতীয়? ভিন্ন শকতির নাম

বৈদিক দেবতাগণ ? অদ্ভুত ! অদ্ভুত !
সত্য কি এ নবধর্ম ? সত্য বিশ্বরূপ ?
সত্য ? না না, মানিবে না, দুর্বাসা কখন।"

আবার সুভদ্রা দেবী সঞ্চারিলা কর।
"কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত !"—বিস্ময়ে দুর্বাসা
কহিতে লাগিল—"সেই বিরাট পুরুষ,
হইল কি রূপান্তর ! কিরাট-শোভিত,
শঙ্খচক্রধর, নীলকান্তি মনোহর,
রবিকর পীতাম্বর, মহাযোগীশ্বর।

হে রাজর্ষি ! মহাদেব ! কে তুমি ? কে তুমি ?
দিবে না, দিবে না, না না, দুর্বাসা তোমায়
পশিতে হৃদয়ে তার। পশিলে হৃদয়ে ?
কে তুমি ? কে তুমি ? কৃ—ষ্ণ ?"
সুমধুর নাম

গাহিলেন ভদ্রা পার্থ। সুমধুর নাম
উচ্চারিতে ধীরে সেই বিকৃত বদন
হইল প্রশান্ত, স্থির। পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত।
পাপমুক্ত ঋষি চলি গেলা শান্তিধাম।

একাদশ সর্গ

স্বর্গারোহণ

এখন ঘোরাল দিবা, নাহি যেন দিবাকর।
কি যেন শোকের ছায়া ছাইয়াছে চরাচর।
কি যেন শোকের গীত গাহিতেছে পারাবার।
কি যেন সমুদ্রানিল বহিতেছে হাহাকার।
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ শ্মশানপ্রায়,
বিস্তীর্ণ প্রভাস-ক্ষেত্র যত দূর দেখা যায়।
এখনো বিদীর্ণ সেই রৈবতক শৃঙ্গ-চয়
করিছে উদগীর্ণ ধূম্র সভস্ম গৈরিকময়
রহিয়া রহিয়া, যেন করি মুখ ব্যাদানিত
করিতেছে দৈত্যব্যূহ ক্রোধ-বাষ্প উদ্গীরিত।
এখনো উঠিছে কাঁপি রহিয়া রহিয়া ধরা,
হৃদয় রয়েছে যেন কি শোক আবেগে ভরা!
কি যেন শোকের দৃশ্য বিস্তীর্ণ প্রভাস তীরে,
ভস্মাচ্ছন্ন ঘোর কৃষ্ণ! ঘোর কৃষ্ণ সিন্ধু-নীর।
ঘোর কৃষ্ণ আবরণে হইয়াছে একাকার!
অভিন্ন ধবল বেলা ঘোর কৃষ্ণ পারাবার।
নাহি চিহ্ন জীবনের, নাহি চিহ্ন জগতের!
যেন প্রলয়ের দিন,
জগৎ হয়েছে লীন
মহাকাল -মহাবক্ষে, মহাবক্ষে প্রলয়ের।
অগ্নিগিরি উদ্গীরিত প্রস্তরে আহত, হত,
অনার্য পড়িয়া আছে স্থানে স্থানে শত শত।
নাহি হিংস্র জীব-চিহ্ন, শৃগাল, বায়সগণ;
কেবল উত্তপ্ত বায়ু স্বনিছে কি শোক-স্বন
মাখি ধূম্র ভস্ম অঙ্গে। আহতের আর্তনাদ
বহিয়া বহিয়া ধীরে শোকে ত্রাসে সবিষাদ!
কেবল সুভদ্রা পার্থ, শোকে ত্রাসে অভিভূত,
ভ্রমিছেন, করুণার অশ্রুতে নয়নাপ্লুত।
করি আহতের সেবা, হতে বর্ষি অশ্রুজল,
করুণার নদ নদী ভ্রমিছেন অবিরল।
আর চলিল না পদ; কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ;
সম্মুখে উৎসব-ক্ষেত্র প্রভাসের,—কি শ্মশান।
যথায় যোজন-ব্যাপী ছিল শিবিরের সারি,
আলোক-কুসুম-দামে নাট্যশালা অনুকারি,
দগ্ধ শিবিরের দণ্ড স্থানে স্থানে চিহ্ন তার
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া, দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড আর।
ভস্মাবৃত, শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত,
বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত!
বিলাসের ভগ্ন, দগ্ধ, উপকরণের রাশি
আছে পড়ি শব সহ; এখনো রয়েছে বাসি
বিলাস-কুসুম-দাম যাদবের যাদবীর
অঙ্গে অঙ্গে ভস্মাবৃত; করে পান-পাত্র স্থির
এখন রয়েছে কারো; রয়েছে বিলাস বেশ
ভস্মাবৃত; ভস্মাবৃত বেণীবদ্ধ চারু কেশ।
রহিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে রত্নময় আভরণ
যাদবের যাদবীর, শুষ্ক অলক্ত চন্দন।
পড়ি যন্ত্রী যন্ত্র করে, নর্তকী অর্ধেক নাচে;
বক্ষে মৃতা প্রণয়িনী প্রণয়ী পড়িয়া আছে।
কেহ গদাহত, কেহ অস্ত্রাহত নিদারুণ,
কেহ বা প্রস্তরে,—অস্ত্রে প্রকৃতির অকরুণ।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুঝি, কোথা ভ্রাতুষ্পুত্র সহ
আছে পড়ি দুই জন; কোথা দৃশ্য শোকাবহ,—
দুই দ্বন্দ্বী মধ্যে আসি পত্নী, পুত্রী, ভগ্নী বলে
নিবারিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ পড়িয়াছে মধ্যস্থলে।
দুই দিকে দুই কর রহিয়াছে প্রসারিত;
কি করুণা, কাতরতা, রয়েছে মুখে অঙ্কিত!
নিমিষে নিরখি দৃশ্য,—ঊর্ধ্বমুখে, অশ্রুজলে
করযোড়ে ধনঞ্জয় বসিলেন ধরাতলে
জানু পাতি। ভদ্রা দেবী,—হৃদয়ে শান্তির ধাম,—
দাঁড়াইলা করযোড়ে, অধরেতে কৃষ্ণনাম
অস্ফুট; ঈষৎ ধীরে কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর,
ঊর্ধ্বমুখ শান্তিময়, স্থিরনেত্র ইন্দীবর।
রহিলেন দুইজন মূরছিত যোগস্থিত
মহাশোকে, স্থির দেহ, নয়ন অবিচলিত।
মহাশোকে অর্জুনের করুণার পারাবার
উদ্বেলিত, অশ্রুধারা বহিতেছে অনিবার।
সুভদ্রার মহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে
হইল বিলীন, নেত্র ছল ছল প্রেম-নীরে।
কিছুক্ষণ পরে উঠি কহিলেন ধনঞ্জয়—
"এ কি লীলা হরি! তুমি প্রেমময় দয়াময়।
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শোক-পারাবার;
ক্ষুদ্র সরোবর, এর নহে যোগ্য তুলনার।

কুরুক্ষেত্র বীর-ক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম।
প্রভাস উৎসব-ক্ষেত্র,—তার এই পরিণাম!
কুরুক্ষেত্রে এই রূপে বিকট মৃত্যু, বিলাস,
করে নাই নিরমম পরস্পরে উপহাস।
এরূপে অমৃতে তথা উঠে নাহি হলাহল।
এরূপে আমোদ-সুধা হয় নাই অশ্রুজল।
এই রূপে হাসি তথা হয় নাহি হাহাকার।
প্রমোদ নিকুঞ্জ বন হয় নাহি পারাবার।
পড়েছিল বীরগণ মহা মহীরুহ যথা;
ছিল না এরূপে তাহে জড়িতা রমণী লতা।
বসন্ত বাহারে তথা উঠেনি দীপক রাগ।
ছিল না কুসুম বনে লুকাইয়া তীব্র নাগ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র; এ ক্ষেত্র আত্মহত্যার;
কুরুক্ষেত্রে বীর্য ক্রীড়া; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া সুরার।
মানব, প্রকৃতি, মিলি করিয়াছে কি ভীষণ
দাবদগ্ধ, সুসজ্জিত সুরম্য প্রমোদ বন!
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্ম রাজ্য লক্ষ্য তার;
হরি! এইরূপ কুল করিলে কেন সংহার?"
কেবল কহিলা দেবী—"কর্মফল! কর্মফল!
এত দিনে ধর্মরাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল।"
কিন্তু কই, কৃষ্ণ কই? ছুটিলেন দুইজন
দেখিলেন সম্মুখেতে বৃক্ষতল মনোরম।
একটি গৈরিক খণ্ড, একটি খণ্ড শিলার,
পড়েনি একটি ভস্ম,—বেলা-ভূমি পরিষ্কার।
শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলফুল রাশি,
শোকের শ্মশানে যেন শান্তির শীতল হাসি।
বুঝিলেন দুই জনে দারুক, শৈল, কেশব,
এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এ বিপ্লব।
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ভূমে হইলেন দুই জন
পাইলেন শোকে শান্তি পাতি বক্ষ অনুক্ষণ।
মহামরুদগ্ধ বুকে কি যেন তুষার জল
প্রবেশিল, দগ্ধপ্রাণ করি শান্ত সুশীতল।
ললাটে পরশি ভূমি প্রণমিয়া বহুবার,
মাখিয়া ললাটে বক্ষে পূজ্য পদরজ আর,
চলিলেন দুজন উর্ধ্বশ্বাসে বহুদূর,—
ও কে! জননীর অঙ্কে যেন শিশু তৃষ্ণাতুর!
একটি রমণী অঙ্কে কখন রাখিয়া মুখ
করিতেছে ছটফট, ভূতলে রাখিয়া বুক।
কখন উঠিয়া চাহি শূন্য পানে আত্মহারা
ছুটিছে উন্মাদ মত, দুনয়নে অশ্রুধারা।
"শৈলজে! শৈলজে!"—পার্থ কহি কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত
ছুটিলেন, লইলেন হৃদয়েতে উদ্বেলিত
শৈলজায়; কহিলেন নেত্রে অশ্রু ছল ছল—
"কোথায় আছেন কৃষ্ণ? আছেন কুশলে বল?"
দাঁড়াইয়া নাগরাজ ছিল চাহি শূন্য পানে,
সুমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি পশিল কাণে,
কহিলা আকুল কাঁদি,—"আহা কি মধুর নাম!
কে শুনাইয়া, জুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ?
গাও নাম আর বার! গাও নাম শত বার!
সহস্র সহস্র বার! লও নাম, গাও আর!
গাও নাম পারাবার! গাও নাম সমীরণ!
গাও নাম চন্দ্র সূর্য! গাও গ্রহ অগণন!
এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম,
এমন ত্রিতাপহর, শীতল শান্তির ধাম,
নাহি মর্ত্যে, নাহি স্বর্গে। এমন মধুর নাম,
গাও মুখ! গাও চোক! গাও অঙ্গ! গাও প্রাণ!
গাও মুখ মধুস্বরে! গাও চোক অবিরাম
বরষিয়া প্রেমধারা! নামামৃত করি পান,
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া, পাষাণ প্রাণ!
নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ! হরে! হরে!
হরে! রাম! হরে! রাম! রাম! রাম! হরে! হরে!"
দুই বাহু উর্ধ্বে তুলি, দিয়া তালি অবিরাম,
নাচিতেছে নাগরাজ গাহিয়া গাহিয়া নাম
পাগল শিশুর মত, বহিয়া নয়নধারা।
ভিজিতেছে বক্ষ, বেলা, নাগরাজ আত্মহারা!
প্রেমানন্দে চিত্ত যেন হইয়াছে প্রপূরিত;
বহিতেছে অনিবার নেত্র পথে উদ্বেলিত।
সেই নৃত্যে, সে আনন্দে, সুভদ্রা ও ধনঞ্জয়
ভুলিলেন আত্মশোক, হইলেন তন্ময়।
সেই প্রেম! সে আনন্দ! সেই গীত! সে নর্তন!
হইতেছে বাসুকির স্বেদ কম্প ঘন ঘন।
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া দেহ অধীর
পড়িতে, আপন অঙ্কে ভদ্রা লইলেন শির।
মহাভাবে ভদ্রা, পার্থ, শৈল, আত্মজ্ঞানহীন
রহিলেন কিছু ক্ষণ আত্মপ্রেমানন্দে লীন।
মহাশোক-স্রোতস্বতী ধনঞ্জয় সুভদ্রার
হইল বিলীন, পশি প্রেমানন্দ পারাবার।
ধীরে ধীরে বাসুকির উপজিলে বাহ্য জ্ঞান,
কহিলা শৈলজা—"দাদা! পূর্ণ তব মনস্কাম!

যে দেবী আরাধ্যা তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার,
চেয়ে দেখ তব শির অঙ্কে সেই সুভদ্রার।
যেই পার্থ শত্রু তব, দেখ পদতলে বসি
সেবিছেন পদ তব। কি প্রেমে কি অশ্রু খসি
পড়িতেছে পদে তব পড়িছে বক্ষে তোমার।
হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাশোকে সঞ্চার!
জ্বলিলে একটি জন্ম যেই প্রেম-পিপাসায়
কর পান সেই প্রেম অজস্র-সুধা-ধারায়।
পতিতপাবনী ধারা এই মাতা জাহ্নবীর,
জুড়াইবে প্রাণ তব, জুড়ায়েছে পাপিনীর।"
"সুভদ্রা! সুভদ্রা! পার্থ!"—নাগরাজ সবিস্ময়
উঠিয়া রহিলা চাহি মূর্তিবৎ, প্রীতিময়।
"সুভদ্রা!—জীবন স্বপ্ন! সুভদ্রা! পিপাসা মম!
একটি চরণ-রেণু ভাবিতাম স্বর্গ সম।
আমার আরাধ্য দেবী, আমার সর্বস্ব ধন,—
তাঁর অঙ্কে মম শির, আমি পাপী নরাধম।
হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে!
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত;
কৌরব যাদব রক্তে করিয়াছি কর্দমিত
এই কর, এই আত্মা;—সকলি লীলা তাঁহার!
আজি কোথা সে সুভদ্রা? সে বাসুকি কোথা আর?
স্বপ্ন! স্বপ্ন সব!—বিকট-স্বপন ঘোর!
সেই ঘোর অমাবস্যা আজি হইয়াছে ভোর।
আজি সেই পত্নীভাব মনে নাহি পড়ে আর;
আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার। মা আমার!
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে, বুকে!
সে অঙ্কে শিশুর মত বাসুকি ঘুমাবে সুখে।"
বাসুকি আবার অঙ্কে রাখি শিশুমত শির।
কাঁদিতেছে, ভিজিতেছে অঙ্ক ঝরি অশ্রুনীর।
"তুই মম কারু আজি; তুই মম শৈল আর;
তুই মম মাতা, পিতা, তুই মা! কৃষ্ণ আমার!"
উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম হ'ল পুনঃ ভাবাবেশ,
বাসুকি কহিল উঠি,—"মরি! কি মধুর বেশ!"
চাহি সুভদ্রার পানে—"কি মোহন চূড়া শিরে!
কাঁপিতেছে শিখিপুচ্ছ মলয়ে কি ধীরে ধীরে!
কেশে ফুলমালা, পৃষ্ঠে কি মোহন পীতধড়া!
কি ত্রিভঙ্গ নীলকান্তি, অতরল সুধা ভরা!
কি মোহন পীতাম্বর! গলে কিবা বনমালা!
চন্দন-চর্চিত বুক কি প্রেমের নাট্যশালা!
শ্রীঅঙ্গের কি সৌরভ যেন পারিজাত রাশি!
করপদ্মে বিম্বাধরে শোভে কি মোহন বাঁশী!
বাজিতেছে কি মধুরে! ডাকিতেছে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই!"—ভাবাবেশে পুনর্বার
পড়িলা ভদ্রার অঙ্কে প্রেমানন্দে মূরছিত।
হইলেন চারি জন ভাবে জ্ঞান-বিরহিত।
গাহিলেন তিন জন,—প্রেমে পুলকিত প্রাণ,—
আত্মহারা চাহি শূন্য, লীলাময় কৃষ্ণনাম।
বাসুকি মেলিলে নেত্র শুনিতে শুনিতে নাম,
কহিলেন ধনঞ্জয়—"নাগেন্দ্র! আকুল প্রাণ,
কোথা কৃষ্ণ? কহ, তুমি পেয়েছ কি দেখা তাঁর?
কোথায় আছেন তিনি? পাইব কি হায়! আর
হৃদয়ে সে পদাম্বুজ? দেখিব নয়ন ভরি
নর-নারায়ণ রূপ, কহ দাসে দয়া করি!"
"কোথা কৃষ্ণ?"—নাগরাজ উঠি পুনঃ আত্মহারা
পার্থে আলিঙ্গিয়া কহে বিস্ফারি নয়নতারা—
"কোথা কৃষ্ণ?"—উচ্চহাসি বাসুকি উঠিল হাসি,
সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমসুধারাশি!
"কোথা কৃষ্ণ?—দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয়?
বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময়!
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে।
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায়;
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়।
কৃষ্ণ অমা-অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্ল জ্যোৎস্নায়;
কৃষ্ণ, সিন্ধু-জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধারায়।
কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে. কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে কৃষ্ণ অনলে।
বিলাস শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে।
প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র বরিষণে।
কৃষ্ণ শার্দুলের দন্তে, কৃষ্ণ নারীবিম্বাধরে।
শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সঙ্গীতস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ নয়নে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ শ্রবণে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ অধরে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম কণ্ঠস্বরে।
কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে কৃষ্ণ মজ্জায়।
কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায়!"
বক্ষের সে অস্ত্রক্ষত উত্তেজিত বিস্ফারিত
হইয়া আবেগে, রক্ত হইতেছে প্রবাহিত।

রক্তজবা হ'তে যেন রক্ত চন্দনের ধারা
ঝরিতেছে পুষ্পপাত্রে ;—বাসুকির নেত্র-তারা
আবার উঠিল ভাসি প্রেমাশ্রুতে সুশীতল,
বিষ্ণু-পদে উপজিল যেন জাহ্নবীর জল।
"কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ?" করি অসি নিষ্কোষিত,
কহিলা নাগেন্দ্র পুনঃ—"কর বক্ষ বিদারিত।
দেখিবে আমার সেই ননীচোরা নীলমণি ;
পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম ক্ষীরননী।
কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তনুখানি!
আমি তার পিতা নন্দ যশোদা জননী আমি!
শ্রীদাম সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে!
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে!
কুঞ্জে কুঞ্জে জ্যোৎস্নায় বাজে কি মধুর বাঁশী!
কি প্রেম-যমুনা বহে কি অনন্ত প্রেমরাশি!
ওই শুন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই।"—প্রেমে রোমাঞ্চিত কায়
ছুটিলা বাসুকি বেগে নাচি করতালি দিয়া,
ধরিলেন ধনঞ্জয় দুই বাহু প্রসারিয়া।
"যাক মান, যাক কুল! ছেড়ে দেও! ছেড়ে দেও!
জীবন যৌবন নাথ! ল'ও তুমি, সব ল'ও!"
কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে ভাবাবেশে মূরছিত
হইলা পার্থের বক্ষে,—দুই বক্ষ সম্মিলিত
কি শক্তের, কি কঠোর! কিবা প্রেমানলে গলি
মিলিল মিশিল, যেন রবির কিরণে জ্বলি
মিলিল মিশিল স্নিগ্ধ দুখানি কোমল ননী ;
চন্দ্র-করে যেন দুটি চন্দ্রকান্ত মণি-খনি।
দুই দিক হইতে আসি দুই নদ বিপরীত,
মিলিল মিশিল মহাপারাবারে পবিত্রিত।
অর্জুনের অংসোপরে মুগ্ধ শির বাসুকির।
বাসুকির অংসোপরে অর্জুনের মুগ্ধ শির।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে দৃঢ় প্রেম আলিঙ্গনে
স্থির দুই বীরমূর্তি, ধারা বহে দু'নয়নে।
নির্বাপিত অগ্নিগিরি শেখর হ'তে শীতল
যেন নির্ঝরিণী ধারা বহিতেছে অবিরল।

"চেয়ে দেখ মা আমার!"—কহে শৈল মুগ্ধমন—
"আর্য অনার্যের আজি চির-প্রেম-সম্মিলন!
কি শোকের মরুভূমে,—কি লীলা বুঝিবে তাঁর?—
উথলিল সুশীতল কি প্রেমের পারাবার!
পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম,—
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হইল পূর্ণ স্থাপন!
আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা! হৃদয়ে আয়!
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায়!"
মূর্ছিতা হইয়া শৈল পড়িলা ভদ্রার বুকে,
মূর্ছিতা সুভদ্রা, বসি বুকে বুকে মুখে মুখে!
আর্য অনার্যের বীর্য, আর্য অনার্যের শক্তি,
আর্য অনার্যের প্রেম, আর্য অনার্যের ভক্তি,
আর্য অনার্যের ধর্ম, কর্ম আর্য অনার্যের,
এত দূরে—এইরূপে—মিশি মহাভারতের
সঞ্চারিল নবযুগ। নবযুগ-ইতিহাস
এইরূপে, এতদূরে,—মানব-অদৃষ্টাকাশ
করিয়া আলোক পূর্ণ,—খুলিল মহিমান্বিত,
ভারতে মহাভারত হইল পূর্ণ-স্থাপিত।
ব্রাহ্মণের ধর্মগ্লানি, ক্ষত্রিয়-অধর্ম আর,
অনার্যের সংঘর্ষণ, কাঁপাবে না ভিত্তি তার।
আর্য অনার্যের এই মহাশক্তি সম্মিলিত,
গঙ্গা যমুনার মত, কিছু দূরে প্রবাহিত
হইয়া অমিশ্র স্রোতে, হইবে মিশ্রিত,
করিবে ভারতভূমি শান্তি-বারি বিপ্লাবিত
সহস্র সহস্র বর্ষ। সে শান্তি-প্লাবিত তটে
ফলিবে কতই রত্ন, নীল নৈশাকাশ পটে
অনন্ত নক্ষত্র মত! কত কীর্তি অতুলিত,
অমর, অনন্তস্পর্শী, হবে তাহে প্রতিষ্ঠিত,
অসংখ্য মৈনাক মত। মহাকাল-পারাবার
গাহিবে সে কীর্তি গীত, প্রণমিবে অনিবার।"
ভাঙ্গিল আনন্দ স্বপ্ন, জাগিল হৃদয় চারি,
জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয় মুছিয়া নয়ন-বারি
আপনার—"নাগরাজ! কর আত্ম-সম্বরণ!
কহ দয়া করি, তুমি দেখেছ কি নারায়ণ?
দেখিতে সে পদাম্বুজ বড়ই আকুল প্রাণ।
কোথায় আছেন হরি? দেখেছ কি ভগবান?"
"দেখেছি"—বাসুকি ধীরে উত্তরিলা শান্ত, স্থির,
বহিতে লাগিল পুনঃ দুনয়নে প্রেম-নীর।
"দেখেছি, কিরীটি! আমি দেখেছি নয়ন ভরি
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন হরি!
দগ্ধ মরু দেখে যথা নিদাঘের নবঘন,
দেখিয়াছি আমি সেই নররূপী নারায়ণ।
এই শিলাসনে বসি, এই নিম্ববৃক্ষতলা,
অঙ্কে বক্ষে কারু মম, প্রেমে জড়াইয়া গলা।
বড় পুণ্যবতী কারু! কি প্রেম-মূরতি খানি!

সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোথা পাব পাপী আমি!
মহাশত্রু!"—নাগপতি কাঁদিতেছে শিশু সম—
"যাদব শোণিতে সদ্য কলুষিত কর মম!
তথাপি কি ক্ষমা, দয়া! কহিলেন—'এস ভাই!
এস বক্ষে!—লীলা শেষ,—শান্তিধামে চল যাই!'
পড়িলাম পদতলে, লইলেন তুলি বক্ষে,
কি প্রেম নয়নে চাহি, কি ধারা বহিছে চক্ষে!
কি ত্রিদিব সেই বক্ষ! মরু বক্ষে কি অমৃত
ঝরিল অজস্র! প্রাণ হইল কি পবিত্রিত,
শীতলিত, কি দ্রাবিত! পাষাণ হইয়া জল
বহিতে লাগিল যেন নেত্রপথে সুশীতল।
হইলাম মূরছিত, দেখিলাম ধরাতল
শত চন্দ্রালোকে যেন হইয়াছে সমুজ্জ্বল।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, মধুর, মধুরতর,
উঠিল ভাসিয়া ধীরে, মনপ্রাণমুগ্ধকর!
কি সুন্দর পুষ্পরথ! রথ-শিরে সুদর্শন
কিবা চক্র সমুজ্জ্বল! স্তম্ভ-শিরে সুকেতন,
সুদর্শন চক্রাঙ্কিত, উড়িতেছি কি লীলায়!
কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায়!
রথে বসি নারায়ণ, অঙ্কে কারু বসি সুখে
গলা জড়াইয়া প্রেমে, বুকে বুকে মুখে মুখে
পরশিয়া ভাবাবেশে; ভাবাবেশে চরাচর
গাহিতেছে হরিনাম,—চরাচর কি সুন্দর!
গাহিতেছে হরিনাম পারাবার কি মধুর!
গাহিতেছে অন্তরীক্ষ, গাহিতেছে সুরপুর!
ভাবাবেশে দেবাঙ্গনা নাচিয়া গাহিয়া নাম,
বর্ষিতেছে সুবাসিত পুষ্পরাশি মুগ্ধপ্রাণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে নাম,
প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে গ্রহে গ্রহে অবিরাম।
সে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নাম তরঙ্গে আর,
ভাসিয়া উঠিছে রথ;—বিশ্ব শান্তি-পারাবার!
আমি রহিলাম পড়ি, হায়! মহাপাপী আমি!
যাদবের সদ্য রক্তে কলুষিত মম পাণি!
না না নাথ! জান তুমি, তুমি ত অন্তরযামী,
আমি বনপশু হীন, নহি আততয়ী আমি।
প্রকৃতির সে বিপ্লবে, সে নিশীথে বিভীষণ,
যাদব-শিবিরে পশি করেছি সম্মুখ রণ।
একটিও গুপ্ত শর, একটিও গুপ্তঘাত,—
আমি করি নাই গুপ্ত এক বিন্দু রক্তপাত।
এই দেখ অঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র-লেখা বাসুকির।
বাসুকি দুর্বাসা নহে, বাসুকি অনার্য বীর।
তুমি বাসুকিরে নাথ! করিয়াছ আলিঙ্গন
কত দয়া! কত প্রেম! নরহরি! নারায়ণ!"
আরবার বাসুকির হইতেছে ভাবাবেশ,
কাঁপিতেছে দেহ, নেত্র হইতেছে নির্নিমেষ।
পুলকিত, রোমাঞ্চিত, হইতেছে কলেবর,
হইতেছে স্বেদোদ্গম, দু' নয়নে দর দর
বহিতেছে প্রেমধারা, কি যেন আনন্দ-নীরে
হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে।
বাসুকি আবিষ্ট কণ্ঠে কহে—"দেখ কি সুন্দর!
কি সুন্দর বৃন্দাবন। কি কদম্ব মনোহর!
কি জ্যোৎস্না! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে হাসি!
কি পুষ্প-সৌরভ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশী।
কি প্রেমমূরতি শিশু, কি প্রেম-নয়নধারা!
গলা জড়াইয়া কারু প্রেমময়ী আত্মহারা!
ওই বাজিতেছে বাঁশী কি মধুরে—'আয়! আয়'
এই যাই, এই যাই!"—বাসুকি ছুটিয়া যায়
দুই বাহু প্রসারিয়া; মহাভাবে প্রেমভরে
পড়িছে ধরায়, পার্থ ধরিলেন ক্ষিপ্রকরে।
রাখিলেন সুভদ্রার অঙ্কে শ্লথ মূর্দ্ধ শির;
বসিলেন শৈল, পার্থ, পদতলে বাসুকির
লয়ে বক্ষে পদতীর্থ। ভাবাবিষ্ট তিন জন
রহিলেন চাহি শূন্যে সেই প্রেম-বৃন্দাবন।
প্রেমাশ্রু নয়নে, প্রেম আনন্দে চিত্ত অচল,
শুনিলেন সেই বাঁশী, সেই যমুনার কল।
সুভদ্রার অঙ্ক-স্বর্গে শুইয়া আনন্দ মনে
মহাভাবে গেলা চলি বাসুকি সে বৃন্দাবনে।
কাঁপিল বসুধা যেন মহাভাবে বিকম্পিত;
গরজিল সিন্ধু যেন মহাভাবে উচ্ছ্বসিত।
ঘোরাল প্রকৃতি মূর্তি; দিনে নাহি দিবাকর;
মহাভাগে সমাধিস্থ যেন বিশ্ব চরাচর।

দ্বাদশ সর্গ

কর্মফল

রৈবতক যোগশৃঙ্গে, বিটপি-ছায়ায়,
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস অজিন আসনে।
বসি চারিদিকে ধ্যান-মগ্ন ঋষি প্রায়
কুরঙ্গ, শশক, মেষ শার্দূলের সনে।
অপরাহ্ণ শেষ। মহা আকাশ মণ্ডল
উপরে সুনীল শান্ত,—শান্তি-নিকেতন
যেন নারায়ণ বক্ষ যোগে অবিচল,
আবরি হিরণ্যগর্ভে অনন্ত ভুবন।
নিম্নে প্রভাসের সিন্ধু সুনীল উজ্জ্বল,
অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে শ্বেত পুষ্পাবৃত ;—
যেন নারায়ণ বক্ষ লীলায় চঞ্চল,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত, শ্বেত চন্দনে চর্চিত।
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি সুন্দর
বিরাজিছে বসুধার বক্ষে সুশ্যামল!
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি সুন্দর
বিরাজিছে মহর্ষির বক্ষে সুশীতল!—
দেখিলেন ধনঞ্জয়, অজিন আসনে
বসি মহর্ষির পার্শ্বে শোকে উদ্বেলিত ;
কি যেন গৈরিক বৃষ্টি, ভীম ভূকম্পনে,
করেছে হৃদয় রাজ্য ঘোর বিপ্লাবিত।
কহিলেন সব্যসাচী—"হায়! দেব! আমি
দেখিয়াছি দ্বারবতী ;—সে অমরাবতী
করেছিল অনাথার হাহাকার বাণী,
অনাথার অশ্রুধারা, কি যে স্রোতস্বতী ;
উৎসবের নাট্যালয়ে মধ্য অভিনয়ে
গিয়াছে চলিয়া যেন অভিনেতাগণ ;
সজ্জিত আলোকে ফুলে সেই রঙ্গালয়ে
অনাথা রমণী শিশু করিছে ক্রন্দন!
দেখিলাম বজ্রসম কঠিন হৃদয়ে
সে শোকের সতীত্বের স্বর্গপুণ্যময়!
করি বজ্রাঘাত সেই পুরে নিরদয়
কহিলাম—"তিরোহিত হরি লীলাময়!"
কহিলাম—"সত্যভামা! করেতে তোমার
করেছেন সমর্পণ নর-নারায়ণ
ধ্বংস-শেষ কুলভার, শিশু, অনাথার।
লও এই ভার—শোক কর সম্বরণ!
সপ্ত দিবানিশি পরে এই লীলাভূমি
দ্বারবতী সিন্ধুগর্ভে হবে নিমজ্জিত,—
বলেছেন লীলাময়। পুণ্যবতী তুমি
চল ইন্দ্রপ্রস্থে, শোক কর তিরোহিত!'
কি আলোকে রুক্মিণীর উঠিল ভাসিয়া
নিরুপমা সেই রূপ! কি হাসি অধরে
ঈষৎ—ঈষৎ—শান্ত! উঠিল হাসিয়া
অরুণ গোলাপে সিক্ত শিশির শীকরে।
কি আনন্দ দুনয়নে প্রেমে ছল ছল!
পতিপ্রাণা নববধূ প্রেম আবাহন—
শুনেছে পতির যেন! অঙ্গ ঢল ঢল
অনুরাগে, অনুরাগে প্রফুল্ল বদন।
আবেশে অবশ দেবী গলা জড়াইয়া
পড়িলেন সপত্নীর বক্ষে স্বর্গোপম।
সেই হাসি, সে আনন্দ, রহিল ভাসিয়া
চিত্রে যেন ; ধীরে দেবী মুদিলা নয়ন।
পূর্ণিমা নিশান্তে চন্দ্রে জ্যোৎস্না যেমন,
মিশাইল পতিপদে সতীর জীবন।
সুপ্ত আনন্দের মূর্তি পর্যঙ্কে রাখিয়া,
পাদপদ্ম নিজশিরে করিয়া গ্রহণ,
সত্যভামা মহাশোকে কহিলা কাঁদিয়া,
—আনন্দের পদতলে শোকের ক্রন্দন,—
'তুইও দিদি! পাপিনীরে করি বিসর্জন
এই শোক দাবানলে, গেলি চলি হায়!
কর আশীর্বাদ! আজ্ঞা পালি নিরমম
দুজনার পাদপদ্ম দাসী যেন পায়!'
পতি দেব, পত্নী দেবী,"—শোকে ফাল্গুনির
রুদ্ধকণ্ঠ, দুনয়নে বহিতেছে নীর।
প্রেমে শোকে ছল ছল নেত্র মহর্ষির ;
চাহি জলধির পানে চারি নেত্র স্থির।
"মানব খাণ্ডবানল, ভীষণ শ্মশান,
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র ;"—কহিলা অর্জুন—
"দেখিয়াছি হায়! দেব! প্রভাসে আবার
পৃথিবী গগনব্যাপী সেই চিতাগুন!
দেখিয়াছি আবার ক্ষত্রিয়া রমণী,
—মাথায় মঙ্গলঘট সবারি পল্লব,—

গাহিয়া মঙ্গলগীত, বিদ্যুৎবরণী
আরোহিত সেই চিতা।"—আবার নীরব
হইলেন মহেষাস ; কহিলা কাঁদিয়া,
না পারি রাখিতে চাপি হৃদয়-উচ্ছ্বাস—
"কহ দেব। এইরূপে নির্ম্মম হইয়া
কেন করিলেন হরি স্বকুল বিনাশ ?"

ব্যাস

স্মরি সেই মহাগীতা, মহাগীতাকার,
অর্জ্জুন। সম্বর শোক। জান ভগবান
এক, অদ্বিতীয়, সত্য ; বিশ্ববীজাধার ;
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ; অব্যক্ত মহান্।
সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে
ছুটে মহাবিবর্ত্তন প্রবাহ যখন,—
অব্যক্তির মহাব্যক্তি, আলোক বিকাশ
বিদ্যুতের,—হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ।
ক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর—
গ্রহ, উপগ্রহ, জীব,—হয় বিবর্ত্তিত।
ক্রমে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে অমর,
কারণ সচ্চিদানন্দে হয় নিবর্ত্তিত !
তিনি বিশ্বরূপ ;—তিনি কারণে ঈশ্বর ;
সূক্ষ্মেতে হিরণ্যগর্ভ ; বিরাট আবার
স্থূল বিশ্বে। সৃষ্টি স্থিতি লয় নিরন্তর
হইতেছে বিবর্ত্তনে দেখ চক্রাকার !
দেখ ওই পারাবার। শান্ত ভাব তার
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান।
মহাস্রোত,—বিবর্ত্তন ; এ বিশ্ব সংসার,—
ঊর্ম্মিমালা ; জীব,—জলবিম্ব কর জ্ঞান।
সিন্ধুগর্ভে স্রোতবলে তরঙ্গ ফেনিল
জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন,
মিশাইছে সিন্ধুগর্ভে,—সলিলে সলিল ;
সিন্ধুর সলিল, শক্তি, থাকিছে তেমন।
তেমতি হিরণ্যগর্ভে—অব্যয়, অক্ষয়,—
বিবর্ত্তন কারণের প্রবাহে জন্মিয়া,
অনন্ত জগৎ স্থূল,—তরঙ্গ নিচয়,—
আবার হিরণ্যগর্ভে যাইছে মিশিয়া
কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে আর
জীবগণ বিবর্ত্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ;
কালারম্ভে এককর্ম্মী, এক কর্ম আর,
এক মহাকর্ম্ম নীতি,—নীতি-বিবর্ত্তন।
এই মহাকর্ম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত,
জড় চেতনের কর্ম-চক্র ক্ষুদ্রতর ;
কর্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
হয় আবর্ত্তিত চক্রে জন্মজন্মান্তর।
কর্ম্মফলে জন্ম, পার্থ। মৃত্যু কর্ম্মফল ;
কর্ম্মফল সুখ দুঃখ। করিবে রোপণ
যেইরূপ বীজ, পাবে অনুরূপ ফল,
কুবৃক্ষে সুফল নাহি ফলিবে কখন।
জন্মিয়া সচ্চিদানন্দে সৃজি চরাচর,
ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্র বিবর্ত্তন।
সেই সৎ চিদানন্দে গতি নিরন্তর,
জড় চেতনের মহাধর্ম সনাতন।
কর কর্ম্ম, এই গতি করি অনুসার,—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠতর।
কর কর্ম, এই গতি প্রতিকূলে আর,—
পশুত্ব—জড়ত্ব—পাবে জন্মজন্মান্তর।
দেখ বিবর্ত্তন গর্ভে করে আকর্ষণ
জীবে জীব, জলে জল। হইবে অঙ্কিত
কর্ম্মফলে যে প্রকৃতি আত্মায় যখন,
সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত
জন্মান্তরে। কর ঊর্দ্ধে ইষ্টক ক্ষেপণ,
পৃথিবীর আকর্ষণ হইল অতীত,
পড়িবে না ; সেই গ্রহে করিবে গমন,
সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত।
থাকে পশু আকর্ষণ, প্রবৃত্তি জড়ের,
পশুত্বে জড়ত্বে তব হইবে জনম।
থাকে দেব আকর্ষণ, প্রকৃতি দেবের,
দেবলোকে, শ্রেষ্ঠলোকে, করিবে গমন।
এইরূপে লভি গতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর,
হইলে জীবাত্মা সৎচিদানন্দময়,
মিশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর,
হবে বিম্ববারি মহাপারাবারে লয়।
এরূপে সচ্চিদানন্দে সৃষ্ট বিবর্ত্তনে,
এরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিত চরাচর ;
এরূপে সচ্চিদানন্দে লয় বিবর্ত্তনে
হইতেছে চরাচর কল্পকল্পান্তর।
কেন এই বিবর্ত্তন ? কেন এ সংসার ?—
তাঁর মায়া তাঁর ছায়া, প্রকৃতি তাঁহার !
এই বিবর্ত্তন গতি,—জগৎ মঙ্গল,—
অনুকূলে প্রতিকূলে কর্ম অনুসার

ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য। এই কর্মফল
জন্ম মৃত্যু মানবের, সুখ দুঃখ আর।
কেন প্রতিকূল কর্ম করি আমি নর?—
চৈতন্যের বিশ্ব আমি! আমি ইচ্ছাময়!
চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর
এ ইচ্ছার স্বাধীনত্বে, জান ধনঞ্জয়!
এই বিবর্তন গতি,—জগৎ মঙ্গল,—
কর প্রতিরোধ, হও অধর্মে পতিত,
বিবর্তন মহাশক্তি দিয়া কর্মফল
যাইবে বহিয়া করি তোমায় পেষিত!
অধর্মের অভ্যুত্থান দেখ কি ভীষণ
সেই কুরুক্ষেত্রে, এই প্রভাসে আবার!
ক্ষত্রিয়ের কর্মফল হায়! নিরমম
কুরুক্ষেত্রে, এ প্রভাসে যাদবের আর!
ছুটিয়াছে বিবর্তন,—মানব মঙ্গল,—
উড়াইয়া তৃণবৎ মত্ত ঐরাবত—
অধর্মী ক্ষত্রিয় জাতি! কি শান্তি শীতল
ধর্মরাজ্য ছায়াতলে লভিছে ভারত!

অর্জুন

কিন্তু কর্মফল-রেখা করিতে মোচন
নাহি কি পারেন হরি পতিতপাবন?

ব্যাস

পারেন—পতিত যদি আত্ম সমর্পণ
করে পাদপদ্মে তাঁর, পাণ্ডব যেমন।
পতিতের পাপকর্মে প্রবৃত্তি তখন
থাকে না কৃপায় তাঁর। পুণ্যকর্মফলে
পাপকর্মফল-রেখা হয় বিমোচন,
অঙ্গারের রেখা যথা নিরমল জলে।
জন্মান্ধ দেখে না চন্দ্র। কর্মান্ধ তেমন
দেখে না বিশ্বের কৃপাময় সুধাকর।
দেখিল না ক্ষত্রিয়েরা; আপন স্বজন
দেখিল না যাদবেরা, কর্মান্ধ পামর।
এই রূপ কর্মান্ধেরে না কর সংহার,
আপনার কর্মপথ, কর্মপথ আর
মানবের, করিবে সে কণ্টক-আধার;—
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র কৃপা পারাবার!
রাজসূয়ে ধর্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত
ছিল কত দিন বল? কত দিন বল
—থাকিলে ক্ষত্রিয়জাতি, যাদব পতিত—
থাকিত এ অট্টালিকা বালিতে চঞ্চল?
কুরুক্ষেত্রে ধর্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত,
হয়েছিল যাদবের পাপে সচঞ্চল
ভিত্তিমূল। হইয়াছে প্রস্তরে প্রোথিত
সেই ভিত্তি;—গাও, পার্থ! মানব মঙ্গল!

অর্জুন

দেখিয়াছি, প্রভু, আরো দৃশ্য ঘোরতর!
আসিলাম কৃষ্ণাদেশে দ্বারবতী ছাড়ি
যবে নাগরিক সহ, কি যে ভয়ঙ্কর
ভূমিকম্পে, জলকম্পে সমুদ্রের বারি
প্লাবিল সে মহাপুরী তরঙ্গে ভীষণ,
বালকের ক্রীড়াপুরী যেন তীরস্থিত।
সিন্ধুগর্ভে, ধরাগর্ভে, কি ঘোর গর্জন!
হইল মুহূর্তে সেই পুরী অন্তর্হিত!
সেই মহা সাম্রাজ্যের চিহ্ন নাহি আর!
চিহ্ন মাত্র নাহি দেব! সে মহালীলার।

ব্যাস

তাঁহার সাম্রাজ্য পার্থ! লীলাস্থল নয়
ক্ষুদ্র দ্বারবতী, নহে ক্ষুদ্র বৃন্দাবন।
তাঁর রাজ্য লীলাস্থল, মানব হৃদয়।
তাঁর রাজ্য, বিশ্বরাজ্য; তিনি নারায়ণ।
তাঁর রাজ্য, ধর্মরাজ্য,—করিতে প্লাবিত
নাহি সাধ্য সমুদ্রের। কাল-পারাবার
চুম্বিয়া চরণ তট হবে প্রবাহিত,
লইয়া চরণরেণু মস্তকে তাহার।
কৌরবের রাজ্য, আর রাজ্য যাদবের,
বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা, হস্তিনা,
কেবল নিমিত্ত মাত্র ধর্ম সাম্রাজ্যের
অদ্ভুত নির্মাণপথে,—অপূর্ব মহিমা!
মানব হইত ভ্রান্ত এ রাজ্য পার্থিব
থাকিলে পৃথিবীবক্ষে; পশ্চাতে তাহার
দেখিত না অন্ধ নর সে রাজ্য ত্রিদিব;
দেখিত না লীলাময় যুগ-অবতার।
নাহি সেই বৃন্দাবন; নাহি দ্বারবতী;
রহিবে না ইন্দ্রপ্রস্থ; রবে না হস্তিনা।
রবে সেই রাজ্য, রবে সে অমরাবতী।
ব্যাপিবে অনন্তকাল সে রাজ্য-মহিমা।
জগৎ,—ভারত মত,—ছায়ায় তাহার
পাইবে অনন্ত শান্তি, জুড়াইবে প্রাণ;
মানব অনন্তকাল লভিবে উদ্ধার,
প্রেমানন্দে সমধুর গাহি কৃষ্ণনাম!

বহিছে মহর্ষি-নেত্রে ধারা দর দর,
    বহিতেছে দর দর নেত্রে ফাল্গুনির।
আত্মহারা কিছুক্ষণ চাহি স্থিরতর
    অপরাহ্ণ সিন্ধুপানে মুরতি গভীর।

অর্জুন

নিবেদিব হায়! দেব চরণে কেমনে
    এ শোক-কাহিনী-শেষ? যেই মনস্তাপ
জ্বলিছে দাবাগ্নি মত মরমে মরমে
    কেমনে দেখাব আমি, চিত্রিব সে পাপ?
লইয়া চতুর্দশীর শশি-রেখা-শেষ,—
    হত-শেষ যদুকুল,—অনাথা রমণী,
অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ,—পঞ্চনদ দেশ
    করিনু প্রবেশ যবে, মহর্ষি! তখনি
আক্রমিল দস্যুগণ; করিল হরণ
    রত্নরাজি, অশ্ব রথ; করিল হরণ
যাদব-রমণীরত্ন;—আমি নরাধম
    সে দৃশ্যও ভগবন্! করেছি দর্শন!
যে গাণ্ডীব ছিল মম কার্মুক ক্রীড়ার,
    নাহি শক্তি সে গাণ্ডীবে করি জ্যারোপণ।
নাহি পড়ে অস্ত্র মনে; নাহি বল আর
    কুরুক্ষেত্র-জয়ী ভুজে; হায়! অদর্শন
হইয়াছে সেই দেব-সারথি আমার,—
    শক্তিরূপী নারায়ণ। নাহি প্রবাহিত
কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর্য ধমনীতে আর;—
    করি শিলাময় চন্দ্র, রবি অস্তমিত।
হয়েছে গাণ্ডীব যেন যষ্টি স্থবিরের।
    তাহাতে করিয়া ভর করিনু দর্শন।
সে লুণ্ঠন, সে হরণ। হায় প্রবীণের
    শুনিলাম, হাহাকার, শিশুর রোদন!
দেখিলাম অধর্মের যেই অভ্যুত্থান
    করি নাই কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে দর্শন;—
সুরামত্তা যাদবীরা, কামাসক্ত প্রাণ,
    করিল তস্করগণে আত্মসমর্পণ।
দেখিতেছি এই দৃশ্য; গাণ্ডীব বাহিয়া
    পড়িতেছে অশ্রুধারা,—পড়িছে তরল
ফাল্গুনির মনস্তাপ; রহিয়া রহিয়া
    শেষ গৈরিকের ধারা তরল অনল,
পড়িছে বহিয়া ধীরে যেন নির্বাপিত
    আগ্নেয় ভূধর অঙ্গে, অঙ্গে ফাল্গুনির;

দেখিতেছি এ নরক,—দেব! আচম্বিত
    কি স্বর্গ উঠিল ভাসি নেত্রে এ পাপীর!
অশ্বপৃষ্ঠে দুই নারী,—দেবী কি মানবী!—
    এ নরকে তারা-বেগে করিল প্রবেশ।
কি শান্তি প্রতিমা দুটি, কি করুণা ছবি!
    পবিত্র গৈরিক বাহি পড়িয়াছে কেশ।
দুই পবিত্রতা মূর্তি—রহেছে চাহিয়া
    দস্যুগণ পাষাণের মুরতি যেমন;
পাষাণ-প্রতিমা যেন আছে নিরখিয়া
    পাপিষ্ঠা যাদবীগণ;—অপূর্ব দর্শন!
থামিয়াছে কোলাহল; নীরব প্রান্তর;
    অনিশ্বাস নাসা; প্রাণ যন্ত্র অবিচল।
কি যেন তাড়িত-স্রোত করিল সত্বর
    চিত্রে পরিণত দেব! সে লুণ্ঠনস্থল
স্থবির রোরুদ্যমান রয়েছে চাহিয়া;
রয়েছে রোরুদ্যমান চাহি শিশুগণ;
রহেছে চাহিয়া দস্যু, ভুজে আলিঙ্গিয়া
    হৃতা নারী-রত্ন, করে লুণ্ঠনের ধন।
মধ্যস্থলে দুই অশ্ব স্থির, অবিচল;
    সুভদ্রা শৈলজা অশ্বে স্থিরা অবিচলা
স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে সে লুণ্ঠনস্থল;
    মেঘপৃষ্ঠে শরতের দুই শশিকলা।
মুহূর্তেক পরে দেব! চলিল ছুটিয়া
    অনার্য তস্করগণ। যদুকুল জায়া
ছুটিল পশ্চাতে,—এও আসিনু দেখিয়া!—
    পাপের পশ্চাতে যেন কর্মফল-ছায়া।
যাইতে ছুটিয়া এক যাদবী পাপিনী
    ঈর্ষায় হানিলা বর্শা বক্ষে সুভদ্রার।
ছুটিল শৈলর অশ্ব, করুণারূপিণী
লইল পাতিয়া বর্শা বক্ষে আপনার।
    তিরোহিত নারায়ণ; ধ্বংস যদুকুল;
    নিমজ্জিত দ্বারবতী গর্ভে জলধির;—
ততোধিক প্রাণ দেব! হয়েছে আকুল
    নিরখি পতন ঘোর যদু-রমণীর।
আসিল প্রভাসে ভদ্রা ল'য়ে শৈলজায়
    আহতা করুণাময়ী। করি অতিক্রম
দস্যুভূমি পঞ্চনদ, সাম্রাজ্য-ছায়ায়
    প্রবেশিয়া পাণ্ডবের করিয়া প্রেরণ
ধ্বংসশেষ, হতশেষ, যাদবী যাদব
    ইন্দ্রপ্রস্থে প্রজাসহ, আসিনু হেথায়

জুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব
মহর্ষির কল্পতরু চরণ-ছায়ায়।
সহিত না প্রাণে মম আত্ম-বিনাশের
সেই মহা শোকদৃশ্য; ধৈর্য-বীর্য-চ্যুত
পারিত না ধনঞ্জয় রাখিতে উদ্ধার
যাদবের; তাই বুঝি ছিনু অনাহূত
প্রভাস উৎসবে! দেব! বালকের বল
নাহি ভুজে, নাহি ভগ্ন হৃদয়ে আমার।
রথী-হীন দেহ-রথ হয়েছে অচল,
অপার্থ হয়েছে পার্থ;—কি কর্তব্য তার?

ব্যাস

গাণ্ডীবীর পরাভব, যাদবী হরণ,—
সকলি তাঁহার লীলা! মহিমা পূরিত
দুই ভাবী ইতিহাস, পার্থ! নিরুপম
এই দুই ঘটনায় হয়েছে সূচিত।
যাদবী হরণে আশু হইয়া মিশ্রিত
রক্ত আর্য অনার্যের, ব্যাপিয়া ভারত
কিছু দিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্মরাজ্য-ছায়াতলে। আলোকি জগৎ
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাহিয়া।
আর্য অনার্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান
করিবে সৃজন পার্থ! যুগ যুগান্তর।
ভারতের মরুস্থান হবে রাজস্থান!
তরঙ্গে তরঙ্গে কত বিপ্লব ভীষণ
এই নব শক্তি-মূলে হইয়া প্রহত
হবে ভগ্ন, ওই সিন্ধু-তরঙ্গে যেমন;
হৃদে কৃষ্ণ, ভুজে পার্থ, নব ধর্মব্রত
রবে যত দিন পার্থ! এ মহাভারত
রহিবে অচল দৃঢ় হিমাচল প্রায়।
এই কালে কত রাজ্য জল-বিম্ববৎ
উঠিবে পড়িবে মহাকালের ক্রীড়ায়।
গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের নাহি কার্য আর
এ ভারতে; নাহি কার্য ভারতে আমার।

আমরা সলিল-বিম্ব যে মহালীলার,
সেই লীলা শেষ, বিম্ব কি করিবে আর?
এ আশ্রম সিন্ধু-গর্ভে হবে নিমজ্জিত;
হিমাচলে মহাধ্যানে হব নিমগন।
রাখি বজ্রে ইন্দ্রপ্রস্থে, রাখি পরীক্ষিত
হস্তিনায়, কর মহাপ্রস্থান এখন
পঞ্চ ভ্রাতা, সহ ভোজ অন্ধক কুকুর—
হত-শেষ যদুকুল। লঙ্ঘি হিমাচল,
ক্রমে ক্রমে বহু দেশ, জনপদ পুর,
করিয়া লঙ্ঘন, এই মহাযাত্রীদল,
—অসংখ্য মানব জাতি, পশু নির্বিশেষ,
পতিতপাবন নামে করিয়া উদ্ধার,
করি পশু নর, মহামরু মহাদেশ,—
হরিকুল—যদুকুল,—স্রোত দুর্নিবার
'লোহিত সাগর' তীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে, পশ্চিমে সুদূর।
খুলিবে কি ইতিহাস! করিবে পূরিত
কি অমৃতে, অমরত্বে, কি মরু বন্ধুর!
হইয়া উত্তরবাহী করিবে স্থাপিত
সুপবিত্র যদুরাজ্য, পুণ্য যদুপুর,
পূরব উত্তর তীরে 'লবণ সিন্ধুর'।
গিয়াছেন হলধর সহ হরিকুল
সিন্ধুর উত্তর তীর করিতে কর্ষণ
মহা নবধর্ম হলে। জগতে অতুল
কত আর্য মহারাজ্য করিবে স্থাপন
ত্রিকূলে ভূমধ্য সেই 'লবণ সিন্ধুর',
এই দুই যাত্রীদল! কতই জগৎ
নূতন, নূতনতর! ব্যাপিয়া সুদূর
করিয়া আলোকময় নব-ভবিষ্যত!"

সেই মহাভবিষ্যত যেন উদ্ঘাটিত
মহর্ষির দুনয়নে। কপোল বহিয়া
কি আনন্দধারা বক্ষ করিছে প্লাবিত!
কি মূর্তি মহিমাময়! কি ধ্যানে বসিয়া!
কি যেন অদৃশ্য সূক্ষ্ম তাড়িত পরশে
হইল পবিত্র দেব-দেহ রোমাঞ্চিত।
"আসি মা!"—কহিয়া উঠি যেন ধ্যানবশে
চলিলেন; চলিলেন ফাল্গুনি বিস্মিত।

ত্রয়োদশ সর্গ

ভবিষ্যৎ

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
 সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
মিশাইছে ধীরে ধীরে প্রভাস সিন্ধুর বক্ষে,—
 সিন্ধু যেন নারায়ণ শান্তির আলয়।
সভস্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে বেলা-ভূমি,
 ধূসর-বসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—যেন মহানির্বাণের গীত
 শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী।
সেই শিলাসনে হরি হইলেন তিরোহিত
 সেই শিলাপাদমূলে, শিলা অন্তরে,
বসিয়া সুভদ্রা দেবী উদাসিনী শান্তিময়ী,
 প্রথম শিলায় শির রাখি ভক্তিভরে।
শৈলজা শায়িতা অঙ্কে, উদাসিনী শান্তিময়ী,
 সৌন্দর্যের স্বপ্ন মুখ বক্ষে সুভদ্রার;
যোগস্থা যোগিনী শৈল নিমীলিত দু'নয়ন,—
 অম্বুজ স্তবকে মালা অপরাজিতার।
শিরদেশে দ্বৈপায়ন, পদতলে ধনঞ্জয়,
 দাঁড়ায়ে মূরতি মত স্থির তিন জন,
শান্তিলীলামৃতে ভরা করুণা-ত্রিদিব মুখ,
 করিছেন অনিমিষ নেত্রে দরশন।
মেলিল নয়ন শৈল; শান্তির ঈষদ হাসি
 ভাসিল অধর প্রান্তে, ভাসিল নয়নে,—
 ভাসিল জ্যোৎস্না যেন সুনীল দর্পণে।
চাহি দ্বৈপায়ন প্রতি সজল নয়নে শৈল
 কহিল—"করুণাময়! করেছি স্মরণ
 অন্তিমে, দুহিতা শিরে দেও শ্রীচরণ!—
দেও পাদপদ্ম পিত!"—কহিল চাহিয়া পার্থে—
 "দেশ দেশান্তরে তুমি যেই অনাথায়
খুঁজিলে অধীর শোকে, ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে
 চাহিলে দুহিতা মত বসাইতে, হায়!
দেখ সে দুহিতা তব, মাতা সুভদ্রার অঙ্কে,
 কি ছার খাণ্ডব রাজ্য তুলনায় তার?
তোমার কৃপায় আজি পতি মম নারায়ণ!
 যেই প্রেমগঙ্গা পদে জন্মিল তোমার,
 পাইয়াছে নারায়ণ প্রেম-পারাবার!
পেয়েছ দুহিতা তুমি, আমি পাইয়াছি পতি,
 হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম,
 লও দুহিতায় বুকে, গাও কৃষ্ণনাম।"
"মা! মা"—কাঁদি উচ্চস্বরে, অর্জুন অধীর শোকে
 পড়িলেন সেই ক্ষুদ্র বক্ষে শৈলজার।
দুই ভুজে প্রেম ভরে জড়ায়ে পার্থের গলা,
 —শোভিল গলায় যেন নীলমণি-হার,—
 আছে শৈল চাহি মাতৃ-মূর্তি করুণার।
কহিলেন ধনঞ্জয়—"মা! তোর এ ক্ষুদ্র বুক
 অর্জুনের শান্তিধাম, ত্রিদিব তাহার;
অর্জুনের এই স্বর্গ, তুই মা করুণাময়ী
 লইবি কি কাড়ি,—করি মরু এ সংসার?
তিরোহিত নারায়ণ; ধ্বংসশেষ যদুকুল;
 স্বপ্নশেষ দ্বারবতী, চিহ্ন নাহি তার;—
বড়ই আকুল প্রাণ! মরুভূমি এ সংসার!
 একই সান্ত্বনা তুই পার্থ সুভদ্রার।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, ভুলিনু পুত্রের শোক,
 ভুলিনু সংসার মা গো! দেখি তোর মুখ।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, আশ্রম কুটীর খানি
 হয়েছিল কি স্বর্গ মা! কি স্বর্গ এ বুক!
আমাদের এই স্বর্গ, আমাদের এই শান্তি,
 হরিয়া কি যাবি তুই দিয়া নব শোক?
পাইয়াছি পুত্রশোক, দিয়া এই পুত্রীশোক,
 জীবন সন্ধ্যার শেষ হরিয়া আলোক?
বড় সাধ ছিল,—তোরে, অভিরে, লইয়া বুকে,
শুইয়া ভদ্রার অঙ্কে, শিরে হৃষীকেশ
 পাদপদ্ম, করিব এ জীব-লীলা শেষ।
কিন্তু পুরিল না সাধ। অভিমন্যু গেল চলি;
 অন্তর্হিত নারায়ণ; তুই মা আমার
গেলে চলি এইরূপে, হায়! পার্থ সুভদ্রার
 এ জগতে কে রহিল, কি রহিল আর?
অস্তমিত প্রভাকর, জগতের যুগ-সূর্য,
 অন্তর্হিত যদুকুল কিরণ তাঁহার।
একটি কিরণ-বিন্দু তুই কাদম্বিনী-বক্ষে
 আছি আমি, তুই গেলে রব কোথা আর?

যাবি যদি, ল'য়ে চল তোর করুণার বক্ষে
যথা পুত্র, যথা কন্যা যাইবি আমার!—
রুদ্ধকণ্ঠবাষ্পে, কথা সরিল না আর।
শৈলজা সজলনেত্রে চাহি অর্জুনের মুখ
কহিল—"এ শোক পিত! কর পরিহার!
শৈলের কি শুভ দিন! এমন কে আছে বল
এ জগতে ভাগ্যবতী মত শৈলজার!
শুয়েছে কি মহাতীর্থে, কি পবিত্র দেব-বুকে,
আসিয়াছে কি সুন্দর লয়ে পুষ্পরথ
তার পুত্র, পুত্রবধূ,—উত্তরা ও অভিমন্যু,—
আসিয়াছে পিতা মাতা,—কি পুণ্য জগৎ।"
নীরব, নয়ন স্থির, চাহিয়া অনন্তাকাশে
কিছুক্ষণ সে জগৎ, কহিল আবার—
"কেবল একটি ভিক্ষা চরণে তোমার।
ওই দেখ নিম্ব বৃক্ষ, পবিত্র ছায়ায় যার
হইলেন তিরোহিত নর-নারায়ণ,
এই কাষ্ঠে দারুমূর্তি, অনার্য শিল্পীর করে
নীল মাধবের পিত! করিবে সৃজন।
এক পার্শ্বে জগন্নাথ, অন্য পার্শ্বে ধনঞ্জয়,
শান্তির প্রতিমা মধ্যে সুভদ্রা জননী,
অনন্ত করুণাময়ী পতিতপাবনী।
প্রভাস সিন্ধুর তীরে এই তিরোধান ক্ষেত্রে,
মন্দির গগনস্পর্শী করি বিনির্মিত,
এই তিরোধান-শৈলে নির্মাইয়া রত্নবেদি,
নবধর্ম মহামূর্তি করিবে স্থাপিত।
সেই মন্দিরের ছায়া পড়িবে এ সিন্ধু বক্ষে,
পড়িবে কালের বক্ষে, যুগ যুগান্তর;
অনন্ত মানব যাত্রী দেখি চূড়া সুদর্শন,
যাবে সিন্ধুযাত্রী মত, জন্ম জন্মান্তর
অনন্ত শান্তির তীরে; কতই বিপ্লব ঘোর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি মন্দির-ভিত্তির
প্রহারিবে পাদমূলে; হবে যুগে যুগে কত
স্থানান্তর, রূপান্তর, মূরতি, মন্দির!
এ মন্দির, এ মূরতি, নীল মাধবের, পিত!
অনার্যের করে তুমি করিবে অর্পণ;
যুগে যুগে, বনে বনে, বিপ্লবের হুতাশনে,
রক্ষিবে পতিত মূর্তি—পতিতপাবন।
আর্যদের আছে জ্ঞান, আছে শাস্ত্র আর্যদের,
অনন্ত শাস্ত্র-শিক্ষক আছে ঋষিগণ;
পতিত অনার্যদের কিছু নাই, কেহ নাই,
দিও তাহাদের মূর্তি পতিতপাবন।
এই মন্দিরের ক্ষেত্র আর্যের ও অনার্যের
হইবে শ্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলন ধাম;
অনার্য ব্রাহ্মণ-আর্য গাবে এক কৃষ্ণনাম,—
আর্য ও অনার্য এক প্রেমে ভাসমান,—
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম।"
অর্জুন উচ্ছ্বাসে মত্ত, কহিলেন—"মা! আমার!
অর্জুন, অর্জুন-পৌত্র, প্রপৌত্র তাহার,
করি শূন্য কোষাগার ইন্দ্র-প্রস্থ হস্তিনার,
পালিবে মা! তোর আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা আমার
কেবল একটি ভিক্ষা,—বীরঘাতী ধনঞ্জয়,
অর্জুন আকণ্ঠ বীর-রক্তে নিমজ্জিত;
এ মহাবেদির বক্ষে বসাইলে এ পাপীরে,
এ পবিত্র বেদি মা গো! হবে কলুষিত।
অর্জুনের পাপ নাম, অর্জুনের পাপকীর্তি,
এই ভস্মরাশি মত সিন্ধুতীরস্থিত,
অচিরে কালের সিন্ধু পবিত্রিয়া ধরা বক্ষ,
একই উচ্ছ্বাসে যেন করে অপনীত।
মধ্য মূর্তি জগন্নাথ, শৈলজা সুভদ্রা পার্শ্বে,
বিরাজিবে কাল-বক্ষে এ তিন মূরতি।
মধ্যে হরি হিমাচল, পার্শ্বে প্রেম-স্রোতস্বতী
বহিবে অলকনন্দা, মাতা ভাগীরথী।"
হইল মলিন মুখ শৈলজার, শৈল যেন
পাইল পরম ব্যথা, সজল নয়ন
কহিল কাতরে শৈল—"ধনঞ্জয় মহাপাপী!
কৃষ্ণ-সখা পাপী! তবে পাপী নারায়ণ!
তাঁর রাজ্যে কত হত্যা! কি জীব-শোণিত-সি
হইতেছে তাঁর রাজ্যে নিত্য প্রবাহিত!
সেই মহাহত্যা-ক্ষেত্র তুলনায় কুরুক্ষেত্র,
অনন্ত সিন্ধুর কাছে বিন্দু পরিমিত।
যার ভুজবলে এই বিরাজিছে মহারাজ্য,
বিরাজিছে মহাশান্তি ব্যাপিয়া ভারত,
যাহার বীরত্ব গাথা, যার করুণার কথা,
গাহিছে, অনন্ত কাল গাহিবে জগৎ।
অধার্মিক মহাপাপী আজন্ম শত্রুর প্রতি
রণক্ষেত্রে করুণায় শ্লথ কর যার,
আমি পতিতার প্রতি করুণার এ প্রবাহ,
পাপী সেই বলদেব, দেবতা আমার!"

ফিরায়ে মলিন মুখ, চাহি দ্বৈপায়ন প্রতি,
কাতরে কহিল শৈল—“কহ ভগবান!
দুহিতার এ কামনা, শিষ্যার অন্তিম আশা,
করিবে পূরণ তুমি, তুমি পূর্ণকাম।”
কহিলা—“তথাস্তু!”—শান্ত কণ্ঠে ভগবান।
“আর এক ভিক্ষা প্রভু!”—কহিতে লাগিল শৈল
“একটি আশঙ্কা-ছায়া তব দুহিতার
পড়িয়াছে এ হৃদয়ে, কর অপসার!
সম্বরিলে নাগরাজ আপনার পুণ্যলীলা,
করি এই তীর্থে ক্রিয়া অন্ত্যেষ্টি তাহার,
—ছিন্ন সংসারের শেষ বন্ধন আমার!—
চলিলাম নাগপুরে, অনার্যের অভ্যুত্থান
নিবারিতে,—কিন্তু লীলা কে বুঝিবে তাঁর?
শুনিলাম সেনাপতি তক্ষক গিয়াছে চলি
লুঠিতে যাদব-পত্নী, যাদব-ভাণ্ডার,—
কি পাপের অভিনয় দেখিলাম আর!
এ পাপের পরিণাম—জ্বলিবে কি কুরুক্ষেত্র,
আর্যের ও অনার্যের, ভারতে আবার?
আবার অনার্য জাতি হবে, হিংস্র পশু মত,
উৎপীড়িত, বিতাড়িত, বিধ্বংসিত আর?
আবার কি নর-রক্তে যাবে ভাসি ধর্মরাজ্য?
এই প্রেম, এই শান্তি, এই সম্মিলন
আর্যের ও অনার্যের, হইবে স্বপন?”
স্থিরনেত্রে দ্বৈপায়ন শৈলজার নেত্র পানে
চাহিলেন নির্ণিমেষ। শৈলের নয়ন
চাহি শূন্যে লক্ষ্যহীন হইল অচল, স্থির;
শৈলজা যোগস্থা, শৈল প্রতিমা যেমন!
কহিলেন মহাযোগী—“ভারতের, জগতের,
দেখ মহাভবিষ্যৎ!—কি দেখিছ বল?”
উত্তরিল শৈল, স্থিরনেত্র ছল ছল,—
“বড়ই নিষ্ঠুর দৃশ্য ওই দেখিতেছি কাছে!
জ্বলিয়াছে কি দারুণ সমর অনল।
পুড়িতেছে নাগজাতি তক্ষকের মহাপাপে,
পোড়ে যথা যজ্ঞানলে পতঙ্গের দল।
দগ্ধশেষ নাগগণ, কারুর পালিত পুত্র
মহর্ষি আস্তিক-পদে লইল আশ্রয়;
ঋষি অগ্রে, অপহৃতা যাদবীর পুত্রগণ
করিল কি মহাসন্ধি, অমর অক্ষয়!
নিবি নাগ-যজ্ঞানল, কৃষ্ণ-প্রেমে চারি যুগে
হ'ল আর্য অনার্যের পূর্ণ সম্মিলন!
যে ধর্মের শুক্ল পক্ষ প্রবেশিল কুরুক্ষেত্রে,
আজি পূর্ণমাসী তার শান্তি-নিকেতন।
শিরে পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ; ভারত পূর্ণিমালোকে
সহস্র সহস্র বর্ষ যাইছে ভাসিয়া
অনন্ত উন্নতি-পথে, হৃদয়ে অভগ্ন শান্তি,
সম্মিলিত মহারক্ত শিরায় বহিয়া।
আবার সে চন্দ্রালোক ছাইল অধর্ম-মেঘে,
কর্ম,—যাগ, যজ্ঞ; ধর্ম,—স্বার্থ নির্মম!
আরবার জীব-রক্তে রঞ্জিত হইল ধরা;
যজ্ঞ-ধূম-সমাচ্ছন্ন ভারত-গগন!
স্বার্থক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অন্তর বিগ্রহানল
জ্বলিল আবার সেই ধূম্রে কি ভীষণ!
ভারতের মহাধর্ম, ভারতের মহাশক্তি,
ভারতের মহারাজ্য হইল স্বপন।
হিমাদ্রির ছায়া-তলে, মানব হিমাদ্রির মত,
মিশ্রিত ক্ষত্রিয় কুলে, পুনঃ ভগবান
আসিলা রাজর্ষি রূপে, ঘোষিলা ভৈরব কণ্ঠে
কি মহান কর্মবাদ! কি ধর্ম নির্বাণ!
নিবিল বিগ্রহানল, নিবিল সে যজ্ঞ ধূম,
নিবিল সে জীবরক্তপ্রবাহ নির্মম,
মহাকরুণার স্রোতে; বহিল ভারত প্লাবি
সেই করুণার স্রোত পতিতপাবন,
উদ্ধারি পতিত জাতি কত দেশ দেশান্তর,
সৃজি কত মহারাজ্য, উপরাজ্য কত!
মানব লভিল শান্তি সহস্র সহস্র বর্ষ;
হইল জগৎ কিবা স্বর্গে পরিণত!
কালে, দূর পর্যটনে, স্থানান্তরে রূপান্তর,
হইল যুগল ধর্ম-স্রোত তিরোহিত।
পৃথিবীর পশ্চিমার্ধ নিমজ্জিত অন্ধকারে
রহিল, রহিল অর্ধ মানব পতিত।
সুদূর সিন্ধুর তীরে আসিলেন আর বার
নব যদুকুলে, নব যদুস্থানে, হরি
শান্তিরস-অবতার! উদ্ধারিলা পশুভূমি;
ঘোর আত্ম-বলিদানে শিলা দ্রব করি।
সেই বলিদান-কাষ্ঠে জ্বলিল কি মহালোক!
দেখাইল পশুগণে দেবত্ব মহান;
এই করুণার স্রোতে তবু নর-মরুভূমি
ভিজিল না, দ্রবিল না পশুত্ব পাষাণ।
লোহিত সমুদ্র তীরে সেই মহামরুভূমে,
পাণ্ডব প্রস্থান স্থানে, আসিল আবার

সব্যসাচী-অবতার, নর ধনঞ্জয় রূপে,
মরুভূমে ভোগবতী করিয়া সঞ্চার।
মহা নব কুরুক্ষেত্র জ্বলিল পৃথিবীব্যাপী,
পশিল সে দাবানল ভারতে পতিত,—
ধর্মহীন, বলহীন, ভারত জীবনহীন,
অন্তর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জরিত।
তখন জাহ্নবী-তীরে, চারু নব বৃন্দাবনে,
আসিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার;
কি মধুর প্রেমরসে ভাসিছে ভারত ভূমি!
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার!
কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণবাস পীত ধড়া,
হয়েছে মোহন বাঁশী দণ্ড বৈরাগীর।
চন্দন হয়েছে ধূলা, প্রেমে গোরা আত্মহারা,
নয়নে যুগল ধারা প্রেম-জাহ্নবীর।
'হরিবোল! হরিবোল!'—নাচে গোরা বাহু তুলি,
ধূলায় সোনার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি।
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
প্রেমের ভিখারি প্রেম অজস্র বিতরি।
'হরিবোল! হরিবোল! গাহিতেছে নর নারী,
'হরিবোল! হরিবোল!' গায় ভাগীরথী;
"হরিবোল! হরিবোল!" গাহিতেছে পশু পক্ষী,
"হরিবোল! হরিবোল!"—গায় জলপতি।
"হরিবোল! হরিবোল!"- কি আনন্দে শৈলজার
করিল হৃদয় ক্ষুদ্র পূর্ণ উদ্বেলিত!
কি প্রেম-নয়ন-ধারা পড়িছে ভদ্রার অঙ্কে!
করিয়াছে ক্ষুদ্র দেহ মাধুরী পূরিত!
"হরিবোল! হরিবোল!"—আবার গাহিল শৈল,
"হরিবোল"—গাহিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন;
গাহিলেন পার্থ ভদ্রা—"হরিবোল! হরিবোল!"
ধীরে শান্তি সন্ধ্যা শৈল মুদিল নয়ন।
"মা! মা!"—কাঁদি ধনঞ্জয় মূর্ছিত পড়িলা বুকে;
পড়িতেছিলেন ধীরে ভদ্রা মূরছিত,
কহিলেন দ্বৈপায়ন—"সুভদ্রে! সম্বর শোক!
তব করে ধর্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত।"
সুপ্ত-উত্থিতার মত সুভদ্রা তুলিলা শির,
রহিলা চাহিয়া স্থির শৈল মুখ পানে,—
নিদ্রা যাইতেছে শান্তি আনন্দ-স্বপনে যেন!
দাঁড়াইয়া দ্বৈপায়ন নিমজ্জিত ধ্যানে।
ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
ডুবিল সিন্ধুর গর্ভে, সিন্ধু স্থির অবিচল,—
যেন নারায়ণ-বক্ষ শান্তির আলয়!
সভক্ত গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে সান্ধ্য বেলা,
ধূসরবসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—যেন নির্বাণের গতি
শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী।
সিন্ধুবক্ষে জলোচ্ছ্বাস ভক্তির উচ্ছ্বাস মত,
উঠিল, আসিল বেদিমূলে ধীরে ধীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদু, তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ি
শৈলজার দীর্ঘ কেশ ভাসিতেছে নীরে।
ভক্তির তরঙ্গ মৃদু মূর্ছিত পার্থের পদ
প্রক্ষালিছে, ধীরে পাদপদ্ম মহর্ষির;
প্রক্ষালিছে ভক্তিভরে শৈল বেদি-বিলম্বিত
পবিত্র চরাম্বুজ শৈলজা দেবীর।
বসন্তের শেষ সন্ধ্যা তমসারূপিণী ধীরে
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনীত,
ঢাকিল প্রভাস-সিন্ধু, প্রভাস-সিন্ধুর তীরে,
তামস সাগরে বিশ্ব করি নিমজ্জিত।
ধ্যানস্থ আকাশ পানে চাহিয়া মহর্ষি স্থির;
মূর্ছিত অর্জুন বক্ষে পড়ি শৈলজার;
প্রীতির প্রতিমা স্থির চাহি শান্ত শৈল-মুখে,
চাহিয়া, চাহিয়া, ভদ্রা দেখিল না আর।
যাও মা মানবী-দেবি! পূর্ণ ব্রত মা! তোমার!
যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণ ব্রত মা! আমার!
চতুর্দশ বর্ষ মা গো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে।
পাইয়াছি শোকে শান্তি; পাইয়াছি দুঃখে সুখ।
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।
ফলিয়াছে বহু আশা; ফলে নাই বহু আর;
বহিয়াছি এ জীবন আশার নিরাশার।
গীত শেষ অপরাহ্নে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে!
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী!
এই তীরে সন্ধ্যা; ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী!

—:*:—

পরিশিষ্ট

(১)

প্রভাস, অষ্টম সর্গ, ৪০ পৃঃ—

"শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া সিন্ধুমুখে কর তাঁর অনুসার,
গাহি আর্য অনার্যের গীত সম্মিলন।"

মহাভারত—মৌষল পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়,—

"এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জন বন প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্র সংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্য নদী সমুদয়, জলপতি বরুণ এবং ককোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্মুখ ও অম্বরীষ প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমন পূর্বক স্বাগত প্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন।"

যদি ইহা রূপক না হয়, যদি ইহার অর্থ বলরামের কতিপয় নাগসহ সমুদ্রযাত্রা না হয়, তবে কি?

Tod's "Rajasthan", Chap. II. Foot note

"Arrian notices the similarity of the Theban and the Hindu Hercules and cites as authority the ambassador of Seleucus, Megasthenes, who says, 'He uses the same habit with the Theban and is particularly worshipped by the Saraseni, who have two great cities belonging to them, namely Methoras (Mathura) and Clisoboras.

"Diodorus has the same legend with some variety. He says, 'Hercules was born among the Indians' * * (Hari-cul-es) = lord of the race (cula) of Hari, of which the Greeks might have made the Compound Hercules. Might not a colony after the great war have migrated westward? The period of the return of the Heraclidæ, the descendants of Atreas (Atri is progenitor of Haricula), would answer; it was about half a century after the great war."

শ্রীকৃষ্ণের বংশের পুরাণের নাম "হরিবংশ"। তাঁহার কুলের নাম তবে হরিকুল। হরিকুলের নেতা বা ঈশ্বর হরিকুলেশ; গ্রীক Hercules. প্রভাস লিখিবার সময় কবি মহাভারতের উপরোক্ত ইঙ্গিত ও গ্রীক ইতিহাস আলোচনা করিয়া যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন অতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ও চিরস্মরণীয় টড্‌ও যে এরূপ বলিয়া গিয়াছেন তিনি জানিতেন না।

(২)

প্রভাস—দ্বাদশ সর্গ, ৬২ পৃঃ—

"লোহিত সাগর তীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে পশ্চিমে সুদূর।
* * *
পূরব উত্তর তীরে লবণ সিন্ধুর।"

মহাভারত, মহাপ্রস্থানিক পর্ব প্রথম অধ্যায়,—"অনন্তর তাঁহারা (পাণ্ডবেরা) ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন…… অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

Bible. Genesis, Chapter XI.

And the whole earth was of one language, and of one speech.

2. And it came to pass, as they journeyed from the East that they found a place in the land of Shenar."

পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান কল্যব্দানুসারে খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ বৎসরে সঙ্ঘটিত হয় এবং বাইবল অনুসারে নোয়ার, বা টড্ মহোদয়ের মতে বৈবস্বত মনুর, সন্তানগণের পশ্চিমাভিমুখে অভিযান প্রায় সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

Chap. XII.

"Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee.

2. And I will make thee a great nation and I will bless thee, and make thy name great and thou be a blessing.

4. So Abram departed ·····and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haræ."

আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের গণনানুসারে মহাপ্রস্থান খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যদি তাহা হয়, তবে দেখা যাইতেছে বাইবলানুসারে এব্রামের অভিযান খৃঃ পূঃ প্রায়ই সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহাতে দ্রৌপদী ও চারি পাণ্ডবের ক্রমান্বয়ে মৃত্যু বর্ণনা আছে, যে উপাখ্যান তাহা পড়িলেই বোধ হয়। উহা বাদ দিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের দুইটি মহাঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগতপূজ্য কবি মহাভারত শেষ করিয়াছিলেন।

(১) বলরামের আত্মা সর্পরূপে প্রভাস সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল।

(২) পাণ্ডবগণ একটি কুক্কুর (যদুকুলের কুক্কুর শাখা) সহ "অসংখ্য দেশ, নদী, সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগর কূলে" ও "লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরে" গমন করিলেন।

এরূপে যদুকুলের বা হরিকুলের দুই শাখার জল ও স্থলপথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবার ইঙ্গিত পাইতেছি। অন্য দিকে গ্রীক ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি পূর্ব দিক হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস (হরিকুলেশ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন ; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে এক দল ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্ব দিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশান্বেষণ করিতেছেন। "লোহিত সাগরের" পূর্ব তীরে মহম্মদের লীলা-ভূমি আরব দেশ, এবং "লবণ সমুদ্রের" বা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে খৃষ্টের লীলা-ভূমি যুদিয়া, উত্তর তীরে গ্রীস। সংস্কৃত যদু শব্দের উচ্চারণ ইহুদি শব্দের মত ; ইহুদিদের দেশের নাম যুদিয়া। খৃষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য সাদৃশ্য! খৃষ্ট জন্মিবেন, তাহা ভারতীয় অঘোরী সন্ন্যাসীর মত পূর্ব দিক হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পূর্বে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি যে জন্মিয়াছেন, তাহাও পূর্ব দিক হইতে জ্ঞানীরা গিয়া প্রচার করেন। আরও দেখিতেছি কি গ্রীসে, কি যুদিয়ায়, কি আরবে, ভারতীয় প্রতিমা পূজার মত প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ চেষ্টা করিলে এরূপ অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এ সকল সাদৃশ্যের মধ্যে কোনও রূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে কি? না থাকে কাব্যকারের ক্ষতি নাই। তাঁহার পথ মুক্ত। প্রভাসের কবির পক্ষে মহাভারতের দুইটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পার্শ্বে বলদেবের ও সুভদ্রা দেবীর পূজা কেন, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

(হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শে নবীনচন্দ্র এই 'পরিশিষ্ট' 'প্রভাস' কাব্যের শেষে সংযোজিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত 'নবীনচন্দ্র-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। —সম্পাদক